চায়ক, পাঠকের পক্ষে বিরক্তিজনক এবং সমালোচকের পক্ষে—মারাত্মক। তবু নিসর্গবর্ণনা কাব্যের একটা অঙ্গ বটে; কিন্তু কাব্যসূচনা, বাগ্দেবতার আরাধনা, ভারতীপ্রার্থনা, কল্পনার উপাসনা, বাল্মীকির কবিশ্রেষ্ঠত্ব,কালিদাসের মহাকবিত্ব, মাইকেলের পরলোক, অকালমৃত্যুজন্য শোক, ভর্তৃহরির স্তব, জয়দেবের মহিমা-কীর্ত্তন, ভবভূতির বন্দনা—এ সকলের দ্বারা কাব্যের যে কি উপাদেয়তা বৃদ্ধি হইতে পারে, আমরা সর্গমর্ত্তারসাতল খুঁজিয়া পাই না।

প্রতি সর্গের শেষেই একবার পণ্ডিতমণ্ডলীর কাছে "সগল-বসনে মুদি যোড কর" করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আমরা এই বলিতে চাই যে, যিনি এত বড় একখানি কাব্য লিখিতে বসিয়াছেন, যিনি বাগ্দেবীর কাছে "কবিত্ব বিমল নভে মাধ্যন্দিন ভানুমান্"হইবার প্রার্থনা করিয়াছেন, তাঁহার একটু আত্মাদর, একটু অহঙ্কার থাকা উচিত। নম্রতা, বিনয়, এ সকল মন্দ নহে, কিন্তু কথায় কথায় কাকুতি মিনতি করা ভাল দেখায় না। যার তার হাতে পায়ে ধরিতে গেলে সম্ভ্রম থাকে না।

গ্রন্থকার আপনি স্বীকার করিয়াছেন যে তিনি মাইকেলের চেলা; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি জয়দেবের চেলা। জয়দেবের সেই ললিত-লবঙ্গ-লতা-পরিশীলন-কোমল-মলয়-সমীরের ন্যায় মধুর কোমল কান্ত পদাবলী, আর গোপাল বাবুর এই দাঁত ভাঙ্গা শব্দবিন্যাস তুলনা করিলে আপাততঃ এ কথায় অনাস্থা হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু একটু বুঝিয়া দেখিলেই ইহার সত্যতা হৃদয়ঙ্গম হইবে। জয়দেবের ন্যায়, গোপাল বাবু বিলক্ষণ কল্পনাশালী ব্যক্তি; এবং জয়দেবের ন্যায় গোপাল বাবুর কল্পনা মার্গৈকপ্রোহিত—যত কারিগরি বাহ্যজগৎ লইয়া, অন্তর্জগতের উপর বড় একটা দৃষ্টি নাই। সূর্য্যরশ্মির প্রফুল্লতা, বসন্তপবনের মধুরতা, সায়াহ্নগগনের সৌন্দর্য্য, নবকুসুমিতা লতার সৌকুমার্য্য, এ সকল চিত্রিত করিতে গোপাল বাবু বিলক্ষণ পারগ—জয়দেব অভ্রান্ত। কিন্তু প্রণয়ের উন্মত্ততা, নৈরাশ্যের কাতরতা, শৌর্য্যের মহত্ত্ব, অনুরাগের চাঞ্চল্য, এ সকল চিত্রিত করিতে গুরুশিষ্য কাহারও তুলি চলে না। জড়জগতের ভীম ভঙ্গী সকল চিত্রিত করিতে জয়দেব চেষ্টা করেন নাই, গোপাল বাবু চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হয়েন নাই। জয়দেব আত্মশক্তি বুঝিতেন, গোপাল বাবু হয় ত বুঝেন না;—জয়দেব গুরু, গোপাল বাবু চেলা। অন্তর্জগতের উপর দৃষ্টি না থাকিলেও বাহ্যপ্রকৃতির সঙ্গে লেখকের বিলক্ষণ সহানুভূতি আছে এবং নিসর্গসৌন্দর্য্য তিনি প্রেমিকের চক্ষে দেখেন—যে চক্ষে ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ দেখিতেন সেই চক্ষে গোপাল বাবু দেখেন—অনেক ভঙ্গী, যাহা অপ্রেমিকের চক্ষে পড়ে না,গোপাল বাবুর চক্ষে

পড়ে, এবং তিনি তাহাতে মুগ্ধ হইয়া যায়েন—শত মুখে, সহস্র মুখে তাহা ব্যক্ত করেন। সামান্য কথা লইয়া কেন এত আড়ম্বর, তাহা প্রেমিক যে, সে বুঝিবে—সকলে বুঝিবে না।

অন্তর্জগতের উপর দৃষ্টি না থাকিলে যে দোষ ঘটে, তাহা এই গ্রন্থেও ঘটিয়াছে—একটী চরিত্রও উত্তমরূপে সংরক্ষিত হয় নাই। দশরথকে দেখ। যখন ভার্গব সেই দুর্জ্জয় কার্ম্মুক রামচন্দ্রের হস্তে দিলেন, তখন রাজা দশরথ পুত্রবিয়োগাশঙ্কায় অত্যন্ত কাতর হইলেন—অনেক বিলাপ করিলেন—শেষে মূর্চ্ছা গেলেন। রাজা দশরথ স্বয়ং বীর পুরুষ, তাঁহার মূর্চ্ছা যাওয়া ভাল হয় নাই। একটু ভয়, একটু আশঙ্কা, হয় হউক, তাহাতে আমাদের বিশেষ আপত্তি নাই, কিন্তু মূর্চ্ছাটা বড় অসঙ্গত। রামায়ণের দশরথ মূর্চ্ছিত হয়েন নাই।

আবার পরশুরামকে দেখ। ভার্গব বিজয়ের পরশুরামকে দেখিয়া আমাদের সেই চিরপরিচিত পরশুরাম বলিয়া চিনিতে পারিলাম না। রামায়ণের পরশুরাম,—মহাবীর, মহাতপস্বী, উন্নতচিত্ত, প্রশস্তহৃদয়। তিনি যখন ক্রোধোদ্দীপ্ত হইয়া সিংহনাদ করেন, তখন সুরাসুর কম্পিত হয়, বায়ু স্তম্ভিত হয়, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ উপগ্রহ পথ হারা হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। আর গোপাল বাবুর পরশুরাম—যদি বিশেষণ পদ দ্বারা তাঁহার চিত্র আঁকিতে হয়, তবে এই রূপ লিখিতে হয়—কুভাষী, অভদ্র, মুখসর্ব্বস্ব দাম্ভিক, নির্লজ্জ, অসার, দুর্বিনীত এবং অনবস্থিতচিত্ত। তিনি যখন আত্ম বীর্য্য খ্যাপন করেন, আমাদের হাসি পায়, যখন দুর্ব্বাক্য ব্যবহার করেন, পড়িতে লজ্জা হয়। বীরের মুখে, ঋষির মুখে তেমন কথা আসে না। রামচন্দ্রের প্রতি যে সকল বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা ভদ্র লোকের অব্যব হার্য্য।

কেহ, সেই নবাগত দেখি শীল দেখাসে,—
ধূর্ত ডমরু সম ভয়ে দূরে গেল
লাঙ্গুল গুটায়ে, পাপ।

রামায়ণের পরশুরামে এরূপ ইতরতা নাই। তিনি রামচন্দ্রের সঙ্গে যেরূপ সম্ভাষণ করিয়াছেন, তাহা বীরের ন্যায়, মহতের ন্যায়, পরশুরামের ন্যায়—দূরশ্রুত জলদনিনাদের ন্যায় ধীর, গম্ভীর এবং ভয়ঙ্কর—

রাম। দাশরথে। বীর। বীর্য্যং তে
শ্রূয়তেঽদ্ভুতং।

* * * *

তদিদং ঘোরসঙ্কাশং জামদগ্ন্যং মহদ্ধনুঃ।
পূরয়স্ব শরেণৈব স্ববলং দর্শয়স্ব চ ॥
তদহং তে বলং দৃষ্ট্বা ধনুষোঽপ্যস্য
পূরণে।
দ্বন্দ্বযুদ্ধং প্রদাস্যামি বীর্য্যশ্লাঘ্যমহং তব ॥

রসাবতারণায় আমাদের কবি সকল স্থানে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তাঁহার রসে সজীবতা নাই। পরশুরাম আসিয়া বীররসের কত কথাই বলিলেন,

তিন সর্গ ব্যাপিয়া বীরদর্পে বীরবাক্য কতই উচ্চারিত করিলেন, কিন্তু এত বীররসের মধ্যে আমাদের এক বিন্দুও শোণিত উষ্ণতর হইল না—পড়িতে পড়িতে একবারও আমাদের রোমাঞ্চ হইল না, একবারও একটু উৎসাহ অনুভব করিলাম না। আবার সীতা যখন পীরিতের ফাঁদ পাতিয়া বলিতে লাগিলেন,

জগতে তোমার সনে মিলে না তুলনা।
তোমার উপমা, দেব, তুমিই ভুবনে।
তোমার বিক্রম সাজে তোমার বিক্রমে,
তোমার বদন যেন তোমার বদন,
তোমার নয়ন, নাথ, তোমার নয়ন,
বামের সুতনু সম বামের সুতনু।

তখন আমরা কোন রূপ কোমলতা অনুভব করিলাম না। কেমন বোধ হইল, যেন এ কথাগুলি সীতা বাড়ী হইতে কণ্ঠস্থ করিয়া আসিয়াছিলেন, এতক্ষণ সময় প্রাপ্ত হয়েন নাই বলিয়া বলা হয় নাই—বোধ হইল যেন "তোমার তুলনা তুমি প্রাণ এ মহীমণ্ডলে" এই গীতটি সীতা জানিতেন, সময় পাইয়া তাহার দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করিলেন। দ্বিতীয় সংস্করণ, সুতরাং হাল আইনানুসারে, পরিশোধিত এবং পরিবর্দ্ধিত।

নিসর্গ বর্ণনার অবতারণাতেও স্থানে স্থানে রসভঙ্গ হইয়াছে। কোথাও উপমা সংযোজনে বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে—তৃতীয় সর্গের প্রথম পাঁচ ছত্র ইহার প্রমাণ। আমাদের কবি একই নিশ্বাসে সূর্য্যদেবকে একবার "প্রাচীদিক্ অধীশ্বরীর সীমন্ত মুকুট হৈম শিখামণি" বলিয়াছেন, আবার "জগৎলোচন" বলিয়াছেন পুনরায় আবার তাঁহারই গলে "সমুজ্জ্বল মালা" দোলাইয়াছেন। তবে মালার সম্বন্ধে এই এক কথা আছে, যে উহা জগৎলোচনের গলে, কি দিক্ অধীশ্বরীর গলে, তাহা ঠিক বুঝা যায় না।

কোথাও বা অলঙ্কারদোষ ঘটিয়াছে—
———"বিমণ্ডিত
কুসুম স্তবক ভারে"

যে ভার দ্বারা বিমণ্ডিত হওয়া যায়, তাহাকে ভার বলা ভাল হয় নাই। এক আধ স্থলে অশ্লীলতা দোষও ঘটিয়াছে—দৃষ্টান্ত, ১৫৯—১৭০ ছত্রদ্বয় এবং ২৩৫—২৩৮ ছত্র চতুষ্টয়, তৃতীয় সর্গ। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে "শাবগণ সনে" থাকায় কিঞ্চিৎ হাস্যজনকও হইয়াছে।

স্থানে স্থানে উপযোগিতা রক্ষিত হয় নাই। তপোবন বর্ণনায় এক স্থলে লিখিত হইয়াছে,

বাজিছে বিবিধ বাদ্য সংগীত সংহতি
মুরজ মন্দিরা বীণা মুরলী রসাল,

আবার, অন্য স্থলে, তপোবনস্থ লতা পাদপ মৃদু পবনে দুলিতেছে—কেমন?—

লাসিকা ললনা যথা লাস্য লীলা করে।

তপোবনে মুরজ মন্দিরা প্রভৃতির ধ্বনি, তপোবন বর্ণনায় উপরি উদ্ধৃত উপমার সমাবেশ বড় অসঙ্গত হইয়াছে—অশ্বমেধ যজ্ঞে যেন খেমটার নাচ হইয়াছে, দেবর্ষি নারদ যেন চাবির শিকল পরিয়াছেন! আমরা একবার কাব্য

শুনিতে গিয়াছিলাম, নকীব শ্যামা বিষয়ক গান গাইতে গাইতে 'স্বজনিলো' বলিয়া রাগিণীটা নিয়াছিল, তাহা আমাদের মনে পড়িল।

গ্রন্থের ভাষার আমরা প্রশংসা করিতে পারিলাম না। যাঁহারা সংস্কৃত জানেন না তাঁহাদের পক্ষে এ গ্রন্থ বুঝা সুকঠিন। যাঁহারা অল্পসংস্কৃত জানেন তাঁহাদিগকেও পাঠকালে বোধ হয় একখানি অভিধান কাছে করিয়া বসিতে হইবে। এরূপ দুরূহ, দুর্ব্বোধ্য, ক্লেশোচ্চার্য্য শব্দ সন্নিবেশ করিলে গ্রন্থের সাধারণে আদর হয় না। তরুণেরা কিছু শব্দাডম্বরপ্রিয় হইয়া থাকেন, কিন্তু এ গ্রন্থে বড় বেজায় বাড়াবাড়ি করা হইয়াছে, এবং তন্নিবন্ধন রচনার উপাদেয়তা অনেকটা নষ্ট হইয়াছে—"এনীশাবলেখাঙ্কিন হিমধামাননা" না বলিয়া যদি "অকলঙ্ক শশিমুখী" বলিতেন, আমরা পরম আপ্যায়িত হইতাম।

ভাষার এই জটিলতা কিয়ৎপরিমাণে অলঙ্কারপ্রিয়তার ফলও বটে—অনুপ্রাস এবং মালোপমার দায়ে অনেক স্থান দুরধিগম্য হইয়া পড়িয়াছে। স্থানে স্থানে অলঙ্কারাধিক্য নিবন্ধন ভাব স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইতে পায় নাই—সোণা রূপার ভারে সংকুচিত, জড়সড়, কাতর, অর্দ্ধ লুক্কায়িত, নির্জ্জীব ভাবে রহিয়াছে। গ্রন্থকারকে এই বলিতে চাই, যে পায়ের নখ হইতে মাথার চুল পর্য্যন্ত সোণা রূপায় ঢাকিয়া দেওয়া অপেক্ষা একখানা জড়াও গহনা ভাল—সুন্দর, সুরুচিপরিচায়ক, মূল্যবান্ এবং সম্ভ্রান্ত। কিন্তু এ বয়সের দোষ বয়সে সারিয়া যাইবার সম্ভব।

গ্রন্থকার কল্পনাশালী ব্যক্তি বটেন। ভার্গববিজয়ের অনেক স্থলে তাহার পরিচয় আছে, দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা রাঘব-বৈবাহ লক্ষ্মীর বর্ণনার উল্লেখ করিতে পারি—ইহা নির্দ্দোষ না হইলেও সুন্দর বটে। গ্রন্থকারের কবিত্বও বিলক্ষণ আছে, তবে কি না, যাহা বলিয়াছি তাই—এক তরফা, দৃষ্টি কেবল বাহ্য জগতের উপর, অন্তর্জ্জগতের সঙ্গে ভাল পরিচিত নহেন। যাহাই হউক, গোপাল বাবু জয়দেবের শিষ্য বলিয়া পরিচিত হইবার যোগ্য বটেন, সন্দেহ নাই।

অমিত্রাক্ষর পদ্য রচনায় গোপাল বাবুর বিলক্ষণ পারদর্শিতা আছে; তবে দুই এক স্থানে যে নিতান্ত গদ্যের ন্যায় হইয়া পড়িয়াছে তাহা মার্জ্জনীয়। গ্রন্থকার যে তরুণবয়স্ক এবং ভার্গববিজয় যে তাঁহার কবিত্বতরুর প্রথম ফল তাহা যে কেহ গ্রন্থখানি পড়িবেন তিনিই বুঝিতে পারিবেন। গ্রন্থকারের নবীনত্ব বিবেচনা করিলে আমরা আশাতিরিক্ত ফল পাইয়াছি বলিতে হইবে। তাঁহার রচনার গাম্ভীর্য্য, স্থৈর্য্য এবং অবিচলিত ধীরা গতির আমরা প্রশংসা করি এবং ভরসা করি গ্রন্থকার অনতিবিলম্বে ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর গ্রন্থ সমালোচনার্থ আমাদের হাতে অর্পণ করিয়া আমাদিগকে সুখী করিবেন।

ইয়াং বাঙ্গালির সামাজিক বুদ্ধি ।

প্রথম প্রস্তাব ।

ঢাকা শিক্ষাসভার মেম্বর শ্রীযুক্ত বাবু তারিণীপ্রসাদ ঘোষ বিএ, ইংরেজিতে একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। 'শিক্ষা-বিভাগের একজন কর্ম্মচারী কয়েক মাস হইল প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, বিবাহিত ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে না দিলে বাল্যবিবাহ কতক নিবারণ হইতে পারে। এই প্রস্তাবনার মূল কয়েকজন বাঙ্গালি। তারিণী বাবু সেই সকল বাঙ্গালিদের বুঝাইবার নিমিত্ত গ্রন্থ লিখিয়াছেন।' কিন্তু তাঁহারা বুঝিবেন কি না সে বিষয়ে আমাদের বড় সন্দেহ আছে। তাঁহারা মনে করেন তাঁহাদের মতামত তাঁহাদের নিজের। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। তাঁহারা অন্যের অনুগামী। বড়লোকের মত যত দিন না ফেরে তত দিন তাঁহাদের মত ফিরবার আশা করা বৃথা।

তাঁহাদের স্থিরবিশ্বাস যে বাল্যবিবাহ আমাদের অনিষ্ট করিতেছে। হয় ত বাস্তবিক অনিষ্ট করিতেছে। কিন্তু তাঁহাদের এ বিশ্বাস ইংরেজ হইতে। ইংরেজদের মধ্যে বাল্যবিবাহ চলিত নাই, বাঙ্গালিরা মনে করেন যে বাল্যবিবাহ অনিষ্টকর বলিয়া ইংরেজদের মধ্যে তাহা চলিত নাই। ইংরেজরা বলেন যে বাল্যবিবাহে সন্তান স্বল্পজীবী হয়, জনকজননীর দেহ রুগ্ন হয়। বাঙ্গালিরা মনে করেন তাহা আমরা স্পষ্ট দেখিতেছি। কিন্তু স্পষ্ট দেখার কথা কতক সন্দেহের বিষয়। মনুর সময় অবধি পশ্চিমরাজ্যে বাল্যবিবাহ চলিয়া আসিতেছে কিন্তু কেহ কখন ইহার কুফল স্পষ্ট দেখেন নাই। তাঁহারা বলেন ইহার কুফল বাঙ্গালায় অতি স্পষ্ট, অধিবাসীরা দিন দিন দুর্ব্বল ও স্বল্পজীবী হইয়া যাইতেছে। দুর্ব্বল দিন দিন হইয়া যাইতেছে কি না তাহা আমরা জানি না কিন্তু বাঙ্গালিরা যে দুর্ব্বল তাহার আর সন্দেহ নাই। হিন্দু মুসলমান ফিরিঙ্গী যে জাতিই পুরুষানুক্রমে বহুকাল বাঙ্গালায় বাস করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ থাক আর নাই থাক, সেই জাতিই দুর্ব্বল হইয়াছে। বাঙ্গালার গরু, বাঙ্গালার ছাগ, বাঙ্গালার ঘোটক সকলই খর্ব্বকায় ও দুর্ব্বল। চতুষ্পদদিগের এই দৌর্ব্বল্য কোথা হইতে আসিল? বাল্যবিবাহের দোষে নহে।

বাল্যবিবাহের মত সমর্থন করিবার নিমিত্ত আমরা এই সমালোচনা করিতে বসি নাই। লিখিতে গিয়া এ বিষয়ে ভ্রমবলেখকের মত স্মরণ হওয়ায় কয়েকটি কথা ভ্রমর হইতে উল্লেখ করিতেছিলাম। অপুষ্টদেহে সন্তান উৎপাদিত হইলে সন্তান দুর্ব্বল হইবার যে সম্ভাবনা

তাহা সত্য। অনেকেই জানেন বৃক্ষাদির বাল্যবিবাহ আছে। অনেক স্থলে মধুমক্ষিকা তাহার ঘটক। মক্ষিকারা পুরুষ-বৃক্ষ হইতে রেণুরূপী বীজ অজ্ঞাতে বহন করিয়া স্ত্রীবৃক্ষের ফুলে মধু সংগ্রহ করিতে বসে, তাহাদের পক্ষ হইতে রেণু যদি মধু সংস্পর্শ করে তাহা হইলে বালিকাবৃক্ষের গর্ভ হয় অর্থাৎ কড়ায়া বা গুটি বাঁধে, যে সকল মালি বাল্য-বিবাহের বিরোধী তাহারা ইহা নিবারণ করিবার নিমিত্ত বালিকাবৃক্ষের মুকুল ভাঙ্গিয়া দেয়। কিন্তু বনে মালি নাই, তথায় বলপূর্ব্বক বৃক্ষের গর্ভপাত কেহ করায় না, কাজেই বালিকাবৃক্ষের ফল ধরে। ফল গুলি ক্ষুদ্র আকার অধিকাংশই ঝরিয়া যায় কিন্তু তাহাতে বনের কোন ক্ষতি হয় না। বৃক্ষেরও অভাব থাকে না ফলেরও অভাব হয় না। কিন্তু তথাপি মধুমক্ষিকারা বড় গুরুতর অপরাধী, তাহাদের প্রবেশিকা পরীক্ষার বিষয় শীঘ্র বন্দোবস্ত হইবে অর্থাৎ তাহাদের পাখা ঝাড়া না লইয়া তাহাদের আর পুষ্পে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না।

নারিকেল সম্বন্ধে বোধ হয় সকলেই দেখিয়াছেন যে বালিকাবৃক্ষের সুপক্ক নারিকেলের সারভাগ অতি সামান্য ও অপুষ্ট। যত্নে গৃহে রাখিলেও অন্য বৃক্ষের নারিকেলের ন্যায় তাহা দীর্ঘকাল থাকে না, শীঘ্র পচিয়া যায়। এই জন্য অনেকে বলেন বৃক্ষের প্রথম অবস্থায় নারিকেল না হইতে দেওয়াই ভাল। ভাল তাহার সন্দেহই নাই। স্বভাবের কুনিয়ম অনেক আছে, তাহা সমুদয় সংস্কার করা নিতান্ত আবশ্যক। যখন ইংরেজি অধ্যয়ন হইতেছে তখন পৃথিবীর নিয়মাবলী যে শীঘ্র সংশোধন করিতে পারা যাইবে এমত ভরসা অনেকে করিয়া থাকেন।

যাঁহারা এরূপ ভরসা করেন তাঁহারা প্রকৃত সাহসী ও অনেক সময় দেখা যায় বাস্তবিক কার্য্যপটু। সকল দেশেই এরূপ কৃতকর্ম্মা লোক আছে, তবে কোন দেশে অধিক, কোন দেশে অল্প। বোধ হয় ফ্রান্স ও মার্কিন দেশে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সমাজ ভাঙ্গা গড়া ইঁহাদের প্রধান কার্য্য। কোন সমাজপ্রথাই ইঁহাদের মনে ধরে না। কি পরিবর্ত্তন করিবেন এই তাহাদের সতত চেষ্টা। অনেক সময় সেই চেষ্টায় গুরুতর অনিষ্ট ঘটে। কারণ সমাজতত্ত্ব বুঝিতে অনেক বিলম্ব আছে।

হঙ্গেরী দেশে এই দলের লোকেরা এক সময় বিবেচনা করিলেন লোকের যে দৈন্যদশা দেখা যায় তাহা কেবল বিবাহের দোষে। যাহাদের বিশেষ ধনসম্পত্তি নাই, তাহারা বিবাহ করিলে সন্তানসন্ততি কষ্ট পায়, সন্তান প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত তাহারা চুরি পর্য্যন্ত করে। অতএব দীনদুঃখীর বিবাহ বন্ধ করা নিতান্ত আবশ্যক। এই সম্বন্ধে মহা চীৎকার আরম্ভ হইল, আমাদের দেশে কয়েকজন বাঙ্গালি বাল্যবিবাহ লইয়া যেরূপ চীৎকার আরম্ভ করিয়াছেন হঙ্গেরীর যুবারা সেইরূপ.

কোলাহল করিতে লাগিলেন। শেষ, আইন হইল যে লোকে ধনবান্ না হইলে বিবাহে অধিকারী হইবে না। যুবাদের আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। তাঁহারা মনে করিতে লাগিলেন যে এই আইনের দ্বারা তাঁহাদের রাজ্যের সকলেই ধনবান হইবে। বাভেরিয়া রাজ্য এইবার সর্ব্বপ্রধান হইবে। এবং তাঁহাদের কীর্ত্তি জগৎব্যাপ্ত থাকিবে।

কিন্তু দুরদৃষ্টবশতঃ এ সকল কিছুই হইল না অল্প দিনের মধ্যে অতি বিপরীত ফল ফলিল। ঐ রাজ্যের নির্দ্ধনের আর বিবাহ হইল না সত্য, কিন্তু তথাপি তাহাদের সন্তান হইতে লাগিল। সে সকল অবিবাহিত অবস্থার সন্তান। এক মিউনিচ নগরে যত সন্তান জন্মিল তাহার অর্দ্ধেক জারজ।

এইরূপ ঘটনা অনেক আছে। সংস্কার করিতে গিয়া অদূরদর্শী লোকেরা সমাজের এইরূপ অনেক অনিষ্ট ঘটাইয়া থাকেন। তাহা বলিয়া তাঁহাদের নিন্দা করি না। কেহই একান্ত অভ্রান্ত নহেন, বরং তাঁহারা আপনাদিগকে অভ্রান্ত বিবেচনা করিয়া কার্য্য করেন এই তাঁহাদের এক বিশেষ গুণ। আপনাকে ভ্রান্ত মনে করিয়া কার্য্য করিতে গেলে একাগ্রতা জন্মে না।

এই শ্রেণীর লোক, ভালই হউন মন্দই হউন, বাঙ্গালায় বড় নাই। এখানে আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, ইংরেজেরা তাঁহাদের সম্প্রতি ইয়াং বেঙ্গাল বলিয়া থাকেন। তাঁহারাই মনে করেন যে যখন ইংরেজি অধ্যয়ন আরম্ভ হইয়াছে তখন স্বভাবের যত কুনিয়ম দেখা যায় সে সমুদয়ের উচ্ছেদ হইবে। তাঁহারাই মনে করেন প্রবেশিকা পরীক্ষা প্রজাপতির দ্বারস্বরূপ, তথায় পাহারা বসাইতে পারিলে বাল্যবিবাহ সাগরপারে পলাইবে। আসল কথা, তাঁহারা বড় চিন্তাশীল নহেন, তাঁহারা নিজে বিবেচনা করিয়া কোন কার্য্য উদ্ভাবন করিতে পারেন না। যাহা কিছু তাঁহারা করেন সকলই অন্যের অনুকরণ মাত্র, অনুকরণ মন্দ নহে, তদ্দ্বারা উন্নতিসাধন হয় কিন্তু তাঁহাদের চিন্তাশীলতা এতই অল্প যে কোন বিষয় অনুকরণীয় আর কোন্‌টি বর্জ্জনীয় তাহা তাঁহারা প্রায় একেবারে বুঝিতে পারেন না, এই জন্য সচরাচর তাঁহারা সাহেবদিগের নিকট ঘৃণিত।

বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে এই দলের প্রধান আপত্তি যে তদ্দ্বারা মনুষ্য অল্পায়ু হয়, দেহ ক্ষয় হয়। কিন্তু মদ্যপানেও ত তাহা হয়, অথচ তাঁহারা কেহ বলেন না যে, যে ছাত্র মদ্যপান করিয়াছে তাহাকে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে দেওয়া হইবে না। ইংরেজদের মধ্যে মদ্যপান আছে এই জন্য ইয়াং বাঙ্গালিরা মদ্যপান নিষেধ করেন না, বরং আপনারা তাহা পান করিয়া আরও উৎসাহ বর্দ্ধন করেন। ইংরেজদের মধ্যে বাল্যবিবাহ নাই, কাজেই ইয়াং বাঙ্গালির নিকট বাল্যবিবাহ দোষের হইয়াছে। তাহাই বলিতেছিলাম যে ইয়াং বেঙ্গাল

কেবল অনুকরণপ্রিয়, চিন্তাশীলতা তাঁহাদের কিছুমাত্র নাই।

আমাদের দেশে ইয়ং বাঙ্গালির সংখ্যা অল্প, এত অল্প যে তাঁহাদের কোন কার্য্য বঙ্গসমাজের অন্তর স্পর্শ করে না। তাঁহারা বঙ্গসমাজের বাহিরে বাহিরে চলেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গমালা সাগর সম্বন্ধে যেরূপ, ইহারা বঙ্গসমাজ সম্বন্ধে সেইরূপ। তরঙ্গ সাগরের কেবল উপরে ভেসে উপরে লম্ফ ঝম্প করে, ফেনা প্রক্ষেপ করে, ক্ষুদ্র কীটেরা সেই ফেনার আশ্রয় লয়। তরঙ্গের কতই আস্ফালন, কতই গর্জ্জন, কতই গলাবাজি কিন্তু সাহস করিয়া নিকটে যাও পদে আছড়াইয়া পড়িবে। স্পর্শ কর দেখিবে অতি মসৃণ কোমল জল মাত্র।

ইংরেজেরা ইহাদিগকে ইয়াং বেঙ্গাল অর্থাৎ নূতন বাঙ্গালি বলেন। বস্তু বাস্তবিক ইহারা নূতন নহেন। সম্প্রতি ইংরেজ আসিয়াছেন বলিয়া ইংরেজি শিক্ষায় যে এই দল জন্মিয়াছে এমত নহে এই দল বাঙ্গালায় চিরকাল আছে। মুসলমানের সময় সাত শত বৎসর পর্য্যন্ত ইহাদিগকে অবিকল এই রূপ ক্রীড়া করিতে দেখা গিয়াছে। ইহারাই তখন সর্ব্বাগ্রে "মের্জ্জাই" পরিয়া নেড়া সাজিয়াছিলেন, চুড়িদার বাউরি করিয়াছিলেন, হাতে মেন্দি মাখিয়াছিলেন "কুর্নিস" অভ্যাস করিয়াছিলেন। ইহারাই শকাব্দ ছাড়িয়া মহাম্মদাব্দ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহারাই মুনসী মুখতার বা মসীশ্বর বা বলিয়া ছিলেন। ইহারাই "জানানা" মহলে অগ্রে চাবি দিয়াছিলেন। এক্ষণে ইংরেজ আসলে ইহারাই অগ্রে মের্জ্জাই ছাড়িয়া সার্ট পরিয়াছেন, চুল ছাঁটিয়াছেন, "জানানা মহলে" চাবি খুলিতেছেন, শকসন ত্যাগ করিয়া "এই উনবিংশ শতাব্দী" বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, কুর্নিস ত্যাগ করিয়া মাথা নাড়িতেছেন, রাজা প্রজা সমান বলিতেছেন।

যাঁহাদের বঙ্গসমাজের তরঙ্গস্বরূপ বলিয়া পরিচয় দিলাম আমরা তাঁহাদের সম্পূর্ণ নিন্দা করি না। তাঁহাদের দ্বারা অনেক সময় অন্যের কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে। চৈতন্য তাঁহাদেরই দ্বারা বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। এই দলের লোক বাঙ্গালায় না থাকিলে তিনি কতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন তাহা বলা যায় না। কেবল অনুকরণপ্রবণতা গুণের নিমিত্ত যে এই ব্যক্তিরা অন্যের হস্তগত হইয়া পড়েন এমত নহে তাঁহারা নূতন ভাল বাসেন, যাহা কিছু নূতন দেখেন বা শুনেন তাহাই ভাল বলিয়া গ্রহণ করেন। এই জন্য ইহারাই প্রথম বৈষ্ণব হন। ইহারাই আবার প্রথম খ্রীষ্টান হইতে আরম্ভ করেন। এতদিন সকলেই খ্রীষ্টান হইয়া পড়িতেন কেবল সময়মত ব্রাহ্মধর্ম্ম উপস্থিত হওয়ায় ইহারা সে পথ হইতে বিরত হইয়াছেন।

আপাততঃ কিছু নূতন নাই। ইংরেজি খানা, ইংরেজি পোষাখ পুরাতন হইয়া পড়িয়াছে। শিল্পসাহিত্য সম্বন্ধে যাহা

হউক, নতুবা ইংরেজদের সকল বিষয়েই একপ্রকার অনুকরণ হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে আর দিন কাটে না। তাহাই আর ইয়াং বাঙ্গালিদের সম্বন্ধে কোন নূতন ব্যাপার শুনিতে পাওয়া যায় না। তবে কেহ কেহ অর্দ্ধনিদ্রিত অবস্থায় মধ্যে মধ্যে বাল্যবিবাহ। বিধবাবিবাহ! বলিয়া দুই এক শব্দ করিতেছেন মাত্র।

বাল্যবিবাহ যদি বাস্তবিক মন্দ হয়, আসুন, সকলেই তাহা ত্যাগ করি। কিন্তু প্রথমে বঙ্গসমাজকে প্রতীত করান যে বাল্যবিবাহ মন্দ বাল্যবিবাহের কোন গুণ নাই সকলই দোষ। তাহা না করিয়া যদি কেবল ইংরেজদের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকেন তাহা হইলে কিছুই হইবে না। তাহা হইলে বঙ্গসমাজ এই দলকে যেরূপ অশ্রদ্ধা করিয়া থাকে সেইরূপ করিতে থাকিবে। কোন ফল হইবে না। গ্যারেট সাহেবের মত লোক ভিন্ন আর তাঁহাদের উপায় থাকিবে না।

উৎকলের প্রকৃতাবস্থা।

বঙ্গদেশীয় অনেকেই "উড়িয়া" অথবা "উড়িষ্যা" নাম শুনিবামাত্র ঘৃণা প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারা উড়িয়াদিগের এবং উৎকল দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা অবগত হইতে পারিলে তাঁহাদের কুসংস্কার অপনোদিত হইবার সম্ভাবনা। আমি উৎকল প্রদেশে অনেক দিন বসবাস করত উৎকল প্রদেশের পুরাকালিক এবং বর্ত্তমান সাময়িক আভ্যন্তরীণ অবস্থা যাহা অবগত হইয়াছি, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করিতেছি।

উৎকলদেশের ইতিহাসলেখকেরা উৎকলবাসীদিগের জাতিনির্ব্বাচন সম্বন্ধে অনেক স্থলে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, তজ্জন্য প্রথমে উৎকলের পুরাকালিক বিষয় কিঞ্চিৎ সমালোচনা করা আবশ্যক। হণ্টার সাহেব বলেন "বর্ণভেদ হইবার পূর্ব্বে আর্য্যজাতি উৎকল এবং বঙ্গদেশে বাস করিয়াছিলেন, তজ্জন্যই মনুর নির্দ্দিষ্ট চতুর্বর্ণ এ দুই দেশে নাই।" হণ্টার বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিতে পারেন নাই বলিয়া জাতিনির্ব্বাচনসম্বন্ধে তাঁহার ঈদৃশ ভ্রম হইয়াছে। মনুলিখিত চতুর্বর্ণই বহু প্রাচীনকাল হইতেই উৎকলে বসবাস করিতেছেন তৎপক্ষে প্রমাণের অপ্রতুল নাই; কিন্তু মনুর পূর্ব্বে আর্য্যজাতি যে উৎকলে আসিয়াছেন তাহার কোন প্রমাণ নাই। আর্য্যজাতিগণ বং-

কালে আর্য্যাবর্ত্ত, ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রদেশে অবস্থিতি করেন তৎকালে উৎকলপ্রদেশে "কন্দ" প্রভৃতি অসভ্যজাতিদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ বসবাস করিবারই সম্ভাবনা। যে সকল আর্য্যসন্তানগণ গুরুতর অপরাধ করিতেন, তাহাদিগকে নির্ব্বাসিত করিবার বিধি মনুতে প্রত্যক্ষ করা যায়। কদর্য্য স্থানই নির্ব্বাসনভূমি নির্দ্দিষ্ট হওয়াই চিরপ্রচলিত রাজনীতি, * বোধ হয় এইজন্যই তৎকালে উৎকল প্রদেশই নির্ব্বাসনভূমি অবধারিত ছিল। সকল প্রবাদবাক্যের মধ্যে আংশিক সত্য থাকা যদ্যপি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে প্রাচীনকালে উৎকল প্রদেশ কেন "যমালয়" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা কতক বুঝা যায়, উৎকলপ্রদেশ যমালয় নামে প্রসিদ্ধ ছিল। "বৈতরণী নদীই" তাহার প্রমাণ স্বরূপ। "বৈতরণী" প্রেত উদ্ধারের স্থান।†

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চতুর্ব্বর্ণের নিয়ম সকল মনু, বিধিবদ্ধ করত পশ্চাৎ যে পতিত ক্ষত্রিয়ের উল্লেখ করিয়াছেন,‡ এক্ষণে দেখা যায়, ঐ সকল পতিত ক্ষত্রিয় বংশের মধ্যে তিন শ্রেণীর বংশ বহুকাল হইতে উৎকল প্রদেশে বসবাস করিতেছেন। "পাণ" এবং "অড" উপাধিবিশিষ্ট যে দুটি নীচ জাতি আছে তাহাদের মধ্যে §"পাণ" জাতিটি মনুর লিখিত "পৌণ্ড্রক" বংশীয়, এবং "ওড্র" হইতে "অড" অথবা "ওড" শব্দ নিষ্পন্ন হইয়া থাকিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। ব্রাহ্মণগণও গুরুতর অপরাধ করিলে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিবার বিধি রহিয়াছে, বোধ হয় সেই সকল অপরাধী ব্রাহ্মণগণ, আর্য্যাবর্ত্ত, ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রভৃতি স্থান হইতে বিতাড়িত হইলে উৎকল প্রদেশেই উপস্থিত হইয়া উপনিবাস সংস্থাপন করিতেন। উৎকল

---

* ন জাতু ব্রাহ্মণং হন্যাৎ সর্ব্ব পাপেষ্বপিস্থিতং।
রাষ্ট্রাদেনং বহিঃ কুর্য্যাৎ সমগ্রধন মক্ষতং॥
মনু ৮অ, ৩৮০ শ্লো,

বিকর্ম্মস্থান্ শৌণ্ডিকাংশ্চ ক্ষিপ্রং নির্ব্বাসযেৎ পুরাৎ।
মনু ৯অ, ২২৫ শ্লো॥

† এই জন্যই কি এ দেশীয়দিগের চিরবিশ্বাস যে দক্ষিণ দিকে যমালয়? পল্লীগ্রাম অঞ্চলের অনেকে দেখা যায় দক্ষিণ দিকে যাও বলিলে যমালয় যাও বলা হইল বিবেচনা করেন তাহার কি এই কারণ? সম্পাদক।

‡ ঝল্লো মল্লশ্চ রাজন্যাৎ ব্রাত্যান্নিচ্ছিবি রেবচ।
নটশ্চ করণশ্চৈব খসো দ্রবিড় এবচ॥
মনু ১০অ, ২২ শ্লোক।

§ পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্র দ্রবিড়াঃ, কাম্বোজা যবনাঃ, শকাঃ,
পারদা পহ্লবাশ্চীনাঃ,কিরাতা দরদাঃ, খশাঃ॥
মনু ১০অ ৪৪ শ্লো।

প্রদেশে "দাস" উপাধিধারী এক সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ আছেন, ব্রাহ্মণবংশে "দাস" উপাধি থাকা ভারতবর্ষের কোন স্থানেই শুনা যায় না, কেবল উড়িষ্যা প্রদেশেই ব্রাহ্মণজাতি মধ্যে "দাস" উপাধি শুনা যায়। "দাস" উপাধিটী নিতান্ত ঘৃণা-সূচক। ব্রাহ্মণবংশে "দাস উপাধি প্রচলিত থাকায় স্পষ্টই অনুভব হয় যে বহু প্রাচীন কাল হইতে যে সকল পতিত ব্রাহ্মণগণ আর্য্যাবর্ত্ত অথবা ব্রহ্মাবর্ত্ত হইতে বিতাড়িত হইয়া উৎকল প্রদেশে বসবাস করিতেন আর্য্যাবর্ত্তবাসী অথবা ব্রহ্মাবর্ত্তবাসী ব্রাহ্মণগণ ঐ সকল ব্রাহ্মণবংশীয়কে পতিত মনে করিয়া "দাস" উপাধি প্রদান করত ঘৃণা প্রকাশ করিতেন; অথবা এমনও হইতে পারে যে যৎকালে আর্য্যগণ উৎকলপ্রদেশে উপস্থিত হইয়া উড়িষ্যার নানা স্থানে উপনিবাস সংস্থাপন করেন, তৎকালে যে সকল ব্রাহ্মণবংশীয়গণ আচারভ্রষ্ট, পতিত হইয়া বহু প্রাচীনকাল হইতে উড়িষ্যাপ্রদেশে নির্ব্বাসিত ছিলেন তাঁহাদিগকে "দাস" বলিয়া ঘৃণা করিতেন, তজ্জন্যই উড়িষ্যায় একটি শ্রেণীর ব্রাহ্মণবংশে "দাস" উপাধি এক্ষণপর্য্যন্ত গোচর রহিয়াছে।*

উৎকলদেশে এক্ষণে অন্যান্য যে সকল ব্রাহ্মণ বসবাস করিতেছেন তাঁহাদিগের উপাধি শ্রবণ করিলে তাঁহারা যে অতি অল্পকাল উড়িষ্যাতে উপস্থিত হইয়া বসবাস করিতেছেন, তাহা স্পষ্টই অনুভব হয়। উড়িয়াতে "দোবাই" উপাধিধারী ব্রাহ্মণ আছে। সংস্কৃত "দ্বিবেদী" হইতে হিন্দি "দোবে" উৎপন্ন, "দোবে" হইতে উড়িয়া "দোবাই" হইয়াছে। উড়িয়া ব্রাহ্মণ বংশে "তেহাড়ি" উপাধি আছে। সংস্কৃত "ত্রিবেদী" হইতে হিন্দি "তেয়ারি উৎপন্ন, উক্ত তেয়ারির অপভ্রংশ উড়িয়া "তেহাড়ি" উপাধি হইয়াছে। সংস্কৃত পণ্ডিত হইতে হিন্দি "পাঁড়ে" এবং হিন্দি পাঁড়ে হইতে উড়িয়া "পাণ্ডা" উপাধি সমুৎপন্ন হইবারই সম্ভাবনা। উড়িষ্যায় "মিশর" উপাধি আছে। সংস্কৃত "মিশ্র" উপাধি হইতে উড়িয়া "মিশর" উপাধি উৎপন্ন স্পষ্টই জানা যায়। এই সকল ব্রাহ্মণবংশীয়গণ উৎকলে অল্পকাল উপস্থিত হওয়া অনুভব অসঙ্গত বোধ হয় না।

"মাহান্তি" অথবা "মাইতি" উপাধি বিশিষ্ট একটি জাতি উৎকলদেশে আছেন, তাঁহারা এক্ষণে আপনাদিগকে "করণ"

* এক্ষণে দেখা যায় যে, যে সকল বাঙ্গালিরা ইদানীং তিন চারি পুরুষ অবধি উড়িষ্যায় বাস করিতেছেন তাঁহারা "কেরা" বাঙ্গালি বলিয়া উড়িষ্যায় পরিচিত। "কেরা বাঙ্গালি" বড় সম্মানের উপাধি নহে। এই সকল ব্যক্তি বাঙ্গালায় আসিলে সমাজে বড় একটা গৃহীত হন না। পশ্চিম অঞ্চলে যাঁহারা বহু পুরুষ অবধি বাস করিতেছেন তাঁহারা গৃহীত হইয়া থাকেন। উড়িষ্যার পক্ষে এ পৃথক্ নিয়ম কেন?
সম্পাদক।

বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন। মনুর উল্লিখিত "করণ" শব্দ হইতে "মাহান্তি" অথবা "মাইতি" শব্দ বিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, উৎকলের রাজাদিগের নিকট তাঁহারা "মাহাতি" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু রাজউপাধি বংশগত অথবা ব্যক্তিগতই প্রচলিত, জাতিগত কোন সম্প্রদায়ের প্রত্যক্ষ হয় না। অমরকোষে "ত্বষ্টৃ করণাদয়" ইত্যাদি লিখিত আছে, তদ্দ্বারা করণজাতি শঙ্কর জাতিমধ্যে পরিগণিত, কিন্তু উড়িষ্যার মাহিতি জাতির অশৌচ পালনের রীতি যাহা প্রচলিত আছে (অর্থাৎ ১০ দিবস অশৌচ গ্রহণ করা) তাহা মাহিতিদের মধ্যেও প্রচলিত, কিন্তু বৈদ্য প্রভৃতির ১৫ দিবস অশৌচ গ্রহণের ব্যবস্থা প্রচলিত; বৈদ্যদিগের স্বগোত্রে বিবাহ হয় না, কিন্তু মাহিতিদের মধ্যে স্বগোত্রে বিবাহ প্রচলিত আছে, তখন উড়িষ্যার মাহিতি জাতিটী মনুলিখিত করণ অথবা অমর সিংহের উল্লিখিত শঙ্করবর্ণ করণ, তাহা স্বীকার করিতে পারা যায় না। এই মাহিতিজাতি মেদিনীপুর অঞ্চলে বহুকাল হইতে বসবাস করিয়া দক্ষিণ রাঢ়ীয় কৈবর্ত্তের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন, তৎপক্ষে একটি প্রস্তাব আমা কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছিল।

উৎকলদেশে "খণ্ডাইত" নামধারী একটী জাতি আছে। তাহাদের বিবাহের সময়ে উপবীত হইবার রীতি প্রচলিত আছে। এই "খণ্ডাইত" শব্দ, "ক্ষত্রিয়" অথবা "খণ্ডধারী" "খড়্গধারী" ইত্যাদি পদের অপভ্রংশ বলা যাইতে পারে। এই জাতি বহু প্রাচীনকাল হইতে উৎকলদেশে অবস্থিতি করিতেছে। এই জাতি উপবীতধারী হইয়াও শূদ্রজাতি মধ্যে পরিগণিত, ইহারা মাহিতি জাতিতে কন্যা সম্প্রদান করিয়া থাকেন, এতদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, ঐ জাতিও পতিত এবং আচারভ্রষ্ট ক্ষত্রিয়জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

উৎকলদেশে ব্রাহ্মণ, মাহিতি, খণ্ডাইত এই তিনটিই শ্রেষ্ঠজাতি, এবং পাণ, ওড প্রভৃতি নীচজাতি বহু প্রাচীনকাল হইতেই এই দেশে বসবাস করিতেছে; এই সকল জাতি মনুর উল্লিখিত বর্ণভেদ হইবার পরে যে উৎকলে উপস্থিত হইয়াছেন, তাহাত স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে, তবে হণ্টার সাহেব কি উপলক্ষ করিয়া বিপরীত মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বলা যায় না, মনুর পূর্ব্বে আর্য্যগণ উৎকলে বসবাস করিয়াছিলেন তাহার কোন যুক্তি বা প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

"উৎকল" শব্দ "ভারবাহ"-হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু "কল" শব্দে মধুরধ্বনি বুঝায় মনে করিয়া উৎকল দেশের নাম প্রতিপন্ন করা কেবল এণ্ডাবান্ দ্বীপবাসী ভিন্ন কোন সভ্য জাতির বলিয়া বোধ হয় না। যাহা হউক

বোধ হয় "ওড্র" অথবা "উড্র" জাতির বাসস্থল বলিয়া উড়িষ্যা নাম, এবং 'ওড্র' অথবা "উড্র" শব্দ হইতে "ওড়িষা" কিম্বা "উড়িষ্যা" নাম প্রচারিত হইয়া থাকিবে।

বহু শতাব্দী পরে যখন আর্য্যগণ উৎকল প্রদেশে উপনিবাস সংস্থাপন করেন, তৎকালে উৎকল দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য প্রত্যক্ষ করত বিমোহিত হইয়া আর্য্য ঋষিগণ উৎকল প্রদেশকে পুণ্যভূমি বলিয়া প্রচারিত করেন, এবং উৎকল প্রদেশে পুণ্য প্রবাহিনী নদী ও তপস্যার অনুকূল ফল পুষ্পাদি পরিপূর্ণ বলিয়া উৎকল ভূমির অনেক গৌরব প্রচার করেন। বোধ হয় উৎকল প্রদেশে উপনিবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি করাইবার জন্যই আর্য্য ঋষিগণ উৎকল প্রদেশের ঈদৃশ অত্যুক্তিপূর্ণ বর্ণনা সকল করিয়াছিলেন। যাহাহউক পৌরাণিক কালের মধ্যাবস্থায় উৎকল প্রদেশে আর্য্যগণ উপনিবাস সংস্থাপন করিতে আরম্ভ করেন, এইরূপ অনুমান করা নিতান্ত অসঙ্গত বোধ হয় না। ঐ সময়েই উৎকল প্রদেশ পঞ্চ কলিঙ্গের অন্তর্গত "কলিঙ্গ" নামে বিখ্যাত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, ঐ সময় হইতেই উৎকল প্রদেশে রাজশাসন সামাজিক শাসন, ধর্ম্মশাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার সূত্রপাত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। উৎকল প্রদেশে পৌরাণিক কালের মধ্যে কোনরূপ সংস্কৃত কাব্যাদি প্রকটিত হইবার নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না, বৌদ্ধদিগের সময়েই উড়িষ্যার সৌভাগ্য লক্ষ্মী উদিত হন, এবং বৌদ্ধদিগের সময় হইতেই উড়িষ্যার প্রকৃত শ্রীবৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হয়। বৌদ্ধদিগের অভ্যুদয়ের পূর্ব্ব সময়ে উৎকলের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার অনুসন্ধান করিতে গিয়া কেবল মাত্র উপন্যাস ভিন্ন আর কিছু পাওয়া যায় না; অতএব যে অংশ গালগল্পের উপরে নির্ভর করে, সে অংশটী পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৌদ্ধদিগের সময় হইতে উৎকলের আভ্যন্তরীণ বিষয়ের আলোচনা করা যাইতেছে।

মহর্ষি শাক্যসিংহের শিষ্যগণ উৎকল প্রদেশে যখন উপস্থিত হন, তখন উৎকলের আদিমবাসী, অর্থাৎ যাহারা আর্য্যাবর্ত্ত ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রভৃতি স্থান হইতে বিতাড়িত হইয়া বংশপরম্পরায় উৎকল প্রদেশে বাস করিতেছিলেন এবং উপনিবাসী আর্য্য সন্তানগণ কর্ত্তৃক ঘৃণিত নিষ্পীড়িত সমাজচ্যুত অপমানিত হইয়া আসিতেছিলেন, তাঁহারা শরণ পাইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারকদিগের আশ্রয় গ্রহণ করেন। নিষ্পীড়িত লোক একটু মাত্র অবলম্বনের উপায় প্রাপ্ত হইলেই শতগুণ উৎসাহের সহিত কার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হওয়া তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ, তাহাতে আবার বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারকগণ অত্যন্ত বিনীতস্বভাব ছিলেন, কি ক্ষুদ্র কি নীচ কি ধনী মানী কি রাজা প্রজা সকলকে সমভাবে আলিঙ্গন করা, সকলের অন্ন

গ্রহণ করা, সকল নর নারীকে মুক্তির পথে আকর্ষণ করা তাঁহাদের জীবনের লক্ষ্য ছিল, অথচ আর্য্যদিগের ব্রহ্মচর্য্যের রীত্যনুসারে যোগাদি সাধন করাও তাঁহাদের প্রধান কার্য্য ছিল; এই সকল অকপট ধর্ম্মভাব তাঁহাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ করত উৎকলবাসী নিষ্পীড়িত নরনারী সকল আগ্রহের সহিত বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। উৎকলবাসী যাহারা পতিত বলিয়া চিরকাল, ধর্ম্মের সুখলাভে চিরবঞ্চিত হইয়া পুরুষানুক্রমে হীন হইয়া আসিতে ছিলেন বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারকগণের এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মের উদারতা দেখিয়া তাঁহারা যেমন বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিলেন, সেই রূপ জীবন্ত উৎসাহের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতিসাধনে প্রাণপণে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। সেই সকল নিষ্পীড়িত লোক দিগের অন্তরে নূতন ধর্ম্মভাব বিকসিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মোন্মত্ততা উপস্থিত হয়, তজ্জন্য সত্বর উৎকল দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি সংসাধিত হইয়াছিল। সেই সকল উৎকলবাসী ধর্ম্মোন্মত্ত বৌদ্ধদিগের যে সকল প্রাচীন কীর্ত্তি উৎকল দেশের নানাস্থানে অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে পৃথিবীর অপর কোন স্থানে একত্রে এতাধিক প্রাচীন কীর্ত্তি বিদ্যমান থাকার পরিচয় বড় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। প্রাচীন উড়িয়াগণ কিরূপ উৎসাহী এবং ক্ষমতাশালী লোক ছিলেন তাঁহাদের প্রাচীন কীর্ত্তিস্তম্ভ গুলিই তাহার বিশেষ পরিচয় প্রদান করিতেছে।

ক্রমশঃ

শ্রীদীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বঙ্গদর্শন।

ষষ্ঠ বৎসর।

সমাজসংস্কার।

পুরাবৃত্ত পাঠ করিলে জনসমাজের দুই প্রকার অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম, অবাতকম্পিততড়াগের ন্যায় নিশ্চল। দ্বিতীয় আন্দোলনপূর্ণ ও পরিবর্ত্তনশীল। এই উভয় প্রকার অবস্থার মধ্য দিয়া মানবজাতির সামাজিক জীবন চলিয়া যায়। যখন লোকে নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে শ্রদ্ধার সহিত চিরাগত ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহারের অনুবর্ত্তী হইয়া চলে, তখনই জনসমাজের নিশ্চল অবস্থা। আর যখন প্রচলিত আচার ও সংস্কারাদির প্রতি শ্রদ্ধার লাঘব হয়, যখন নূতনবিধ আচার ও বিশ্বাসের দিকে লোকের চিত্ত আকৃষ্ট হইতে থাকে;—পুরাতন পত্র স্খলিত হইয়া নূতন পত্র উদ্ভিন্ন হইতে থাকে; তখনই জনসমাজের পরিবর্ত্তনের অবস্থা।

প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যখন সেণ্টপল রোমনগরে খ্রীষ্টান ধর্ম্মপ্রচারার্থ গমন করেন, তখন তথাকার এই অবস্থা। প্রচলিত পৌত্তলিকতার প্রতি সাধারণ লোকের বিশ্বাস ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল। সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ চিরপূজ্য দেবদেবীগণের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন। একজন প্রসিদ্ধ লেখক বলেন যে, তৎকালীন রোমনগরে পুরোহিতদিগের মন হইতেও বিশ্বাস অন্তর্হিত হইতেছিল; এমন কি, তাঁহারা কোন কুসংস্কারমূলক ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া অনেক সময় পরস্পরের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন না; পাছে হাস্যসম্বরণে অক্ষম হইয়া মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া ফেলেন। এই পরিবর্ত্তনস্রোত ক্রমশঃ বহমান হইয়া, সেণ্টপলের ধর্ম্মপ্রচারের পর কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই রোমরাজ্যে ধর্ম্ম ও সামাজিক বিষয়ে প্রায় সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন উপস্থিত করিল। ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার সময়েও এই প্রকার

ঘটিয়াছিল। অধিক দৃষ্টান্তের প্রয়োজন নাই। ইতিহাস পাঠকমাত্রেই জানেন যে, সকল দেশেই সময়ে সময়ে উক্তরূপ পরিবর্ত্তনের অবস্থা উপস্থিত হয়।

এক্ষণে আমাদের দেশের ঐ প্রকার অবস্থা; অতিশয় গুরুতর সামাজিক পরিবর্ত্তনের সময় আসিয়াছে। মুখ উন্মুক্ত করিয়া দিলে বহুকালের বদ্ধ নদী যেমন স্রোতস্বতী হয়, সেইরূপ পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে এই প্রাচীন স্থির-ভাবাপন্ন রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ বিচলিত হইয়াছে। লোকের চিন্তার গতি ভিন্ন দিকে চলিয়াছে; সুতরাং কি সামাজিক, কি ধর্ম্মবিষয়ক, সকল বিষয়েই পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে।

এই গুরুতর সময়ে চিন্তাশীল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কর্ত্তব্য কি? "যাহা হয় হউক, দেশের কি হইবে না হইবে ভাবিয়া আমাদের মাথা ধরাইবার প্রয়োজন নাই," এ কথায় আমরা সায় দিতে পারি না। পরিবর্ত্তন মাত্রেই যদি হিতকর হইত, তাহা হইলে ত কোন কথাই ছিল না। কিন্তু পরিবর্ত্তনে ভাল হয়, মন্দও হয়। পরিবর্ত্তনেই রোমসাম্রাজ্যের পতন, পরিবর্ত্তনেই ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের বিলোপ, পরিবর্ত্তনেই এখন মিতাচারী হিন্দুজাতির মধ্যে সুরাপানের স্রোত দিন দিন প্রবলতর হইয়া উঠিতেছে। পরিবর্ত্তনমাত্রেই যে ভাল হয় এরূপ নহে।

যে পরিবর্ত্তন এখন সংঘটিত হইতেছে কাহারও সাধ্য নাই যে, তাহার গতিরোধ করে; এবং গতিরোধ করা প্রার্থনীয়ও নহে। কে না স্বীকার করিবে যে, সামাজিক কদাচার সকল বিদূরিত হইয়া তাহার স্থানে সদাচার সকল প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। পরিবর্ত্তন হইবেই, তবে যাহাতে সেই পরিবর্ত্তন মঙ্গলের দিকে যায়, প্রত্যেক সুশিক্ষিত চিন্তাশীল ব্যক্তির এ প্রকার যত্ন করা কর্ত্তব্য।

মঙ্গলের দিকে লইয়া যাইবার উপায় কি? যাহা সত্য বলিয়া, ভাল বলিয়া বুঝিয়াছি, যাহাতে তাহা অন্য লোকেও বুঝিতে পারে, এমন চেষ্টা করা। পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশ, প্রকাশ্য বক্তৃতা, পরস্পর কথাবার্ত্তা ও তর্ক বিতর্ক প্রভৃতি উপায় দ্বারা সাধারণতঃ সত্য প্রচার হইয়া থাকে।

কিন্তু ঐ সকল করিলেই কি যথেষ্ট হইল? কখনই না। আমি লোককে যে সত্য শিখাইতে যাইব আমাকে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। মুখে বলিব, কাজে করিব না, লোকে তাহা শুনিবে কেন? যাঁহারা মানবপ্রকৃতি ভাল করিয়া বুঝেন তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, দৃষ্টান্ত না দেখিলে কেবল উপদেশে লোক তাদৃশ আকৃষ্ট হয় না। অনেক সময়েই সে প্রকার উপদেশের প্রতি অবজ্ঞা ও ঘৃণা প্রকাশ করিয়া থাকে। একজন পরস্বাপহারী ব্যভিচারী পাষণ্ড ধর্ম্মোপ-

দেশ দিবার জন্য দণ্ডায়মান হইলে কে তাহার কথা শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করে? শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এরূপ অনেক লোক আছেন যাঁহারা বলেন যে, "যে সকল চিরপ্রচলিত সামাজিক প্রথার অনিষ্টকারিতার বিষয় বুঝিয়াছ, তাহার বিরুদ্ধে পুস্তক লেখ, বক্তৃতা কর, তাহাতে আপত্তি নাই; কিয়ৎপরিমাণে তদনুযায়ী কার্য্য কর তাহাতেও আপত্তি নাই; কিন্তু সম্পূর্ণরূপে করিও না। যতদূর করিলে সমাজের লোক সহ্য করিতে পারে, তত দূর কর; তাহার অধিক আর যাইও না।" "সমাজের লোক সহ্য করিতে পারে" অর্থাৎ সমাজচ্যুত করিয়া না দেয়।

যাঁহারা এ প্রকার বলেন তাঁহাদের যুক্তি আছে। যুক্তি এই যে, "তুমি যদি কোন উন্নত সত্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে থাক, কিন্তু যদি দেশের সাধারণলোকের মনে চিরপ্রচলিত তদ্বিরোধী ভ্রমাত্মক সংস্কার বদ্ধমূল হইয়া থাকে তবে তাহারা তোমার আচরণ কখনই সহ্য করিতে পারিবে না। তাহারা তোমাকে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবে; তোমার সহিত আহারাদি বা আদান প্রদান করিবে না। সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইলে সমাজের ভিতর আর তোমার কোন ক্ষমতা চলিবে না, সুতরাং তোমার দ্বারা সমাজের কোন উপকারের সম্ভাবনা থাকিবে না।"

সমাজের বাহিরে থাকিলে সমাজের ভিতরে কোন প্রভাব থাকে না,—সমাজের কোন প্রকার উন্নতিসাধন করা যায় না, আমরা এ কথা স্বীকার করি না। যাঁহারা এমন কথা বলেন, তাঁহারা প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধ কথা বলেন। এখন হিন্দুসমাজে যে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে তাহার মূল সমাজের ভিতরের লোক, না বাহিরের লোক? চক্ষুকর্ণবিশিষ্ট ব্যক্তি মাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, এ পরিবর্ত্তনের মূল কারণ ইউরোপীয়গণ। ইংলণ্ডের অধিকারে আসাতেই আমাদের দেশে এ পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছে। সমাজের ভিতরের লোক পরিবর্ত্তনের কারণ নয়, সমাজের বাহিরের লোকই উহার মূল কারণ। এদেশে ইংরেজ অধিকার না হইলে এ পরিবর্ত্তন স্রোত কে প্রবাহিত করিত? লোকে যত ইউরোপীয়দিগের সংস্পর্শে আসিতেছে, যত পাশ্চাত্য জ্ঞান চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইতেছে, সেই পরিমাণে হিন্দুসমাজের ভিত্তি মূল পর্য্যন্ত বিকম্পিত হইয়া উঠিতেছে। প্রস্তাবলেখকের জনৈক বন্ধু যথার্থই বলিলেন যে, "আজকাল যে "আর্য্য" "আর্য্যবংশ" "আর্য্যগৌরব" বলিয়া চীৎকার উঠিয়াছে, হিন্দুসমাজভুক্ত কোন ব্যক্তি ইহার হেতু নহে। সুপ্রসিদ্ধ জর্ম্মান পণ্ডিত মোক্ষমূলর ইহার প্রধান কারণ। তবে কেমন করিয়া বলিব যে, সমাজের বাহিরে থাকিলে সমাজের ভিতর ক্ষমতা চলে না?

অতীত সাক্ষী ইতিহাস কি বলে এক

বার দেখা যাউক। প্রাচীন গ্রীস্ ও রোমবাসিগণ আমাদিগের ন্যায় পৌত্তলিক ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। খ্রীষ্টধর্ম্ম কেমন করিয়া সেই পৌত্তলিকতার বিলোপসাধনপূর্ব্বক তাহার সিংহাসন অধিকার করিল? সেণ্টপল—একজন য়িহুদি তাহার মূল কারণ। তিব্বৎ সিংহল প্রভৃতি দেশে ভারতবর্ষীয় প্রচারকেরা বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়া উক্ত দেশ সকলের সমাজের আকার নূতন করিয়া দিয়াছিলেন। অধিক দৃষ্টান্ত দিবার প্রয়োজন নাই। সমগ্র পৃথিবীর ধর্ম্ম প্রচারের পুরাবৃত্ত পাঠ করিলে দেখা যায় যে, শত শতস্থলে সমাজের বাহিরের লোক আসিয়া সমাজের ভিতর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ইংলণ্ডবাসিগণ সর্ব্ব প্রথমে সভ্যতাসোপানে কেমন করিয়া আরোহণ করিলেন? বিদেশীয় রোমান জাতির সংস্পর্শে আসাই কি তাহার কারণ নহে? তবে কেমন করিয়া বলিব যে, সমাজের ভিতরে না থাকিলে সমাজের কোন উপকার করা যায় না, সমাজে কোন প্রকার ক্ষমতা চলে না?

সমাজে থাকা কাহাকে বলে? সমাজের লোকের সহিত একত্রে আহার ও পরস্পর আদান প্রদান থাকিলেই সমাজে থাকা হইল। যদি সমাজের লোকে তোমার সহিত আহার না করে এবং তোমার পুত্র কন্যার সহিত তাহাদের কন্যা পুত্রের বিবাহ না দেয়, তাহা হইলেই তুমি সমাজচ্যুত হইলে। সমাজে থাকার অর্থ এই। আমরা যাহাকে হিন্দুসমাজ বলি বাস্তবিক তাহা সম্পূর্ণ একটি সমাজ নহে। ব্রাহ্মণসমাজ, কায়স্থসমাজ, বৈদ্যসমাজ, এই প্রকার যত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন জাতি আছে, তত গুলি সমাজ। তাহাই কেন? সকল ব্রাহ্মণ বা সকল কায়স্থ বা অন্য যে কোন জাতি হউক না কেন, তাঁহাদের সকলের মধ্যে পরস্পর ভোজ্যান্নতা বা আদান প্রদান নাই। এক একজাতির মধ্যে আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগ; সেই বিভাগের মধ্যে ভোজ্যান্নতা ও আদান প্রদান বদ্ধ। রাঢ়ীয় কি বারেন্দ্র কি বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগকে অথবা রাঢ়ীয়, বঙ্গজ, বা বারেন্দ্র শ্রেণীর কায়স্থদিগকে এক একটী স্বতন্ত্র জাতি বলিলে অসঙ্গত হয় না। তাঁহাদিগের সমাজ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র। হিন্দুসমাজ বলিলে একটি প্রকাণ্ড পদার্থ বুঝায় বটে, কিন্তু বাস্তবিক প্রত্যেক হিন্দুর ভোজ্যান্নতা ও আদান প্রদান যত লোকের সঙ্গে চলিয়া থাকে তাহা ধরিলে প্রত্যেকের সমাজ অপেক্ষাকৃত অতি ক্ষুদ্র পদার্থ।

সে যাহা হউক এখন প্রকৃত কথার আলোচনা করা যাউক। আদান প্রদান ও ভোজ্যান্নতা থাকিলেই যদি সমাজে থাকা হয়, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে, আদান প্রদান ও ভোজ্যান্নতা থাকিলেই কি সমাজের ভিতরে ক্ষমতা চলে, নতুবা চলে না? সমাজের বাহিরে থাকিলেও যে সমাজের ভিতরে

ক্ষমতা চলে, সমাজের উপকার করা যায় ইহার অকাট্য প্রমাণ পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। সে বিষয়ে আরও কয়েকটি কথা বলা যাইতেছে। এমন শত শত লোক রহিয়াছে যাহারা হিন্দু-সমাজভুক্ত, অথচ সমাজের ভিতর তাহাদের কিছুমাত্র ক্ষমতা চলে না, কেহই তাহাদিগকে গ্রাহ্য করে না। আবার এমন লোকও দেখিয়াছি যাঁহারা প্রচলিত আচারবিরুদ্ধ কার্য্য করিয়া জাতিচ্যুত হইয়াছেন, তথাচ হিন্দুসমাজের অনেক লোকে তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা করে এবং তাঁহাদের প্রভাব অনুভব করে। সুতরাং সমাজের ভিতরে থাকিলেই যে, সমাজে ক্ষমতা চলে বা সমাজের উপকার করা যায়, এবং বাহিরে থাকিলে করা যায় না তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে না। সমাজে থাকিলে যে অনেক বিষয়ে সুবিধা আছে;—কোন কোন হিতকর কার্য্য অপেক্ষাকৃত সহজে সম্পন্ন করা যায় তাহা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু তাহা বলিয়া আমরা কখনই ইহা স্বীকার করিতে পারি না যে, সমাজে না থাকিলে সমাজসংস্কার করা যায় না। বরং আমরা তাহার বিপরীত কথাই সত্য বলিয়া মনে করি যে, এখন হিন্দুসমাজের যে প্রকার অবস্থা তাহাতে সমাজে থাকিয়া সমাজ সংস্কার কার্য্য সম্পূর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রূপে সম্পন্ন করা অসম্ভব। আমরা ক্রমে ক্রমে আমাদের কথা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিব।

আর একটী কথা। সমাজসংস্কার সম্বন্ধে কোন গুরুতর বিষয়ের কথা উত্থাপন করিলে অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি অমনি বলিয়া উঠেন "এখনও সময় আসে নাই।" তাঁহারা সুশিক্ষিত, সুতরাং পুরাবৃত্ত ও বিজ্ঞানের সাহায্য লইয়া তাঁহারা তাঁহাদের মত সমর্থন করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহারা বলেন যে, উপযুক্ত সময় না আসিলে কোনপ্রকার সংস্কারকার্য্য সুসিদ্ধ হইতে পারে না। ক্রমোন্নতিই জগতের নিয়ম। জড়, উদ্ভিজ্জ, কি প্রাণীজগৎ সর্ব্বত্রই বিজ্ঞান ক্রমোন্নতির নিয়ম প্রতিপন্ন করিতেছে। আগষ্ট কম্‌ট, হারবার্ট স্পেন্সর প্রভৃতি অধুনাতন কালের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ প্রদর্শন করিয়াছেন, যে, জনসমাজ সেই নিয়মের ব্যতিরেকস্থল নহে। বিকাশের (evolution) নিয়ম ব্রহ্মাণ্ডের সকল কার্য্যেই পরিলক্ষিত হয়। সমাজসংস্কার এই বিকাশের নিয়মের উপর নির্ভর করে। সুতরাং উপযুক্ত সময় না আসিলে কোন প্রকার সংস্কারকার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না।

ক্রমোন্নতির নিয়মে আমরা বিশ্বাস করি। উপযুক্ত সময় না আসিলে যে কোন সংস্কারকার্য্য সুসম্পন্ন হয় না তাহাও সত্য বলিয়া স্বীকার করি। কিন্তু তাঁহারা ইহা হইতে যে সিদ্ধান্ত করেন, তাহা স্বীকার করিতে পারি না। অর্থাৎ আমরা স্বীকার করি না যে সেই জন্য আমাদিগকে হস্ত পদ সঙ্কুচিত করিয়া

বসিয়া থাকিতে হইবে। আমরা মনে করি যে, সময় আসুক আর নাই আসুক যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছি, অকুতোভয়ে তাহা বলিব ও তদনুযায়ী কার্য্য করিব। তজ্জন্য কষ্ট যন্ত্রণা বহন করিতে হয়, অম্লানবদনে করিব। সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইতে হয়,সত্যের গৌরব রক্ষার জন্য তাহাও শিরোধার্য্য করিব। ইহাই আমাদিগের অনতিক্রমণীয় পবিত্র কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্যসাধনে চরিত্র উন্নত হয়; হৃদয় মনের উচ্চতর বৃত্তি সকল সতেজ ও বিকশিত হয়। আর আমরা যতই সত্যকে সত্য বলিয়া জানিয়াও তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিব, নিশ্চয়ই চরিত্র সেই পরিমাণে অবনতি প্রাপ্ত হইবে।

সময় আসার অর্থ কি? সময়ের কি হাত পা আছে, যে সে আপনা আপনি চলিয়া আসিবে। সময় আসার অর্থ সাধারণ লোকের মন সত্যগ্রহণে প্রস্তুত হওয়া। এখন জিজ্ঞাস্য এই, সাধারণ লোকের মন কেমন করিয়া প্রস্তুত হয়? উপদেশ ও দৃষ্টান্ত সত্যপ্রচারের এই দুই অমোঘ উপায়। উপদেশ ও দৃষ্টান্তের ফল শীঘ্র না ফলিতে পারে, কিন্তু কালে নিশ্চয়ই ফলিবে। নূতন সত্য প্রচার জন্য আপাততঃ হয় ত যার পর নাই অত্যাচার বহন করিতে হইবে,কিন্তু কাঁদিতে কাঁদিতে যে শস্য বপন করা হইবে, এমন সময় আসিবে যখন লোকে হাঁসিতে হাঁসিতে উহা কর্ত্তন করিবে।

সময় না আসিলে সমাজসংস্কার কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না, মানিলাম, কিন্তু সময়কে আনিতে হইবে। আনার উপায় কি তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এখন নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকি, সময় আসিলে কার্য্য আরম্ভ করিব, নদী শুষ্ক হইলে পার হইব, ইহা নির্ব্বোধের কথা।

যিনি কোন গুরুতর সমাজসংস্কার কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তিনি যে সকল সময়ে জীবদ্দশাতেই তাঁহার চেষ্টার সম্পূর্ণ ফল দেখিতে পান এমন নহে। তিনি যে বীজ বপন করিয়া যান, বংশপরম্পরায় তাহা অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমে উন্নত বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়া অমৃত ফল প্রসব করে। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ফ্রান্সিস নিউম্যান বলেন যে, লুথর যদি জন্মগ্রহণ না করিতেন তথাচ ইউরোপে প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মসংস্কার অবিলম্বে সুসিদ্ধ হইত। বহুকাল পূর্ব্ব হইতে শিক্ষাদ্বারা লোকের মন এরূপ প্রস্তুত হইয়াছিল যে লুথর উক্ত সংস্কার কর্য্যে কেবল একটি উপলক্ষ মাত্র।*

যে শিক্ষাদ্বারা লোকের মন প্রস্তুত হইয়াছিল, সে শিক্ষা কিপ্রকার তাহা বিবেচনা করা উচিত। সে শিক্ষা কেবল বিদ্যালয়ের শিক্ষা নহে। লুথরের পূর্ব্বে আরও অনেক সংস্কারক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে প্রায় বিংশতি বার ধর্ম্মসংস্কারকগণের অভ্যুদয় হইয়াছিল। রোমীয় ধর্ম্মসমাজের কুসংস্কার ও কদাচার সকল বিনষ্ট করিবার

* Vide Pro. Newman's "Phases of Faith" Sixth Edition p. p. 97-98

জন্য তাঁহারা প্রাণগত যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছিলেন। সাধারণ সংস্কারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়াতে তাঁহাদিগকে সমাজ হইতে বিদূরিত ও অশেষ যন্ত্রণাগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। যে সত্যের জন্য তাঁহারা জীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন, জীবন থাকিতে সেই সত্যের জয় তাঁহারা দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। কিন্তু তাহা বলিয়াই কি তাঁহাদের সকল যত্ন ও চেষ্টা বৃথা হইয়াছিল? কখনই না। সত্যের জন্য একটি বিন্দু রক্তও কখন বৃথা পতিত হয় নাই। উইকলিফ প্রভৃতি সমাজসংস্কারকগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই লুথরের কার্য্য অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়াছিল। ললার্ড প্রভৃতি উন্নতমতাবলম্বী লোক সকল যৎপরোনাস্তি অত্যাচার ও কষ্টভোগ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদিগের জীবদ্দশায় সাধারণের মধ্যে তাঁহাদিগের বিশ্বাস প্রচার করিতেও সক্ষম হন নাই বটে, কিন্তু তাঁহারাই ভবিষ্যতের পথ প্রস্তুত করিয়া গিয়াছিলেন।* এই সকল ব্যক্তির যত্নেই সাধারণ লোকের চিন্তাস্রোত নূতনপথে ক্রমশঃ প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। যে শিক্ষা দ্বারা আপামর সাধারণের মন প্রস্তুত হইয়াছিল, উইকলিফ প্রভৃতির চেষ্ট সেই শিক্ষার অন্তর্গত।

ইউরোপের পুরাবৃত্ত ত দূরের কথা। আমাদের দেশের বিষয় ভাবিয়া দেখা যাউক। যখন মধুস্থদন গুপ্ত মেডিকেল কালেজে সর্ব্বপ্রথম শবচ্ছেদনের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্ব্বক সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন, তখন কি সময় আসিয়াছিল? যখন বেথুন বালিকাবিদ্যালয়ে কন্যাপ্রেরণ করিয়া মৃত কবিবর মদনমোহন তর্কালঙ্কার সমাজচ্যুত হন, ও কলিকাতার ধর্ম্মসভা ঘোষণা করেন যে, যে বালিকাবিদ্যালয়ে কন্যা পাঠাইবে তাহাকেই সমাজচ্যুত হইতে হইবে, তখন কি সময় আসিয়াছিল? যাঁহারা সময় আসে নাই বলিয়া সংস্কারকার্য্য বন্ধ করিতে বলেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি সময় আসা না আসার কি কোন বিশেষ চিহ্ন আছে? যদি থাকে তাহা কি?

অনেকে উক্ত প্রশ্নের এই উত্তর করেন যে, কোন সংস্কারকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া যদি দেখ যে তাহা করিলে তোমাকে

---

* উইক্লিফ ও তাঁহার পরবর্ত্তী সংস্কারকগণ যে ইংলণ্ডে ধর্ম্মসংস্কারের পথ সহজ করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন ইহা এমন সুপরিচিত সত্য যে সামান্য বালকদিগের পাঠ্যপুস্তকেও এ কথা লিখিত থাকে।—Wicliff warmly attacked the corruptions of the church by exposing the evil lives and evil teachings of the priests. His followers were called Lollards: and though the Lollards were persecuted by many of the English kings, especially by Henry IV, they undoubtedly prepared the people of England for the reformation.

সমাজ হইতে দূরীকৃত হইতে হইবে, তাহা হইলেই জানিবে যে এখনও সময় আসে নাই। যে সংস্কার সমাজে থাকিয়া করা যায়, তাহারই সময় আসিয়াছে। এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে মধুসূদন গুপ্তের সময়ে শবচ্ছেদের সময় আসে নাই, এবং বেথুনস্কুল সংস্থাপন সময়েও বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবার সময় আসে নাই। তবে ইহাও বলিতে হইবে যে, মধুসূদন গুপ্ত ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার অন্যায় ও অবিবেচনার কার্য্য করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাই বা কেমন করিয়া বলিব? যখন দেখিতেছি যে লোকে তাঁহাদের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিতেছে, তখন কেমন করিয়া বলিব যে, তাহাদের সময়ে সময় আসে নাই। বাস্তবিক কথা এই যে তাঁহারা কষ্ট করিয়া পাশ্চাত্য জ্ঞানের সাহায্যে সময়ের কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক আনিয়াছিলেন বলিয়াই এখন সময় আসিয়াছে।

বিগত পঞ্চাশৎ বৎসরের আমাদিগের সামাজিক অবস্থার বিষয় আলোচনা করিলে অনেক শিক্ষা পাওয়া যায়। যখন সুপ্রিমকোর্টে কোন এক মোকর্দ্দমায় সাক্ষ্য দিবার সময় বাবু রসিককৃষ্ণ মল্লিক বলিলেন "আমি সাক্ষ্য দিবার জন্য গঙ্গাজল হস্তে লইব না, আমি গঙ্গা মানি না।" তখন সেই কথায় কলিকাতায় হুলস্থূল হইয়াছিল। এখন সে সময় কোথায়? দেখা যায় যে এক সময় যে কার্য্য করিয়া জাতিচ্যুত হইতে হইত এখন অবিকল সেই কার্য্য করিয়া জাতি রক্ষা করা যায়। মেডিকেল কালেজে শবচ্ছেদ ও বালিকাবিদ্যালয়ে কন্যা প্রেরণের দৃষ্টান্তে ইহা প্রমাণ হইতেছে। পলাণ্ডু ভোজন করিলে এক সময় জাতিচ্যুত হইতে হইত, এখন লোকে প্রকাশ্যরূপে পলাণ্ডুভোজন করিতেছে অথচ জাতিচ্যুত হইতেছে না।* বঙ্গদেশের কোন কোন স্থানে পলাণ্ডু ভোজন করিলে অদ্যাপিও জাতিচ্যুত হইতে হয়। প্রকাশ্য রূপে যবনান্ন ভোজনে সমাজচ্যুত হইতে হয় বটে, কিন্তু শত শত লোক গোপনে উহা করিতেছে অথচ তাহাদের জাতি যায় না। গোপনে, অর্থাৎ সকলেই জানে অথচ গোপন। প্রকৃত হিন্দুয়ানি এখন অন্য সকল স্থান হইতে তাড়িত হইয়া ক্রিয়াবাটীর সামিয়ানার নিম্নে ঘনীভূত হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। সেইখানেই যত বিচার। যবনান্নভোজন এখন সমাজের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়াছে। শুনিয়াছি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে স্নানের পূর্ব্বে সকলে কাগজ পত্রের কার্য্য নির্ব্বাহ করিত, স্নানের পর পূজা আহ্নিক করিয়া আর কেহ কাগজ স্পর্শ করিত না, করিলে ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্য হইত। কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! ব্রাহ্মদিগের মধ্যে এখন যাঁহারা উপবীত

* চারি পাঁচ বৎসর হইল নবদ্বীপে এক ব্যক্তি পলাণ্ডু ভোজন করাতে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছিল।

পরিত্যাগ করিতেছেন, তাঁহাদিগের প্রায় সকলকেই জাতিচ্যুত হইতে হইতেছে। কিন্তু এমন এক সময় ছিল যখন কেবল ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত হওয়ার জন্য কোন ব্যক্তিকে তাঁহার গ্রামের লোক সমাজভ্রষ্ট করিয়াছিল।

যে কার্য্য করিলে সমাজচ্যুত হইতে হয় তাহাই করিবার সময় আসে নাই এ কথা যে নিতান্ত অযুক্ত তাহা বোধ হয় আমরা সুন্দররূপে প্রমাণ করিয়াছি।

বাস্তবিক সমাজে থাকিয়া সমাজসংস্কার করিবার মত সকল স্থলে মানিতে হইলে, কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয় কার্য্য হইতে এখন নিবৃত্ত হইতে হয়। বিধবাবিবাহ প্রথা প্রচলিত করিবার জন্য পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় যে চেষ্টা করিতেছেন তাহা একেবারে বন্ধ করিয়া দিতে হয়। কেন না, আজও সমাজের এমন অবস্থা হয় নাই যে, বিধবাবিবাহ করিয়া কেহ সমাজে থাকিতে পারে। সমাজে থাকিয়া সমাজের উপকার কর, এ উপদেশ মানিতে হইলে কেবল সমাজ-সংস্কার বন্ধ হয়, এমন নহে, আমাদিগের রাজনৈতিক উন্নতির মূলেও কুঠারাঘাত করা হয়। সিবিল সরভিস, মেডিকেল সরভিস, বা ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষা দিবার জন্য, শিল্পশিক্ষা ও বাণিজ্যের উন্নতি জন্য, কোন বিষয়ে এ দেশের রাজনৈতিক উন্নতির উদ্দেশে আন্দোলন করিবার জন্য, অথবা কেবল ভ্রমণ করিয়া অভিজ্ঞতা উপার্জ্জন করিবার জন্য বিলাত গমন করিতে পারা যায় না। কেন না এ পর্য্যন্ত যত লোক প্রকাশ্যভাবে বিলাত গিয়াছেন সকলকেই সমাজচ্যুত হইতে হইয়াছে। আজ যদি পার্লেমেণ্ট মহা-সভা ভারতবর্ষ হইতে প্রতিনিধি গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা করেন, আর যদি কতকগুলি হিন্দুসন্তান প্রতিনিধি হইয়া বিলাত যাইতে প্রস্তুত হয়েন, তাহা হইলে কি তাঁহাদিগকে এই বলিব "না, তোমরা এমন দুষ্কর্ম্ম করিও না। বিলাত গমন করিলে সমাজচ্যুত হইবে। সমাজে থাকিয়া সমাজের হিতসাধন কর?" সমাজে থাকিয়া সমাজের মঙ্গলসাধনের মত মানিতে হইলে ইহাই বলিতে হয়, বিধবাবিবাহ প্রচারের চেষ্টা বন্ধ করিয়া দেও, বিলাত যাওয়া বন্ধ করিয়া দেও, বিলাত যাওয়ার ষ্টেট্ স্কলার্সিপ উঠিয়া গিয়া বড়ই ভাল হইয়াছে।

তবে বাস্তবিক কি এমন কোন স্থল নাই যেখানে উপযুক্ত সময়ের জন্য প্রতীক্ষা করা উচিত? অবশ্য আছে। মনুষ্যের কর্ত্তব্য সকলকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম, এমন কতকগুলি কর্ত্তব্য আছে যাহা সম্পূর্ণরূপ সামাজিক। দ্বিতীয় প্রকার কর্ত্তব্যগুলি ব্যক্তিগত। প্রথম প্রকার কর্ত্তব্যের এই প্রকৃতি যে, সমাজের সমস্ত লোক বা অধিকাংশ লোক একত্র না হইলে প্রত্যেক ব্যক্তি দ্বারা কখনই তাহা সম্পন্ন হইতে পারে না।

আর দ্বিতীয় প্রকার কর্ত্তব্য সকল,

প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ত্তব্য বলিয়াই সামাজিক বা জাতীয় কর্ত্তব্য। কেন না, প্রত্যেক ব্যক্তিকে লইয়াই সমাজ বা জাতি। এই সকল কর্ত্তব্য সমাজের সর্ব্বসাধারণ লোকে করুক আর নাই করুক প্রত্যেক ব্যক্তিকে উহা করিতেই হইবে।

আমরা এই উভয় প্রকার কর্ত্তব্যের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি। প্রথম সামাজিক বা জাতীয় কর্ত্তব্য বিষয়ে দুই একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুন। মনে করুন কোন পরাধীন জাতির মধ্যে এক ব্যক্তির মনে হইল যে, জাতীয় স্বাধীনতা ব্যতীত কোন জাতির সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির সম্ভাবনা নাই। তাঁহার তখন কর্ত্তব্য কি? তিনি কি তখনই স্বয়ং অস্ত্র শস্ত্র লইয়া রাজবিদ্রোহী হইবেন? তাহা হইলে ত বাতুলের কার্য্য হইবে। আর একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুন। মনে করুন আমার এইরূপ বিশ্বাস জন্মিল যে,বাঙ্গালিজাতির পক্ষে এখন দেশান্তরে গিয়া উপনিবেশ সংস্থাপন করা উচিত। কিন্তু আমি একাকী বিদেশে গিয়া বাস করিলেই ত উপনিবেশ সংস্থাপন করা হয় না। সুতরাং দেশের লোকের মন যাহাতে তদ্বিষয়ে প্রস্তুত হয়, এমন যত্ন করিতে হইবে; এবং উপযুক্ত সময় আসিলে বিশেষ কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে।

দ্বিতীয় প্রকার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে এ প্রকার প্রণালীতে কার্য্য করিলে চলিবে না। আমার সন্তানের জীবন রক্ষা করা, তাহাকে প্রতিপালন করা ও উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে আমি সমাজের বা সময়ের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকিতে পারি না। সমাজ যদি আমাকে বলে তোমার শিশুকে হত্যা কর, (শিশুহত্যা প্রথা, বাস্তবিক কোন কোন জাতির মধ্যে অদ্যাপিও প্রচলিত আছে) আমি কি সে আজ্ঞা পালন করিতে পারি? আমার জাতি, কুল, মান, সম্ভ্রম যায় যাউক, প্রাণ যায় তাহাও স্বীকার তথাচ আমি পারি না। কোন হৃদয়বান্ সদসদ্বিবেচক বিশিষ্ট ব্যক্তি বলিতে পারেন না, যে, "ওরূপ স্থলে সমাজের খাতিরে তোমার শিশুহত্যা করা কর্ত্তব্য।" শিশুহত্যা পাপ, ইহা কেবল মুখে উপদেশ দিয়া উপযুক্ত সময়ের জন্য কখন প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে পারি না। পঞ্চাশৎ বা একশত বৎসর পরে কবে সময় আসিবে আমি কি তাই বলিয়া আমার প্রাণের সন্তানকে দেশাচার রাক্ষসের মুখে নিক্ষেপ করিতে পারি?

আর একটি দৃষ্টান্ত। মনে করুন আমার একটি বিধবা কন্যা আছে। দুর্ব্বিষহ বৈধব্য যন্ত্রণায় দিবা রজনী সে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে। এস্থলে কি আমার কর্ত্তব্য নহে যে, বিবাহ দিয়া তাহাকে সুখী করি? সমাজ কবে প্রস্তুত হইবে ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে কি পিতার কর্ত্তব্য করা হয়? এস্থলে কি রক্ষণশীল ভ্রাতারা বলিবেন যে, "তোমার কন্যার কষ্ট যতই অধিক হয় হউক,

দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তির উত্তেজনা অতিক্রম করিতে অক্ষম হইয়া সে বিপথগামিনী হয় হউক, ভ্রূণহত্যা রূপ মহাপাতকে কলঙ্কিত হইতে হয়, তাহাও হউক, কিন্তু তুমি তাহার বিবাহ দিয়া সমাজের বাহিরে যাইও না।" আর এ কথা বলিলে কি আমার তাহা শুনা উচিত? কন্যার প্রতি কর্ত্তব্য আমার ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য; সে বিষয়ে সমাজ বা সময়ের মুখাপেক্ষা করা আমার কোন ক্রমেই উচিত নহে। সে বিষয়ে আমার প্রতি বল করিবার, কি আমার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার কোন অধিকার সমাজের নাই।

হিন্দুসমাজের শত শত লোক কি করিতেছেন? গোপনে ভ্রূণহত্যা রূপ মহাপাতকের অনুষ্ঠান দেখিয়াও নিশ্চিন্ত হইয়া আছেন, তথাচ বিধবাবিবাহে মত দিবেন না। সকলে মত দিউক তবে আমি মত দিব কথা বলিলে চলে না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে যাঁহারা কোন সংস্কারকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন অনেক সময়ে তাঁহারা তাঁহাদের চেষ্টার সফলতা দেখিয়া ইহলোক হইতে অবসৃত হইতে পারেন না, লোকে ভাবে তাঁহারা অকৃতকার্য্য হইলেন। কিন্তু বাস্তবিক ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা তাঁহাদের চেষ্টার ফলভোগ করে। নূতন সংস্কারকদিগের অভ্যুদয় জন্য কখন কখন প্রচলিত কুসংস্কার পূর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়ীভূত হয়। কিন্তু যখন দ্বিতীয় বার সেই সংস্কারের চেষ্টা হয়, তখন পূর্ব্বে একবার আন্দোলন হইয়াছিল বলিয়া বিংশতি বৎসরের কাজ দশ বৎসরে সম্পন্ন হয়। যদিই বা এমন মনে করা যায় যে, কোন কার্য্যের ফল বর্ত্তমান বংশীয়েরা অথবা ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা কেহই লাভ করিতে পারিবে না—সমাজের উপর সে কার্য্যের কোন ফল হইবে না, তথাচ যদি তাহা ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য কার্য্য হয়, তবে উহা করিতেই হইবে। কবে সময় আসিবে বলিয়া আমার বিধবা দুহিতার প্রতি কর্ত্তব্যসাধন করিব না? সমাজের লোকের ক্রোধান্ধ নয়নের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, নির্ভীক চিত্তে সত্য ও বিবেকের গৌরব রক্ষা করিতে হইবে।

আমরা এই প্রবন্ধে যে মত সমর্থন করিতেছি, বর্ত্তমান সময়ের সর্ব্বপ্রধান চিন্তাশীল পণ্ডিত হার্বার্ট স্পেন্সর তাহা অতি সুন্দররূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছ তাহা নির্ভয়ে বলিবে, ও তদনুযায়ী কার্য্য করিবে। সময়ের জন্য প্রতীক্ষা করিবে না। যে পরিবর্ত্তন সাধন করা তোমার লক্ষ্য তাহাতে কৃতকার্য্য হও ভালই, না হও তথাচ ভাল, কেন না তোমার যাহা কর্ত্তব্য তাহা করা হইল।*

নূতন সত্য নির্ভয়ে প্রচার করিতে

* Whoever hesitates to utter that which he thinks the highest truth lest it should be too much in advance of the time, may re-assure himself by looking at his acts from an impersonal point of view.

হইবে বটে, কিন্তু প্রচারের প্রণালী কি প্রকার হওয়া উচিত? আমাদিগের বিবেচনায় সম্পূর্ণরূপ জাতীয় রুচির অনুবর্ত্তী হওয়া কর্ত্তব্য। লোকভয়ে বিন্দুমাত্র সত্যের অপলাপ করিব না, অথচ প্রচার প্রণালী সম্বন্ধে দেশের লোকের যাহা ভাল লাগে তাহাই করিতে হইবে। সংক্ষেপতঃ আমাদিগের ইহাই মত যে, যাহাতে শারীরিক মানসিক বা আধ্যাত্মিক কোন প্রকার অমঙ্গল প্রসূত না হয়, এমন সকল বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে জাতীয় ভাব রক্ষা করিয়া চলা উচিত। জাতীয় ভাব রক্ষা করিব, অথচ জাতীয় ভ্রম, কুসংস্কার, কদাচারের বিরুদ্ধে নিরন্তর খড়্গহস্ত থাকিব। পুষ্পশয্যায় শয়ন করিয়া সমাজসংস্কার হয় না। সংসারে কখন তাহা হয় নাই। সমস্ত ইতিহাস এ কথায় সাক্ষ্যদান করিতেছে। যদি কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা দেখি, তবে করিব, নতুবা নয়, সমাজসংস্কার এ প্রকার ভীরু, সাবধান লোকের কাজ নয়।† জন ষ্টুয়ার্ট মিল যথার্থই বলিয়াছেন যে, যখন খ্রীষ্টের শিষ্য ষ্টিফিনকে, তাঁহার অবলম্বিত ধর্ম্মের জন্য লোকে

Let him duly realize the fact that opinion is the agency through which character adapts external arrangements to itself, that his opinion rightly forms part of that agency, is a unit of force, constituting, with other such units, the general power which works out social changes and he will perceive that he may properly give full utterance to his innermost conviction, leaving it to produce what effect it may. It is not for nothing that he has in him these sympathies with some principles and repugnance to others. He, with all his capacities, and aspirations and beliefs is not an accident, but a product of the time. He must remember that while he is a descendant of the past, he is a parent of the future; and that his thoughts are as children born to him, which he may not carelessly let die. He, like every other man, may properly consider himself as one of the myriad agencies through whom works the Unknown Cause, and when the Unknown Cause produces in him a certain belief he is thereby authorized to profess and *act out* that belief. For, to render in their highest sense the words of the poet:—

———Nature is made better by no mean,
But nature makes that mean: over that art
Which you say adds to nature, is an art
That nature makes.

Not adventitions, therefore, will the wise man regard the faith which is in him. The highest truth he sees he will fearlessly utter; knowing that, let what may come of it, he is thus playing his right part in the world—knowing that if he can effect the change he aims at—well: if not—well also; though not so well. *First Principles, by Herbert Spencer, third Edition pp.* 123.

† Those who will be so full of foresight and so prudent as not to act till they are secure against failure, will surely have no chance

হত্যা করিয়াছিল, তখন কে মনে করিতে পারিত যে, সেই অনাথ, দরিদ্র, মূর্খ ষ্টিফি-নের মত সভ্য জগতে প্রচারিত হইবে, আর তাঁহার পরাক্রান্ত ধনশালী শত্রুদিগের দেশপ্রচলিত প্রবল ধর্ম্ম, চির-কালের জন্য সংসার হইতে তিরোহিত হইবে। থিওডোর পার্কার বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বতন সমাজসংস্কারক মহাপুরুষেরা আপনাদিগের শোণিত দিয়া যে পথ ধৌত করিয়া দিয়া গিয়াছেন, আমরা এখন তাহাতেই ভ্রমণ করিতেছি। বায়ু দূষিত হইলে ঝঞ্ঝা ঝটিকা তাহা বিশুদ্ধ করে, শরীরে গভীর ক্ষত হইলে সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র-চিকিৎসা চাই, সেই প্রকার বহুকাল স্থায়ী সামাজিক অমঙ্গল সকল বিদূরিত করিতে হইলে, অনেক স্বার্থত্যাগ, কষ্ট যন্ত্রণাবহন করা আবশ্যক। সত্যপালন করিতেই হইবে, তাহাতে সুখসাচ্ছন্দ্য, সমাজ, আত্মীয় স্বজন ও স্বদেশবাসীর প্রসন্নতা পাওয়া যায়, ভালই, নতুবা পরমেশ্বরকে স্মরণ করিয়া, ফলাফলের বিচার ছাড়িয়া দিয়া "যে যায় যাক্ যে থাকে থাক্" বলিয়া সকল কষ্ট, সকল যন্ত্রণা, সকল বিপদ শিরোধার্য্য করিয়া লইতে হইবে।

শ্রীনঃ না,

বাঙ্গালির জন্য নূতন ধর্ম্ম।

কোমৎ বলিয়াছেন, স্ত্রীলোকই দেবতা স্ত্রীসেবাই ধর্ম্ম; আমরা বাঙ্গালি, প্রা-ণের সহিত বলিয়াছি—তথাস্তু। দুর্ভা-গ্যবশতঃ কোমৎ পূজার পদ্ধতিটা ভাল করিয়া বিবৃত করেন নাই। আমরা বাঙ্গালি—চিরকাল পৌত্তলিক—পৌত্ত-লিকতা আমাদের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়াছে, আমাদের অস্থি মজ্জার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে—শুদ্ধ আধ্যাত্মিক উপা-সনায় আমাদের তৃপ্তি হয় না। আমরা শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইব, ধূপ ধুনা জ্বালিব, দান ধ্যান করিব, স্তবস্তুতি করিব;—পুরোহিত মন্ত্র বলিবে, যজ্ঞের অনল জ্বলিয়া উঠিবে, আঙ্গিনায় ঢাক ঢোল

of success. Such persons ought to be called timid and weak, not prudent: they will never commence any noble enterprise; nor must we regret that, for they would probably embarrass it by a perpetual suggestion of difficulties. Danger and loss cannot always be avoided. they must often be met and borne. No great object has ever been won by those who make it essential to avoid them. The eleven disciples would not have founded Christianity, if they had first taken in hand to ensure against the danger of future quarrelling among themselves.—*Catholic Union, by Pro. F. W. Newman.*

বাজিবে, হাড়কাঠে ছাগ ব্যা ব্যা করিবে, নতুবা কেমন যেন অঙ্গহীন হইল বলিয়া বোধ হয়। কোমৎধর্ম্মের এই অভাব আমি আজি পূর্ণ করিব। অমিতশক্তি কোমৎ পৃথিবীর পাঁচটি সুসভ্য জাতির জন্য যে ধর্ম্মের জ্ঞানকাণ্ড প্রকাশ করিয়াছেন, ক্ষুদ্রশক্তি আমি পৃথিবীর একটী অর্দ্ধসভ্য জাতির জন্য সেই ধর্ম্মের কর্ম্মকাণ্ড প্রকাশ করিব।

পূজার উপকরণ। অশ্রুজল এবং দীর্ঘশ্বাস এ পূজার পাদ্য অর্ঘ্য; সুবর্ণালঙ্কার এ পূজার পুষ্প; সৌন্দর্য্যতৃষ্ণা ইহাতে হাড়কাঠ; উপাসকের প্রাণ তাহাতে ছাগ; সোহাগ খর্পর; ভালবাসা কামার; ঢাকাই সাড়ী ইহাতে বিল্বপত্র; ফ্রেঞ্চ পারফিউমারি তাহাতে চন্দনের ছিটা। প্রতি শনিবারের রাত্রি এ পূজায় মহাষ্টমী। পুরোহিত যৌবন।

যজ্ঞ। যজ্ঞকালে পুরোহিত যৌবন মহাশয় উপাসকের প্রাণ সমিধে মোহের আগুন লাগাইয়া দিয়া সর্ব্বনাশ তন্ত্র হইতে মন্ত্র পড়িয়া আহুতি দিবেন—"মান ভাঙ্গিতে নিদ্রা স্বাহা"—"কথা রাখিতে ভ্রাতৃবন্ধন স্বাহা"—"অলঙ্কার ও শাটী কিনিতে যথাসর্ব্বস্ব স্বাহা"—"পাঠের জন্য নাটক কিনিয়া দেশীয় সাহিত্য স্বাহা"—"মন রাখিতে ইহলোক পরলোক স্বাহা"—ইত্যাদি।

স্তুতি। সংসারগগনে তুমি ব্যোমযান—কথায় কথায় আকাশে তোল; আবার যখন ফেলিয়া দাও, তখন সমুদ্রগর্ভে অথবা পর্ব্বতশৃঙ্গে হাবুডুবু খাইতে হয়, অথবা হাড় চূর্ণ হইয়া যায়। জীবনের পথে তুমি রেলের গাড়ি—যখন রসনারূপ এঞ্জিনে ফুল ফোর্স দাও তখন এক দণ্ডের মধ্যে চৌদ্দ ভুবন দেখাও। কার্য্যক্ষেত্রে তুমি ইলেক্‌ট্রিক টেলিগ্রাফ—কথাটি পড়িলে নিমেষের মধ্যে তাহা দেশদেশান্তরে চালাইয়া দাও। ভবনদীর তুমি নৌকা—অধমকে পার কর।

তুমি ইন্দ্র—শ্বশুরকুলের দোষ দেখিতে তুমি সহস্রচক্ষু; স্বামীর শাসনে তুমি বজ্রপাণি; তোমার থাকিবার স্থান অমরাবতী—যেখানে তুমি সেই স্বর্গ।

তুমি চন্দ্র। তোমার হাসি কৌমুদী—তাহাতে মনের অন্ধকার দূর হয়। তোমার ভালবাসা অমৃত—যার অদৃষ্টে ঘটে তার সশরীরে স্বর্গভোগ। আর লোকে যে অনর্থক বলে তুমি পরাধীন, ঐ টুকু তোমার কলঙ্ক।

তুমি বরুণ, কেন না, মনে করিলেই জলে মাটী ভিজাইতে পার। তোমার চক্ষের জল; দেখাদেখি আমরাও গলিয়া যাই।

তুমি সূর্য্য—উপরে আলোকের আবরণ, ভিতরে অন্ধকার বাষ্প। একদণ্ড চক্ষের বাহির হইলে দশদিক্ অন্ধকার দেখিতে হয়। আবার যখন মাথায় উঠ, তখন আঞ্চান করিয়া মরি—দেশ ছাড়িয়া পলাইতে ইচ্ছা করে।

তুমি বায়ু—জগতের প্রাণ। তোমা ছাড়া হইলে কতক্ষণ বাঁচি? একদণ্ড

তোমার দেখা না পাইলে প্রাণ ছটফট করে, জলে ঝাঁপ দিতে ইচ্ছা করে; আবার যখন প্রখর বহু, কার বাপের সাধ্য তোমার সম্মুখে দাঁড়ায়?

তুমি যম—বেড়াইয়া আসিতে রাত হইলে। তোমার বক্তৃতা নরক—সে যন্ত্রণা যাহাকে সহ্য করিতে না হয়, সে পুণ্যবান্—তার অনেক তপস্যা।

তুমি অগ্নি, কেন না দিবানিশি আমাদিগকে হাড়ে হাড়ে পোড়াইতেছ।

তুমি বিষ্ণু। তোমার নাসিকার নথ তোমার সুদর্শন চক্র—উহারই ভয়ে পুরুষ অসুরগণ মাথা গুঁজিয়া তটস্থ হইয়া থাকে। একমন একচিত্তে তোমার সেবা করিলে সশরীরে গো-লোক প্রাপ্ত হয়।

তুমি ব্রহ্মা। তোমার মুখ দিয়া যাহা বাহির হয় তাহাই আমাদের বেদ—অন্য বেদ আমরা মানি না—ঋক্, যজু, সাম, অনেক দিন হইল বৈতরণী পার করিয়াছি।

তুমি নীলকণ্ঠ, কেন না তোমার কণ্ঠ ভরা বিষ—অন্ততঃ দরিদ্রের ভাগ্যে। পরনিন্দায় তুমি পঞ্চমুখ। স্ত্রীস্বাধীনতাবাদীরা তোমার দলবল, অতএব তুমি ভূতনাথ।

তুমি লক্ষ্মী—তুমি যার ঘরে নাই, সে লক্ষ্মীছাড়া। তুমি ধনের দেবতা—প্রধান আচার্য্য ম্যালথস্ আইন জারি করিয়াছেন, যার টাকা নাই সে যেন তোমার উপাসনা করিতে না আসে।

তুমি সরস্বতী—বোধোদয় এবং পদ্যাবলী পড়িয়াই। বহু আরাধনায় তোমায় লাভ করিতে হয়, বহু সেবায় রাখিতে হয়।

তুমি মহামায়া, কেন না অত মায়া আর কেহ জানে না। পরচ্ছিদ্রদর্শনে তুমি ত্রিনয়নী। শরীরসজ্জার উপকরণগ্রহণে তুমি দশভুজা। শান্তিপুরের প্রসাদে তুমি দিগম্বরী।

তুমি শ্যামা। কেন না স্বামী, তোমার পদতলে। তোমার সাধনায় অনেক ভূত প্রেতিনীর দৌরাত্ম্য সহ্য করিতে হয়—বাসর ঘরের প্রেতিনীদিগের দৌরাত্ম্যের কথাটা মনে পড়িলে এ বৃদ্ধবয়সেও হৃৎকম্প শিরঃশূল নূতন করিয়া উপস্থিত হয়।

তুমি শ্রীকৃষ্ণ, কেন না এই সংসারগোষ্ঠে পুরুষ গোরুদিগকে চরাইয়া লইয়া বেড়াও। সারাদিন চরাইয়া সন্ধ্যাকালে দুটি ঘাস জল দিয়া গোয়ালে বন্ধ কর,

তুমি জগন্নাথ—তোমার জুরিস্‌ডিক্সনের মধ্যে জাতিভেদ নাই; ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, তাঁতি, জোলা, সব একগোত্র। জগন্নাথের হাত নাই; বঙ্গদেশে তোমারও কিছুতে হাত নাই।

তুমি গয়া—কত লোকের পিণ্ডই যে তোমাতে মর্দ্দিত হইয়াছে তার সীমা নাই। তুমি কাশী—পৃথিবীর ধর্ম্মের ষাঁড় তোমাদের চেলা।

তুমি বসন্ত—মিলনে; তখন হৃদয়োদ্যানে কত ফুল যে ফুটে, কত বায়ু যে

বহে, কত ভ্রমর গুঞ্জরে, কত কোকিল কুহরে—সুখের স্পর্শে অনুক্ষণ পুলকপূর্ণ। তুমি গ্রীষ্ম—বিরহে; সদাই আঞ্চান, ছটফট, জলে মরি, বাতাস দে, নির্জীব, নিরুৎসাহ, অলস, অবশ—প্রাণটা হুহু করে, পৃথিবীটা খাঁ খাঁ করে, যেন প্রলয় উপস্থিত। তুমি বর্ষা—রোগে; হৃদয়াকাশ সদা মেঘাচ্ছন্ন, নয়নজলদ সদা জলভারাকীর্ণ এবং বর্ষণোন্মুখ—একবার বর্ষে, তখনই ধরে, আবার তখনই বর্ষে—সর্ব্বদা আশঙ্কা, কখন কি হয়। তুমি শীত—রাগে; জড়সড়, কম্পযুক্ত, পেটের ভিতর হাত পা ঢুকিয়া যায়, দাঁতে দাঁতে লাগে; শীতে কেবল আহারের সুখ, তুমি যে দিন রাগে থাক সে দিনও বটে—দুই জনের ভাগ একার হয়। তুমি শরৎ—প্রার্থনায়; যখনই তোমার দিকে চাহিয়া দেখি যে দিঙ্মণ্ডল পূর্ণ প্রকাশ, শশধর ষোল কলায় হাসিতেছে, খঞ্জনচকোর নাচিতেছে, তখনই বুঝিতে পারি, আজ বুঝি কিছু আবদার আছে, নহিলে এত রূপের ছড়াছড়ি, সোহাগের এত বাড়াবাড়ি!

তুমি বেদ—তোমার কথাই সকল ধর্ম্মের উপর ধর্ম্ম। তুমি ধর্ম্মশাস্ত্র—মনুত্রিবিষ্ণুহারীত প্রভৃতিকে তামাদি করিয়া তুলিয়াছি, এখন তোমার বিধানমতেই চলিব। তুমি তন্ত্র—উচ্ছন্নের মূলমন্ত্র। তুমি পুরাণ—অধিকাংশই বাজে কথা, অনেক মিথ্যা কথা, কাজের কথা খুঁজিয়া পাওয়া ভার। তুমি সাংখ্য—প্রকৃতিই মূল তত্ত্ব। তুমি বেদান্ত—সব মায়ার মোহ। তুমি ন্যায়—অন্ততঃ কলহপটুতায়। তুমি পাতঞ্জল—তোমা বৈ আবার যোগ কি? তুমি মীমাংসা—তা কেবল দর্শন বলিয়া কেন, দর্শনে স্পর্শনে, আস্বাদনে, তুমি যা বল তাই নিষ্পত্তি, যে আপত্তি করে তার কম্বক্তি।

তুমি ক্ষিতি, কেননা প্রকৃত পক্ষে তুমিই বসুন্ধরা—যে হাসি হাস, যে কথা কও, যে চাহনি চাও কুবেরের ভাণ্ডার বেচিয়া দিলেও তার মূল্য হয় না। তুমি অপ, কেন না তুমি তরলমতি। তুমি তেজঃ—বালিকাবিদ্যালয়ের প্রসাদাৎ। তুমি মরুৎ, কেন না শব্দ বহন করা তোমার ধর্ম্ম। তুমি ব্যোম—কত রঙ্গেই যে থাক তার ঠিকানা পাই না।

এ স্তবটা হিন্দুমতে হইল। ব্রাহ্মেরা হয় ত তজ্জন্য কিঞ্চিৎ মনক্ষুণ্ণ হইবেন। কিন্তু আমরা কাহাকেও বঞ্চিত করিব না; ব্রাহ্মমতেও একটা স্তোত্র দিতেছি। আমার ইচ্ছা সকলকেই অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যাই; চক্ষুর দোষে যদি কাহারও আলো আঁধারি লাগে, আমি কি করিব? স্তোত্র যথা,—

হে সর্ব্বময়ি, এই পরিদৃশ্যমান জগৎ নিরন্তর তোমার অপার মহিমা ঘোষণা করিতেছে। এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড তোমার মঙ্গলময় ইচ্ছা পরিপূর্ণ করিতেছে। বায়ুর সৃষ্টি তোমার গ্রীষ্ম দূরীকরণ করিবার জন্য; মৃত্যুর সঞ্চার তোমার মাথার উকুন মারিবার জন্য; সূর্য্যের উদয়

তোমার ভিজা কাপড় শুকাইবার জন্য; চন্দ্রের বিকাশ তোমার শোবার ঘরের বারান্দায় বাঁধা রোশনাই করিবার জন্য; ফুল ফুটে, তুমি খোঁপায় পরিবে বলিয়া; ফল পাকে, তুমি শ্রীউদরে দিবে বলিয়া; হে পরম সৎ, আশীর্ব্বাদ কর, রাত্রে যেন সুনিদ্রা হয়।

তুমি অনন্ত, কেন না তোমার অন্ত পাওয়া ভার। তুমি সর্ব্বশক্তিমতী, কেন না তুমি না করিতে পার হেন কর্ম্ম নাই। তুমি একমেবাদ্বিতীয়ং কেন না তোমার যোড়া নাই—হে সশরীরে মুক্তি প্রদায়িনি, পাপীর অপরাধ লইওনা, আমি কথায় কথায় অনুতাপ করিব;—অনুতাপ আমি খুব করিতে পারি, এক প্রকার সিদ্ধবিদ্য বলিলেই হয়।

তুমি সত্যস্বরূপ, কেন না তোমা বৈ সব মিথ্যা। তুমি যে অমৃতস্বরূপ তাহা আর বলিতে হইবে কেন? তুমি অতি গুরু—নতুবা লোকে ভূতের বোঝা বলিবে কেন? তুমি অতি হাল্‌কা—প্রমাণ, পেটে কথা থাকে না। তুমি অপরিসীম—উদর সম্বন্ধে। তুমি মনুষ্যবুদ্ধির অতীত—হে সর্ব্বদুঃখবিনাশিনি, হে সর্ব্বসুখপ্রদায়িনি, অধমের অপরাধ হইলে রাগ করিয়া ঘরের বাহির করিয়া দিও না—আমি খাটের পাশে দাঁড়াইয়া থতমত খাইব, মাথা চুলকাইব আর অ্যাঁ অ্যাঁ করিব। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

সনাতন ধর্ম্মপ্রচারের সেণ্ট পল
শ্রীচঃ

উৎকলের প্রকৃতাবস্থা।

"খণ্ডগিরি" প্রাচীন উড়িয়া বৌদ্ধদিগের প্রধান কীর্ত্তি। এই খণ্ডগিরি কটকসহরের ৮।৯ ক্রোশ দূরবর্ত্তী দক্ষিণ পশ্চিমাংশে ভুবনেশ্বর নামক শৈবক্ষেত্রের নিকটে জঙ্গলমধ্যে দুইটি পর্ব্বতমধ্যে সংস্থাপিত। ঐ দুইটী পর্ব্বতের গাত্র খোদিত করত দ্বিতল, ত্রিতল বাটী সকল প্রস্তুত হইয়াছে। সেই বাটী সকলের নিম্নে প্রাঙ্গণ, উপরের ঘরে উঠিবার জন্য সোপানাবলি, দরদালানের একপার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত থাম সকল শ্রেণীবদ্ধ, দরদালানের পরে কুঠারী সকল শ্রেণীবদ্ধ। কুঠারীগুলি যে নিতান্ত সঙ্কীর্ণ এমত নহে, কলিকাতার অনেক বাসাড়ের ঘর অপেক্ষা তাহা লম্বাচৌড়া; গৃহদ্বারের উপরে খোদিত নানারূপ পুত্তলিকা আছে। একটি পর্ব্বতে ঐরূপ বাটী দুইটি, অপরটীতে একটি আছে। উত্তরপার্শ্বের পর্ব্বতটীর মধ্যস্থলে সর্পের আকৃতির ন্যায় বক্রভাবে খোদা গহ্বর, লম্বা প্রায়

৩০।৪০ ফুট; নিম্নে পর্ব্বত, উর্দ্ধে পর্ব্বতচূড়া, দূর হইতে দেখিলে বোধ হয় যেন পর্ব্বত মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে। এইটীর নাম ইংরেজিতে "এস্নেক্ কেভ্" বলে। এই কেভটীর পশ্চিমাংশে ব্যাঘ্রের মুখাকৃতির ন্যায় আর এক গহ্বর আছে, সেটির নাম ইংরেজিতে "টাইগার কেভ" বলে, সেইটির মধ্যে একটি কুঠারী, এবং দরদালান আছে। পশ্চিমাংশের পর্ব্বতে একটি হস্তীর মুখাকৃতি কৃত্রিম গুহা আছে, তাহার নাম "এলিফেণ্ট কেভ" ঐ দুই পর্ব্বতে আরও অনেকগুলি কেভ অর্থাৎ কৃত্রিমগুহা আছে; দুইটি পর্ব্বতে প্রায় ৬০।৬২ টী গুহা প্রত্যক্ষ হয়। পর্ব্বতের অন্য পার্শ্ব এক্ষণে জঙ্গলপূর্ণ, হিংস্রজন্তুর আবাসস্থল বলিয়া গমনাগমনের নিতান্ত অসুবিধা হইয়াছে। ঐ দুইটি পর্ব্বতের উপরে পাঁচটি চৌবাচ্ছা আছে; ঐ গুলি "গঙ্গা" নামে প্রসিদ্ধ। যে সকল বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারকগণ অনেকদিন কার্য্য করিয়া বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হইতেন, তাঁহারাই ঐ সকল গুহাতে যোগসাধনা করত জীবনাতিবাহিত করিতেন; আর ঐ চৌবাচ্ছাতে স্নানাদি করিতেন। পশ্চিমাংশের পর্ব্বতের উপরে একটি মন্দির, এবং তাহার সংলগ্ন দুইটি লাটমন্দির আছে; কিন্তু তাহা আধুনিক বলিয়া বোধ হয়। ঐ মন্দির প্রস্তরাদি দ্বারা নির্ম্মিত। তন্মধ্যে বেদী আছে, এবং বেদীতে বুদ্ধদেবের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্ত্তি কয়েকটি সংস্থাপিত আছে। কয়েকটি দ্বিতল গুহা অর্দ্ধখোদিত হইয়া অসম্পূর্ণ অবস্থায় রহিয়াছে, বোধ হয় ভুবনেশ্বরের কেশরীবংশীয় রাজাদিগের প্রাদুর্ভাব কালে যখন শৈবধর্ম্মের উৎসাহ-অগ্নি উৎকল দেশে প্রজ্জলিত হয়, এবং শৈবগণ বৌদ্ধদিগকে উৎপীড়ন আরম্ভ করেন, তাহার প্রাক্কালেই ঐ কয়েকটি কেভ খোদিত হইতেছিল, তৎপরে শৈবদিগের উৎপীড়ন হেতু বৌদ্ধগণ ঐ খণ্ডগিরি পরিত্যাগ করত প্রস্থান করেন, যাহা হউক, খণ্ডগিরি অশোক রাজার সময়ে একটি সমৃদ্ধিশালী স্থান এবং পুণ্যভূমিমধ্যে পরিগণিত ছিল। ইতিহাসলেখক হণ্টর প্রভৃতির মতে ঐ সকল কেভ প্রায় বাইশশত বর্ষের অধিককাল হইবে নির্ম্মাণ হইয়াছে। তাহা যাহাই হউক এক্ষণে খণ্ডগিরির ব্যাপার দেখিলে প্রাচীন উৎকলবাসী বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মোৎসাহের চূড়ান্ত নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। উৎকলের ইতিহাসলেখকগণ বলেন, নানা স্থানীয় বৌদ্ধগণ সেই সময়ে উৎকলপ্রদেশে উপস্থিত হইয়া এই আশ্চর্য্য কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, যদিও তাহা স্বীকার করা যায় তাহা হইলেও বিদেশী বৌদ্ধগণ সংখ্যাতে কয়জনই বা আসিয়া থাকিবেন? ঐ সকল ব্যাপার সম্পন্ন করা দুই জন কি দশ জন লোকের কার্য্য নহে। এই কার্য্য উপলক্ষে বহুসংখ্যক লোক ভিন্নদেশ হইতে উৎকলপ্রদেশে যে আসিয়াছিলেন, তাহার কোন বিশিষ্ট প্রমাণ যখন প্রাপ্ত হওয়া যায় না,

তখন প্রাচীন উৎকলবাসীদিগের দ্বারাই যে ঐ সকল কীর্ত্তি সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহা মুক্তকণ্ঠেই স্বীকার করা যাইতে পারে।

পুরীর জগন্নাথের মন্দিরটিও বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদিগের একটি প্রধান কীর্ত্তি। হণ্টারের মতে খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে তৃতীয় ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা কর্ত্তৃক প্রসিদ্ধ মন্দিরটি নির্ম্মিত হইয়াছে।* এই মন্দিরের বেষ্টিত ভিত্তির মধ্য দিয়া একটী

* হণ্টার তৃতীয় ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক দ্বাদশ শতাব্দীতে ঐ মন্দির নির্ম্মাণ হইবার কথা উল্লেখ করিয়াছেন,তাঁহাকে এ বিষয়ে ভ্রমশূন্য বলিয়া মনে করিতে পারা যায় না। হণ্টার সাহেব নিজকৃত ইতিহাসে লিখিয়াছেন—"খ্রীঃ পঞ্চম শতাব্দীর কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব হইতেই উৎকলবাসী বৌদ্ধগণ শৈবধর্ম্মাবলম্বী রাজগণ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া ক্রমশঃ শৈবধর্ম্মাবলম্বন করেন, এবং অনেক বৌদ্ধ উড়িয়া দেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করেন; ষষ্ঠ শতাব্দীতে শৈবধর্ম্মাবলম্বী যজাতিকেশরী রাজা কর্ত্তৃক ভুবনেশ্বরের প্রসিদ্ধ মন্দির নির্ম্মিতহয়।" যখন পঞ্চম শতাব্দী হইতে উৎকলের বৌদ্ধগণ উৎপীড়নের হস্তে পতিত হইয়া ক্রমশঃ দেশ পরিত্যাগ ও ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আসিতেছিলেন, এমত অবস্থায় অষ্টম শতাব্দী পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী উৎকলদেশে থাকা, অনুমান করা যায় না। যে যুক্তিতে, যে কারণে মহম্মদের অত্যাচার এবং উৎপীড়ন আরম্ভ হইবার ২।৩ শত বর্ষ পরে আরবরাজ্যে অন্য ধর্ম্মাবলম্বী বেশী লোক থাকা অনুমান করা যাইতে পারে না, সেই যুক্তি অবলম্বন করিয়া দেখা যায় শৈবধর্ম্মাবলম্বী কেশরীবংশীয় রাজাদিগের পীড়ন আরম্ভের দুই তিন শতাব্দীর পরে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীরা উৎকলদেশ হইতে নির্ম্মূল হইয়াছিলেন এরূপ অনুমানও অসঙ্গত বোধ হয় না। এদিকে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র পুরীর মন্দিরে বৌদ্ধদেবের, এবং জগন্নাথদেবও বৌদ্ধদেবের আক্ষরিক মূর্ত্তি প্রমাণ করিতেছেন, তাহা হইলে তৃতীয় ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার তিনশত বর্ষ পূর্ব্বে, এমন কি ভুবনেশ্বরের মন্দির নির্ম্মিত হইবার পূর্ব্বে পুরীর মন্দির নির্ম্মিত হইবার সম্ভাবনা এবং তৃতীয় ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, এরূপ স্বীকার করিতে হয়, নচেৎ তৃতীয় ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা বৌদ্ধদেবতার ঐ মন্দিরের কেবলমাত্র সংস্কারকার্য্য সম্পন্ন করত, বৌদ্ধদেবতার আক্ষরিক মূর্ত্তিকে "জগন্নাথ" নাম প্রদান করিয়া বিষ্ণুধর্ম্মের উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন, এই মাত্র অনুমানসিদ্ধ হইতে পারে। পুরীর মন্দিরটি খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দীর বহুকাল পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইবার আরও একটি যুক্তিসঙ্গত প্রমান হণ্টার সাহেবের মতেই প্রকাশ হইতেছে; হণ্টার সাহেব নিজকৃত ইতিহাসে লিখিয়াছেন "শাক্যসিংহের মৃত্যুর পরে বৌদ্ধগণ উৎকলে শাক্যসিংহের দুইটি দণ্ড আনিয়াছিলেন; এবং সেই দুইটী দণ্ডকে রথারোহণ করাইয়া টানা হইত, বর্ষে বর্ষে তদ্ধেতুক খুব জাঁক জমকের মেলা হইত। যখন শৈবধর্ম্মাবলম্বিগণ বৌদ্ধদিগকে উৎপীড়ন আরম্ভ করেন, তখন একজন বৌদ্ধ ঐ দুইটী দণ্ড লইয়া সিংহলদ্বীপে পলায়ন করেন।" হণ্টার সাহেবের এই কথাই প্রমাণ করিতেছে যে, শৈবধর্ম্মাবলম্বী কেশরীবংশীয় রাজাদিগের প্রাদুর্ভাব

গুপ্ত সোপান আছে; তাহা ত্রিতল এবং তাহা সম্প্রতি প্রকাশ হইয়াছে। ভিত্তির মধ্য দিয়া বরাবর উপরে উঠিবার সিঁড়ি প্রস্তুত করা বড় সাধারণ বুদ্ধির এবং ক্ষমতার কার্য্য নহে। এই মন্দিরটি প্রায় দেড়শত হস্ত অপেক্ষা উচ্চ হইবে। মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ, তৎপার্শ্বে দেবালয় সকল সংস্থাপিত, বাটীর চারিদিকে চারিটী গেট। জগন্নাথের বাটীর ফ্লোর উচ্চতায় প্রায় ৮।৯ হস্ত হইবে। মন্দিরের সম্মুখস্থ তিনটী লাটমন্দির সংস্থাপিত আছে, উক্ত তিনটী লাট-মন্দিরের কার্নিসের চতুষ্পার্শ্বে এবং গাত্রে ঈদৃশ জঘন্য অশ্লীলভাবব্যঞ্জক মূর্ত্তি সকল সংস্থাপিত আছে, তাহা দেখিলে ঐ মন্দির দেবমন্দির না বলিয়া "নরকধাম" বলিতে ইচ্ছা হয়।†

বৃদ্ধি হইবার পূর্ব্বে অর্থাৎ খ্রীঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর আরও পূর্ব্বে পুরীর মন্দির নির্ম্মিত, এবং দণ্ডোৎসব উপলক্ষে রথযাত্রার প্রথা প্রচলিত হওয়াই সম্ভব। যজাতি কেশরী রাজার সময়ে খ্রীঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভুবনেশ্বরের প্রসিদ্ধ শিবমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল, এরূপ স্থলে খ্রীঃ পঞ্চম শতাব্দীতে বৌদ্ধদিগের উন্নতাবস্থার সময়ে পুরীর মন্দির নির্ম্মিত হওয়াই সম্ভব। উৎকলের "মাদলাপঞ্জিকা" প্রভৃতির দ্বারা যে সব প্রমাণ সংগ্রহ করা হইয়াছে, তাহা তত ঠিক বোধ হয় না। তাহার প্রধান কারণ কেশরীবংশীয় রাজাদিগের সময়ে অথবা ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার সময়ে উড়িয়া ভাষাই অসম্পূর্ণাবস্থা ছিল, তৎকালে "মাদলাপঞ্জিকা" প্রভৃতি প্রস্তুত হওয়া কদাচই সঙ্গত বোধ হয় না; "মাদলা পঞ্জিকা" প্রভৃতি গঙ্গাপতি বংশীয়দিগের সময়ে প্রচলিত হওয়াই সম্ভব। তখন ঐ পঞ্জিকাদির দ্বারা বহু প্রাচীনকালের বিবরণ সংগ্রহ হওয়া ঠিক বলা যাইতে পারে না। বোধ হয় ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা পুরীর মন্দিরের লাট মন্দির সিংহদ্বার প্রভৃতি নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন, তজ্জন্যই ঐ মন্দিরও তাঁহার কীর্ত্তি বলিয়া প্রচারিত হইয়া থাকিবে।

† হণ্টার প্রভৃতি উৎকলের ইতিহাস লেখকগণ, ঐ জঘন্য মূর্ত্তি সকল মন্দিরের সঙ্গে সংস্থাপিত হইয়াছে, কি অন্য কোন সময়ে সংস্থাপিত হইয়াছে তদনুসন্ধানে ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন। আমি ইহার অনুসন্ধান করিয়াছিলাম; প্রথমে দেখিলাম প্রধান মন্দির এবং লাটমন্দির প্রস্তরনির্ম্মিত; শ্রেষ্ঠ মন্দিরটীর উত্তর পার্শ্বের গাত্রে একস্থানে একটি মাত্র ঐরূপ জঘন্যমূর্ত্তি আছে; কিন্তু সেটী কেবল মাত্র চূণ বালির জমাটে প্রস্তুত হইয়াছে; এই খানেই আমার সন্দেহ হয় যে, মন্দির নির্ম্মাণের সময় ঐ মূর্ত্তিটি সংস্থাপিত হইলে, ঐ মূর্ত্তিটি প্রস্তর খোদিত হইত এবং গাঁথুনির সঙ্গে সংযুক্ত হইত; তৎপরে সম্মুখের প্রথম লাটমন্দিরের সম্মুখের গাত্রে কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরের যতগুলিন জঘন্য মূর্ত্তি সংস্থাপিত দেখিলাম, ঐ সকল মূর্ত্তি লাটমন্দিরের গাত্র সাবধানে খোদিত হইয়া তন্মধ্যে সংস্থাপিত হইয়াছে, বড় লাটমন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে যে সকল জঘন্যমূর্ত্তি আছে, তাহাও চূর্ণ বালির জমাট করা প্রস্তুত; তাহাতে স্পষ্ট বোধ হইল ঐ সকল জঘন্য মূর্ত্তি মন্দির নির্ম্মাণের বহুকাল পরে সংস্থাপিত হইয়াছে। এমন কি ঐসকল জঘন্যমূর্ত্তি

উক্ত মন্দিরের সিংহদ্বারের সম্মুখে "অরুণ-স্তম্ভ" সংস্থাপিত আছে। স্তম্ভটী প্রায় ৪০ ফুট উচ্চ; ব্যাস প্রায় গড়ে আড়াই ফুট; ঐ স্তম্ভটীর নিম্নদেশে কৃষ্ণ-বর্ণ প্রস্তরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হংসমালা বেষ্টিত। ঐ হংসমালা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। ঐ স্তম্ভটী কণারক নামক স্থানের সূর্য্যমন্দিরের সম্মুখে সংস্থাপিত থাকে, মহারাষ্ট্রীয় রাজাদিগের সময়ে ঐ স্তম্ভটীকে তিনখণ্ড করিয়া; পুরীতে আনা হয়; এবং জগন্নাথের বাটীর সম্মুখে সংস্থাপিত করা হয়। পুরীতে তিনটি প্রকাণ্ড পুষ্ক-রিণী আছে, "ইন্দুদ্যুম্ন" একটীর নাম, দ্বিতীয়টীর নাম "মার্কণ্ড" তৃতীয়টীর নাম "নরেন্দ্র" এইটী অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

পুরীর প্রায় দেড় ক্রোশ দূরবর্ত্তী—"লোকনাথ" নামক একটি শিব আছেন। ঐ শিবের মস্তক হইতে জলস্রোত নির্গত হইতেছে।

ভুবনেশ্বর—এই মন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য যজাতিকেশরী রাজার সময়ে সম্পন্ন হয়। অর্থাৎ খ্রীঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রস্তুত হয়; প্রায় তেরশত বর্ষ অতীত হইল ঐ মন্দিরের নির্ম্মাণ-কার্য্য সমাধা হইয়াছে। নির্ম্মাণ করিতে একশত বর্ষ অতিবাহিত হইয়াছিল। উড়িয়া শৈবধর্ম্মাবলম্বীদিগের ঐ কীর্ত্তি দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। মন্দিরটী যেমন বৃহৎ, সেইরূপ আবার প্রশস্ত। মন্দিরের গাত্রে নানা প্রকার প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি সকল সন্নিবেশিত আছে। একটি মূর্ত্তির পায়ে একরূপ বুটজুতা আছে, তদ্দৃষ্টে বোধ হয় তৎকালে বুট-জুতার ব্যবহার প্রচলিত ছিল।* মন্দি-রের মধ্যস্থলে, চতুষ্পার্শ্বে প্রাচীর এবং

মুসলমানদিগের রাজত্বের পরে সংস্থাপিত হইয়াছে এরূপ অনুমান অসঙ্গত বোধ হয় না। মুসলমানগণ পুরীর মন্দিরের গাত্রে যে সকল খোদিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবমূর্ত্তি ছিল, তৎসমুদয়ের হস্তপদ নাসিকা, গ্রীবা প্রভৃতির কোন না কোন অংশ ভগ্ন করিতে ত্রুটি করে নাই; যদ্যপি তৎকালে ঐ সকল মূর্ত্তি মন্দিরে সন্নিবেশিত থাকিত তাহা হইলে, ঐ সকল মূর্ত্তিরও অন্ততঃ কোন না কোন অঙ্গ ভাঙ্গিতে ত্রুটি করিত না, ঐ সকলমূর্ত্তি কদাচই অক্ষত অঙ্গ থাকিত না; ইহার দ্বারা স্পষ্টই জানা যাইতেছে ঐ সকল মূর্ত্তি মুসলমানদিগের শেষকালে যখন শৈব তান্ত্রিকদিগের হস্তে মন্দিরের কার্য্যভার পতিত হইয়াছিল; সেই সময়ে তান্ত্রিক পুরোহিতগণ "বটুক ভৈরব" নামক একটি শিবমূর্ত্তি জগন্নাথের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত করেন, এবং বোধ হয় সেই সময়েই তাঁহারাই ঐ সকল জঘন্যমূর্ত্তি লাটমন্দির প্রভৃতির গাত্রে সন্নিবেশিত করত আপনাদের পাপরুচির চিহ্ন সংস্থাপিত করেন। তৎপরে যখন তপ্ত মুদ্রাধারী বৈষ্ণবদিগের হস্তে মন্দিরের ভার পতিত হয় তখন তাঁহারা জগন্নাথের সম্মুখ হইতে বটুক ভৈরবের মূর্ত্তি উঠাইয়া সমুদ্রে বিসর্জ্জন করেন। এই ঘটনা বোধ হয় মহারাষ্ট্রীয়দিগের আমলদারিতে সম্পন্ন হয়।

* ইতিহাস লেখকদিগের মতে গ্রীকগণ তৎকালে উৎকল দেশে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের পাদুকা ঐ রূপ ছিল, তদ্দৃষ্টেই মন্দিরের গাত্রে প্রস্তরময়ী মূর্ত্তিতে বুটজুতা খোদিত হইয়াছে।

দেবালয় সকল সংস্থাপিত, সম্মুখে প্রকাণ্ড সিংহদ্বার, এবং অন্য তিনদিকে তিনটা বৃহৎ প্রবেশদ্বারও আছে; এই মন্দির প্রাচীন উৎকলীয় লোকের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কীর্ত্তি। এরূপ সুন্দর এবং সুগঠন মন্দির ভারতবর্ষের কুত্রাপিও নাই বলা অত্যুক্তি হয় না।

ভুবনেশ্বরে "মার্কণ্ডেশ্বর" নামক অপর একটি শিবালয় আছে। তাহার কার্য্যও অতি সুন্দর। ঐ দেবালয়টি মর্কটকেশরী রাজার সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া ইতিহাসলেখকগণ বলেন। উক্ত দেবালয়ের মধ্যে প্রবেশদ্বারের দুই পার্শ্বে দুইখানি কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরফলকে উক্ত মন্দিরের বিবরণ লিখিত আছে; আমি তাহা পড়িতে চেষ্টা করিতে গিয়া দেখিলাম, তাহার অক্ষর অনেক গুলি দেবনাগর, কতকগুলি বাঙ্গালা, আর এক্ষণে যে সকল উড়িয়া বর্ণমালা প্রচলিত, সেরূপ অক্ষরও মধ্যে মধ্যে আছে; ঐ বিবরণ উল্লিখিত তিন প্রকার বর্ণমালাতে সম্পন্ন হইয়াছে, তদ্দৃষ্টে বেস অনুভব হইল, মর্কটকেশরী রাজার সময়েও উড়িয়া বর্ণমালা পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই; এবং বাঙ্গালাভাষা অথবা বাঙ্গালা বর্ণমালা তাহার বহুকাল পূর্ব্বে পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল; সংস্কৃত, এবং বাঙ্গালা এই দুই ভাষার বর্ণমালা হইতেই উড়িয়া বর্ণমালা প্রস্তুত হইয়াছে তাহা উপরুক্ত প্রস্তরফলকের লিখন দৃষ্টিমাত্রেই অনুভব হইবে। খ্রীঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে কেশরীবংশীয় রাজাদিগের সময়েও উড়িয়া বর্ণমালা সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই।

ভুবনেশ্বরের নানা স্থানে প্রাচীন দেবমন্দির সকল সংস্থাপিত রহিয়াছে, ঐ সকল মন্দিরের গাঁথুনি কেবল মাত্র পাথরে পাথরে ঘর্ষণ করিয়া, পাথরের উপর পাথর সংস্থাপিত হইয়াছে; চূর্ণ বালি শুরকী অথবা অপর কোনরূপ মসলা দ্বারা ঐ সকল মন্দিরের গাঁথুনি হয় নাই; শতশত বর্ষাতীত হইল, তথাপি ঐ সকল মন্দির অটলভাবে অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। ভুবনেশ্বরের পূর্ব্ব উত্তরাংশে জঙ্গলমধ্যে একটি অত্যাশ্চর্য্য প্রাচীন মন্দির আছে; ঐ মন্দিরের গাত্রে নানা রূপ মূর্ত্তি সকল খোদিত। মন্দিরমধ্যে যে মূর্ত্তি আছে, তাহার নিম্নদেশ হইতে জলস্রোত নির্গত হইয়া একটি কুণ্ডমধ্যে পতিত হইতেছে, পুনরায় সেই কুণ্ডহইতে জল নির্গত হইয়া মাঠে পতিত হইতেছে, ঐ মন্দিরের প্রায় দুই ক্রোশ দূরে পর্ব্বত আছে, বোধ হয় সেই পর্ব্বত হইতে জলস্রোত নিম্নদেশ দিয়া অলক্ষিত ভাবে ঐ স্থানে আসিতেছে। ঐ স্থানটি অতিশয় রমণীয়। ভুবনেশ্বরের প্রাচীন মন্দির যত গুলি আছে, সকল গুলিই উড়িয়াদিগের অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিতেছে।

কণারক;—এই স্থান কটক নগরীর পূর্ব্ব দক্ষিণ প্রায় ১৬।১৭ ক্রোশ দূরবর্ত্তী সমুদ্র তীরবর্ত্তী। এই স্থানে একটী সূর্য্য-

মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল। মেঃ হণ্টারের মতে এই মন্দির খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল। যজাতিকেশরী রাজা যে দশ সহস্র ব্রাহ্মণ যাজপুর নামক স্থানে বসবাস করাইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সূর্য্যোপাসক ছিলেন, ঐ মন্দির তাঁহাদেরই কীর্ত্তি। ঐ মন্দিরটী এক্ষণে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; দূর হইতে দেখিলে বোধ হয় যেন একটী পর্ব্বত উন্নতমস্তকে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ঐ মন্দিরের ১৪।১৫ ক্রোশ মধ্যে কোন পর্ব্বতাদি প্রত্যক্ষ হয় না; কিন্তু ঐ মন্দির প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঐ মন্দিরের সম্মুখ দ্বারে একখানি বৃহৎ প্রস্তর সন্নিবেশিত ছিল, তাহাতে নবগ্রহের প্রতিমূর্ত্তি খোদিত আছে; ঐ খানি আনুমানিক দুই বিঘা জমি সরাইয়া আনিতে গবর্ণমেণ্টের বিস্তর অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে, এমত স্থলে মন্দির নির্ম্মাণকালে ঐ প্রস্তর সকল বহু দূরদেশ হইতে কিরূপে কণারকে আনা হইয়াছিল,তাহা চিন্তা করিতে গিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। এখন এত বিজ্ঞানের উন্নতি, এত কল, এত সুগম্য পথ, তথাচ ঐ প্রস্তর খণ্ড স্থানান্তরিত করিয়া সমুদ্রতীরে আনা দুরূহ ব্যাপার হইয়াছে,কিন্তু সেই প্রাচীন কালে উড়িয়াগণ অন্ততঃ ১৭। ১৮ ক্রোশ দূর হইতে ঐ প্রস্তরখণ্ডকে আনিয়া মন্দিরের উপরে উঠাইয়াছিলেন, ইহাও সাধারণ ক্ষমতা এবং অধ্যবসায়ের কার্য্য নহে। এই মন্দিরের ভগ্নাবশেষ কার্য্য সকল দেখিলে প্রাচীন উৎকলীয়দিগকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকা যায় না।

কটক—কটকের এক পার্শ্ব দিয়া মহানদী, অপর পার্শ্ব দিয়া কাঠযোড়ী নদী প্রবাহিত হইতেছে। ঐ দুই নদীর স্রোতে কটক সহর ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল, সেই অপকার নিবারণ জন্য কাঠযোড়ী নদীর গর্ভ হইতে একটী প্রস্তরের পোস্তা গাঁথা হয়; ঐ পোস্তা প্রায় তিন মাইল পথ ব্যাপ্ত; কোন স্থানে ত্রিশ ফুট, কোন স্থলে ততোধিক উচ্চ; মধ্যে মধ্যে প্রশস্ত ঘাট; এবং প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্তম্ভ সকল নদীগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে একটী স্তম্ভের গঠনকৌশল দেখিলে প্রাচীন উড়িয়াগণ কতদূর ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যাবিশারদ ছিলেন, তাহার চূড়ান্ত উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বর্ষাকালে যখন অতিবেগে জলস্রোত প্রবাহিত হয়, তখন ঐ স্তম্ভ কটক রক্ষা করে। জলস্রোত বেগে আসিয়া শেষোক্ত স্তম্ভে আঘাত করে; করিবামাত্রই জলস্রোত হ্রস্বতেজা হইয়া এপার ছাড়িয়া অপর পারে প্রধাবিত হইতে থাকে;—আর কটকের পারে জলের আঘাত লাগিতে পারে না, এরূপ কৌশল অবলম্বন করা সাধারণ বুদ্ধির কার্য্য নহে। এই স্তম্ভ প্রায় আট শত বর্ষের অপেক্ষাও প্রাচীন হইবে; উৎকলের ইতিহাসলেখক ষ্টার্লিং সাহেব বলেন উড়িশ্যায় প্রাচীন কালে শবদাহের জন্য কর নির্দ্ধারিত ছিল, সেই শবদাহ হইতে যে কড়ি আ-

দেবালয় সকল সংস্থাপিত, সম্মুখে প্রকাণ্ড সিংহদ্বার, এবং অন্য তিনদিকে তিনটী বৃহৎ প্রবেশদ্বারও আছে ; এই মন্দির প্রাচীন উৎকলীয় লোকের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কীর্ত্তি। একরূপ সুন্দর এবং সুগঠন মন্দির ভারতবর্ষের কুত্রাপিও নাই বলা অত্যুক্তি হয় না।

ভুবনেশ্বরে "মার্কণ্ডেশ্বর" নামক অপর একটি শিবালয় আছে। তাহার কার্য্যও অতি সুন্দর। ঐ দেবালয়টি মর্কটকেশরী রাজার সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া ইতিহাসলেখকগণ বলেন। উক্ত দেবালয়ের মধ্যে প্রবেশদ্বারের দুই পার্শ্বে দুইখানি কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরফলকে উক্ত মন্দিরের বিবরণ লিখিত আছে, আমি তাহা পড়িতে চেষ্টা করিতে গিয়া দেখিলাম, তাহার অক্ষর অনেক গুলি দেবনাগর, কতকগুলি বাঙ্গালা, আর এক্ষণে যে সকল উড়িয়া বর্ণমালা প্রচলিত, সেরূপ অক্ষরও মধ্যে মধ্যে আছে, ঐ বিবরণ উল্লিখিত তিন প্রকার বর্ণমালাতে সম্পন্ন হইয়াছে, তদ্দৃষ্টে বেশ অনুভব হইল, মর্কটকেশরী রাজার সময়েও উড়িয়া বর্ণমালা পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই, এবং বাঙ্গালাভাষা অথবা বাঙ্গালা বর্ণমালা তাহার বহুকাল পূর্ব্বে পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল ; সংস্কৃত, এবং বাঙ্গালা এই দুই ভাষার বর্ণমালা হইতেই উড়িয়া বর্ণমালা প্রস্তুত হইয়াছে তাহা উপরুক্ত প্রস্তরফলকের লিখন দৃষ্টিমাত্রেই অনুভব হইবে। খ্রীঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে কেশরীবংশীয় রাজাদিগের সময়েও উড়িয়া বর্ণমালা সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই।

ভুবনেশ্বরের নানা স্থানে প্রাচীন দেবমন্দির সকল সংস্থাপিত রহিয়াছে, ঐ সকল মন্দিরের গাঁথুনি কেবল মাত্র পাথরে পাথরে ঘর্ষণ করিয়া, পাথরের উপর পাথর সংস্থাপিত হইয়াছে, চূর্ণ বালি শুরকী অথবা অপর কোনরূপ মসলা দ্বারা ঐ সকল মন্দিরের গাঁথুনি হয় নাই, শতশত বর্ষাতীত হইল, তথাপি ঐ সকল মন্দির অটলভাবে অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। ভুবনেশ্বরের পূর্ব্ব উত্তরাংশে জঙ্গলমধ্যে একটি অত্যাশ্চর্য্য প্রাচীন মন্দির আছে, ঐ মন্দিরের গাত্রে নানা রূপ মূর্ত্তি সকল খোদিত। মন্দিরমধ্যে যে মূর্ত্তি আছে, তাহার নিম্নদেশ হইতে জলস্রোত নির্গত হইয়া একটি কুণ্ডমধ্যে পতিত হইতেছে, পুনরায় সেই কুণ্ডহইতে জল নির্গত হইয়া মাঠে পতিত হইতেছে, ঐ মন্দিরের প্রায় দুই ক্রোশ দূরে পর্ব্বত আছে, বোধ হয় সেই পর্ব্বত হইতে জলস্রোত নিম্নদেশ দিয়া অলক্ষিত ভাবে ঐ স্থানে আসিতেছে। ঐ স্থানটি অতিশয় রমণীয়। ভুবনেশ্বরের প্রাচীন মন্দির যত গুলি আছে, সকল গুলিই উড়িয়াদিগের অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিতেছে।

কণারক ;—এই স্থান কটক নগরীর পূর্ব্ব দক্ষিণ প্রায় ১৬।১৭ ক্রোশ দূরবর্ত্তী সমুদ্র তীরবর্ত্তী। এই স্থানে একটী সূর্য্য-

মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল। মেঃ হণ্টারের মতে এই মন্দির খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল। যজাতিকেশরী রাজা যে দশ সহস্র ব্রাহ্মণ যাজপুর নামক স্থানে বনবাস করাইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে যাহারা সূর্য্যোপাসক ছিলেন, ঐ মন্দির তাঁহাদেরই কীর্ত্তি। ঐ মন্দিরটী এক্ষণে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, দূর হইতে দেখিলে বোধ হয় যেন একটী পর্ব্বত উন্নতমস্তকে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ঐ মন্দিরের ১৪।১৫ ক্রোশ মধ্যে কোন পর্ব্বতাদি প্রত্যক্ষ হয় না; কিন্তু ঐ মন্দির প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঐ মন্দিরের সম্মুখ দ্বারে একখানি বৃহৎ প্রস্তর সন্নিবেশিত ছিল, তাহাতে নবগ্রহের প্রতিমূর্ত্তি খোদিত আছে; ঐ খানি আনুমানিক দুই বিঘা জমি সরাইয়া আনিতে গবর্ণমেণ্টের বিস্তর অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে, এমত স্থলে মন্দির নির্ম্মাণকালে ঐ প্রস্তর সকল বহু দূরদেশ হইতে কিরূপে কণারকে আনা হইয়াছিল, তাহা চিন্তা করিতে গিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। এখন এত বিজ্ঞানের উন্নতি, এত কল, এত সুগম্য পথ, তথাচ ঐ প্রস্তর খণ্ড স্থানান্তরিত করিয়া সমুদ্রতীরে আনা দুরূহ ব্যাপার হইয়াছে, কিন্তু সেই প্রাচীন কালে উড়িয়াগণ অন্ততঃ ১৭।১৮ ক্রোশ দূর হইতে ঐ প্রস্তরখণ্ডকে আনিয়া মন্দিরের উপরে উঠাইয়াছিলেন, ইহাও সাধারণ ক্ষমতা এবং অধ্যবসায়ের কার্য্য নহে। এই মন্দিরের ভগ্নাবশেষ কার্য্য সকল দেখিলে প্রাচীন উৎকলীয়দিগকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকা যায় না।

কটক—কটকের এক পার্শ্ব দিয়া মহানদী, অপর পার্শ্ব দিয়া কাঠযোড়ী নদী প্রবাহিত হইতেছে। ঐ দুই নদীর স্রোতে কটক সহর ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল, সেই অপকার নিবারণ জন্য কাঠযোড়ী নদীর গর্ভ হইতে একটী প্রস্তরের পোস্তা গাঁথা হয়; ঐ পোস্তা প্রায় তিন মাইল পথ ব্যাপ্ত, কোন স্থানে ত্রিশ ফুট, কোন স্থলে ততোধিক উচ্চ, মধ্যে মধ্যে প্রশস্ত ঘাট, এবং প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্তম্ভ সকল নদীগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে একটী স্তম্ভের গঠনকৌশল দেখিলে প্রাচীন উড়িয়াগণ কতদূর ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যাবিশারদ ছিলেন, তাহার চূড়ান্ত উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বর্ষাকালে যখন অতিবেগে জলস্রোত প্রবাহিত হয়, তখন ঐ স্তম্ভ কটক রক্ষা করে। জলস্রোত বেগে আসিয়া শেষোক্ত স্তম্ভে আঘাত করে, করিবামাত্রই জলস্রোত হ্রস্বতেজা হইয়া এপার ছাড়িয়া অপরপারে প্রধাবিত হইতে থাকে,—আর কটকের পারে জলের আঘাত লাগিতে পারে না, এরূপ কৌশল অবলম্বন করা সাধারণ বুদ্ধির কার্য্য নহে। এই স্তম্ভ প্রায় আট শত বর্ষের অপেক্ষাও প্রাচীন হইবে; উৎকলের ইতিহাসলেখক ষ্টার্লিং সাহেব বলেন উড়িশ্যায় প্রাচীন কালে শবদাহের জন্য কর নির্দ্ধারিত ছিল, সেই শবদাহ হইতে যে কড়ি আ-

দায় হইত তদ্দ্বারাই ঐ পোস্তা সকল নির্ম্মাণ হইয়াছে।

ধবলেশ্বর, মহানদীর মধ্যস্থলে একটি ক্ষুদ্র পর্ব্বত এবং অল্পাংশ উচ্চ ভূমি আছে; ঐ স্থানে একটি মন্দির আছে; সেই মন্দিরের সম্মুখে কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরের নানাপ্রকার মূর্ত্তি সকল পড়িয়া রহিয়াছে। তন্মধ্যে অনেক মূর্ত্তিই ভগ্নদেহ। ঐ সকল মূর্ত্তির গাত্রে যে সকল অলঙ্কার খোদিত দেখিয়াছি, তন্মধ্যে অনেকগুলি অলঙ্কার এ পর্য্যন্ত আমাদের দেশে ব্যবহার হইয়া থাকে। কটকের কাঠযোড়ি নদীর এবং মহানদীর পরপারের পর্ব্বতে বৌদ্ধদিগের খোদিত গুহা সকল আছে, কিন্তু শৈবগণ ঐ সকল গুহার উপরে চূড়া নির্ম্মাণ করত তন্মধ্যে শিব সংস্থাপন করিয়া "শিবমন্দির" "শিবালয়" নাম প্রদান করিয়াছেন।

যাজপুর—এই স্থান বৈতরণী নদীর তীরবর্ত্তী, এখানে প্রাচীন কালের প্রতিষ্ঠিত দুটি প্রস্তরময় স্তম্ভ আছে; এইস্থান এক সময়ে কেশরীবংশীয় রাজাদিগের কালে সমৃদ্ধিশালী ছিল, এখন কেবল নাম মাত্র আছে। বালেশ্বর প্রদেশে প্রাচীন কীর্ত্তি প্রায় প্রত্যক্ষগোচর হয় না।

এই সকল প্রসিদ্ধ দেবালয় ভিন্ন অপরাপর অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাচীন দেবালয় প্রভৃতি উড়িশ্যাতে বিদ্যমান আছে; সে সব বিষয়ের উল্লেখের তত আবশ্যক নাই, এক্ষণে উৎকলবাসীদিগের অন্যান্য বিষয়ের ক্ষমতা কতদূর তাহারও কিছু বলা আবশ্যক হইতেছে।

সার্ব্বভৌমিক রাজা গৌড়াধিপতি দেবল দেবের সময়ে উৎকল প্রদেশ যদিও গৌড় দেশের অধীনস্থ ছিল, পালবংশীয় রাজাদিগের সময়েও উৎকল প্রদেশ যদিচ পঞ্চগৌড়ের অন্তর্গত ছিল, এবং বঙ্গদেশীয় গঙ্গাপতি বংশীয় রাজাগণ যদিচ বহুকালাবধি উৎকল দেশে একাধিপত্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু এক সময়ে উড়িয়ারাও বঙ্গভূমির ত্রিবেণী পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়া স্বজাতীয় বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিতে ত্রুটি করেন নাই। তবে এই মাত্র বলা সঙ্গত, বিদেশ আক্রমণ করিতে যে সকল কৌশল অবলম্বন করা আবশ্যক, গঙ্গাপতি বংশীয় রাজাদিগের নিকটই উড়িয়াগণ তাহা শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কারণ গঙ্গাপতি রাজাদিগের পূর্ব্বে উড়িয়াগণ কোনকালে কখন ভিন্নদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

উৎকল রাজ্য যেটুকু বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের অধীনে আছে, কেবলমাত্র সেইটুকু উৎকল প্রদেশ নহে, উৎকলের অনেকাংশ মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির এবং মধ্যভারতবর্ষের অন্তর্গত হইয়া রহিয়াছে, এই বহুজনপূর্ণপ্রদেশকে উৎকলবাসীরাই সুশাসনে রাখিয়া স্বজাতীয় প্রভুত্ব রক্ষা করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা তাঁহাদের বীরত্বের বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এক্ষণে বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সিতে উৎকলে ১৮টী গড়জাত মহল আছে, এবং মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি, মধ্যভারতবর্ষের অন্তর্গত আরও কয়েকটি গড়জাত মহল আছে; ঐ সকল প্রদেশের রাজাগণ ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে সামান্য মাত্র করপ্রদান করেন,—তাঁহাদের রাজত্বের বিচারকার্য্য সকলেই তাঁহারা স্বয়ং সম্পন্ন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের জেলখানা আছে, তিনবর্ষ মিয়াদের যোগ্য ফৌজদারি মোকর্দ্দমা তাঁহারাই করেন, ততোধিক অপরাধী যাহারা, তাহাদের বিচার উড়িষ্যার স্থানীয় কমিশ্যনর সাহেবকে সোপর্দ্দ করিতে হয়। এই নিয়ম অদ্যাপি প্রচলিত থাকাতে বঙ্গদেশ অপেক্ষা উড়িষ্যার অনেকটা স্বাধীনতা এ পর্য্যন্ত অক্ষত রহিয়াছে।

বহুকাল হইতে উড়িয়াগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাহাজ নির্ম্মাণকার্য্যে সুশিক্ষিত হইয়া আপনারা সমুদ্রপথে জাহাজ চলাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন।* অদ্যাপি উড়িয়াগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাহাজ নির্ম্মাণ করিয়া বঙ্গোপসাগর দিয়া বাণিজ্যকার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন। যদিচ চট্টগ্রামের কয়েক জন বাঙ্গালির জাহাজ আছে সত্য, কিন্তু তাঁহাদের প্রধান প্রধান জাহাজে কাপ্তেন ইয়ুরোপীয়,কিন্তু উৎকলবাসীদিগের জাহাজ, উড়িয়াগণ আপনারাই চালাইয়া থাকেন, উড়িষ্যার জাহাজে কাপ্তেন, মালিম, ইঞ্জিনিয়ার এবং অন্যান্য সকল কার্য্যকারকই উড়িয়া। জাহাজ নির্ম্মাণ এবং সমুদ্রপথে জাহাজপরিচালন সম্বন্ধে উড়িয়াগণ সমগ্র ভারতসন্তানের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

শ্রীদীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

* বঙ্গবাসীদিগের নিকটেই উড়িয়াগণ জাহাজনির্ম্মাণ শিক্ষা করিবারই সম্ভব। বঙ্গদেশের রাজা সিংহবাহুর পুত্র বিজয়সিংহ খ্রীষ্টের ৪৭৭ বর্ষ পূর্ব্বে সিংহল অধিকার করেন; তাঁহার সময়ে বঙ্গদেশে জাহাজ নির্ম্মাণ হইত, তিনি সমুদ্র পথেই পঞ্চশত পরিচারক সহিত সিংহলে গমন করেন। জাহাজ ভিন্ন সিংহলে গমন করা সম্ভব হইতে পারে না; গঙ্গাপুত্রবংশীয় রাজাগণ যখন তমলুকে রাজত্ব করেন, তৎকালে তমলুকে জাহাজ নির্ম্মাণ হইবার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, উড়িষ্যায় তৎকালে জাহাজ নির্ম্মাণের কোনরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, বোধ হয় যখন গঙ্গাবংশীয় রাজাগণ উৎকল অধিকার করত উৎকলে প্রভুত্ব সংস্থাপন করেন, সেই সময় হইতে উৎকলবাসীরা বঙ্গদেশীয়দিগের নিকট হইতে জাহাজ নির্ম্মাণ শিক্ষা করেন, এবং সমুদ্রপথে গমনাগমন দ্বারা বাণিজ্য ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিলেন।

গঙ্গাধর শর্ম্মা

ওরফে

জটাধারীর রোজনামচা।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

গোষ্ঠযাত্রা।

সন্ধ্যার প্রাক্‌কাল। কেহ কেহ কহিতেছেন আজ "শীত শীত" বোধ হইতেছে, দুই একটি বৃদ্ধ হিমের ভয়ে মস্তকে চাদরের উপ্টা ফেটা লাগাইয়াছেন, শুভ্র শুভ্র চুলের দুই পার্শ্বে কর্ণদ্বয় বাহির হইয়া রহিয়াছে, কৃষকেরা গোপাল লইয়া চ-অ-ল অমুকের গোরু বলিয়া প্রভুর গৌরব বৃদ্ধি করিতেছে। কোন গোপাল কহিতেছে চল আজ ঠাণ্ডা হয়েছে এখনি ধূমও দিব, কোন রাখাল কহিতেছে আজ কেবল আলে কিছু হবে না ভাই; ঘরে খ্যাড় জ্বালাতে হবে, এমন সময় হুঁ হুঁ শব্দ শুনা গেল—দেখা গেল একটি তানযানে আশুতোষ বাবু উদ্যান হইতে বাটী প্রত্যাগমন করিতেছেন, লাল পাগড়ি মস্তকে, লম্বা লাঠী হস্তে দুইজন পদাতিক অগ্র পশ্চাতে দৌড়িতেছে ও একজন ভৃত্যমাত্র একটি বৃহৎ উজ্জ্বল রৌপ্যনির্ম্মিত ফুরসী হস্তে পশ্চাতে শশব্যস্ত। বেহারাদলের, দ্বারবানের, হুঁকা বর্দ্দারের জুতোর, সকলেরই এক চাল, তালে তালে পা পড়িতেছে। বাবুমহাশয় অবতরণ করিবামাত্র কালিন্দী সায়েবের ঘাটোপরি গঙ্গাধরের মন্দিরে একটি প্রণাম করিলেন, পরে অস্ফুট বচনে কোন স্তব উচ্চারণ করিতে করিতে বৈঠকখানার দিকে গমন করিয়া প্রশস্ত বারেন্দায় পাদচালনা করিতে লাগিলেন। ঠাকুরবাটীতে আরতির বাজনা বাজিতেছে, নহবতে টিক্‌কৃরা সংযুক্ত সানায়ে পুরবী গাইতেছে, সেই দিকেই মন দিয়া যেন বাবুমহাশয় মধ্যে মধ্যে মস্তক হেলন করিতেছেন। ইতিমধ্যে একটি কামরা আলোকময় হইল, দুগ্ধ-ফেণ নিভ প্রশস্ত চাদরোপরি একটি ক্ষুদ্র গদি, এক বৃহৎ তাকিয়া ও কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালিস সংযুক্ত হইল, পার্শ্বে একটি মোচার খোলের ন্যায় বৃহৎ স্বর্ণজ্যোতির্ম্ময় বাঁধা হুঁকা ও কদলীপত্রনির্ম্মিত হস্তদ্বয় প্রমাণ [illegible]নল শোভমান হইল, রজতনির্ম্মিত শুভ্র রেকাবীতে কয়েকটী চামেলী পুষ্প ও রজনীগন্ধ সংস্থাপিত হইল—মুহূর্ত্তমধ্যে বাবুমহাশয়ের কাঞ্চননিভ সুগঠনশালী অঙ্গ শয্যোপরি শোভমান হইল। সকলেই জানিত যে বাবুমহাশয়ের একটী সোণার খল নুড়ি ছিল, প্রতিদিন প্রাতে দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত মধু দিয়া ঘর্ষিত হইত ও ঐ মধুসংযুক্ত

স্বর্ণ, বাবুমহাশয়ের দৈনিক ভোজ্য ছিল, তাহাতেই তাঁহার রঙ্গে সোণার আভা। বাবুমহাশয় গদ্দির উপরে উপবেশনমাত্র ভৈরবকে তলব ও তালবৃন্তের পাখা হেলাইবার হুকুম হইল। আজ সবার শীতানুভব তবু বাবুমহাশয়ের এক একটী পাখা চাই, সকলে জানিত, তাহার গরম ধাত, কেহ কেহ কহিত সে কেবল টাকার গরমী।

ভৈরব তাকিযার পশ্চাদ্ভাগে কিঞ্চিৎ অন্তরে বসিল। এক হাতে পাখা হেলাইতেছে ও আর এক হস্ত হেলাইয়া মুখভঙ্গীর সহিত সকলকে কহিতেছে"যা,বলে দেব এখনি দেখ্‌বি।" আমি গৃহের দ্বারে এক উঁকি মারিলাম। বাবুমহাশয় কয়েকটী ফুল হস্তে আঘ্রাণ লইতেছেন, ভৈরব আমাকে দেখিযা চক্রাকারে অঙ্গুলি ঘুরাইল ও ঠাকুরবাটীর দিকে যাইতে ইঙ্গিত করিল।

আমি ঠাকুরবাটীতে গেলাম, দেখিলাম রাধাবল্লভের সমস্ত দিনের বাহান্ন ভোগ বিতরণ হইতেছে, শীতল ভোগে তাদৃশ আস্থা ছিল না, লুচি মোণ্ডা, চাল ছোলা ভাজা কতকটি লইয়া বৈঠকখানার প্রতি আবার ধাবমান। আমার মন সেইখানেই রহিয়াছে,শুনিয়াছি দেওয়ান্‌জী আগতপ্রায় অনেক পরামর্শ হইবে। এ দিকে রাঙ্গা ঠাকুরুণ আমাকেই রিপোটার বাহাল করিয়াছেন, তাঁহার এজলাশে এক একবার সব কাছারীর বিচারের আলোচনা ও সুখ্যাতি অখ্যাতির মীমাংসা হইত। আমি সত্বর ভৈরবের নিকট সমাগত, ক্ষণকাল মধ্যে গজানন গৃহমধ্যে বিছানার কাঠার্দ্ধ স্থান যুড়িয়া উপবিষ্ট।

বাবুমহাশয় কহিলেন, " শিবসহায়ের কি বিপদ শুনিতে পাই।" গজানন সমস্ত কথা ব্যক্ত করিলেন, কেবল সুন্দরী গোয়ালিনীর পালাটি গোপন রাখিলেন।

বাবুমহাশয়। তবে শিবসহায়ের বড় বিপদ, আদালতে কি তলব হবে?

গ। হাকিমের একান্ত জেদ।

আ। এখন উপায; তখন বিরুদ্ধাচরণ করেছিল, কিন্তু সে কথা ত আমার এখন মনে রাখা আর উচিত নয়। সে সময়ও গত, সে শত্রুতাও গত, এখন রক্ষা করা চাই, উদ্ধারের উপায়।

গ। উপায় মহাশয়, শিবসহায় ইহার যে কষ্ট দেয—স্মরণ আছে—

আ। সে কথা স্মরণ করে লাভ, সে শত্রু হউক, মিত্র হউক, এখন বিপদ্‌গ্রস্ত, উদ্ধার করা চাই।

গ। এত উদারতা কেন? একটু পাকে পড়ুক, দুই এক ঢেউ ঢেউ খাক, দুই একটা ঢেউ; বড বড নয।

আ। বল কি! পরের বিপদ্ চিন্তা করিতে আছে; অনিষ্ট সকলেই ঘটাতে পারে, সংসার ত অনিষ্টপূর্ণ, মঙ্গলবর্দ্ধন করাই ধর্ম্ম।

গ। তবে হাকিমের সহিত দেখা করুন, তিনি এলেন, কি আগতপ্রায়।

আ। দেখা করিয়াই বা ফল কি

দাঁড়াবে, বলি কি, আবার তিনি না বুঝেন যে, তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্মে প্রতিরোধ করিতেছি, বড় কঠিন কার্য্য। তবে দয়া? বিচারকার্য্যে কি দয়া দিশান যায় না—ভদ্রের মান রক্ষা করিতে পারেন না? হাকিম পৌছিলেই যেন সংবাদ পাই। হাকিম হলেই কি দয়া বিসর্জ্জন দিতে হয়? পরের সম্মানে উপেক্ষা করিতে হয়?

এই কথার পর উভয়েই স্তব্ধ, উভয়েই গম্ভীরভাবে চিন্তা করিতেছেন, পাখার স্বন্ স্বন্ ভিন্ন আর কোন শব্দ নাই, এমন সময় কি একটি কট্‌কট্ শব্দে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইল, "কিসের শব্দ রে ভৈরব?" ভৈরব কি উত্তর দিবে, শেষ বলিল।

এই জটাধারী বাবু ঠাকুর বাটীর প্রসাদ খাইতেছেন। ভৈরব এবার মজালে। বাবুমহাশয় পশ্চাদ্দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিয়া দেখিলেন, জটাধারী শাসিত।

আমাকে উঠে বসিতে হইল, কিঞ্চিৎ তিরস্কৃত হইলাম, সন্ধ্যার পর নিদ্রা? পাঠাভ্যাস কখন হইবে—ভগবান্ বিপদের বন্ধু! আমার মনে পড়িল, হউক না হউক, বলিয়া দিলাম, আজ যে শনিবারের রাত্রি। সকলে নিরুত্তর।

আশু। এখন কেমন পড়া হইতেছে? কহিলাম, কিছুই নয়। মাষ্টার পাগল হইয়াছে। আশুবাবু জিজ্ঞাসিলেন, কিসের পাগল?

ভৈরব কহিল, শীতু ক্ষেপা সুন্দরী গোয়ালিনীর সহিত কথা কহিয়াছিল বলিয়া তুমুল যুদ্ধ করিয়াছে।

ইহা গজাননের কর্ণে অতি সুসম্বাদ। সময় পাইয়া কহিলেন, এখানে ইহাদের আর পড়ার আবশ্যক নাই, হেয়ার স্কুলে বা ব্রাঞ্চ স্কুলে পড়াইলে ভাল হয়।

আশুতোষ বাবু কিঞ্চিৎ ভাবিয়া কহিলেন "সকলকে? যাহারা বার বৎসরের উপর বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহাদিগকে পাঠান যাইবে। তোমার নীলমণিকেও পাঠাও, সেও ত প্রায় চতুর্দ্দশবর্ষীয় হইল।

গজানন বিপদ মনে করিলেন, প্রকাশ্যে কহিলেন, সে নিতান্ত শৈশব—

ভৈরব কহিল, মহাশয় নীলমণি বাবুকে পাঠাইলেই ত লক্ষ্মী ঝিকে সঙ্গে দিতে হইবে?

গজানন একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

ভৈরব আবার কহিল এবার নীলমণির গোষ্ঠযাত্রা।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

যে যার কর্ম্মে ব্যস্ত।

এখন চিকিৎসালয়ের যেমন আড়ম্বর রোগও তেমনি উৎকট—যেমন বাঘা তেঁতুল তেমনি বন্য ওলেরও তেজবৃদ্ধি। যেমন কুইনাইন, তেমনি না ছোড় পিয়াদা জ্বর প্লীহা, যেমন বিষাক্ত হায়পর

ক্লোরোডাইন তেমনি জলদ্ পিয়াদা বিষুচিকার সংবৃদ্ধি। যেমন রিলিফের প্রশস্ত প্রণালী তেমনি বিস্তার প্রদেশে ঘন ঘন দুর্ভিক্ষপীড়ন, যেমন শীত তাপের গণক "ওয়েদার প্রফেট" তেমনি রঙ্গশালী হঠাৎবাহী বাত্যা বা সাইক্লোন। যেমন কার্য্য-কৌশল-সম্পন্ন সুনির্ম্মিত সেতুশ্রেণী তেমনি বানের তোড়, যেমন ইরিগেসন সিস্টেমের বহুব্যয়সাধ্য খাল-প্রণালী তেমনি ঘন ঘন বিন্দুপাতবিহীন শুষ্ক ও শস্যাপচয়। একদিকে বাঁধ দিতে অন্য দিকে ভাঙ্গে—ইহাই কি বিজ্ঞান শাস্ত্রের উন্নতির পরিচয়? বা পাশ্চাত্য উচ্চতর সভ্যতার অনুকরণ ফল!

আজ কাল কোন পীড়া হইলে শীঘ্র আরাম হউক না হউক দুই একদিনেই গৃহ সাজে শোভমান হয়। যেমন প্রতিমা সাজে খুলে তেমনি রোগীর বিছানার পার্শ্বে রং বরঙ্গ দীর্ঘ খর্ব্ব গণ্ডা গণ্ডা কারফা, বোতল, অর্দ্ধ বোতল, দুয়ানি বোতল, ক্ষুদ্র সাণ্টর শিসাতে রুগ্নশয্যার শ্রীবৃদ্ধি হইয়া উঠে। বরফের তলর ঘন ঘন, নাঁপিতের ক্ষুরের আঘাতেই মস্তকের গ্রীষ্ম তাপ ছুটিয়া যায়। মৃত্যু-পরে মৃতদেহ পার করা সহজ, কিন্তু আনামত শিশি বোতলাদি স্থানান্তর করা ব্যয়সাধ্য কর্ম্ম হইয়া উঠে। গঙ্গাধর যে সময় জটাধারীর বেশে বাল্যক্রীড়া করিতেন তখন কোন কার্য্যেরই এত আড়ম্বর ছিল না, এক রামার মা, নাপিত বুড়ি মকুণ দিয়া ডাক্তার মার্জ্জন জান্দরেলের কর্ম্ম শেষ করিত—আমাদের শুভঙ্কর লাউসেন দত্ত মহাশয়ের ধাতুজ্ঞানে ও মুষ্টিযোগে অনেকের প্রাণরক্ষা হইত। যাঁহারা প্রবীণ বিজ্ঞ বৈদ্য ছিলেন তাঁহাদিগকে সাধারণতঃ কেহ ডাকিত না, তাঁহারা বিকার কালে আসন্নাবস্থায় বিষম বটীকা বা চালানে বড়ি দিতে নিমন্ত্রিত হইতেন।

অদ্য পূজার বন্ধের পর দত্তজ মহাশয়ের কার্য্যগৃহদ্বার সুবিস্তার হইয়া উদ্ঘাটিত হইয়াছে। পাঠশালার একদিকে অনেক ছাত্র আর এক দিকে কতকগুলি রোগী বসিয়াছে। যাহার গাত্র কণ্ডু হইয়াছে তাহাকে তুলসী পাতার রস প্রয়োগ করিতে কহিলেন—বুড়ো জোনকে গঙ্গামৃত্তিকামর্দ্দনে দাদ ভাল করিতে পরামর্শ দিলেন, তাহাতে একান্ত ভাল না হয় ক্ষুদ্র কণ্টকাকীর্ণ শিউলিপল্লব ঘর্ষণ করিতে কহিলেন, বৃদ্ধ হায়দর বক্স শিরঃপীড়ায় অস্থির, তাহাকে দাড়িম্বকুসুমরেণুর নস্য লইতে ও আহারান্তে একটি বস্ত্র দিয়া শিরোবন্ধনের ব্যবস্থা কহিয়া দিলেন। মির্জ্জা বুড়ো অম্লশূলে কাতর, রাত্রে উষ্ণ জলে ঘটিম দিয়া পরদিন প্রাতে সেই জল পান করিতে কহিয়া দিলেন। যাহার শিশু সন্তান শ্লেষ্মাভিভূত তাহাকে রসাসিন্ধু নাম দিয়া রাঙ্গা মাটীর বটীকা দিয়া বিদায় করিলেন ও যাহার শিশু দুধ তুলিয়াছে তাহাকে দোতলবাসী প্রদীপের তৈল জল সেবন করিতে আদেশ করিলেন।

সকলে চলিয়া গেলে কেবল সাহেবানী গোয়ালিনী একপার্শ্বে কোন চিন্তায় নিমগ্না হইয়া বসিয়া রহিল। চিকিৎসা বিভাগের কার্য্য শেষ হইল, এখন শিক্ষা বিভাগে মনোনিবেশ হইল।

দত্তজ মহাশয় আজ বেত্রপাণি না হইয়া ধুতুরা ফল হস্তে কার্য্যারম্ভ করিয়াছেন। সর্ব্বাঙ্গ গাত্র কণ্ডুতে পূর্ণ, তজ্জন্য একটি ধুতুরাফলের কণ্টকাগ্র গুলি ঘর্ষিত করিয়া আপন লম্বা হস্ত ও পদদ্বয় সেই ফলে বিঘটিত করিতেছেন। প্রথমে জটাধারীর প্রতিই তাঁহার সুদৃষ্টি। আজ আমার সুপ্রভাত, কেন না আজই একবার দত্তমহাশয়ের মুখে প্রিয়বাক্য শুনিলাম। আজ পাঠাশালায় দণ্ডবিধির সব জ্বালা ভুলিয়া শীতল হইলাম—আজ দত্তজ এত মিষ্টভাষী কেন? তিনি শুনিয়াছেন আমরা সত্বর তাঁহার শাসনাধীনত্ব হইতে মুক্ত হইব—আমরা কালেজে যাইব।

দত্তজ আজ মিষ্টভাবে (যত মিষ্ট তিনি হইতে পারেন) মধুরভাবে কহিলেন "ওহে গঙ্গাধর ভায়া তুমি কালেজে যাবে শুনিতেছি। নগরে থাকিবে, মধ্যে মধ্যে যেন পত্র লিখিলে উত্তর পাই, আমার জন্য একজোড়া চটি জুতা ও নস্যের ডিপা একটি পাঠাইবে। আর কি বলিব?" আমি কহিলাম মহাশয় "বাজারে বলে বেশ ছাঁচি বেত পাওয়া যায়!! দেশী গুলা মহাশয়ের হস্তে অতি শীঘ্র শীঘ্র ভাঙ্গিয়া যায়!" "ভায়া আমায় পরিহাস করিতেছ! এই বেতের গুণ—" বলিয়া বেত গ্রহণ করিয়া দুই একবার হেলাইলেন। আমি অভ্যাসগুণে চমকিয়া স্থানান্তরে বসিলাম। "ভায়া ভয় নাই—আমি আর তোমায় মারিব না এই বেতের গুণ সময়ান্তরে জানিবে। যদি জমিদার হও যে দিন গোমস্তার হিসাবে ভুল ধরিবে—যদি মহাজন হও যে দিন অধীনস্থ চৌধুরীর চুরি নিবারণে সক্ষম হইবে—যদি বিচারকৃৎ হও যে দিন আমলা কি মামলাবাজের তঞ্চক বুঝিতে পারিবে সেই দিন লাউসেন দত্তের নামও স্মরণ হবে, বেতও স্মরণ হবে—ভায়া এমন যে সুমিষ্ট ইক্ষুদণ্ড তা ঘানিতে না ঘুরালে রসও দেয় না, গুড়ও হয় না--তেমনি বেত না খাইলে বুদ্ধি টস্‌টসে হয় না। এই যে ' সমানি শিব শিরসানি ঘনানি বিরলানিচ' মুক্তার ন্যায় তোমার অক্ষর, এই যে কড়ানে, সটকে, বুড়কে, আনা মাসা কাঠাকালি,বিঘাকালি কসিতে তুমি এক শুভঙ্কর বিশেষ। এই যে রামায়ণ, মহাভারত, গুরুদক্ষিণা, দাতাকর্ণ, শিব রামের যুদ্ধ পাঠে এত সুস্বর হয়েছ, এ কেবল জান্‌বে এই বেতের ভয় এই বেতের গুণ।" বলিয়াই সম্মুখের পাটির উপর আবার দুই চারি বার সজোরে বেত্রাঘাত করিলেন ও কহিলেন "আমার নাশের কথা ভুল না।" দত্তজ মহাশয়ের কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎকাল নিস্তব্ধে ভাবিলাম, যেরূপ জন্ম হইলেই মৃত্যু, শীল পড়িলেই

জল, সেইরূপ পাঠশালায় প্রবেশ করিলেই বেতের পটপটী লাভ সুনিশ্চয়।

দত্তজ মহাশয়ের দণ্ডবিধির অধীনে আসিযা কোন ছাত্রই দণ্ড অতিক্রম করিতে পারেন না, তথাপি কৃতজ্ঞতার বিষয় এই গঙ্গাধর অপরের মত দণ্ডনীয় হইতেন না, তাঁহার পক্ষে কিছু যেন ক্ষমা ছিল, সেই জন্য এই বক্তৃতার শেষ হওয়ায় আমি দত্তজ মহাশয়ের প্রতি একবারে ভক্তিশূন্য না হইয়া তাঁহাকে এখনও স্মরণ করিয়া থাকি ও সময় পাইলে সাধ্যমত তাঁহার উপকার করিতে ব্রতী হইয়া থাকি। অহো! গুরুভক্তি!

আমার চিন্তা শেষ না হইতেই সাহেবানী গোয়ালিনী কহিয়া উঠিল—"বেলা হল, আমার কথা শুনিবার কি আজ সরকার মহাশয়ের অবসর হবে? আমি চলিলাম।" বলিয়া নিকটস্থিত দুগ্ধপাত্র উঠাইল। দত্তজ মহাশয় কহিলেন, শত কাজ পরে,তবু তোমার কার্য্য প্রথমে —সাহেবানী চক্ষু ঘুরাইয়া কহিল "হুঁ এত ভাব হে! তবে কেন এতক্ষণ নিরর্থক বসে আছি?"

দত্তজ। যা হবার হইয়া গিয়াছে,এখন কি হুকুম?

সাহেবানী দত্তজার নিকটে আসিয়া বসিল ও নিম্নস্বরে কহিল "শুনেছেন সুন্দরীকে সাহেবের কাছে লয়ে গেছে। তাই এলাম একবার—খড়ি পাত,গুণে বল,সব ভাল হবে ত?" দত্তজ মহাশয় গণক। একটি "হনুমান্ চরিতের" পুঁথি দপ্তর হইতে বাহির করিলেন—পাঠশালায় সব নিস্তব্ধ। খড়ি বাহির করিলেন—ভূমে একটি অঙ্কপাত করিলেন ও কহিলেন "ফল হাতে আছে?"

সা। তা ভুলি নাই।

গাঁট হইতে একটি হরিতকী বাহির করিল। লাউসেন কহিল, সুপারি নাই? আরও ভাল। একটী সুপারি সঙ্গে সঙ্গে স্থাপিত হইল। পুস্তক হইতে একটি বচন ব্যাখ্যা করিলেন ও দত্তজ মহাশয়ের রসিকতার পরিচয় আরম্ভ হইল। "সুন্দরীর পিতার নাম কি?" সাহেবানীর ত লজ্জা রাখিবার স্থানাভাব হইল। কহিল, "এত পরিচয় কেন?" আবার চক্ষু ঘুরাইয়া কহিল, "বাপের সংবাদে কাজ কি—সে আমার গর্ভজাত কন্যা কি না?"

দত্তজ কহিলেন "সেই প্রকারেই গণনা করি, যদি ভুল হয় তো জবাবদিহি তোমার?"

সাহেবানী। তা গর্ভে ধারণ করে অবধি জানা আছে! দারোগাকে দাও, দেওয়ানজীকে দাও, টাকা কি তোমরা দিয়াছিলে। এখন পুরাণ কথায় কাজ নাই যা বলি তা কর।

গণনা আরম্ভ হইল। "ভাল হবে কি মন্দ হবে? এই গণনা? এই প্রশ্ন?" বলিয়া আর একটি খড়ির দাগ দিলেন ও দত্তজ খড়ির তালটি লুফিতে লাগিলেন, কত কত বচন অস্ফুটস্বরে কহিতে লাগিলেন, "ভাল মন্দ" "মন্দের ভাল" "বড় মন্দ নয়" "মন্দও নয়" "ভালও নয়।"

" দেওতো আবার এক জায়গায় হাত দেও। এজে হনুমানের ঘরে হাত দিলে। দেখি হনুমান্ কি করেন।"

সাহেবানী কহিল "মশয় তুমি ভিন্ন—তুমি যা বলবে হনুমান্ তাই করবে—"

ইতিমধ্যে তর্কালঙ্কার মহাশয় পাঠশালার বারান্দায় আসিয়া উপস্থিত। এক মুহূর্ত্ত জন্য সব কার্য্য বন্ধ হইল। একটি কম্বল আসন সত্বর বিস্তৃত হইল, তর্কালঙ্কার উপবেশন করিবামাত্র দত্তজ মহাশয় সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন। তর্কালঙ্কার কহিয়া উঠিলেন, " লাউসেন তুমি প্রকৃত ভক্ত কিন্তু এটি তোমার অনধিকার চর্চ্চা। জ্যোতিষ চর্চ্চা করিয়া তুমি কেবল কলির শূদ্রের পরিচয় দেও।" দত্তজ কহিলেন " এখন সে কথা যাহা হউক মহাশয়ের আগমন সাহেবানীর শুভদায়ক হইবে সন্দেহ নাই। এখন আপনিই খড়ি গ্রহণ করুন—এই অঙ্ক গৃহও প্রস্তুত।"

তর্কা। লাউসেন, আবার তুমি ভুলিলে! তোমার অঙ্কে আমি গণনা করিব? একটা নূতন খড়ি নাই?

নূতন খড়ি সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইল, তর্কালঙ্কার মহাশয়ও সঙ্গে সঙ্গে অদৃষ্টদর্শনে ধীরভাবে নিযুক্ত—

"এই স্থানে কোন দ্রব্য রাখ।" সাহেবানী একটি হরিতকী বাহির করিল—তর্কালঙ্কার রুষ্ট হইয়া ফোকলা মুখে কহিলেন, " আমি ফল গ্রহণ করি না—ও গোপিনি, তুই আজ নূতন হলি, রজত মুদ্রা?" দত্তজ মহাশয় কহিলেন "ফলে হবে না, সিকি, আধুলি কিছু নাই?"

সাহেবানী একটি সিকি রাখিলেন—তর্কালঙ্কার মহাশয় কিঞ্চিৎ কাল স্তব্ধ থাকিয়া কহিলেন "অস্মিন ব্যাপার এক কালেই মঙ্গল সূচক কদাচিৎ হয়। এক কলসি দুগ্ধে বিন্দুমাত্র লবণাক্তও অম্লচীর কারণ। সাহেবানী তোকে রিষ্ট ভঙ্গ জন্য একটা কার্য্য করা চাই। সে পাঁচ আনা পাঁচ সিকার কাজ নয়। কন্যার মঙ্গল চাস ত শুদ্ধ গব্য ঘৃত সংগ্রহ কর। একটি ভাল করে জাগ করা চাই, তোদের পুরোহিতকে পাঠাইয়া দিস্।"

সা। কত খরচ হবে না হয় পাঁচ টাকা?

সাহেবানীর এই কথা উচ্চারণ হওন সময়ে শীতু খেপা উপস্থিত। কহিল "অধ্যাপক মহাশয়, বলি পাঁচ টাকা, আর নয়—সুন্দরীর শুভসাধন জন্য আমিই পাঁচ টাকা দিব।" পাগলের যেমন কথা তেমনি কাজ। সঙ্গে সঙ্গে থলি হইতে মুদ্রা পঞ্চ বাহির করিয়া তর্কালঙ্কারের সম্মুখে রাখিয়া দিল কিন্তু তাহার বাক্য সাঙ্গ না হইতেই খঞ্জভীম গর্জ্জন করিতে করিতে বঙ্গভূমে উপস্থিত—"ডেম ক্ষেপা, তুই পাঁচ টাকা দিবি, আমার সুন্দরী।" ক্ষেপা কহিল "আমার সুন্দরী।" অমনি আমার "আমার" যুদ্ধ উত্তেজক বাণী উভয় পক্ষে উচ্চারিত হইতে লাগিল, ও পরক্ষণেই একটি ক্ষুদ্র কুরুক্ষেত্র উপস্থিত হইল। শীতু দংষ্ট্রা নির্ব্বাচন পূর্ব্বক

ভীমের প্রতি ধাবমান, ভীম দন্তজার বেত্র হস্তে দণ্ডায়মান। যে যার আপন কার্য্যে ব্যস্ত। ইতিমধ্যে বেগতিক দেখিয়া তর্কালঙ্কার মহাশয় সাহেবানীর প্রতি ইঙ্গিত করিয়া ক্ষেপার দত্ত পঞ্চ মুদ্রা হস্তে লইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে অন্তর্দ্ধান।

ভারতবর্ষের লোকবৃদ্ধির ফল।

ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। নিত্যই দেখিতে পাওয়া যায় নূতন নূতন নগর স্থাপিত হইতেছে, পুরাতন জঙ্গল আবাদ হইতেছে ও নগর নগরীর আয়তন বৃদ্ধি হইতেছে। কৃষ্টভূমির আয়তন বৃদ্ধি হইতেছে, নূতন নূতন খনি আবিষ্কার হইতেছে, রেলওয়ে লাইন বিস্তার হইতেছে, কিন্তু কোথাওই লোকের অভাব নাই। যখন এলফিনষ্টোন ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখেন, তখন ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা কমবেশ ১৪০০০০০০০ কোটি ছিল বলিয়া অনুভব হইয়াছিল, মহাত্মা এলফিনষ্টোন ভারতবর্ষের নানা স্থানে নানা প্রকার চাকরী করিয়া শেষ বোম্বাইয়ের গবর্ণর হন। তিনি ভারতবর্ষের কোনখানে কত লোক আছে, একপ্রকার জানিতেন, তাঁহার অনুভব আমরা গ্রহণ করিতে পারি। মোটামুটি তাঁহার সময়ে ভারতবর্ষে চৌদ্দকোটি লোকের বাস ছিল। এক্ষণে ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা ২৪০০০০০০০ চব্বিশ কোটী। এই চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে দশ কোটী লোক বৃদ্ধি হইয়াছে। যদি বাস্তবিক হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই লোকবৃদ্ধি ভারতের মঙ্গল কি অমঙ্গল? এই সকল লোকের অবস্থা কিরূপ, ইহাদের দ্বারা ভারতের ভাবী উন্নতির আশা করা যাইতে পারে কি না চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই মনে এইরূপ প্রশ্ন উদিত হয়। কেহ বলেন ভারতের মঙ্গল হইতেছে, কেহ বলেন অমঙ্গল হইতেছে। আজি আমরা এ বিষয়ের কিছু আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি।

বাস্তবিক দেখিতে গেলে এইরূপ লোকসংখ্যা বৃদ্ধি ভারতবর্ষের দুর্গতির একমাত্র কারণ। যে পরিমাণে লোক বৃদ্ধি হইতেছে স্বর্ণপ্রসবিনী ভারতভূমিও তাহাদের আহার যোগাইয়া উঠিতে পারেন না। ভারতবর্ষের উৎপন্ন হইতে যত লোকের সুখে ও স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে, লোকসংখ্যা তাহা অপেক্ষা অধিক হইয়া উঠিয়াছে। তাহার সাক্ষী প্রতিবৎসর দুর্ভিক্ষ। প্রতিবৎসর লক্ষ লক্ষ লোকের

প্রাণবিনাশ। আর যে সকল লোক আছে, তাহারাও অন্নাভাবে জীর্ণকলেবর। তাহা নাই বা হইবে কেন? ভারতবর্ষের পরিমাণ ১৬০০০,০০ ষোল লক্ষ বর্গ ক্রোশ, এক এক বর্গ ক্রোশে ১৯৩৬ বিঘা জমী আছে। তবে সর্ব্ব শুদ্ধ ভারতবর্ষের জমী মোটামুটি ৩০৯৭৬০০০০০ বিঘা। এই জমীতে পাহাড়, পর্ব্বত, নদী, হ্রদ, মরুভূমি, জঙ্গল, লবণ-ক্ষেত্র প্রভৃতিতে অর্দ্ধেকের উপর আচ্ছন্ন, অপর অর্দ্ধেকের উপর গ্রাম, নগর, বাগান বাগিচা, রেলওয়ে রাস্তা আছে, বেলে, জলা, উঁচু কাঙ্করিয়া মাটি আছে ইহাতেও আন্দাজ অর্দ্ধেকের এক তৃতীয়াংশ বাদ যায়, তাহা হইলে প্রায় ১০৩২৫০০০০০ বিঘা জমী আবাদের জন্য পাওয়া যায়, যদি এই সমস্ত জমী ২৪০০০০০০০ চব্বিশকোটী লোকের মধ্যে সমান ভাগ করিয়া দেওয়া যায়; তাহা হইলে প্রত্যেকের অদৃষ্টে গড়ে ৪$\frac{১}{৪}$ স চারি বিঘা জমী পড়ে। স চারি বিঘার উৎপন্ন গড়ে প্রতিবৎসর বিঘায় পাঁচ মণ ধরিলে ২১$\frac{১}{৪}$ স একুশ মণ পড়ে। কিন্তু একজন জোয়ান মানুষের যদি সম্পূর্ণ পেট ভরিয়া আহার করিতে হয়, তাহা হইলে তাহার অন্ততঃ ২ সের আহার প্রত্যহ দরকার হয়, প্রত্যহ দুই সের হইলে, বৎসরে ১৮ মণ হয়। ইহার উপর কাপড় চোপড় আছে, ঘর বাড়ী আছে, সে সকল বাঁকী ৩$\frac{১}{৪}$ মণে কোনরূপেই হয় না। যদিও হয়, তাহাতে স্বাস্থ্য রক্ষা হয় না। স্বাস্থ্যকর আহারের কথা দূরে থাকুক, মাদুরে শুইয়া পেট ভরিয়া আহারও হয় না।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, এক এক বিঘায় কোথাও ১৬ মণ ২০ মণ চাউল হইয়া থাকে। সে কথা সত্য, কিন্তু তাহাতে যে সার দিতে হয় ও যে খরচ করিতে হয় তাহা করা চাসাদিগের অনেকেরই সাধ্যাতীত। বাঙ্গালায় সারের ব্যবহার প্রায়ই নাই এই জন্য বাঙ্গালার চাসারা আজিও খাইতে পায়, কিন্তু অন্যত্র সার ভিন্ন শস্য একেবারেই হয় না। এই জন্য সেখানে লোক অনাহারে মারা যায় ও আধপেটা খাইয়া জীবনধারণ করে।

আবার কেহ বলিতে পারেন যে /২ সের নিত্য খোরাক অধিকরতর হইয়াছে। তাহা নহে, বাঙ্গালার মৎস্য ঝোলজীবী ভদ্রলোকের পক্ষে ২ সের অধিক হইতে পারে, কিন্তু চাসাদের সেরূপ নহে। কাবুলের লোক ২ সের মাংসই প্রত্যহ খায়, ইহা ভিন্ন অন্য উপকরণ আছে। শুনা যায়, আকবর খাঁ এক একবারে /৫ সের মাংস /১ সের চাল ও /১ সের ঘৃত ভক্ষণ করিতেন। আমাদিগের /২ সের বলা বরং অল্প হইয়াছে ত অধিক হয় নাই।

আমরা যে ভাবে হিসাব করিয়া ভারতবর্ষীয় লোকের অর্দ্ধাহার দেখাইলাম, ইহাতে সমস্ত জমী সমান ভাগে বিভাগ করিয়া লওয়া হইয়াছে, কিন্তু

বাস্তবিক তাহা নহে, অসমান ভাগ হওয়ায় গড় ঐ ৪$\frac{১}{৪}$ সচাবি বিঘাই দাঁড়াইয়াছে; ইহার অপেক্ষা অনেক লোকের অধিক জমী আছে, অনেকের আবার কমও আছে। বহুসংখ্যকেব কিছুই নাই। যাহাদের কিছুই নাই, তাহারা চাকরী করে ভিক্ষা করে উঞ্ছবৃত্তি কবে এবং অতি কষ্টে দন্তবসমাত্র পান করিয়া কোনরূপে মনুষ্যজন্ম কাটাইয়া যায়। যখন দেখা যাইতেছে যাহাদের গড় মাফিক আছে, তাহদেবই অর্দ্ধাহার তখন যাহাদের নাই, তাহাদেব ত কথাই নাই।

এখনও হয় নাই; ভাবতবর্ষ ইংলণ্ডেব ন্যায় বিদেশ হইতে শস্য সংগ্রহ করিতে পারে না, ইহাব ঘবের শস্যেই গুজবান করিতে হয়, এই শস্যেব মধ্য হইতেও আবার অনেক শস্য প্রতিবৎসব দেশ বিদেশে নীয়মান হইতেছে ২১$\frac{১}{৪}$ স একুশ মণে অসম্পূর্ণাহার হয, তাহার উপব হইতে প্রতিবৎসর লক্ষ লক্ষ মণ শস্য বিদেশে পাঠান হয়।

দুঃখের কাহিনী এখনও ফুবায় নাই, ইহার উপর হইতে এই ভারতবর্ষ হইতে এক ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ৫৫০০০০০০০ পঞ্চান্ন কোটী টাকা লইতেছেন। কবদ ও মিত্ররাজ্যের আয় সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ২০ কোটী। আর ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের ও প্রজাগণের মধ্যবর্ত্তী জমীদার, তালুকদার যতদূর ইসক্রুপ চলিতেছে অণুমাত্র কসুর করিতেছেন না। মোট আয় ত ২১$\frac{১}{৪}$স একুশ মণ ক্রমে যে সব যায়, তোমার উদর চলুক না চলুক, তুমি খাও না খাও, তুমি সমাজে বাস কর, সমাজেব জন্য যে টুকু চাহি তাহা তোমাব দিতেই হইবে। সে টুকু জোব।

পাঠক মনে করিও না হতভাগাদিগেব ইতিহাস ইহাব মধ্যেই শেষ হইয়াছে, তাহাদেব সমস্ত আশা ভরসা আকাশেব উপব নির্ভর কবে; গ্রীষ্ম সময় পড়িতে না পড়িতেই তাহাবা হাঁ কবিয়া আকাশেব দিকে চাহিয়া থাকে, একদিন দুইদিন তিনদিন—দিন যত যাইতে থাকে, তাহাদের বুক দুড়দুড় কবিতে থাকে, সমস্ত বৎসর অর্দ্ধাহারে গিযাছে, আর আবার অর্দ্ধাহারেব পথও রুদ্ধ হয়। জ্যৈষ্ঠ পডিল, এখনও একবিন্দু জল নাই, এইবাব সর্ব্বনাশ, আকাল পড়িল, কতকগুলি নিঃস্বলোক সমাজের ঘাডে পডিয়াই আছে, যাহাদের আছে, তাহাবা তাহাদেরই গুজরান করিয়া উঠিতে পাবে না। আবাব লক্ষ লক্ষ লোক ঘর বাড়ী বিক্রয় করিয়া লাঙ্গল গোরু জলে ভাসাইয়া জীবনে হতাশ হইয়া চলিল, যাহার জোর আছে কাড়িয়া খাইবে, যাহার জোর নাই সে যেখানে বসিবে সেইখানেই মাবা যাইবে। কাড়িয়া খাইবে কি? পুলিশ আছে ধবিয়া প্রহার। এইরূপে গত বৎসর লক্ষ লক্ষ লোক পশ্চিম ও দক্ষিণ দেশে মারা গিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট রিলিফওয়ার্ক খুলিয়া কত লোকেব প্রাণদান করিবেন? যখন দেশের

অর্দ্ধেকের উপর লোক নিরুপায়, তখন কত রিলিফ করিবেন।

এইরূপে ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত লোকই অর্দ্ধাহারে জীবনযাপন করে। যাহাদের লইয়া দেশ, যাহাদের লইয়া জাতি, যাহাদের লইয়া বল, যাহাদের লইয়া ভরসা, তাহারা নিরন্ন, তাহাদের দুঃখের পার নাই। যাহারা ইংলণ্ডে রাজার উপর হুকুম জারী করে, যাহারা ফ্রান্সদেশে সর্ব্বময় কর্ত্তা, যাহারা কটাক্ষে ইটালীর উদ্ধার সাধন করিল, যাহারা আমেরিকায় নূতন সমাজের সৃষ্টি করিতেছে ও সমস্ত জগৎ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গড়িতে চাহিতেছে এই বিশাল ভারতসাম্রাজ্যে সেই সাধারণ লোক নিরন্ন, অর্দ্ধাহার, ঘোরঅজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন, কিরূপে আপনার অবস্থার উন্নতি করিতে হইবে জানে না জানিতে পারে না, সে বিষয়ে ভাবে না ভাবিতে পারে না, ভাবিবার সময় নাই, ভাবিতে গেলে অপার নৈরাশ্য সাগরে আপ্লুত হয়, কূল কিনারা না পাইয়া অদৃষ্টে যা হয় হবে, "জীব দিয়াছেন যিনি শিব দিবেন তিনি" বলিয়া কোন রূপে আপন আপন দুর্গতি ভুলিয়া আপন সমবস্থ লোকদিগের নিন্দা কুৎসা প্রভৃতি নির্দ্দোষ আমোদে কাল কাটায় কিন্তু দুর্গতিদহন নিরন্তর হৃদয় দগ্ধ করে। এই ত সাধারণ লোকের অবস্থা, আবার যাঁহারা ভদ্রলোক বলান যাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা রাজকীয় কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন, যাঁহারা শ্রেষ্ঠ জাতি তাঁহাদের অবস্থা আরও শোচনীয়। কি মুসলমান কি হিন্দু সকল ঘরেই লোকসংখ্যা বৃদ্ধি, যে আয়ে গত শতাব্দীতে রাজার হালে চলিত এখন তাহাতে নিয়ত বৃদ্ধিশীল পরিবারের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ হয় না। পেটে ক্ষুধা মুখে লাজ মানের ভয়ে স্বীয় অবস্থা প্রকাশ করার জো নাই; দুর্ভিক্ষ হইলে ছোটলোকে রিলিফ ওয়ার্ক পায়, কিন্তু ইহাদিগকে গৃহমধ্যেই থাকিতে হয়; স্বচক্ষে অনশনে প্রাণসম শিশু সন্তানকে কাতর দেখিতে হয়, তাহার ক্ষুধাজনিত ছট ফটানি দেখিয়া কাঁদিতে হয়, শেষ যখন অসহ্য হয় তখন সেই শ্মশান সমান আত্মগৃহে, হয় সন্তানের না হয় আপনার, প্রাণ বধ করিয়া দুঃখানলে আহুতি দিতে হয়।

এরূপ অবস্থায় ভারতবাসীদিগের দুইটি মূল মন্ত্র জপ ও সাধনা নিতান্ত আবশ্যক। প্রথম লোকসংখ্যা হ্রাস, দ্বিতীয় সাংসারিক উন্নতিসাধন। যে পরিমাণ লোক সংখ্যা, ইহা ভারতবর্ষের উৎপন্ন হইতে রক্ষিত হইতে পারে না; অতএব ইহার হ্রাস করা ও পরে আর যাহাতে বাড়িতে না পারে তাহার চেষ্টা করা নিতান্ত আবশ্যক। লোকসংখ্যা হ্রাসের এক উপায় বিদেশে লোক পাঠান, সে চেষ্টা সফল হইতে অনেক দিনের কথা। গত বৎসর দুর্ভিক্ষে পশ্চিমাঞ্চলে ১৫০০০০ দেড় লক্ষ লোক মারা গেল তথাপি দশহাজারও বিদেশে যায় নাই। লোকসংখ্যা হ্রাস করার তিন স্বাভা-

বিক উপায, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও মারী ভয়। আমাদের দেশে যুদ্ধ বিগ্রহ নাই, যুদ্ধে অনেক লোক মারা যায় এবং অনেক দিন সেই ক্ষতি পূরণ করিতে লাগে, আছে দুর্ভিক্ষ, মারীভয়ও বিশেষ নাই। যে ম্যালেরিয়া আছে, তাহাতে লোক ত অধিক মরে না, কেবল কষ্ট পায়। অতএব যাহাতে সেই দুর্ভিক্ষ ইচ্ছামত কাজ করিতে পারে সে বিষয়ে অন্যের হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে। যুদ্ধ অপেক্ষা দুর্ভিক্ষে লোকনাশ অনেক পরিমাণে বাঞ্ছনীয়, কারণ যুদ্ধে যাহারা মরে তাহারা সবল সুস্থকায়, তাহাদের দ্বারা সংসারের উন্নতি হইতে পারে। দুর্ভিক্ষে মরে যাহারা দুর্ব্বল উপায়হীন—তাহাদের থাকায় তাহাদের নিজের ত যন্ত্রণার সীমা নাই আর অন্যেরও কষ্ট। যাহাই হউক ১৬০০০০০ বর্গ মাইলে ২৪০০০০০০০ লোক প্রতিপালন করা দুরূহ। ২১$\frac{১}{৪}$ স একুশমণ হইতে টেক্স খাজানা দিয়া চলে না, অন্য অনেক দেশেও এইরূপ আছে কিন্তু তাহাদের বাণিজ্য আছে, শিল্প আছে, ক্রমে সে সব দেশে মূলধন সঞ্চিত হইতেছে সুতরাং অনেক লোক তাহাতে প্রতিপালন হয়। আমাদের দেশে বিদেশীয় মূলধনে বাণিজ্য, বিদেশীয় মূলধনে রেলওয়ে, বিদেশীয় মূলধনে শিল্প, মূলধনের সমস্ত মুনাফা বিদেশে চলিয়া যাইতেছে, আমাদের বর্দ্ধনশীল লোক সমূহের আহার চলে কিসে? কিন্তু ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে এই পরিমাণে লোক বাড়িয়া আসিলে ও বিদেশীয় মূলধনের সাহায্য না পাইলে আমাদের অবস্থা আরও শোচনীয় হইত।

এরূপ বিদেশীয় মূলধনের প্রাদুর্ভাব ত চিরদিন থাকিবে না যদি না থাকে তবে কি উপায় হইবে।

আর এক উপায় সাংসারিক উন্নতিসাধন। চাসারা যাহাতে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে তাহার যত্ন করা, তাহাদের যাহাতে বিবাহ ভিন্ন জগতে আরও সুখ আছে এরূপ প্রতীতি জন্মে, তাহার চেষ্টা করা। যাহারা নিজে কষ্ট না পায় তাহারা ছেলে কষ্ট পায় এটা চাহে না, সুতরাং তাহার একটু পরিণামদর্শন করিয়া চলে, ভাবিয়া বিবাহ করে এবং সতর্ক হইয়া জগতের ভার বৃদ্ধি করে। বাবুআনা করা অভিপ্রেত নহে, কিন্তু যাহাতে অভাব কমে, স্বচ্ছন্দ বৃদ্ধি হয়, সে বিষয়ে সকলেরই বিশিষ্টরূপে যত্নশীল হওয়া চাই। এই স্বাচ্ছন্দ্য যত বৃদ্ধি হইতে থাকিবে ততই লোকের সেই দিকে টান হইবে। যতক্ষণ সেই সকল সামগ্রী না পায় ততক্ষণ অন্য ব্যয় করিতে ইচ্ছা করিবে না। নিজের আরাম যাহারা চায় তাহারা শীঘ্র বিবাহ করে না, বিবাহ করিলেও সন্তানেরাও যাহাতে সেই সকল আরাম পায় সে বিষয়ে চেষ্টা করে। যাহার কিছু নাই তাহার বুদ্ধি বিবেচনাও নাই। সে ভাবে আমারও যেমন করিয়া চলিল পরে ছেলেদেরও সেইরূপ করিয়া চলিবে।

তাহারা নিজে জীবনে কষ্ট যন্ত্রণা বই ভোগ করিল না, তাহারা জানে জগৎ যন্ত্রণাময়, যা সুখ আছে তাহা বিবাহজনিত সাংসারিক। সুতরাং তাহারা প্রথম হইতেই বিবাহ করিবার জন্য ব্যগ্র হয় এবং ছেলেদের বিবাহ দেওয়া পর্য্যন্তই পিতার একমাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম মনে করে। বিবাহে তাহারা অনেকটা সহানুভূতি পায়। নিজ সুখ দুঃখের ভাগী পায় যন্ত্রণাময় জীবলোকে কতকটা আরাম পায়। সকল যন্ত্রণা গৃহলক্ষ্মীর মুখ দেখিয়া দূর করে। ছেলে হয় মরে সে কেবল স্বভাবের উপর নির্ভর। যত দিন ছেলে গুলি রহিল নিজের মুখের গ্রাস তাহাকে দিয়া বাঁচাইয়া রাখিল। বরাবর বাঁচিয়া রহিল ত পাঁচবৎসর বয়স হইতেই সে রোজগার করিতে শিখিল। সে একরকম আত্মোদর পূর্ত্তি করিতে শিখিল। কিন্তু তাহাতে কোন উপকার নাই, সে ভাল শিক্ষা পাইল না, ভাল কারিগর হইতে পারিল না। চিরদিন সকল অপেক্ষা অল্পদরের যে মজুরি তাহাই করিয়া তাহার দিনপাত করিতে হইবে। কখন পূরা পেট ভাত খাইতে পাইবে না। এরূপ অবস্থা হইতে তাহাদের উদ্ধার করিতে হইলে, তাহাদের সাংসারিক উন্নতিসাধন যাহাতে হয়, তাহার চেষ্টা করা প্রয়োজন। যাহাতে তাহারা সঞ্চয় করিতে শিখে, সে বিষয়ে যত্ন করা, আর যাহাতে তাহারা বিবেচনা করিয়া বিবাহ করে ও সাবধানে জগতের ভার বৃদ্ধি করে সেইটি তাহাদিগকে শিখাইয়া দেওয়া প্রয়োজন।

শুদ্ধ দুঃখীলোকদিগের সাংসারিক উন্নতি সাধন করিলেই হইবে না। জাতিগত উন্নতিও সেই সঙ্গে চাহি। এলফিন্ষ্টোনের সময় ভারতবর্ষে এক কোটি চল্লিশ লক্ষ লোক ছিল,তখন অন্নকষ্ট ছিল না। মিউটিনির সময়ও অন্নকষ্ট বিশেষ ছিল না। তাহার পর হইতেই অন্নকষ্ট আরম্ভ হইয়াছে। মিউটিনির সময় লোক আন্দাজ ১৭ কোটী,এখন শুদ্ধ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীনেই তাহা আছে। মনে কর এই ১৭ কোটী লোকই ভারতবর্ষের বর্ত্তমান উৎপন্নে গুজরান করিতে পারে। তাহা হইলে সত্তর লক্ষ লোক বাড়তি হইয়াছে ইহাদের কি উপায়। মনে কর বৃটিশ বর্ম্মা প্রভৃতি নূতন দেশে এক কোটী লক্ষ লোক আছে। জঙ্গল আবাদ করিয়া আর এক কোটী লোকের চলিতেছে এবং রেলওয়ে ও পবলিক ওয়ার্ক কল ইত্যাদিতে আর দশ লক্ষ লোক সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। এখনও চারি কোটী বাঁকি। ইহারাই দুর্ভিক্ষে মরিতেছে, প্রতি বৎসরই শুনা যায় এখানে দেড়লক্ষ ওখানে তিন লক্ষ মরিতেছে। এই চল্লিশ লক্ষ পূর্ব্বোক্ত বিংশতি কোটী লোকের কষ্টের কারণ হইয়াছে। বিশ কোটীর যাহাতে চলে তাহাতে চব্বিশ কোটীর চলিতে গেলে কাজেই সকলেরই অর্দ্ধাহার। অতএব এই চারি কোটী লোকের

জন্য বন্দোবস্ত চাই। এ জেলা হইতে ও জেলা এইরূপে চারাইয়া দিলে বোধ হয় এখনও পতিত জমী আবাদ করিয়া দুই লক্ষ লোকেব চলিতে পারে, কিন্তু তাহা করে কে? প্রথম লোকে ত বাড়ী ঘর ছেড়ে যেতেই রাজী নয়, তৎপর যাওয়ার ও যাইয়া সংসাব ফাঁদিয়া বসিবাব খরচ চাই, কাহারই কিছু নাই, দেয় কে? দুঃখী ভদ্রলোকের এইরূপে এখান হইতে ও খান কবিয়া অনেক সহস্রেব উপায় হয় কিন্তু গরিব দুঃখীর হয় কই?

দ্বিতীয়, জাতীয় সাংসারিক উন্নতি অর্থাৎ দেশীয়শিল্প ও বাণিজ্যেব শ্রীবৃদ্ধি। ব্যবসাযাদিতে মূলধনেব প্রয়োগ, কৃষির উন্নতি অল্প ভূমিতে অধিক শস্যোৎপাদনেব চেষ্টা ইত্যাদি। আমাদেব দেশে বাণিজ্য ও শিল্পেব এক কথা এই যে, ইংরেজদিগের সঙ্গে যেন আমাদের শিল্প ও বাণিজ্যের এরূপ শৈশবাবস্থায় সংঘর্ষ (compitition) না হয়। হইলেই আমাদেব লোকসান। বহির্ব্বাণিজ্য ইংরেজে করে, তোমবা তাহাতে এখন যাইও না। এর পর সে সব হবে। অন্তর্ব্বাণিজ্যের ভাল করিয়া শ্রীবৃদ্ধি কর দেখি, তাহাতে দশ লক্ষ লোকের এখনও চলিতে বেশ পারে। রেলওয়ে খাল ইত্যাদি হইয়া সে বিষয়ের ত খুব সুবিধা হইয়াছে? চার চাসে ইংরেজ আছে, তাহাতে তোমরা যাইও না, প্রথম উহাদের টাকা অধিক, তাহার উপর আবার তোমাদের লোকসান করিয়া দিবার উহাদের অনেক উপায় আছে। যাহাতে ইংরেজ আছে তাহাতে যাইও না লোকসান হইবে, দেশের বড় ক্ষতি হইবে। কয়লার খনিতে ইংরেজ আছে, কিন্তু এরূপ কাজে ইংরেজের সঙ্গে দেশীয় লোকেও কাজ চালাইতেছে। ছোট নাগপুরে অনেক কাজ আছে, তাহাতে ইংরেজ নাই। অনেক তামাব খনি আছে, এই সকল কাজে দেশীয় লোকের উঠিয়া পড়িয়া লাগা উচিত। বাঙ্গালায় এখন নীলের কাজে ইংরেজলোক ক্রমেই কম হইতেছে। সে দিকে অনেক লাভ ও লোকসানের সম্ভাবনা, তাহাতে অনেক লোক প্রতিপালন হইতে পারে। অন্তর্বাণিজ্যে বিস্তব টাকা খাটিতে পাবে, যাহা খাটিতেছে তাহা ঠিক নয়। আরো অনেক খাটিতে পারে ও অনেক লোক প্রতিপালন হইতে পারে। জামালপুরেব বেলওয়ে কেরাণীগণ অন্তর্বাণিজ্যের জন্য এক সম্ভূয় সমুত্থান (Joint Stock) কার্য্য আবম্ভ কবিযাছেন, তাঁহারা যেরূপ শীঘ্র শীঘ্র এবং বিনা আয়াসে ২০,০০০ বিশ হাজার টাকা তুলিয়াছেন তাহাতে তাঁহাবা কৃতকার্য্য হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। তাঁহাদের সেয়াব পাঁচ টাকা, সুতরাং তাঁহারা অল্প আয়াসেই অধিক সেয়ার বিক্রয় করিতে পারিতেছেন। তাঁহারা যেরূপ দক্ষতার সহিত কার্য্য করিতেছেন, তাঁহাদের উপর আমাদেব যথেষ্ট ভরসা হয়। এই দৃষ্টান্তানুযায়ী প্রতি গ্রামে গ্রামে সমবেত কারবার খুলিতে

লাগিলে অনেক উপায় হইতে পারে। কিন্তু এইরূপ সাংসারিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যেন অকাতরে বিবাহ না হয়, আর যেন লোকসংখ্যা বৃদ্ধি কোন মতেই না হয়। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডের দশাও আমাদের মত কতকটা ছিল, দুঃখী লোক খেতে পাইত না, তাহাদের সুবিধার জন্য স্বাধীন বাণিজ্য স্থাপিত হইল, জিনিস পত্রের দাম সস্তা হইল। কিন্তু এই কয়েক বৎসরের মধ্যে নানা উপনিবেশ স্থাপনা সত্ত্বেও ইংলণ্ডে শত করা ৫০জন লোক বাড়িয়া গিয়াছে। ইংলণ্ডে এখন প্রতি ২৪ জন লোকে একজন ভিখারী আছে। এখনও ইংলণ্ডের চলিতেছে কিন্তু আমাদের আর চলে না। আমাদের উপস্থিত হিসাবে ৬ জনের মধ্যে একজন কাঙ্গাল, ইহাদের জন্য কোনরূপ বন্দোবস্ত করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে যাহাতে আর সংখ্যা বৃদ্ধি না হয়, সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকা উচিত।

অনেকে মনে করেন ট্যাক্সই আমাদের দুর্গতির কারণ সেটা আমাদের ভুল। ট্যাক্সে গুরুতর কিছুই নাই। যদি চব্বিশ কোটী লোক ৫৫০০০০০০০ পঞ্চান্ন কোটী (ইংরেজদের ৫৫ ও স্বাধীন রাজাদের ২০ কোটী) টাকা দেয় তবে প্রতিজনের ৩৶০ তিন টাকা দুই আনা পড়ে, এখন যে রূপ উচ্চমূল্যে দ্রব্যাদি বিক্রয় হইতেছে, তাহাতে ২১$\frac{1}{2}$ মণের মূল্য ৫০ পঞ্চাশ টাকা হইতে ৩৶০ তিনটাকা দুই আনা দিলে শতকরা ৬ ছয় টাকা ট্যাক্স ন্যায্যমত। কিন্তু কথা হইতেছে এই যে স একুশমণ হইতে স তিন টাকা লইয়া চাসা যে আর কোন কালে কিছু সঞ্চয় করিবে তাহার যো ত রহিলই না। বরং তাহার স্বাচ্ছন্দ্যের যা ছিল তাহাও রহিল না। কিন্তু সে দোষটি কার? লোকসংখ্যা বৃদ্ধির। যদি এই বৃদ্ধি না হইত মনে কর ২০ কোটী লোকই যদি থাকিত তাহা হইলে ৩ তিন টাকা ৷৵০ আনা খাজনা দিতে হইত সন্দেহ নাই তাহা হইলে কিন্তু তাহাদের আয় হইত $\frac{১০৩২৫০০০০০}{২০০০০০০০০}$ বিঘা × ৫ মণ = ২৭। সসাতাইশ মণ হইত। অনায়াসে চলিত। সাতাইশ মণ হইতে ১৮ মণ খাবার ও ৩৷৶ তিন টাকা বার আনা রাজস্ব দিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিত। সঞ্চয় তখনও হইত কি না সন্দেহ। এখন ঘোর কষ্ট হইয়াছে। মোটে তাহা হইলে টেক্স কষ্ট নহে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির দরুণ এই টেক্স কষ্টকর হইয়াছে। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের দোষ দেওয়া যায় না। তাই বলিয়া আমরা গবর্ণমেণ্টের ট্যাক্স সিষ্টেমের স্বাপক্ষে কিছু বলিতেছি না। আমরা কেবল এই মাত্র বলিতে চাহি যে দোষ যত আমাদের, তত গবর্ণমেণ্টের নয়। আমরা দেখিতেছি যে গবর্ণমেণ্ট আমাদের রক্ষা করিতেছেন, আর বর্গীর হাঙ্গামা নাই, লুঠ তরাজ নাই, একমুটা যেমন জোড়ে খাইতে পাইতেছি। আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম এখন বংশবৃদ্ধি করা। যাহাতে বংশলোপ না হয় যাহাতে

আমাদের বংশের কীর্ত্তি-ধ্বজা চিরদিন উড়িতে পারে। এই এক মাত্র আমাদের কাজ হইয়া উঠিয়াছে। যদি বংশবৃদ্ধির কোনরূপ প্রতিবন্ধক না থাকিত, যদি দুর্ভিক্ষ বা মারী ভয় না থাকিত, যদি বালকদিগের মৃত্যু সম্ভাবনা অধিক না হইত, যদি আমরা—আর কাজ নাই—তাহা হইলে এই চল্লিশ বৎসরে আমাদের বংশপঙ্গপালে ভারতভূমি ছাইয়া যাইত। সুবিধার মধ্যে এই, যখনই দেখি কষ্ট হইযাছে বিদেশীয় রাজত্ব বলিয়া পরের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিযা খুন হই।

যদি এই সময় হইতে আমরা সতর্ক না হই, তবে ভবিষ্যতের গর্ভে কি যে নিহিত আছে তাহা বলা যায় না। আমাদের অবস্থা এখনই অতি ভয়ানক। ৪ কোটি লোকের অন্ন নাই। কেহই পূরা পেট আহার করিতে পায় না। এই সময় ঠেকিয়া যদি আমরা না শিখি তবে আমাদের দুঃখে শৃগাল কুক্কুরও রোদন করিবে।

মাধবীলতা।

উপন্যাস।

সূচনা।

১

একদা সিংহশত গ্রামে একজন ধনবান্ রাজা বাস করিতেন। এক্ষণে সে গ্রাম নাই, সে রাজাও নাই, কেবল দুই একটি বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকার ভগ্নাংশ পড়িয়া আছে। ধনবানের শেষ চিহ্ন এইরূপ—প্রস্তরখণ্ড, বা ইষ্টকস্তূপ। উপযুক্ত পরিণাম! বিক্রমাদিত্যের এক্ষণে সিংহদ্বারের এক ভগ্নাংশ মাত্র আছে। কিন্তু গরিব কালিদাসের শকুন্তলা অদ্যাপি নবপ্রস্ফুটিত কাননকুসুমের ন্যায় সদ্যস্ক; পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মনোহর ও দিগন্তব্যাপী। মূর্খের নিকট শকুন্তলা বৃথা। অন্ধের নিকট চন্দ্রও মিথ্যা। বিক্রমাদিত্য স্বর্ণসিংহাসনে, আর কালিদাস নিম্নে, যোড় হস্ত। ভুল।

সিংহশত গ্রামের শেষ রাজা ইন্দ্রভূপ পরাক্রান্ত ছিলেন না, সামান্য লোকের ন্যায় সরল, শান্ত, ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। সেই ধর্ম্মপরায়ণতা তাঁহার অনর্থের মূল হইয়াছিল। অতি প্রাচীনকাল অবধি বংশের এই নিয়ম ছিল, যে জ্যেষ্ঠ পুত্র বিষয়-অধিকারী হইবেন, কনিষ্ঠেরা কেবল কিঞ্চিৎ মাসিক পাইবেন। এই নিয়ম, সঙ্গত হউক, অসঙ্গত হউক, রাজবংশের মধ্যে

দুইটী নূতন বৈষম্য ঘটাইয়াছিল; একটি প্রকৃতিগত; অপরটি আকৃতিগত। এক শাখা সদা সন্তুষ্ট, সবল, শান্ত ও উদার। অপর শাখা সদা ঈর্ষ্যাপরবশ ও কুটিল। এক শাখা রূপবান্, অপর শাখা কুৎসিত। এক বংশের মধ্যে পরস্পর এতাদৃশ প্রভেদ বিস্ময়জনক, কিন্তু ঘটিয়াছিল। যিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইবেন তাঁহার অসন্তোষের কোন কারণ ছিল না, সকলেই তাঁহার আশৈশব সন্তোষ বিধান করিত। কিন্তু যিনি বিষয়বৈভব কিছুই পাইবেন না তিনি সদাই ভাবিতেন, "পিতার এত ঐশ্বর্য্য। কি অপরাধে তিনি তাহাতে বঞ্চিত? সামান্য প্রজার সন্তানেরা পিতৃবৈভবে তুল্যাংশী, তিনি রাজপুত্র অথচ তাঁহার ভাগ্যে কিছুই নাই।" যাঁহার মনে সতত এই আলোচনা, সর্ব্বদা তাঁহার ভ্রূ কুঞ্চিত, সর্ব্বদা তাঁহার তীর্য্যগ্দৃষ্টি, সর্ব্বদা তাঁহার দন্তলগ্ন, সর্ব্বদা তাঁহার মুখ বিকট। মুখের উপর মনের আধিপত্য অতি চমৎকার, মনোবৃত্তি মাত্রেই মুখে আসিয়া উদয় হয়। কোন মনোবৃত্তির স্থান ভ্রূযুগ, কোনটির বা ভ্রূযুগ ও নেত্র। কোন মনোবৃত্তির স্থান ওষ্ঠ, কোনটির বা ওষ্ঠপার্শ্ব ও নাসা। এইরূপ রাগ, ঈর্ষ্যা, শোক, আহ্লাদ প্রভৃতি যে কোন মনোবৃত্তি হউক মুখের কোন অংশ না কোন অংশ অধিকার করিয়া থাকে। যে মনোবৃত্তি সর্ব্বদা উদয় হয়, তাহার অধিকারস্থল ক্রমে পুষ্টিলাভ করে। মুখের সেই অংশ ক্রমে এত স্পষ্ট হয়, যে প্রথমেই সেই অংশের প্রতি দৃষ্টি পড়ে। সে মনোবৃত্তি তৎকালে মনে উপস্থিত থাক বা না থাক, মুখে তাহার চিহ্ন রহিয়াছে। এই জন্য দেখিবামাত্র জানা যায় যে কাহার মুখে কোন বৃত্তির গতিবিধি অধিক। এই লোক স্বভাবতঃ উগ্র, এই লোক স্বভাবতঃ শান্ত, এই লোক স্বভাবতঃ দয়ালু যে অনুভব হয়, তাহার কারণ অপর কিছুই নাই।

কুপ্রবৃত্তি, কুৎসিত। মুখের যে অংশ কুপ্রবৃত্তির অধিকারস্থল, তাহা পুষ্ট হইলে, মুখ কুৎসিত হয়। এই জন্য সিংহশত রাজবংশের এক শাখা কুৎসিত ছিলেন। ঈর্ষ্যা, বৈরক্তি অসন্তোষ প্রভৃতি বৃত্তি সর্ব্বদা তাঁহাদের মনে জাগিত।

সজ্জন ব্যক্তিরা সুশ্রী। সৎপ্রবৃত্তি মনে প্রবল থাকিলে মুখ সুশ্রী হয়। যাঁহারা অসজ্জনকে সুশ্রী দেখিয়াছেন, তাঁহাদের ভ্রম হইয়াছে। শ্রী মুখের অংশ নহে, অন্তরের।

অবস্থানুসারে প্রকৃতি। প্রকৃতি হইতে আকৃতি।

ইন্দ্রভূপ স্বয়ং সর্ব্বদা সন্তুষ্ট; সকলকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করেন, কেবল জ্ঞাতিদের পারেন না। তিনি তাঁহাদের সর্ব্বস্ব লইয়াছেন, কেন তাঁহারা সন্তুষ্ট হইবেন? জ্ঞাতিদের নিকট ইন্দ্রভূপ অধার্ম্মিক, অবিবেচক, অত্যাচারী, কেবল

এক জন জ্ঞাতি ইন্দ্রভূপের প্রশংসা করিতেন, সর্ব্বদা তাঁহার অনুগত থাকিতেন। তাঁহার নাম চূড়াধন বাবু। তিনি যৎপরোনাস্তি মিষ্টভাষী, নম্র, শান্ত এবং নির্ব্বিরোধী ছিলেন, তাঁহাকে ইন্দ্রভূপ বিশেষ ভাল বাসিতেন। তিনি কাহাকেই বা ভাল না বাসিতেন?

চূড়াধন বাবু বড় সাবধানী ছিলেন। আপনি কখন রাজসম্মুখে কোন কথাই উত্থাপন করিতেন না। মহারাজ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে সসম্মানে নতশিরে কেবল সেই কথারই উত্তর দিতেন, কখন নিজের মত জানাইতেন না। সাধারণের মত কি, অন্যের মত কি, দেওয়ান মহাশয়ের মত কি, কেবল তাহাই জানাইতেন। ইন্দ্রভূপ তাহাতেই সন্তুষ্ট হইতেন। ভাবিতেন চূড়াধন বড় বিজ্ঞ।

রাজা ইন্দ্রভূপ আহার করিবার সময় নিত্য বহুজনপরিবেষ্টিত হইয়া আহার করিতেন। অতি উপাদেয় সামগ্রী নানা দেশ হইতে সংগৃহীত হইত। কিন্তু পরিচারকগণ দেখিত, চূড়াধন বাবু সে সকল কিছুই স্পর্শ করিতেন না, বাছিয়া বাছিয়া কেবল অপকৃষ্ট সামগ্রী আহার করিতেন। আহারান্তে ইন্দ্রভূপ পাশক্রীড়া করিতে ভাল বসিতেন। চূড়াধন বাবু ভিন্ন আর কাহার তাঁহার সহিত ক্রীড়া করিবার অধিকার ছিল না। কিন্তু অমাত্যবর্গ সকলেই দেখিত যে, চূড়াধন বাবু নিত্য হারিতেন। ইন্দ্রভূপ হাসিয়া বলিতেন, "চূড়াধন অদ্যাপি খেলা শিখিতে পারিল না।"

একদিন ক্রীড়ার পরিচয় দেওয়ান মহাশয় শুনিয়া কিঞ্চিৎ বিমর্ষ হইলেন। অনেক পরে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আপনা আপনি বলিলেন—"চূড়াধন বাবু এক দিন জিতিবেন।"

নিকটে একজন আত্মীয় বসিয়াছিলেন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কবে জিতিবেন?" দেওয়ানজি কোন উত্তর করিলেন না। ক্ষণেক পরে আপন পুত্রকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার অবর্ত্তমানে রাজাকে রক্ষা করিতে পারিবে?"

পুত্র। ভবিষ্যতে রাজার কি কোন বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে?

দেও। সম্পূর্ণ

পুত্র। কি বিপদ?

দেও। তাহা আমি এক্ষণে নিশ্চয় অনুভব করিতে পারি নাই। কিন্তু কে বিপদ ঘটাইবে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি।

পু। কে?

দেও। চূড়াধন বাবু।

পুত্র। ইচ্ছা পূর্ব্বক?

দেও। ইচ্ছা পূর্ব্বক। রাজার অনিষ্ট ভিন্ন চূড়াধন বাবুর আর কোন ইচ্ছা এ জগতে নাই।

পুত্র। চূড়াধন বাবু বড় সজ্জন বলিয়া ত বোধ হয়, সকলেই তাঁহার প্রশংসা করে।

দেও। কিন্তু আমি তাহা করি না। যতদিন আমি জীবিত থাকিব, তত দিন

চূড়াধন বাবু কোন বিশেষ উদ্যোগ না করিতে পারেন। কিন্তু আমি আর কত দিন? একে বৃদ্ধ, তাহাতে আবার নানা প্রকার পীড়াগ্রস্ত। তোমার নিমিত্ত কিছু সঞ্চয় করিতে পারি নাই, সঞ্চয়েরই বা প্রয়োজন কি? আমি যে রূপ কাটাইলাম তুমিও সেইরূপ কাটাইবে। আমরা পুরুষানুক্রমে রাজদেওয়ান, আমার পর তুমি অবশ্য দেওয়ান হইবে, রাজা তোমাকে ভাল বাসেন। চূড়াধন বাবু তোমার প্রতি হস্তক্ষেপ করিবেন না; তুমি অল্পবয়স্ক এই জন্য তুমি তাঁহার লক্ষ্য নহ। তাঁহার সম্মুখে বালকের মত ব্যবহার করিবে। আর এক কথা—রাজার যদি পুত্র না থাকে, বিষয় অধিকারী চূড়াধন বাবু হইবেন। রাজপুত্র বালক, অতএব রাজপুত্রকে বিশেষ সাবধানে রাখিবে। বোধ হয়, রাজপুত্রের উপর চূড়াধন বাবুর লক্ষ্য অধিক।

পুত্র। আমি দেখিয়াছি রাজপুত্রের প্রতি তাঁহার যত্ন অধিক। যখনই রাজপুত্রকে চূড়াধন বাবু দেখেন, কতই আদর করেন। প্রত্যহ দুই তিন বার করিয়া রাজপুত্রের তত্ত্ব করেন। রাজপুত্রও তাঁহাকে ভাল বাসেন।

দেওয়ান আবার বিমর্ষ হইলেন। আর কোন কথা কহিলেন না। তাঁহার পুত্র আপন বৈঠকখানায় গিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "পিতা অনর্থক চূড়াধন বাবুকে সন্দেহ করিয়াছেন। বৃদ্ধ হইলে অন্যের প্রতি সর্ব্বদাই সন্দেহ হয়, এই বয়সে যেমন প্রত্যেক পীড়ার প্রতি সন্দেহ হয় তেমনই আবার প্রত্যেক মনুষ্যের প্রতি সন্দেহ হয়। সন্দেহই এই বয়সের নিয়ম, সন্দেহের নাম বিজ্ঞতা।"

২

ক্রীডান্তে ইন্দ্রভূপ প্রত্যহ নিয়মিতরূপে কোন না কোন সংস্কৃত মূলগ্রন্থ শ্রবণ করিতেন, রাজসভায় কখন ভাগবদ্গীতা, কখন যোগবাশিষ্ঠ, কখন রামায়ণ, কখন মহাভারত পাঠ হইত। শ্রোতারা সকলেই সংস্কৃতজ্ঞ, ব্যাখ্যার আর প্রয়োজন হইত না। এই সময় যে কথা বার্ত্তা আবশ্যক হইত, তাহা সমুদয় সংস্কৃত ভাষায় কহিতে হইত। ফল এই দাঁড়াইয়াছিল যে, ইচ্ছা হইলেও বড় কেহ কথা কহিতে পাইতেন না, কাজেই নির্ব্বিঘ্নে পাঠ হইত। কিন্তু রামায়ণ কি মহাভারত পাঠকালে এ নিয়ম বড় খাটিত না। রামের বিলাপ, বা অন্ধমুনির বিলাপ, সীতার বিলাপ বা দশরথের বিলাপ বা তদ্বৎ কোন অংশ পাঠ হইতে আরম্ভ হইলে, প্রথমে সকলেই নিস্পন্দ হইয়া শুনিতেন, ক্রমে সকলের হৃদয় যখন পূর্ণ হইয়া উঠিত, তখন হয় ত কোন শ্রোতা আর শোকসম্বরণ করিতে অসমর্থ হইয়া কুণ্ঠিত ভাবে নিশ্বাস ফেলিতেন, অমনি নিকটেই সজোরে নস্যগ্রহণের দুই একটি শব্দ হইত, তাহার পরেই চারিদিকে উপর্য্যুপরি নস্যগ্রহণের

তুমুল শব্দ হইয়া উঠিত। কেবল নাসার দীর্ঘ শব্দ। এই এককপ ক্রন্দন। অধ্যাপকের ক্রন্দন শেষ হইলে ইন্দ্রভূপ স্বয়ং কম্পিতকণ্ঠে শোক প্রকাশ করিয়া ফেলিতেন, তাহার পর কথা কহিবার আর বাধা থাকিত না, প্রথম দুই একটি সংস্কৃত, পরেই বাঙ্গালা চলিত। তখন সকলেই কথা কহিতেন, কেবল চূড়াধন বাবু নিস্তব্ধ থাকিতেন। রামায়ণ, মহাভারত তাঁহার ভাল লাগিত না; লোকের কেন ভাল লাগে, তাহাও তিনি অনুভব করিতে পারিতেন না। এক দিন তিনি দেওয়ান্ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনি কোন দিন রামায়ণ শুনিতে বসেন না কেন?" দেওয়ান্ উত্তর করিলেন, "রামায়ণ কর্ম্মনাশা, একদিন শুনিলে, দুইদিন কোন কর্ম্ম করিতে পারা যায় না।" চূড়াধন একটু হাসিলেন, তাঁহার বিকট দন্ত দেখা গেল। তাহা দেখিয়া দেওয়ান্ মহাশয়ের একজন পরিচারক ভাবিল, "দাঁত ছাড়ান যদি হাসি হয়, তাহা হইলে শৃগালেরও হাসি আছে।"

বাস্তব সকল হাসি, হাসি নহে। সকলে হাসিতে পারে না, অনেকে আবার হাসিবার অধিকারীও নহে। অথচ সকলেই হাসিতে যান, হাসিতে কাহার না সাধ? হাসি দেখিলে হাসি পায়, কিন্তু যে ব্যক্তি হাসিতে অনধিকারী, তাহার হাসি দেখিলে কেহ হাসে না, ভয় পায়। সুধীরা হাসিতে জানে, সরল ও উদার ব্যক্তিরা বিলক্ষণ হাসিতে পারে, প্রণয়ীরা চমৎকার হাসে, শোকাকুল ব্যক্তিরা ম্লান হাসি হাসে, অন্ধকার ঝড় বৃষ্টিতেও কখন কখন দীপ-আলোক পড়ে, কিন্তু কুটিল ব্যক্তিরা হাসিতে পারে না, তাহাতেই পরিচারক চূড়াধন বাবুর হাসিকে "দাঁত ছাড়ান" বিবেচনা করিয়াছিল।

চূড়াধন বাবু প্রায় রাজবাটীতেই সময় অতিবাহিত করিতেন। কোন কার্য্যের বিশেষ ভার ছিল না, তথাপি তিনি প্রত্যূষে আসিয়া রাজদ্বারে দাঁড়াইয়া থাকিতেন, ইন্দ্রভূপ বহির্গত হইলে, সঙ্গে সঙ্গে পুষ্পোদ্যানে বেড়াইতেন, নিতান্ত নিকটে যাইতেন না, অথচ এমত দূরে থাকিতেন, যে অন্যের কথা যদিও একান্ত না শুনিতে পান, তথাপি রাজার উত্তর শুনিতে পাইবেন। যিনিই যত মৃদুস্বরে কথা বলুন, রাজা তাহার উচ্চৈঃস্বরে উত্তর দিতেন। ইন্দ্রভূপ কখন মৃদুস্বরে কথা কহিতে পারিতেন না। যিনি মৃদুস্বরে কথা কহিতে পারেন না, তিনি আবার প্রায় কোন কথা গোপন করিতেও পারেন না; কথা আপনারই হউক, পরের হউক, সকলের সম্মুখে মুক্তকণ্ঠে আলোচনা করা তাঁহার অভ্যাস হয়।

পুষ্পোদ্যান হইতে ইন্দ্রভূপ যখন বিষয় কার্য্য করিতে যাইতেন, চূড়াধন বাবু সেই অবকাশে রাজভৃত্য ও পরিচারকদিগের সহিত মিষ্টালাপ করিতেন, কখন বা অধ্যাপকদের সহিত শাস্ত্রীয় কথা লইয়া তর্ক করিতেন। নানাশাস্ত্রে

তাঁহার বিলক্ষণ অধিকার ছিল। পণ্ডিতেরা তাঁহার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতেন, অপর সকলে তাঁহার সদ্ব্যবহার সম্বন্ধে প্রশংসা করিতেন, কেবল এক দেওয়ান্ মহাশয় নিস্তব্ধ থাকিতেন।

রাজা সর্ব্বদাই চূড়াধনকে মিষ্ট সম্ভাষণ করিতেন, সর্ব্বদাই সন্তুষ্ট রাখিতে যত্ন করিতেন। ইন্দ্রভূপ ভাবিতেন, যে চূড়াধন বাবুর পিতা রাজ্যাধিকারী হইলে চূড়াধন কতই সুখভোগ করিত, অতএব যাহাতে সে অভাব চূড়াধন অনুভব করিতে না পান, রাজা সতত সেই চেষ্টায় থাকিতেন, কিন্তু অর্থাম্বুকাল্যের দ্বারা সে অভাব পূরণ করিতে পারিতেন না। দেওয়ান তাহাতে কোন গতিকে না কোন গতিকে ব্যাঘাত ঘটাইতেন। দেওয়ানের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, যে চূড়াধন বাবুর অর্থাভাব রাজার পক্ষে মঙ্গল।

দেওয়ানের বৈরিত্ব চূড়াধন বাবু জানিতেন, কিন্তু কখন সে জন্য দেওয়ানের সহিত অসদ্ব্যবহার করিতেন না, বরং তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। সকলেই দেখিত, স্বয়ং ইন্দ্রভূপ দেখিতেন, যে চূড়াধন বাবু দেওয়ানের বিশেষ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। এক দিন অকস্মাৎ দেওয়ানের গৃহদাহ হয়, চূড়াধন বাবু তৎক্ষণাৎ অগ্রে যাইয়া দেওয়ানকে উদ্ধার করেন, সকলেই চূড়াধন বাবুকে ধন্যবাদ দিয়াছিল, কিন্তু দেওয়ান দেন নাই, সেই জন্য সকলেই দেওয়ানের নিন্দা করিত, দেওয়ান্ তাহা শুনিয়া কোন উত্তর করিতেন না। কেবল একবার পুত্রকে নির্জ্জনে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, "গৃহদাহ বিস্মরণ হইও না।"

পুত্র। কেন?

দেও। তাহা হইলে যে দাহ করিয়াছে তাহাকে ভুলিবে।

পুত্র। কে দাহ করিয়াছে?

দেও। চূড়াধন বাবু।

পুত্র। তিনি আপনাকে উদ্ধার করিয়াছেন।

দেও। উদ্ধার করিবেন বলিয়াই বিপদ ঘটাইয়াছিলেন।

পুত্র আর কোন উত্তর না করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। দেওয়ান রাজবাটীতে গেলেন, তথায় যাইয়া দেখেন চূড়াধন বাবু কয়েক জন বৃদ্ধ অধ্যাপকপরিবেষ্টিত হইয়া বক্তৃতা করিতেছেন। চূড়াধন বাবু স্বভাবতঃ অল্প কথা কহেন, তাহাও মৃদুস্বরে, এক্ষণে তাহার অন্যথা দেখিয়া দেওয়ান মহাশয় সেই দিকে গেলেন। অন্য কর্ম্মচ্ছলে কিঞ্চিৎ দূরে থাকিয়া শুনিতে লাগিলেন। দেওয়ানের সমাগমে চূড়াধন বাবুর স্বর ঈষৎ উচ্চ হইল, দেওয়ান তাহা বুঝিলেন। চূড়াধন বাবু বলিতে লাগিলেন—"পুত্রের কুচরিত্র কেবল পিতার দোষে ঘটে, নির্ব্বোধ পিতারা সকল কথাই পুত্রকে বলে, পুত্রকে সাবধান করিতে গিয়া আপনারা অসাবধান হয়। বিজ্ঞতা শিখাইবে মনে করিয়া কুটিলতা শিখায়। উপকার করিলে যাহারা উপকৃত বোধ করে না

তাহারা আপনারা অপকার করিতে না পারিয়া সন্তানের উপর ভার দিয়া যায়।"

দেওয়ান্ আর শুনিলেন না; কর্ম্মান্তরে চলিয়া গেলেন। যাইতে যাইতে একবার একজন পদাতিককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার শিবিকার সহিত কে আসিয়াছিল ?"

পদা। আমি আসিয়াছিলাম।

দেও। আমার পাল্কির পূর্ব্বে আর কেহ রাজবাটীর দিকে দৌড়িয়া আসিয়াছিল ?

পদা। কই দেখি নাই।

দেও। আশ্চর্য্য।

দেওয়ান্ মহাশয় মুখে "আশ্চর্য্য" শব্দটী মাত্র উচ্চারণ করিলেন, কিন্তু অন্তরে অনেক কথা বলিলেন, অনেক বাদানুবাদ করিলেন। ক্রমে তাঁহার সন্দেহ ঘনীভূত হইতে লাগিল, তিনি আর দেওয়ান্ খানায় বসিতে পারিলেন না, সত্বর গৃহে গেলেন। প্রথমেই পুত্রকে ডাকিয়া এক দৃষ্টে তাহার প্রতি অন্যমনস্কে চাহিয়া রহিলেন। পুত্র নতশিরে দাঁড়াইয়া রহিল। অনেক পরে পুত্রকে বিদায় দিয়া আলবোলা নিকটে টানিয়া অস্ফুট স্বরে আপনা আপনি বলিলেন, "যার পুত্র পর, তার বিদায় লইবার আর বিলম্ব কেন?" তৎক্ষণাৎ ব্যস্ত হইয়া চারি দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া পূর্ব্বমত মৃদুস্বরে বলিতে লাগিলেন "গৃহে গোপন কথা যে কহিতে না পায় তার আর গৃহ কেন, সংসার কেন ?"

এই দিন চূড়াধন বাবু অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত রাজবাটীতে ছিলেন। অন্যদিন প্রায়ই সন্ধ্যার পর বাটী যাইতেন। যাইবার সময় কিঞ্চিৎ দ্রুত পদবিক্ষেপে যাইতেন, লোকে বলিত, "ঐ চূড়াধন বাবু প্রদীপ নিবাইতে যাইতেছেন। বাস্তবিক সে কথা কতকাংশে সত্য। গৃহে তাঁহার প্রতীক্ষায় অনর্থক প্রদীপ না জ্বলে, অনর্থক তৈল নষ্ট না হয় ইহা তাঁহার সাংসারিক বন্দবস্তের কথা বটে। তাঁহার যে নিতান্ত দৈন্যদশা ছিল এমত নহে। গৃহে দাস দাসী ছিল দ্বারপালও ছিল। কিন্তু তাহা বলিয়া অনর্থক তৈল নষ্ট কেন হইবে ? এই জন্য গৃহে প্রদীপ বড় জ্বলিত না।

তাঁহার গৃহ দেখিলে কোন ধনবান্ বা রাজগোষ্ঠী কাহার বাসস্থান বলিয়া বোধ হইত না। গৃহটী ইষ্টকনির্ম্মিত বটে কিন্তু বড় ক্ষুদ্র ও ভগ্নোন্মুখ, অথচ জাঁকজনক আছে। চারি দিকে কার্ণিসের নিম্নে বিবিধ প্রকার পক্ষী চতুষ্পদ সেপাই শাস্ত্রি চূনকামে অঙ্কিত রহিয়াছে—দেখিলে ঢাকাই শাটী মনে আইসে। গৃহাভ্যন্তরে বায়ুপ্রবেশের পথ বড় ছিল না, তৎকালে গবাক্ষের আকৃতি পরিবর্ত্তন হইয়া অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চতুষ্কোণ ঝরকা প্রচলিত হইয়াছিল, চূড়াধন বাবুর বাটীতে তাহার দুই তিনটী মাত্র ছিল। বাটীর মধ্যে বা পার্শ্বে কোথাও পুষ্পোদ্যান ছিল না, তৎকালে গৃহস্থের পক্ষে ইহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া নিন্দা হইত। একবার একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ

ভিক্ষার্থে আসিয়া, "ভিক্ষাং দেহি" বলিয়া দ্বারে দাঁড়াইল, পরে ইতস্ততঃ অবলোকন করিয়া দেখিল,যে গৃহে কোন পুষ্পবৃক্ষ নাই,অতএব তৎক্ষণাৎ ফিরিল। গৃহিণী স্বয়ং ভিক্ষা লইয়া আসিলেন, ভিক্ষুক তাহা গ্রহণ করিল না,বলিল,"মাতঃ, তোমার ভিক্ষা আমি লইব না। পুষ্পোদ্যান নাই দেখিয়া বুঝিয়াছি যে তোমার গৃহে নারায়ণ নাই।"

ভিক্ষুক যদি আর কিঞ্চিৎ দাঁড়াইয়া পর্য্যবেক্ষণ করিত, তাহা হইলে বলিত, "তোমার গৃহে কোন পালিত পক্ষী নাই, বোধ হয় তোমার কোন সন্তান সন্ততি নাই, আমি ভিক্ষা লইব না নিঃসন্তানের ভিক্ষা অশুচি।" চূড়াধন বাবু বাস্তবিক নিঃসন্তান, গৃহে আপনি আর গৃহিণী বাস করেন। পুত্রবতী হইলে স্ত্রীজাতির যে কোমলতা জন্মে, সর্ব্বলোকে যে স্নেহ যে দয়া জন্মে, তাহা তাঁহার গৃহিণীর একবারে জন্মে নাই। চূড়াধন বাবু জানিতেন যে তাঁহার স্ত্রী অতিশয় দয়াময়ী, স্নেহময়ী, দাতা, এবং একবারে স্বার্থপরতাশূন্যা। চূড়াধন বাবু এসকল বিশেষ দোষ জ্ঞান করিতেন, এবং এই জন্য মধ্যে মধ্যে গৃহিণীকে তিরস্কার করিতেন, তথাপি গৃহিণী রাত্রিকালে স্বামীর ভোজন পাত্রের নিকট বসিয়া নিজের স্নেহ,দয়ার নানা পরিচয় দিতেন। কিন্তু তাহার একটি কথাও প্রকৃত নহে, চূড়াধন বাবু সকল গুলিই প্রকৃত মনে করিতেন। চূড়াধন বাবু অসাধারণ বুদ্ধিমান্ ছিলেন সকলের অন্তরস্থ পর্য্যন্ত দেখিতে পাইতেন, কিন্তু আপনার স্ত্রীর নিকট অন্ধ হইতেন, কিছুই বুঝিতে পারিতেন না। গৃহিণী বিশেষ বুদ্ধিমতী ছিলেন না,প্রতিবাসীদিগের অভিসন্ধি কিছুই অনুভব করিতে পারিতেন না; কিন্তু চূড়াধন বাবুর অন্তস্তল পর্য্যন্ত দেখিতে পাইতেন, বুঝিতে পারিতেন।

যে রাত্রে চূড়াধন বাবু দ্রুতপাদবিক্ষেপে বাটী আসিতেছিলেন, সেই রাত্রে তাঁহার বাটীতে দুই জন লোক বসিয়া তাঁহার নিমিত্তে অপেক্ষা করিতেছিল। চূড়াধন বাবু তাঁহাদের দেখিয়া মহা আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন, অর্থাৎ বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করিলেন। তাহার পর একত্রে বসিয়া অতি নিম্নস্বরে পরস্পর অনেক কথাবার্ত্তা হইল। শেষ উঠিবার সময় চূড়াধন বলিলেন "এইবার বুঝিব তোমরা কেমন জাল ফেলিতে পার।" তাহাদের মধ্যে একজন উত্তর করিল, "জেলে ত আপনি, আমরা মাত্র জেলের হাঁড়ি,আমরা সঙ্গে সঙ্গে ফিরিব, দেখিব, আপনার জালে কেমন করে রাজমৎস্য ধরা পড়ে।"

বঙ্গদর্শন।

ষষ্ঠ বৎসর।

রত্নরহস্য।

এদেশে যখন একমাত্র দেবভাষা সংস্কৃতের প্রাবল্য ছিল তখন হইতে "রত্ন" শব্দটি চলিয়া আসিতেছে।

সংস্কৃত শাস্ত্র আলোচনার দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায় পূর্ব্বাচার্য্যেরা দুই প্রকার অর্থে "রত্ন" শব্দের সঙ্কেত বন্ধন করিয়া গিয়াছেন। এক, সামান্যতঃ উৎকৃষ্ট বস্তুর উপর, দ্বিতীয় উৎকৃষ্ট প্রস্তরের উপরই রত্নের প্রয়োগ দেখা যায়।

"জাতৌ জাতৌ যদুৎকৃষ্টং তদ্ধি রত্নং
প্রচক্ষতে।"

প্রত্যেক জাতীয় বস্তুর মধ্যে যেটী উৎকৃষ্ট সেইটিই রত্ন। যথা স্ত্রীরত্ন, পুরুষরত্ন, অশ্বরত্ন, ধনরত্ন ইত্যাদি; "রত্নস্তু মণিভেদে স্যাৎ" মণিবিশেষের সহিত রত্নশব্দের সঙ্কেত বাঁধা আছে। রত্নশব্দের এই দ্বিতীয় অর্থের বিবরণ ব্যক্ত করা আমাদের উদ্দেশ্য, এই জন্যই আমরা উপরে "রত্নরহস্য" মুকুট স্থাপন করিলাম। এক সময়ে ভারতবর্ষবাসীদিগের মনে যে কি পর্য্যন্ত প্রস্তরপরীক্ষা বিষয়ক অনুসন্ধিৎসা প্রবল হইয়াছিল এই প্রস্তাব পাঠ করিলে তাহা পাঠকবর্গ অবগত হইতে পারিবেন।

রত্নপদবাচ্য যত প্রকার মণি আছে তন্মধ্যে নয়টি প্রধান। এই জন্য আমরা "নবরত্ন" নামটি সর্ব্বদা শুনিতে পাই। তদযথা।

"মুক্তা মাণিক্য বৈদূর্য্য গোমেদো
বজ্রবিদ্রুমৌ
পদ্মরাগং মরকতং নীলঞ্চেতি যথাক্রমম্।"
(তন্ত্রসারঃ)

পাঠকগণ বৈদূর্য্য কি? গোমেদ কি? বলিয়া ব্যস্ত হইবেন না, ক্রমে সমস্তই বলিব—অগ্রে মুক্তার বিবরণ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

মুক্তা বহুমূল্য রত্ন। ভারতবাসিগণের ন্যায় ইউরোপীয়গণও প্রাচীনকাল

হইতে ইহার বিশেষ আদর করিয়া আসিতেছেন। পূর্ব্বকালে রোমকগণ ইহা বহুব্যয়ে ক্রয় করিতেন। একজন রোমক গ্রন্থকার তাঁহার সময় একছড়া মুক্তাহার অষ্ট লক্ষ টাকায় বিক্রয়ের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ রূপবতী ক্লিওপেট্রা একটি ৮০৭২৯০ টাকা মূল্যের মুক্তা চূর্ণ করিয়া মদ্যের সহিত পান করিয়াছিলেন, এবং এতাদৃশ বহুমূল্য একটি মুক্তা দ্বিখণ্ড করিয়া রোমের প্রসিদ্ধ ভিনসের মূর্ত্তির কর্ণাভরণ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। আধুনিক সময়েও রাজ্ঞী এলিজেবেথের রাজ্যকালেও তৎসমক্ষে স্যর টমাস গ্রেসাম একটী ১৫০০০০ টাকা মূল্যের মুক্তা চূর্ণ করিয়া মদ্যের সহিত পানকরত স্পেনদেশীয় রাজদূতকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। মুক্তা এইরূপ সকল সময় ও সকল রাজ্যেই আদৃত হইয়া আসিতেছে।

ভারতের জ্যোতিষশাস্ত্রে ইহার সমধিক গৌরব দৃষ্ট হয়। মুক্তা ধারণে মহাফল, গৃহে থাকিলে মহাফল, ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চন্দ্র, এইরূপে গৌরব বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। বৈদ্যকশাস্ত্রকারেরাও ইহার গৌরব করিতে ত্রুটি করেন নাই। ইহার গুণ, ঔষধে উপযোগ, উপকারিতা রাজনির্ঘণ্ট ও ভাবপ্রকাশ প্রভৃতি বৈদ্যক গ্রন্থে আছে।

মুক্তার ছায়া বা কান্তি, বিশেষ বিশেষ আকর বা উৎপত্তি স্থান, ও বিশেষ বিশেষ পরীক্ষা প্রভৃতি গরুড় পুরাণে আছে। ইহা ভোজরাজকৃত "যুক্তিকল্পতরু" গ্রন্থে কিছু অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। ৺ স্যর রাজা রাধাকান্ত দেব এই সমস্ত গ্রন্থ হইতে প্রমাণ সমূহ কল্পদ্রুমে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। পাঠকবর্গের গোচরার্থ পুস্তকগুলির অগ্রে পরিচয় দিলাম। মুক্তার আকর বা উৎপত্তি স্থান যথা—

মাতঙ্গোরগমীন পোত্রি শিরসস্তক্সার
শঙ্খাম্বুভৃৎ।
শুক্তীনামুদরাচ্চ মৌক্তিক মণিঃস্পষ্টং
ভবত্যষ্টধা॥ (যুক্তিকল্পতরু)

(১) মাতঙ্গ—হস্তী (২) উরগ—সর্প। (৩) মীন—মৎস্য। (৪) পোত্রী—শূকর। (৫) ত্বক্‌সার বাঁশ। (৬) শঙ্খ—শাঁখ। (৭) অম্বুভৃৎ—মেঘ। (৮) শুক্তি—ঝিণুক।

ভাবপ্রকাশ গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে।

"শঙ্খো গজশ্চ ক্রোড়শ্চ ফণী মৎস্যশ্চ
দর্দ্দুরঃ।
বেণুরেতে সমাখ্যাতা তজ্জৈ্ঞ মৌক্তিক
যোনয়ঃ।" (ভাবপ্রকাশ)

(১) শঙ্খ—শাঁখ। (২) গজ—হস্তী। (৩) ক্রোড়—ঝিণুক। (৪) ফণী—সর্প। (৫) মৎস্য—মাছ। (৬) দর্দ্দুর—ভেক। (৭) বেণু—বাঁশ।

মল্লিনাথ অন্য একটি বচনের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা

"দ্বিপেন্দ্র জীমূত বরাহ শঙ্খ মৎস্যাহি
শুক্ত্যুদ্ভববেণুজানি

মুক্তাফলানি প্রথিতানি লোকে তেষান্তু
শুক্ত্যুদ্ভবনেব ভূরিব।

(১) দ্বিপেন্দ্র—জাত্যহস্তী। (২) জীমূত—মেঘ। (৩) ববাহ—শূকব। (৪) শঙ্খ—শাঁখ। (৫) মৎস্য—মাছ। (৬) অহি—সর্প। (৭) শুক্তি—ঝিণুক। ৮) বেণু—বাঁশ। এই সকল স্থান হইতে মুক্তা জন্মে এইরূপ প্রসিদ্ধ আছে। পরন্তু শুক্ত্যুদ্ভব মুক্তা বহু উৎপন্ন হয।

রাজা বাধাকান্তদেব অন্য আব একটী বচন উল্লেখ কবিযাছেন। যথা

"গজাহিকোলমৎস্যানাং শীর্ষে মুক্তা-
ফলোদ্ভবঃ।
ত্বক্ সার শুক্তি শঙ্খানাং গর্ব্ভে মুক্তা-
ফলোদ্ভবঃ।"

হস্তী, সর্প, শূকব, ও মৎস্যের মস্তকে মুক্তামনি জন্মে এবং বাঁশ, ঝিণুক ও শাঁখের উদবে জন্মে। এই সকল বচনের মধ্যে মল্লিনাথের ধৃত বচনটী-তেই আমাদের শ্রদ্ধা হয। কেন না ঐ বচনের একাংশে প্রকাশ কবা হই-যাছে যে, "শুক্তিজাত মুক্তাই আমবা অধিক পাই, অন্যান্য আকবেব মুক্তা সকল লোকপ্রবাদে প্রসিদ্ধ।" এই কথাই সত্য।

মাতঙ্গ মুক্তা—গজমুক্তা।

"মৌক্তিকং ন গজে গজে" (চাণক্য)—সকল গজে মুক্তামনি পাওয়া যায় না। অর্থাৎ সকল হস্তীর মস্তকাভ্যন্তরে পা-থরী জন্মে না। কিরূপ হস্তীর মস্তকে জন্মে তাহা বলিতেছি।

"মতঙ্গজা যেতু বিশুদ্ধবংশ্যা
স্তে মৌক্তিকানাং প্রভবাঃ প্রদিষ্টাঃ।
উৎপদ্যতে মৌক্তিক যেষু বৃত্তং
আপীত বর্ণং প্রভযা বিহীনম্॥"
(যুক্তিকল্পতরু)

যে সকল মাতঙ্গ বিশুদ্ধ বংশোৎপন্ন তাহাদেবই মস্তকে মুক্তা প্রস্তর উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই সকল জাত্যহস্তীব মধ্যে কোন কোন হস্তীতে যে মুক্তা জন্মে তাহা সুগোল,ঈষৎ পীতবর্ণ, এবং ছায়া-বিহীন। মুক্তাব ছাযা কি? তাহা পবে বলা যাইবে।

"বক্ষ্যে গজ পবীক্ষায়াং গজজাতি-
শ্চতুর্ব্বিধা।
মৌক্তিকং তেষু জাতং হি চতুর্ব্বিধ
মুদীর্য্যতে॥" (যুক্তি কল্পতরু)

হস্তীজাতিব মধ্যে বিবিধ শ্রেণীব হস্তী আছে তন্মধ্যে জাত্যহস্তী চাবি প্রকাব শ্রেণীভুক্ত। যে সকল বৃত্তান্ত গজপবীক্ষা প্রকবণে বলিব। ৪ শ্রেণীব জাত্য গজেই মুক্তা জন্মিযা থাকে, সুতবাং তদুৎপন্ন মুক্তা ৪ জাতি বা ৪ শ্রেণী। সেই ৪ শ্রেণীব মুক্তাব ৪ প্রকাব আখ্যা দেওযা হইয়া থাকে—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয, বৈশ্য ও শূদ্র।

"ব্রাহ্মণং পীত শুক্লন্তু ক্ষত্রিযং পীতবক্ত-
কম্।
পীত শ্যামন্তু বৈশ্যং স্যাৎ শূদ্রং স্যাৎ
পীতনীলকম্।" (ঐ)

ব্রাহ্মণ জাতীয় মুক্তা পীত শুক্লবর্ণ, ক্ষত্রিয় মুক্তার বর্ণ পীতবক্ত, বৈশ্যজাতীয

মুক্তাব বর্ণ পীতশ্যাম এবং শূদ্রজাতীয় গজমুক্তার বর্ণ পীতনীল। কাম্বোজদেশীয় মাতঙ্গ মুক্তার কিছু বিশেষ আছে। যথা—

"কাম্বোজকুম্ভসম্ভূতং ধাত্রীফলনিভং গুরু।
অতিপিঞ্জরসচ্ছায়ং মৌক্তিকং মন্দদীধিতি।" (যুক্তিকল্পতরু)

কাম্বোজদেশীয় হস্তিকুম্ভে যে মুক্তা জন্মে তাহাব আকাব ঠিক গোল নহে। তাহাব গঠন আমলকী ফলসদৃশ, ওজনে ভারী, পিঙ্গববর্ণ, ছাযা বা কান্তিহীন নহে অর্থাৎ কিঞ্চিৎ পবিমাণে ছাযা আছে এবং অল্পকিবণও আছে।

সর্পমণি বা ফণিমুক্তা।

সকল সর্পেব মস্তকে মণি উৎপন্ন হয় না।

"ভুজঙ্গমা স্তে বিষবেগতৃপ্তাঃ
শ্রীবাসুকের্ব্বংশভবাঃ পৃথিব্যাম।
কচিৎ কদাচিৎ খলু পুণ্যদেশে
তিষ্ঠন্তি তে পশ্যতি তান্ মনুষ্যঃ॥"

যে সকল সর্পেব মস্তকে প্রস্তব হয় তাহারা আপনার বিষবেগে পরিতৃপ্ত থাকে। ইহাবা বাসুকি নাগের বংশে উৎপন্ন। পৃথিবীব কোন কোন পুণ্য স্থানে কখন কখন এইরূপ সর্প মনুষ্যেরা দেখিতে পায়।

লক্ষণ।

"সুস্নিগ্ধং বর্ত্তুলং রম্যং নীলচ্ছায়ং মহাদ্যুতিঃ।
পুণ্যহীনা ন পশ্যন্তি বাসুকেঃ কুলসম্ভবম্॥

ফণিজাত মুক্তা দেখিতে অতি সুন্দর বর্ত্তুল অর্থাৎ গোল। নীলাভ এবং অত্যন্ত দীপ্তিমান্। অপুণ্যবান্ ব্যক্তিরা বাসুকিবংশীয সর্প দেখিতে পায় না সুতরাং ফণিজাতমুক্তা তাহাদেব নিকট দুর্লভ।

দ্বিতীয লক্ষণ। যথা—

"শৃগালকোলামল কেলগুঞ্জা-
ফল প্রমাণস্ত চতুর্বিধাস্তে।
স্যু ব্রহ্ম বাহুদ্ভব বৈশ্য শূদ্র
সর্পেষু জাতাঃ প্রবরাস্তু সর্ব্বে॥"

শৃগালকোল=শ্যাকুল। প্রমাণে শ্যাকুল যত বড়, তত বড হয়। আমলকী প্রমাণও হয়। গুঞ্জা অর্থাৎ কুঁচ পবিমিতও হয। কুলফলেব মতনও হয। এই চাবি প্রকাব মুক্তা চাবি জাতি সর্পে জন্মে। ইহা সকলই প্রশস্ত।

ফলশ্রুতি।

প্রাপ্যাপি রত্নানি ধনং শ্রিয়ং বা।
বাজশ্রিয়ং বা মহতীং দুবাপান্॥
তেজোহন্বিতাঃ পুণ্যকৃতো ভবন্তি
মুক্তা ফলন্যাস্য বিধায়গেন॥"

(কল্পদ্রুমধৃত।)

ধন, রত্ন, মহতী বাজশ্রী প্রাপ্ত হইয়া এই ফণিমুক্তা ফল ধারণ করিলে ধারণকর্ত্তাব পুণ্য কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয় এবং তেজোবৃদ্ধি হয়।

তৃতীয় লক্ষণ।

"ভৌজঙ্গমং নীল বিশুদ্ধ বর্ণং,

সর্ব্বং ভবেৎ প্রোজ্জ্বলবর্ণ শোভম্ ॥"

(কল্পক্রমধৃত)

অথ মীনজমুক্তা।

মৎস্য বিশেষের মুখ প্রদেশে এক প্রকার পাথর জন্মে তাহাকেই শাস্ত্রকারেরা মীনমুক্তা বলিয়া থাকেন। ইহার সবিশেষ বৃত্তান্ত ক্রমে বর্ণন করা যাইতেছে

পাঠীন পৃষ্ঠস্য সমানবর্ণম্ ।
মীনাৎ সুবৃত্তং লঘুনাতিসূক্ষ্মম ॥
উৎপদ্যতে বারিচরাননেষু
মীনাশ্চ তে মধ্যচরাঃ পয়োধেঃ ॥

পাঠীন মৎস্য—রোহিত মৎস্য বাটা মৎস্য। মীন হইতে যে মুক্তা পাওয়া যায় তাহা পাঠীন মৎস্যের পৃষ্ঠের বর্ণের সদৃশ সুগোল লঘু অর্থাৎ ওজনে হাল্কা, ও নিতান্ত সূক্ষ্ম নহে। মীনমুক্তা সকল বারিচর অর্থাৎ মৎস্যাদিগের মুখে জন্মিয়া থাকে এবং এই সকল মৎস্য সমুদ্রের মধ্যপ্রদেশে বাস করে।

লক্ষণ।

গুঞ্জাফল সমস্থৌল্যং।
মৌক্তিকং তিমিজং লঘু ॥
পাটলা পুষ্প সঙ্কাশং।
অল্পকান্তি সুবর্ত্তুলম্। (কল্পক্রমধৃত)

মীনমুক্তার লক্ষণ এইরূপ। তিমিমৎস্যজাত মুক্তাসকল স্থূলতায় গুঞ্জা অর্থাৎ কুঁচের ন্যায়। লঘু অর্থাৎ হাল্কা। পাটলা পুষ্পের ন্যায় কান্তি কিন্তু তাহার দ্যুতি ছায়া অল্প। ইহার বর্ত্তুলতা অতি সুন্দর।

মীন মুক্তার সামান্য লক্ষণ এই বটে কিন্তু মৎস্যদিগের প্রকৃতিভেদ থাকায় তদ্ভুৎপন্ন মুক্তার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রভেদ হইয়া থাকে।

বাতপিত্ত কফদ্বন্দ্ব সন্নিপাত প্রভেদতঃ।
সপ্ত প্রকৃতয়ো মীনা সপ্তধা তেন মৌক্তিকম্। [গরুড় পুরাণ]।

বায়ু, পিত্ত, কফ, এতত্ত্রয়ের দুই দুই ও তিন তিন ক্রমে মৎস্য সকল ৭ প্রকার প্রকৃতি সম্পন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং তদুৎপন্ন মুক্তা ফলও ৭ প্রকারের প্রভেদ যুক্ত হয়, তাহা নির্ণীত হইয়াছে।

"লঘিষ্ট মরুণং বাতাৎ আপীতং মৃদু-
পিত্ততঃ।
শুক্লং গুরু কফো দ্রেকাৎ বাতপিত্তা-
ন্ম দুর্লঘু।
বাতশ্লেষ্ম ভবং স্থূলং পিত্তশ্লেষ্মজ মর্দ্দকম্।
সর্ব্বলিঙ্গ প্রয়োগেন সান্নিপাতিক মুচ্যতে।
একজাঃ শুভদাঃ প্রোক্তা স্তথা বৈ সান্নি-
পাতিকাঃ।"

বাতাধিক্য বশতঃ লঘু ও অরুণাভ। পিত্তপ্রাধান্য মৃদু ও ঈষৎপীতাভ। কফের বাহুল্যে শুক্ল ও শ্বেতাভ। বাতপিত্ত উভয়ের প্রাবল্যে মৃদু অর্থাৎ কোমল ভাবাক্রান্ত এবং লঘু। বাতশ্লেষ্ম উভয়ের প্রাবল্যে স্থূলত্ব গুণযুক্ত। পিত্তশ্লেষ্ম জাত হইলে স্বচ্ছতার আধিক্য। এক একটি ও দুই দুইটী প্রকৃতিতে যে সকল লক্ষণ নির্দ্দেশ করা হইল, যদি সকল

চিহ্ন কিছু কিছু প্রকাশ পায় তাহা হইলে তাহা সান্নিপাতিকজ বলা যায়। এই সকলের মধ্যে সান্নিপাতিকজ এবং একজ মুক্তাই প্রশস্ত ও শুভদায়ক।

[ক্রমশঃ প্রকাশ্য]

শ্রীরামদাস সেন।

উৎকলের প্রকৃতাবস্থা।

প্রাচীন উৎকলবাসীদিগের যাহা সংক্ষেপে পরিচয় প্রদান করা হইল, তদ্দ্বারা প্রাচীন কালের উড়িয়াদিগের ক্ষমতা, অধ্যবসায় ধর্ম্মোৎসাহ ধীসম্পন্নতা প্রভৃতির সমীপে, অনেক সভ্যজাতিরও গর্ব্বিত মস্তক অবনত হইয়া পড়ে, এবং "উড়িয়া" নাম শ্রবণ মাত্রেই যাঁহারা মুখবিকৃত করত ঘৃণাপ্রকাশ করিয়া থাকেন তাঁহাদিগের অনভিজ্ঞতা দোষ বিদূরিত হইয়া প্রাচীন উড়িয়াদিগের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব উদিত হইবার সম্ভাবনা।

গজপতিবংশীয় গঙ্গাপতিবংশীয় রাজাদিগের কাল হইতে উড়িয়া ভাষা পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয়, এবং এই সময়ে উড়িয়া ভাষাতে কাব্যাদি গ্রন্থ রচনা আরম্ভ হইবার সম্ভাবনা। যাহা হউক, রাজা উপেন্দ্র ভঞ্জ আপনার রাজ্যভার মন্ত্রীর হস্তে প্রদান করত উড়িয়া ভাষায় প্রায় ৫২ খানি কাব্য লিখিয়াছিলেন, এবং দীনকৃষ্ণদাস নামক একজন উড়িয়া প্রাচীনকবি অনেক গুলি ভক্তি রসোদ্দীপক কাব্যগ্রন্থও রচনা করেন, তদ্ভিন্ন উড়িয়াভাষাতে মহাভারত, রামায়ণ, জ্যোতিষ, অঙ্ক প্রভৃতি অনুবাদিত হইয়াছিল। কবিতা লিখন সম্বন্ধে শ্রীহর্ষ, ভট্টনারায়ণ, জয়দেব প্রভৃতি সংস্কৃতকাব্য লেখকদিগকে যদ্যপি পরিত্যাগ করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে কাব্যলিখন সম্বন্ধে উড়িয়াগণ বঙ্গবাসী কবিদিগের অপেক্ষা উচ্চাসন প্রাপ্ত হইবার অধিকারী। যাহা হউক এক্ষণে উৎকলবাসিগণের বর্ত্তমান সামাজিক আচার ব্যবহার সংক্ষেপে প্রকাশ করত প্রস্তাব উপসংহার করা যাইতেছে।

বর্ত্তমানকালে উড়িষ্যাপ্রদেশে ব্রাহ্মণ, মাইতি, খণ্ডাইত, এই তিনটি শ্রেষ্ঠজাতি মধ্যে পরিগণিত। উড়িষ্যার ব্রাহ্মণগণের এক্ষণে নিতান্ত শোচনীয় অবস্থা; অধিকাংশ মূর্খ, এবং ভিক্ষাবৃত্তি অথবা কৃষিকার্য্যোপজীবী। ব্রাহ্মণপরিবারে শুট্‌কী মৎস্য, পিঁয়াজ, রসুণ আহার নিন্দনীয় নহে, প্রত্যুত: তাঁহারা ঐ সকল দ্রব্য প্রকাশ্য রূপেই আহার করিয়া থাকেন। সন্ধ্যাহ্নিক তগৈরচ, ফোঁটাছিটার উপরেই নির্ভর,

এবং জগন্নাথের নির্ম্মাল্য সেবনই শ্রেষ্ঠ কার্য্য। স্ত্রীপুরুষে চুরাটের ধুমপান করিয়া থাকেন। উড়িয়া ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যাঁহারা সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের উচ্চারণ বঙ্গদেশীয়দিগের অপেক্ষা বিশুদ্ধ। স্বহস্তে হলকর্ষণ,অথবা মস্তকে দ্রব্যাদি লইয়া ফিরিওয়ালার মত বিক্রয় করা উড়িয়া ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বিলক্ষণ প্রচলিত আছে। পুত্র কন্যার বিবাহ অল্প বয়সে, অথবা বেশী বয়সে উভয়বিধ রূপেই প্রচলিত প্রত্যক্ষ হয়। স্ত্রীলোকদিগের গাত্রে উল্কীর ছয়লাপী, এবং কাছা দিয়া বস্ত্র পরিধান, ললাটদেশে বাংতা প্রভৃতির অলকাতিলকা কাটা, তৈলহরিদ্রা মাখিয়া সুন্দরী সাজার খুব ধুম দেখা যায়। স্ত্রীশিক্ষাও অল্পাংশে প্রচলিত হইয়াছে। বহুবিবাহ প্রচলিত আছে, কিন্তু বঙ্গদেশীয়দিগের অপেক্ষায় কম। উড়িয়া বিধবার মধ্যে নির্জ্জলা একাদশীর প্রথা প্রায়ই নাই।

মাহিতি, জাতিটি বঙ্গদেশীয় কায়স্থ দিগের ন্যায় বুদ্ধিমান্, চতুর, এবং বিদ্যাব্যবসায়ী। মাহিতিদিগের মধ্যে স্ত্রী শিক্ষা প্রচলিত আছে, কন্যা বয়স্থা হইলে বিবাহ প্রদান করা নিয়মও আছে, অল্পবয়সেও বিবাহ সম্পন্ন হয়। মাহিতি দিগের বাটীতে জামাতাকে আনয়ন করা কঠিন ব্যাপার। জামাতাকে বাটীতে আনিলে জামাতা যে কয়েকদিন বাটীতে থাকিবেন, প্রতিদিন তাঁহাকে যে বাসনে আহার করিতে দিতে হইবে, শয়ন করিতে যে শয্যাদি প্রদান করিতে হইবে হাত মুখ প্রক্ষালন জন্য যে ঘটি গাড়ু প্রদান করিতে হইবে সকলই জামাতার নিজ সম্পত্তি হইবে। প্রত্যেকবারেই প্রত্যেকদিনেই নূতন দ্রব্যাদি দিতে হইবেই; এই ভয়ঙ্কর কুপ্রথা প্রচলিত থাকা জন্য, মাহিতিজাতির বাটীতে জামাতাকে আনা কঠিন হইয়া পড়ে। এমন কি এখন যে সকল উড়িয়া মাহিতিদিগের পুত্রগণ ইংরেজি শিক্ষা করিতেছেন, তাঁহারাও ঐরূপ প্রথার অন্যথাচরণ করিতে পারেন না। মাহিতিদিগের মধ্যে একটি পিশাচীয় কাণ্ড প্রচলিত আছে। দাসীতে সন্তান উৎপাদন করা, এবং সেই দাসীপুত্রগণকে ‘সাগরপেধ” উপাধি দিয়া ভৃত্যস্বরূপ বাটীতে রাখা হইয়া থাকে,মাহিতিদিগের কন্যাগণ পাঠশালায় লিখিতে যায়, তাহারা বয়স্থা হইলে তালপত্রে লৌহ লেখনীদ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক এবং পঞ্জিকা লিখিয়া থাকে, ঐ সকল পুস্তকের উপরে লৌহলেখনীর দ্বারা সুন্দর সুন্দর ছবি অঙ্কিত করে, এবং সেই সকল পুস্তিকা বাজারে বিক্রয় হয়। মাহিতিদিগের কন্যাগণ একপ্রকার লতার দ্বারা খেমী, চুবড়ী প্রভৃতি প্রস্তুত করে, তাহা অতি পরিপাটি এবং দেখিতে বড়ই সুন্দর। মাহিতিদিগের গৃহলক্ষ্মীগণ গাত্রে উল্কী দাগাইয়া থাকেন। এমেরিকান সেলারদিগের গাত্র যদ্রূপ উল্কীতে ছয়লাপী, মাহিতিদিগের অঙ্গনা-

গণ তদ্রূপ উল্কীতে অঙ্গ শোভিত করিয়া থাকেন, মোটা বস্ত্র পরিধান প্রথাটী আছে, এবং কাছা প্রদানও করেন, কিন্তু সেই সকল বস্ত্রের বহর নিতান্ত অল্প, তজ্জন্য স্ত্রীজাতির সম্ভ্রমরক্ষা হওয়া কঠিন হয়। চুরাটের ধূমপান ঐ সকল কুলকুমারীদিগের মধ্যে খুব প্রচলিত। কাংস্য, পিত্তল রূপা প্রভৃতির যে সকল অলঙ্কার ধারণ করেন, তদ্দৃষ্টে উড়িয়া অঙ্গনাদিগকে একরূপ লোহাঙ্গী বলাও অত্যুক্তি হয় না, যদ্যপি গাঢ় নিদ্রাবশে দৈবাৎ সেই অলঙ্কারসজ্জিত হস্ত দুর্ব্বলশরীর স্বামীর কপোলদেশে পতিত হয় অথবা মানভরে যদি ঠোনাটা আসটা কপোলে পড়ে তাহা হইলে, তৎক্ষণাৎ চিকিৎসকের প্রয়োজন হইয়া থাকে। স্ত্রীজাতির মধ্যে তাম্বূল ব্যবহারও বিলক্ষণ প্রচলিত। ব্রতনেমও খুব প্রচলিত। অধিকাংশ ব্রতে পিষ্টকভক্ষণ হইয়া থাকে; সুখের মধ্যে বিহারদেশীয় স্ত্রীজাতির ন্যায় উড়িয়া স্ত্রীজাতি নোংরা নহে। হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকের প্রস্তুত রুটিকাদি ভক্ষণকালে অস্পৃশ্য পদার্থের ময়ান পতিত হওয়ার যে প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হইয়া থাকে উড়িয়া স্ত্রীলোকের হস্তের প্রস্তুত দ্রব্যাদি ভক্ষণকালে তদ্রূপ সন্দেহ অথবা ঘৃণার উৎপত্তি হইবার সম্ভাবনা নাই কিন্তু উড়িয়া স্ত্রীলোকের প্রস্তুত দ্রব্যাদি অতি জঘন্য এবং অভক্ষ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। জগন্নাথের এবং কেন্দ্রাপাড়া নামক স্থানে বলভদ্র ঠাকুরের জন্য যে খেচড়ান্ন প্রস্তুত হয়, তাহা অতি উপাদেয়, তথায় কয়েক প্রকার সুখাদ্য মিষ্টান্নও প্রস্তুত হইয়া থাকে।

খণ্ডাইত জাতির আচার ব্যবহার মাহিতি জাতিদিগের সদৃশই; কিন্তু এই জাতি অধিকাংশই কৃষিকার্য্যোপজীবী, এই জাতির মধ্যে "ঘেঁইতো" প্রচলিত আছে। বিধবা ভ্রাতৃজায়াকে বিবাহের নাম "ঘেঁইতো।" ঘেঁইতোর মন্ত্র কেবল মাত্র ছুটী, অশ্বত্থ পত্র বরকন্যার হস্তে প্রদান করত "অশতপাত্তা ঘর ঘরব্ এ গোত্র থেকে ও গোত্রে পশ" এই মন্ত্র পাঠের পরেই ভ্রাতৃজায়ার বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া যায়। এই জাতি বিবাহের কালে উপবীত ধারণ করে, কিন্তু মাহিতিদিগের কন্যা বিবাহ করত, এই জাতি "মাহিতি" জাতিমধ্যে পরিগণিত হইতে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া থাকে। খণ্ডাইত ধনসম্পন্ন হইলেই মাহিতি হইবার চেষ্টা করে, এবং কেহ কেহ মাহিতিজাতি মধ্যে পরিগণিত হইয়া পড়ে। খণ্ডাইত জাতির স্ত্রীলোকদিগের আচার ব্যবহার রীতিনীতি এবং বেশবিন্যাসাদির পারিপাট্য মাহিতিদিগের স্ত্রীজাতিরই সদৃশ; কেবল ঘেঁইতো হইলে তাহার চিহ্নস্বরূপ একপদে বেঁকমল ধারণ করা প্রচলিত আছে।

এই সকল জাতিদিগের মধ্যে দুর্গোৎসব শ্যামাপূজা প্রভৃতির চলন প্রায়ই

দেখা যায় না, কেবল গণেশপূজার পদ্ধতি দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্গদেশে যেমন লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক একচেটে, উড়িষ্যায় তদ্রূপ গণেশ একচেটে হইয়াছেন!! বোধ হয় উড়িয়ারা মান্দ্রাজ প্রভৃতি দাক্ষিণাত্য হইতেই গণেশপূজার প্রথা প্রাপ্ত হইয়াছেন। উড়িয়ার ভদ্র জাতিরা, মদবিকাকে বড়ই ঘৃণা করেন, এমন কি খর্জ্জুররস পান করাও জাতিভ্রংশের কারণ বলিয়া রস ব্যবহার পর্য্যন্ত করা হয় না। উৎকলপ্রদেশে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ই অধিক, তান্ত্রিক এবং শৈব অতি অল্পই আছেন, তবে এখন সকল মিশ্রিত হইয়া ধর্ম্মের খিচুড়ি হইয়া পড়িয়াছে।

উড়িষ্যার মধ্যে কটক নগরীতে "সোণার" অর্থাৎ স্বর্ণকারদিগের আচার ব্যবহার যদিচ মাহিতি প্রভৃতি জাতিদিগের সদৃশ হইয়াছে, কিন্তু তাহারা প্রকৃত উড়িয়া নহে। (৮) এই সকল স্বর্ণকার রূপা এবং স্বর্ণের সূক্ষ্ম তারের আতরদান, গোলাপপাশ, ফুল, প্রজাপতি, ব্রেসলেট্ এবং নানা প্রকার বিলাতি ফেসনের দ্রব্যাদি প্রস্তুত করে, পৃথিবীর কোন স্থানে তাদৃশ তারকোষির দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয় না। এই স্বর্ণকার জাতির মধ্যে কয়েকজন পেরিস প্রভৃতি স্থানের একজিবেসন মেডল প্রাপ্ত হইয়াছিল; ইউরোপের নানা স্থান হইতে কটকের সোণার দিগের নিকট দ্রব্যাদির ফর্মাস্ আসিয়া থাকে। কেবল তার কোষির কার্য্যেই যে ইহারা অদ্বিতীয় এমত নহে, ঘড়ির চাবি, চেন, অঙ্গুরী প্রভৃতি যাহা প্রস্তুত করে তাহা হেমিলটনের অপেক্ষা ভাল না হউক, মন্দ নহে।

উড়িয়া "গৌড়" অর্থাৎ গোয়ালা; বোধ হয় বঙ্গদেশ হইতে উৎকলে বাস করিয়াছিল তজ্জন্য "গৌড়" উপাধি বিদ্যমান রহিয়াছে। এই জাতি দুগ্ধ দধি প্রভৃতির ব্যবসায় করে, এবং পাল্কী বহন করিয়া থাকে, এই জাতির স্ত্রীলোকগণ, বড়ই অপরিষ্কার বস্ত্র ব্যবহার করে তাহার উপরে সোণায় সোহাগা বিশেষ, ঘৃত দুগ্ধ প্রভৃতি পতিত হইয়া দুর্গন্ধ বৃদ্ধি করে।

বাড়ই, অর্থাৎ ছুতার জাতির মধ্যে, কটক প্রভৃতি সহরে যাহারা বাস করে তাহারা টেবিল কেদারা, আলমারী, খাট প্রভৃতি অতি সুন্দররূপে প্রস্তুত করে।

এক্ষণে উড়িয়াদিগের প্রধান কয়েকটি জাতির রীতি নীতি যাহা বলা হইল, তদতিরিক্ত অনেকগুলি ইতরজাতি

(৮) কটকের প্রসিদ্ধ জগন্নাথ স্বর্ণকারের প্রমুখাৎ শুনিয়াছি, যে তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ বঙ্গদেশ হইতে গিয়া উড়িষ্যাতে বসবাস করিতেছিল; তাহারা বাঙ্গালি এবং বহুকাল হইতে উড়িষ্যাতে বসবাস করাপ্রযুক্ত এক্ষণে উড়িয়া চাল চলন হইয়া গিয়াছে। জগন্নাথের পিতা, শুঁড়িদাস স্বর্ণকার, বয়স প্রায় ৭৫ বর্ষ হইবে, বলিয়াছিল যে তাহার পূর্ব্বপুরুষগণ বাঙ্গালী, বঙ্গদেশ হইতেই তাহারা উৎকল দেশে বাস করিতেছে।

উড়িষ্যাতে বাস করে; তাহাদের আচার ব্যবহার বঙ্গদেশীয় নীচ জাতিদিগের সদৃশ। গড়জাৎ মহলের অন্তর্গত ঢাকানাল নামক স্থানে এক সম্প্রদায় অসভ্যজাতি বাস করে, তাহাদিগের স্ত্রীজাতি "বাএ খাই" নামে প্রসিদ্ধ। ঐ সকল স্ত্রীজাতি বস্ত্র পরিধান করিত না। প্রত্যহ কটিদেশে কোন রূপ একটা ডোর বন্ধন, অথবা অন্য কোনরূপ বন্ধনী দিয়া কাঁচা পত্র ঝুলাইয়া লজ্জা রক্ষা করিত, কটিদেশ ভিন্ন সর্ব্বাঙ্গ আবরণশূন্য থাকিত। অল্পকাল অতীত হইল, ঢাকানালের মহারাজা ভাগীরথী মহেন্দ্রদেব বাহাদুরের প্রযত্নে ঐ সকল অসভ্য-স্ত্রীজাতি বস্ত্র পরিধানে বাধ্য হইয়াছে, এবং সেই পর্য্যন্ত ঐ জাতি এক্ষণে আর পত্র পরিধান করে না। গড়জাৎ মহলে যে সকল জাতি বাস করে, তাহার অধিকাংশই কতকাংশে সভ্য, কিন্তু "বেধি" প্রভৃতি গড়জাৎ মহলে "কন্দ" প্রভৃতি যে সকল জাতি বাস করে, তাহারা একেবারে অসভ্য, কিন্তু কৃষিকার্য্যোপজীবি এবং সাহসিক।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের অন্তর্গত যতটুকু উৎকল ভূমি আছে, সেনসেস্ রিপোর্টে দেখা যায়, তন্মধ্যে প্রায় একলক্ষ চল্লিশ হাজার অপেক্ষাও অধিক অধিবাসী বাঙ্গালি; তৎপরে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত মধ্য ভারতবর্ষের অন্তর্গত উৎকল দেশে যে সকল বাঙ্গালি আছেন, তাহাদিগকে ধরিলে প্রায় দেড়লক্ষ অনুমান করা অসঙ্গত বোধ হয় না। বহুকাল হইতে যে সকল বাঙ্গালি উড়িষ্যাতে বাস করিতেছেন, তাঁহারা কেরা বাঙ্গালি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। এই সকল কেরা বাঙ্গালি ট্যাসফিরাঙ্গীদিগের সদৃশ শঙ্করজাতি মধ্যে পরিগণিত। ইহারা কেবল "কেরা ক্যারা" রূপে বিকৃত ভাষাতে কথা বার্ত্তা কহিয়া থাকেন বলিয়া "কেরা বাঙ্গালি" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, নচেৎ কেরা বাঙ্গালিদিগের বুদ্ধি এবং আচার ব্যবহার সর্ব্বাংশেই বঙ্গদেশীয় বাঙ্গালিদিগের সদৃশ বলা যাইতে পারে। উড়িষ্যা ব্রাহ্মণ, মাইতি, খণ্ডাইত, গৌড় প্রভৃতিও কেরা বাঙ্গালি; ব্রাহ্মণদিগের অন্নাহার করে না এই জন্য কেরা বাঙ্গালিগণ বহুকাল হইতে উৎকলে বাস করত উৎকলীয়দিগের সহিত জাতীয় ভাবে সম্মিলিত হইতে পারেন নাই, কিন্তু এই উভয় সম্প্রদায়ে বিশেষ বিদ্বেষ ভাব প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্তু ইদানী স্থানীয় রাজপুরুষদিগের ব্যবহার দোষে অল্পকাল মধ্যে সেই সৌহার্দ্দ্য ভঙ্গ হইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। উৎকলের রাজপুরুষগণ খাস উড়িয়া এবং কেরা বাঙ্গালি পৃথক্ করিয়া কর্ম্মকার্য্য প্রদান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন; জাতীয় স্বার্থের যবনিকা যখন উভয় দলের মধ্যস্থানে পতিত হইয়াছে, তখন আর কত দিনই বা নিঃস্বার্থভাবে বন্ধুত্ব থাকিতে পারিবে?

উড়িষ্যায় দেশীয় খ্রীষ্টান্ অনেক

আছেন; দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে যে সকল অনাথ বালক অনাথা বালিকা খ্রীষ্টান্ যাজকদিগের তত্ত্বাবধারণে ছিল, তাহাদের মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীজাতির সংখ্যা অতিরিক্ত হইয়াছে, তাহাদের বিবাহ হওয়া ভার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উড়িয়া খ্রীষ্টান্দিগের একটু ধর্ম্ম সংস্কারের কথা এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক বোধ করিতেছি। উড়িয়া খ্রীষ্টান্ রমণী নিজ সন্তান সহিত পথে গমনকালে মুসলমান দেখিয়া হয় ত সন্তানকে বলিতেছেন, "ওটা পাঠান টোকা দেখিস যেন ছুঁসনে" দুর্ভিক্ষের আমদানিতে খ্রীষ্টানই অধিকাংশ।

উড়িষ্যাতে মুসলমান বিস্তর আছে। কটক সহরে বিস্তর গোহত্যা হইয়া থাকে, এই কারণেই উড়িষ্যা হইতে বিস্তর গোচর্ম্ম কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে রপ্তানি হইয়া থাকে। মুসলমানেরাও শ্যামাপূজা প্রভৃতি হিন্দুধর্ম্মানুষ্ঠানে যোগ দিয়া থাকেন, এবং কটকের হিন্দুদিগের মধ্যে অনেকেই গোঁয়ারাতে যোগ দেন এটি সুলক্ষণ।

এইস্থানে একটী পরিহাসের কথা মনে হইল। যৎকালে লার্ডমেয়োর কটকে যাইয়া দরবার করিবার অবধারিত হয়, তৎকালে উৎকলের সকল রাজাকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। গড়জাৎ মহলের রাজাগণ কটকে উপস্থিত হন; তন্মধ্যে একজন জঙ্গুলি রাজা সৈন্য সামন্ত সঙ্গে কটক সহর দর্শন করিতে বাহির হইয়াছেন। দেখিলাম তাঁহার পাল্কীর অগ্রে অগ্রে প্রায় ৪০।৫০ জন লোক, কাহার হস্তে বামদা, কাহারও হস্তে তলবার, কাহার হস্তে বল্লম, ইত্যাদি অস্ত্র। প্রায় সকলের কটিবন্ধন কিন্তু পশ্চাতে একটী একটী কৃত্রিম লাঙ্গুল দোলযমান হইতেছে। মস্তকে উষ্ণীষ, তদুপরি পাট অথবা শোন প্রভৃতির গোচ্ছা চামরের সদৃশ ফর ফর করিয়া উড়িতেছে। অনেকের মুখমণ্ডল গৈরিকাদির দ্বারা রঞ্জিত। ঢোল, সানাই, চড়চড়ি প্রভৃতি বাদ্য হইতেছে, আর ঐ সকল বীরপুরুষগণ নৃত্য করিতে করিতে, ঢালিপাক খেলাইতে খেলাইতে, রাজার অগ্রে অগ্রে চলিতেছে। এই ব্যাপারটি দেখিয়া রামায়ণ প্রভৃতির হনুমানের কথা অত্যুক্তি বলিয়া আর মনে হইল না।

প্রাচীন উৎকলবাসিগণ প্রাচীন বঙ্গদেশের নিকট হইতে বর্ণমালা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এবং জাহাজ নির্ম্মাণ শিক্ষা করিয়াছিলেন।

উপসংহার কালে ইহাও বলা আবশ্যক, যে উৎকলবাসীদিগের বিষয় যাহা বলা হইল, তাহা কোন ইতিহাসের অনুবাদ নহে। উড়িষ্যার ইতিহাসলেখকগণ অনবধানতা বশতঃ উড়িষ্যার বিষয় যাহা ভুলিয়া গিয়াছেন, অথবা অনুসন্ধান করিতে বিরত হইয়াছেন, সেই সকল বিষয় বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা লিখিত হইল।

শ্রীদীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

গঙ্গাধর শর্ম্মা

ওরফে

জটাধারীর রোজনামচা।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

কাছারি গরম।

ডিপুটি সাহেবের চসমা মেরামত হইয়া আসিয়াছে, মফঃসলে চসমা হারাইলে যে নয়নতারা হারা হইতে হয়, তাহা মৌলবি সাহেবের বিলক্ষণ ধারণা হইয়াছে, সেই জন্য একের বদলে দুই সেট চসমা আনাইয়াছেন, যখন একটি যোড়া আঁখিদ্বয়োপরি শোভমান হয়, তখন আর একটি যোড়া জেবে চলে। বিচারের দোষ চসমার উপর দিয়া যাইত, সাধারণে কহিত চসমার মধ্য দিয়া প্রকৃতির বিকৃতিই দৃশ্যমান হইয়া থাকে এ জন্যই বিচার ভুল হয়। চসমার অভাবে কাছারীর কার্য্য বন্ধ ছিল, যাহা হইয়াছে, তাহা কাণার হাতে প্রতিমা নির্ম্মাণ স্বরূপ হইয়াছে। তাহাতে ক্ষতি নাই, উর্দ্ধতর কার্য্যক্ষেত্রে মৌলবি সাহেবের বিশেষ খোসনাম আছে ও তিনি সুদক্ষ কর্ম্মচারী বলিয়া বিখ্যাত। যাহা হউক আজ একবার চসমার প্রসাদে বিচারস্রোত উচ্ছসিত হইবে।

একজন চৌকিদার এই মাত্র দৌড়িয়া আসিয়া কহিল, "হাকিমের ঘোড়ার পিটে জিণ চড়িয়াছে।" সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র শান্তিপুরে হুলস্থূল পড়িল। তাম্বুর কানাদ কয়েক দিন হইতে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, ঝড়ে বাদলে রজ্জুগুলি শিথিল হইয়াছিল, হাকিমের শুভাগমন সংবাদে খুটাগ্রে মুদ্গার প্রহারআরম্ভ হইল। দড়াস্ দড়াস্ শব্দ আরম্ভ হইল। শব্দে কত কত লোকের হৃৎকম্প হইতে লাগিল। ভীরু জনগণের বক্ষে যেন সেই মুদ্গার প্রহার হইতে লাগিল। কেহ কেহ কহিতেছেন, "আইন—আইনের সৌরবদৃষ্টি করিব, আইনের প্রভাবে উচ্চ নীচ সমতলসাবলাভ করিবে," কেহ কহিতেছেন, "ভদ্রসমাজে সম্ভ্রমসোপান ভগ্ন হইবে," শিবসহায় মনে করিতেছেন, আজ সূর্য্যাস্ত হইবার পূর্ব্বে তাঁহার কুলমান বুঝি অস্তমিত হইবে। শিবসহায় স্তব্ধভাবে ভাবিতেছেন, এই সময় দন্তহীন ওষ্ঠোচ্চারিত "নচ দৈবাৎ পর বলংম্" একটী বচন শুনা গেল, এবং পরক্ষণেই প্রাতঃসলিলে-ধৌতশিক্কাহিল্লোলিত তর্কালঙ্কার মহাশয় শিবসহায়ের সম্মুখে দর্শন দিলেন।

তর্কা। ব্যাপার কি? যাহাদের শুভাকাঙ্ক্ষী তাহাদের বিপদ শুনিলেই একান্ত কাতর হইতে হয়। আমার যা শক্তি

তাহা করি, শুনে কি নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পাবি? ভোরে গাত্রোত্থান কবে প্রথমে তোমাব নিকট ত্রস্ত আসিলাম।

শিবসহায় দণ্ডবৎ হইলেন, ও কেবল মাত্র কহিলেন, "উপায়?" তর্কালঙ্কাব কহিলেন, "মধুসূদন নামোচ্চারণ—চণ্ডী-পাঠ আজই আবম্ভ কবা যাক্।" শিবসহায় কহিলেন, "যা ইচ্ছা।"

ত। এখানে হবাব নয়—যবন প্রভৃতি অনেক অস্পৃষ্ঠ লোকের আজ এই গ্রামে আগমন হইবে। মনে কবেছি সেই প্রান্তবে শান্তিনাথের মণ্ডপে যাইয়া শান্তি মন্ত্র পাঠ কবিব।

শিবসহায় মস্তক হেলাইয়া সম্মতি দিলেন। তর্কালঙ্কার ভাণ্ডাবিকে সঙ্গী কবিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন।

এ দিকে শিবসহায়েব বাটীব কিয়দ্দূর পূর্ব্বে ক্ষুদ্র নদীব তটে একটি আম্রকাননে আজ নগব বসিয়া গিয়াছে। দূব হইতে বৃক্ষেব কাল কাল সাবি সাবি সমদূরবর্ত্তী স্কন্ধগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লৌহস্তম্ভ স্বরূপ দেখাইতেছে, আম্র শাখাগুলি পবস্পব সংমিলিত, সকল বৃক্ষই যেন এক ছাঁচে প্রস্তুত, এক তুলিতেই অঙ্কিত। উদ্যানেব প্রান্তরে বৃক্ষশাখা নির্ব্বিরোধে বর্দ্ধমান হইয়া তলস্থ শস্যক্ষেত্রে সংলগ্ন হইয়াছে। একভাগে দেশবিভাগেব কর্ম্মচারীব পটগৃহের শুভ্র ছাওনি দৃশ্যমান। একটি যেন প্রকৃতির ছবির সঙ্গে মানবনির্ম্মিত ছবি মিলিয়া গিয়াছে। যেন কোন মন্ত্রবলে গৃহটি মুহূর্ত্তমধ্যে উত্থিত হইয়াছে। এমন গৃহ দেখিতে পল্লীস্থ কোন্ বালকেব বা বালকের পিতাব কৌতুক না জন্মে? সাহেবের "কাপড়েব ঘর" দেখিতে অনেকেই দৌড়িয়াছে, যেখানে পথ কম পবিসর সেখানে কোন দাম্বাল বালক কোন বুড়িকে হুমড়ি করিয়া ফেলিয়া দৌড়িতেছে, বুড়িবা বালকের পিতৃপুরুষ উদ্ধাব কবিতেছে, ও ছাওনি দর্শনেব হাতে হাতে ফলদান কবিতেছে। ক্রমে গ্রামেব লোক বাগানের নিকটবর্ত্তী হইয়া চতুষ্পার্শ্বে পর্য্যবেক্ষণ কবিতেছে, কোন বৃক্ষতলে মোক্তাবেব দল বসিয়াছে, তাহাদেব পাগড়ি দেখিয়াই কত কত ছেলে হাসিয়া গড়াগড়ি দিতেছে। কাবও পাগড়িতে একথান, কাবও অর্দ্ধখান লাগিয়াছে, কাবও দুই তিন হস্ত প্রমাণ কাপড়ে যথেষ্ট হইয়াছে, কাবও লাট্টু-দার, কারও হাতে বান্ধা, কারো মুরেচ্চা পাগড়ি মস্তকে শোভমান বা অশোভমান রহিয়াছে, কাহাবও পাগড়িব পশ্চাৎভাগে বজতনিন্দিত শিক্কাব শেষাগ্র চামরীর লাঙ্গুলাগ্র সম বিক্ষিপ্ত। প্রায় অনেকের পাগড়ি দুই একটী ছারপোকার ও ক্ষুদ্র কীটের বিচরণভূমি। তাহাদিগকে বেদখল করিতে কেহই সাহসি নহেন, কাবণ সকলেই মনে মনে জানেন, ঐ স্থান বিচাবালয়। সকলেই ন্যায় নিয়মের অধীন, ফলনা আইনেব ফলনা ধারার ফলনা প্রকরণে "সি" চিহ্নিত তফসিলানুসাবে কীট দলের দখলের সত্ব জন্মিয়াছে।

পাগড়ির নিম্নভাগে ভ্রূযুগল মধ্যে কোন মোক্তারের গোল রক্তচন্দনের ফোঁটা, কাহার যজ্ঞবিভূতির রেখা উর্দ্ধগামী হইয়া শিরোভূষণে ঠেকিয়াছে। এই ফোঁটা সুনীত—সুধর্ম্মের লক্ষণ মাত্র, অহোরাত্র দুশ্চিন্তা, জাল, ফেরেপ, দলিল কাটকুট, নূতন কথার সৃজনকৌশল, প্রকৃত ঘটনার বিকৃতি ঘটাইবার ঘটকালির সকল পাপ, সকল দোষ ঐ পূজার বলে,ঐ ফোঁটার মোহিনী গুণে—ধার্ম্মিকতার সুপরিচয়ে পরিপাক হইয়া যায়, এইরূপ অনেকেরই বিশ্বাস। মোক্তার মহাশয়দের মধ্যে দুই একটি মুসলমান, সুসজ্জিত,ইহাদের কেহ এত বৃদ্ধ যে পুরাণ দ্রব্যের পরিচয়স্থলে, পরিদর্শনগৃহে স্থাপিত হইবার যোগ্য। ইহার মধ্যে সয়েদ ফকিরদ্দিন মিয়াই সর্ব্বপ্রধান, তাহার কত বয়স ঠিক কেহ কহিতে পারিত না। যাহার পিতামহের কাছে তিনি চল্লিশ বৎসর বয়স্ক বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, তাহার পৌত্রকে কহেন যে তিনি পঞ্চাশ বৎসর মাত্র অতিক্রম করিয়াছেন। তাঁহার পাগড়িটি সকলের অপেক্ষায় স্থূল, শ্মশ্রুদেশের শুভ্র কেশগুলি বয়োধর্ম্মে প্রায় দশআনা উঠিয়া গিয়াছে। প্রায় দন্তহীন, তথাপি বাক্যপটু, অনর্গল কথা কহিতেছেন, কখন বাঙ্গালা, কখন হিন্দি কহিতেছেন, শত কথা কহিতে প্রায় পঞ্চবিংশতি বার "ফরূকে ফরূকে" কহিয়া থাকেন। তাঁহার গোঁফের মধ্যভাগ কেশহীন। একে দন্তহীন গোঁফ, তাহাতে দুই পাশে লম্বমান শুভ্র কেশ, মধ্যদেশ একবারেই খুব চাঁচা। বুড় মিয়া এই বয়সে সাত বার মাত্র বেগম পরিগ্রহ করিয়াছেন, কনিষ্ঠা চাচি অল্পবয়স্কা, এইরূপ গোঁপের পরিপাকে বুড মিয়া চাচিরও মন রাখিয়াছেন, খোদাকেও সন্তুষ্ট করিয়াছেন। ফলে তাঁহার ধর্ম্মপ্রবৃত্তি অতি বলবৎ, আজ ১৪ বৎসর হইতে তাঁহাকে এইরূপ বক্তৃতা করিতে শুনা যায়। "আর এ জেন্দগানি মিছা! আমার বড় পো যে সাহেবের পানা পাকড়াইয়াছে,তাহাতে আর বালবাচ্ছার তকলিফ থাকিবে না। আগামী পুয় মাহানায় মক্কা কুচ করিবই করিব, দরগায় দরগায় ফযতা দিতে দিতে হজে পৌছির, খোদা এক বটি এক বদনা পানি দেয় বেহস্তর,না দেয় বেহেস্তর।" যাহা হউক কার্য্যের অনুরোধে বা অর্থের লালসায় ফকিরদ্দি সাহেব সুকামনা ১৪ বৎসর পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই—কখন কখন সন্দেহ করেন,তাঁহার কামনা বহুকালব্যাপী, তাহাতে হয় ত তামাদির প্রতিবন্ধকতা ঘটিয়াছে, এজন্য এখনও মোক্তারি ত্যাগ করেন নাই। তিনি ঐ বাগিচার মধ্যেই ডেরা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, একটী স্থূল বৃক্ষতলে বিচালির বিছানার উপর সতরঞ্চি পাতিয়াছেন, সম্মুখে পিতলের গুড়গুড়ি, দুই একটি মহুরর মুসবিদা করিতেছেন, তিনি "চড়ের"জায়গায়"নাথি""পথে মারপিট"

পরিবর্ত্তে "গৃহপ্রবেশ করিয়া মারপিট," "লাটির" স্থানে সাংঘাতিক অস্ত্র তরবাল বা সড়কি লিখিতে অনুমতি করিতেছেন। "অহে। তোমরা ছেলে মানুষ, মামলা কিসে সাজে, কিসে থাফফনাত সঙ্গীন হয়, তার সবক আবতক্ পাইয়াছ কি?" ক্রমে মোক্তার সাহেবের স্থানে ভিড় বাড়িল, পঞ্চ হস্ত মাত্র তাঁহার বিছানার বিস্তার কিন্তু তাহাই আশ্রয় করিয়া সাত হাত পর্য্যন্ত লোক বসিয়াছে—নূতন লোক আসিলেই স্থান হইতেছে, সকলে সরে সরে বসিতেছে লোকসংখ্যা সহিত যেন বিছানা বাড়িয়া যাইতেছে। প্রকৃতার্থ অৰ্দ্ধেক লোকথালি ভূমিতলে উপবিষ্ট। তাঁহার নিকট অনেক লোক আগত, কারণ তিনিই রঘুবীরের আমমোক্তার।

আর এক দিকে রামাদিন সুকুলের বৈঠক, ইনিও একটী প্রসিদ্ধ প্রবীণ মোক্তার, মাথা হইতে পাগড়ি নামাইয়া গাছের শাখায় রাখিয়াছেন, মাথাটী বৃহৎ, মাথা হেলাইতেছেন,তামাক টানিতেছেন, ও সাক্ষী গুলিকে কহিতেছেন, "ভয় করিও না, হাকিমের ধমকে ভুল না, এই এজাহার প্রণালী আমার কথা গুলি মনে রেখ, ও যা বলে দিয়েছি বলো, তাহলেই শিবসহায়ের জয়।"

আম্রকাননের আর এক অংশে হায়দার বক্স চাপরাশী এজ্‌লাশ সাজাইয়াছেন। একটী পুরাণ কেম্পটেবেল তাহার একটি ভগ্নপদ রজ্জু দিয়া বাঁধা। টেবেলের উপর কতক গুলি পুস্তক কলমদান দোয়াত ও ফারসি লিখিবার একটী ওয়াস্তির কলম সংস্থাপিত হইয়াছে। একটী হস্তহীন ভগ্নপ্রায় ছারপোকার আবাসস্থান স্বরূপ কেদারা টেবিলের সম্মুখে রক্ষিত হইয়াছে, সকলে বিচারকের আগমন অপেক্ষা করিতেছেন, এমন সময় ক্ষুদ্র খালের পার হইতে একটি হাঁক শুনা গেল, অনেক গুলি চৌকিদার সেই দিকে দৌড়িল, আমি ঘাটের পার্শ্বে এক উপকূলে দাঁড়াইলাম, অপর কূলে দেখিলাম অশ্বারোহী হাকিম সাহেব আসিতেছেন। দুই জন পদাতিক অশ্বের দুই লাশথলিন বজ্জু ধরিয়াছে, অশ্বটী তেজীয়ান্ তাহাতে জলপার হইতে হইবে। মৌলবি সাহেব থালের অপর কূল দেখিতেছেন, তবু তাঁহার ভাবনা অকূল, মনে মনে ভাবিতেছেন, "বালি না কাদা" ইচ্ছা, জলের দিকে দেখেও দেখিব না, তজ্জন্য চসমা খুলিলেন, পকেটে পুরিলেন; দুই জন চৌকিদার লাগাম ধরিল, দুই জন সাহেবের দুই পদ জিনের উপর চাপিয়া রাখিল, মৌলবি সাহেব নিস্তব্ধ। অশ্ব জলে নামিল। একজন অগ্রে চলিতেছে আড়কাটির (পাইলট) বোল বলিতেছে "অল্প জল" "বালিসার।" সাহেবের, সাহস বৃদ্ধি হইতেছে, তথন অশ্ব চাকিভোর জলে নামিয়াছে লাঙ্গুলে জলস্পর্শ হওয়ায় একবার বামে একবার দক্ষিণে বিক্ষেপ করিল, সঙ্গে সঙ্গে হ্রেষারব করিল, অশ্বারোহী মৌলবি সাহেবের মনে হইল বিনা মেঘে বজ্রাঘাত। আর ভাবি-

বার সময় কৈ? তীরের মত অশ্ব অপর কূলে আসিয়া উপস্থিত। মৌলবি সাহেব "আল্লা হো লাহু লেল্লা" উচ্চারণ করিয়া সুজ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন, ও গর্জ্জন করিয়া "আমাকে কেন ধরেছিস্" কহিয়া চৌকিদারগণকে তিরস্কার করিলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

বিচার ধর্ম্ম।

যাঁহারা বিচারপতি, তাঁহারা ধর্ম্মাবতার আখ্যায়িত, তাঁহারা ন্যায়সাধন করিয়া থাকেন, কিম্বা "ন্যায়সাধন করাই তাঁহাদের কার্য্য বলিয়া" এত গৌরব। সেই গৌরব রক্ষা করিতে তাঁহারা সতত তৎপর, বিচারক কিয়দ্দূর নিয়মের বাধ্য, প্রমাণের বাধ্য, আবার প্রমাণ প্রয়োগ অসম্পূর্ণ ও স্বার্থসম্ভূত মিথ্যা বর্ণনায় বিদূষিত হইলে, বিচারককে হতাশ হইতে হয়। মনে মনে জানিয়া শুনিয়াও দেশবিধির অনুরোধে, কাগজে কলমে প্রমাণাভাবে, তাঁহাকে নিজ অনুমানের বিপরীত কার্য্য করিতে হয়। ইহা এক মনোকষ্টের কারণ, তাহার উপর আমাদের দেশে সমাজের এমনি স্বভাব, এমনি স্বার্থপরতা প্রবল, এমনিই আপনার স্বরূপ অপরকে দেখিতে তৎপর, যে নিজ ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য না হইলে কেবল বিচারককে ভ্রান্তিসঙ্কুল বলিয়া আমরা সন্তুষ্ট হই না। "পক্ষপাতী," "কাণপাতলা," "বন্ধুজনের অনুরোধ রক্ষাকাঙ্ক্ষী," শেষে "বোকা হাকিমটা," কহিয়া তাঁহার সকল শ্রমের, সকল কষ্টের, পুরস্কার দিয়া থাকি।

আজ শান্তিপুরে আমতলার এজ্‌লাসে বিচারকার্য্য নিষ্পত্তি হইতেছে। শুনা যাইতেছে মৌলবি সাহেবের বিংশতিটি টুপি সঙ্গে আসিয়াছে। সকলে কহিতেছে, যেমন কোন প্রশংসিত ব্যক্তি বিশ তোপ পায়, তেমনি এই হাকিম সরকার হইতে বিশ টুপি বক্‌সিস্ পাইয়াছেন, এ জন্য তিনি "বিশ টুপিদার হাকিম" বলিয়া খ্যাত। কিন্তু কাছারীর কার্য্য এক ঘণ্টা মাত্র আরম্ভ হইয়াছে, ইহার মধ্যে দণ্ডে দণ্ডে আমরা কেবল তিনটি টুপি পরিবর্ত্তন হইতে দেখিলাম। ঘড়িটি মধ্যে মধ্যে খুলিতেছেন, ও "টোপি লাও" কহিতেছেন। টুপি লইয়া তিনটী ভৃত্য আসিতেছে, দুই জন রেখা পরিবর্ত্তন নিবারণাশয়ে কেশাগ্র উভয় কর্ণের নিকট ধরে, একজন পুরাণ টুপিটী উঠাইয়া, নূতন একটী মস্তকে পরাইয়া দেয়, এটি কলের ব্যাপার। অনেক যত্ন করিয়াও মাথার মধ্যভাগ ভাল করিয়া দেখিতে পাইলাম না, আভাষে বোধ হইল, যেন পার্শ্বদেশ অপেক্ষা মস্তকের মধ্যস্থলের কেশ খর্ব্ব, যাহা হউক মৌলবি সাহেবের টুপিতে যেরূপ সাধ, সরকারি কার্য্যেও সেইরূপ আস্থা, কলম খস্ খস্ চলিতেছে, দস্তখত করিতে বড় আমোদ "আউর দেও," "আউর দেও" আদেশ করিতেছেন, ও মধ্যে মধ্যে কহিতেছেন, "যেমন

মাল থাকুক না থাকুক, লোক চড়ুক না চড়ুক, রেলের গাড়ি নিয়মিত সময়ে চলি- বেই চলিবে, তেমনি নির্দ্ধারিত কাছারির সময় তাঁহার হাত থামিবার নহে, কাজ থাকিলেও চলিবে না থাকিলেও চালা- ইতে হইবে। অতি সামান্য সামান্য কার্য্যে একঘণ্টা অতিবাহিত হইল। এক্ষণে মোকর্দ্দমা পেষের সময় উপস্থিত। হাযদার বক্স চাপরাসি চীৎকার শব্দে কহিল "ফরিয়াদি রঘুবীর সিং হাজির হ্যায়।" অমনি কাননের চতুষ্পার্শ্ব হইতে জনস্রোত ছুটিল, সুকুল ঠাকুর লম্বমান টিকি এক হস্তে উঠাইয়া ব্রহ্মরন্ধ্রের উপর রাখিলেন, অন্য হস্তে তাহা পাগড়িতে আচ্ছাদিত করিলেন। ফকিরদ্দী মিয়া শ্মশ্রু কেশসহ ঘন ঘন দুই তিন বার নাশাগ্রে উত্তোলন করিয়া আঁখিদ্বয় নিম্নে নিক্ষেপ করিয়া সজ্জা সিজিল করিয়া লইলেন, পরে উভয় দলপতি এক একটী দরখাস্ত হস্তে যাত্রার আসরে বিন্দে দূতীর ন্যায় দলবল সহ বিচারকের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। রঘুবীরের সর্ব্বাঙ্গ আজ আবার গোময়বিকীর্ণ ও চুন হরিদ্রা প্রলেপিত, অনেক কষ্টে বসিল কিন্তু বাম উরুতের ব্যাথায় ঋজু হইয়া দাঁড়াইতে অক্ষম, তাহার কাতরোক্তিতে কানন কাতর হইল—তাহার চক্ষে দর দর অশ্রু পড়িল, কান্দিয়া কহিল, হুজু- রালি। আজ পর্য্যন্ত দরদ ভাল হয় নাই! সে বসিয়া সাক্ষ্য দিতে অনুমতি পাইল; অমনি দুই তিন জন মুহুরি এজাহার লিখিতে বসিয়া গেল, মৌলবি সাহেব সকলের কথা শুনিতেছেন সক- লকেই প্রশ্ন করিতেছেন সকলের উত্তর মুহুরিদিগকে সঠিক করিয়া লিখিতে কহি- তেছেন কিন্তু মনের কথা মনই জানে, সাক্ষী সংখ্যানুসারে মুহুরিগণ আপন "তহরিকের" মুদ্রা দেওয়ানজীর নিকট আমানত করিয়া আসিয়াছেন, যাহা লিখি- ত হইবে তাহাও জানিয়া আসিয়াছেন।

হাকিমের এক বিচারাসন, ও আশে পাশে দশ বিচারাসন দেখিতেছি, দশ- মুখে বিচার নিষ্পত্তি হইতেছে, গাঁয়ের যাদু মণ্ডল কহিতেছে হাকিম সিংহরাশ, আর একজায়গায় সাগর আচার্য্য কহি- তেছে হাকিম ন্যায্য বিচারের জন্য "আটু পাটু" করিতেছেন, যখন রঘুবীরের পক্ষ সাক্ষীকে ধমকাইতেছেন তখন তার শ্বশুর সঙ্করসিংহ কহিতেছে হাকিমের ঐ দিকে টান দেখ্‌ছ—এ অন্যায়, না হয় জেলায় যাইয়া দরখাস্ত দিব। শিবসহায়ের ভৃত্য রামা কহিতেছে যে দিন শিবের জয় হইবে সেই দিন জানিব হাকিম সুবিচারক, এখন কি তোরা ভাল মন্দ বল্‌চিস? এইরূপ নিরপেক্ষ অভিপ্রায়ই ত বিচারপতিদের সুখ্যাতির ভিত্তি!

এখন বিচারপতি স্বয়ং নাজির সাহেব- কে জিজ্ঞাসা করিলেন "কাদম্বিনীকে হাজির আনিয়াছ? লইয়া আইস।" নাজির কেবল মাত্র কহিলেন "জোনাব" মুহূর্ত্ত মধ্যে মরালগামিনী ছদ্মবেশী সুন্দরী গোয়ালিনী কাদম্বিনীর বেশে বিচা-

বকের সম্মুখগামিনী হইল। বিচারালয়ে একে স্ত্রীলোকের আগমন, তাহাতে সুন্দরী অনেকের অপরিচিত, অজ্ঞাত, প্রকৃত সুন্দর যুবতী কামিনী, সেই দৃশ্য দেখিতে কি দর্শককে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতে হয়? কানন পরিপূরিত হইল, চারিপার্শে চৌকিদার সকলে চুপ চুপ করিয়া গোলযোগ বাড়াইতেছে, হাতে লোক সরাইতেছে, তবুও অল্প সময় মধ্যে কাননে লোকসঙ্কুলে বায়ু প্রতিরোধ করিল—সুন্দরী আকাশে, পাতালে, সম্মুখে, না পার্শ্বে দেখিবে? সকল দিকে অপরিচিত জনের কটাক্ষাক্রান্ত। প্রগল্‌ভতা নাই, লজ্জার উদ্রেক হইয়াছে, জিজ্ঞাসিলে কি উত্তর দিব এই ভাবিতেছে, পূর্ব্বের শিক্ষা ভুলিয়া যাইতেছে। মৌলবি সাহেব কহিয়া উঠিলেন "তবে নাকি কাদম্বিনী ফৌত করিয়াছিল, এবা একবারে রাতকে দিন করিতে চায়, সকলে মনে করে যে আমি দারোগার রিপোর্টে নির্ভর করিয়াই কার্য্য করি। নাজির!"

না। হুজুর।

মৌ। বাবু শিবসহায় সিংহকে বোলাও।

নিমেষমধ্যে বৃদ্ধ থর থর কলেবর স্থূলশরীর প্রচুর সুপক্ক গোঁপধারী শিবসহায় সিংহ উপস্থিত। বিচারপতি কহিলেন "ইহাকে প্রতিজ্ঞা পাঠ করাও।" মন্ত্র উচ্চারণকালে শিবসহায় আপনাকে একান্ত নিঃসহায় পাপপঙ্কে পতিতোন্মুখ মূঢ় জ্ঞান করিলেন, চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখিলেন—পেষাদার সাক্ষী ও ধর্ম্মভীত ভদ্রের এই প্রভেদ! শিবসহায়ের কাতরতা দেখিয়া শত্রু মিত্র সকলেই কাতর হইল। বিচারপতি জিজ্ঞাসা করিলেন "দেখ এই আওরাত কাদম্বিনী নয়?"

শি। না।

বি। তোমার কন্যা নয়?

শি। কালী কালী। না।

বিচারপতি ক্রুদ্ধ হইলেন ও কহিলেন তাহাতেই কহিয়াছিলাম এনারা রাতকে দিন করিতে পারেন, ইহার উত্তর লিখিয়া পড়িয়া শুনাও, মিথ্যাবাদীর থান দান এককালে সিকস্ত হওয়া উচিত।

সকলে ভয়ে থর থর, কি হুকুম হইবে কে কহিতে পারে, আরো লোক সংখ্যা চতুষ্পার্শ্বে বাড়িতেছে, সকলে সমাগত, কেবল এই পুতুল খেলার যে জন প্রকৃত খেলী সে গজানন কোথায়? তিনি বিচারালয়ে আসিতে বড় কাতর, হলফ করিতে আরো কাতর। তিনি রঙ্গভূমিতে আসেন নাই, দূর হইতে কল টিপিতেছেন, ডোর ছাড়িতেছেন, টানিতেছেন, গ্রামের কোন নিভৃত স্থানে বসিয়া আছেন, পলে পলে সকল সংবাদ পাইতেছেন।

পোষ্টমাষ্টার গাঙ্গুলি মহাশয়েরও এখানে দেখা নাই। মাজিষ্ট্রেট ক্ষুদ্র বিচারপতি, বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের ভৃত্য, তিনি কেবল নবাব গবর্ণর জান্দেরেলের অধীন। অধীনতম হাকিমের কাছারিতে

গিয়া ন্যূনতা স্বীকার করা অপমান অথচ ফলতঃ খবর সকল বিষয়ের রাখিতে হইবে এ জন্য ছুটি ডাকের ধাওয়া কাছাবিতে রিপোর্টার নিযুক্ত কবিয়া পাঠাইয়াছেন, গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বিলক্ষণ নিন্দাবাদপটু ও ভদ্রেব গ্লানি কবা তাহাব বিশেষ গৌবব, তিনি মহা তীর্থ জ্ঞানবাপীব ন্যায় সমলসলিল পূর্ণ।

সকল সাক্ষীব এজাহাব লিখিত হইল। কাগজাৎ পাঠ হইল। হাকিম বায় লিখিতে বসিলেন। সকলে নীবব, এমন সময় মটুকধারী বনমালী পিতাম্বব সজ্জায় কোথা হইতে শীতু ঠাকুর আসিয়া উপস্থিত ও গদ্‌গদ বচনে কবযোড়ে কহিলেন আজ ধর্ম্মাবতাবের আবির্ভাব, শুনিয়াছিলাম আজ বাবণ আসিয়াছে সীতা হবণ হইবে তা ত নয়; এই আমাব দরখাস্ত নিষ্কবে দখল দেন আব এই সুন্দবীকে দান করুন প্রভু। আমি ঘনেশ্যাম তাহাব উপযুক্ত পাত্র। বলিয়া আপন গলদেশ হইতে মালা খুলিয়া সুন্দবীব গলায় অর্পণ কবিল।

মৌলবি সাহেব ইহাব ভয়ানক গোস্তাফি দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন। ইঙ্গিত মাত্র বন্ধকর হইয়া সিংহাসনেচ্ছু শীতু ঠাকুর কারাবাসে চলিলেন। মধ্যে মধ্যে কেবল মাত্র কহিতে লাগিলেন এতদিনে দশম দশা প্রাপ্ত হইলাম ও সঙ্গে সঙ্গে গান হাঁকিয়া দিলেন। এদিকে মৌলবি সাহেবের রায় লিখিতে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইল, পশ্চিমাকাশে প্রবল ঝড় উঠিবাব পূর্ব্বে যেন উচ্চ তরুশ্রেণী স্থিবপত্রে দণ্ডায়মান হয় সেই রূপ দর্শকমণ্ডল আদেশ প্রচাব হইবাব পূর্ব্বে সুস্থিব! এক্ষণে হাকিম কহিলেন "শিবসহায় সিংহ, তুমি বঘুকে গুরুতব আঘাত কবিযাছ, সাংঘাতিক অস্ত্র সহকাবে দাঙ্গা তোমার অনুমতিতেই হইয়াছে, তুমি কাদম্বিনীব মৃত্যুব মিথ্যা সংবাদ দিয়াছিলে ও সেই মিথ্যাব পোষকে আজ আবাব সফৎ কবিয়া প্রকাশ্য বিচাবালয়ে মিথ্যা কথা কহিলে যে এই আওবাত তোমাব দক্তব নহে। এ সকল গুরুতর অপবাধ,আমাব অভিমতে তোমাব আবো উচ্চতব বিচাবস্থলে দণ্ড বিধান হওয়া উচিত, অতএব তোমাকে সসিহান সুপর্দ্দ কবিলাম।" একজন মোহবার কহিয়া উঠিল আপনি সাফায় সাক্ষীব নাম দেন।

হুকুম প্রচার হইল। সকলে বিমর্ষ, সকলেব কৌতুক, সকলেব কাছারি দেখিবাব উৎসাহ শেষ হইল, যে নিবাহারে আসিয়াছিল তার ক্ষুধা মনে পড়িল, আজ কৃষীদের পাক বন্ধ, ছাত্রদেব পাঠ বন্ধ, গ্রামে ঘোর বিপদ, কাল প্রাতে মালা ঘুবাইতে ঘুরাইতে কে আব কৃষীদেব বীজধানের হলকর্ষণের খবব লইবে, ছেলেদিগকে একত্র কবিয়া পরীক্ষা কবিবে কুস্তি খেলা দেখিবে, লাড়ু বিতরণ কবিবে, আজ গ্রামেব মাথা ভাঙ্গিয়া গেল। শিবসহায়কে দিন দিন কাছাবিতে জামিন দিয়া হাজিব থাকিতে

আজ্ঞা হইল। একে একে পরে দলে দলে নির্বিচ্ছুক পল্লীবাসীরা গৃহ মুখে চলিল। এখন মৌলবি সাহেবের স্মরণ হইল যে সবে জমিনে তদারকে আসিয়া তিনি এ পর্য্যন্ত দাঙ্গার স্থল দৃষ্ট করেন নাই। ঘোড়া চড়িয়া সেই জমি মাড়াইয়া যাইবেন, মনে করিলেন।

কিয়ৎকাল পরেই অশ্ব প্রস্তুত হইল, ও তিনিও আরোহী হইলেন। ঘোড়া চালাইতে প্রস্তুতপ্রায় এমন সময় দেখিলেন একটি খঞ্জ দ্রুতগামী কয়েকটী পাঠশালার বালকসঙ্গে দূর হইতে সেলাম ঠুকিতে ঠুকিতে তাঁহার নিকট আসিতেছে, মৌলবি সাহেব কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করিলেন, খঞ্জভীম একটি সুচ্ছবি ইংরাজি লিখিত পত্র হস্তে উপস্থিত হইয়া কহিলেন "স্যার" আমি শ্রীনগরের পাঠশালার প্রধান শিক্ষক, এটি হজুরের (এড্রেস) অভিনন্দন পত্র, হজুর যে শীতু দুষ্টকে শাসন করিয়াছেন, হাজতে দিয়াছেন তাহাতে কি কহিব। দেশ বিদেশের লোক সন্তুষ্ট, হজুর সন্মুখেই তার পরিচয় পাইয়াছেন, সে এক লম্পট বদমাইস লোক।" এই বালক দলের মধ্যে সকল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট "জরক বরথ" জরি বিভূষিত উজ্জল বর্ণময় সজ্জাধারী নীলমণি এতক্ষণ দাঁড়াইয়াছিলেন; খঞ্জভীমের কথা শেষ না হইতেই তিনি কহিয়া উঠিলেন আমি একটি বকৃটিটা করিব। মৌলবি সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন এটি কে? "I am is sir, Babu Nilmani Chaudhury" আই এম ইস বাবু নীলমণি চৌধুরি Heir apparent Dwan Gajanana Chaudhuri your honor come an address, you are very happy" কোন উত্তর না দিয়া মৌলবি সাহেব খঞ্জভীমের হস্ত হইতে পত্রখানি লইলেন ও তৎক্ষণাৎ জনেক পদাতিককে কহিলেন "শীতুকে ছাড়িয়া দাও, সে পাগল বোধ হইতেছে।" আদেশ দিবামাত্র সকলকে সেলাম করিয়া অশ্ব চালাইলেন। খঞ্জভীম মনে করিলেন হিতে বিপরীত, এড্রেসে শীতু খালাস পাইয়া গেল। এড্রেস ব্যবসায়ী ভদ্রগণ অনেক সময় এই রূপ গোলে পড়েন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

শুভচণ্ডী পূজা।

কর্ত্তার ইচ্ছা কর্ম্ম। আশুতোষ বাবুর মতানুসারে গ্রামস্থ কয়েকটি ছাত্রের নগরে যাওয়াই স্থির হইল, গজানন অগত্যা নীলমণিকে কালেজে পাঠাইবার অভিমত করিলেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় লম্বমান চিত্র বিচিত্র কোষ্ঠীপত্রের পাক খুলিয়া অঙ্কপাত করিতে লাগিলেন। দিন, লগ্ন স্থির হইল—আগামী বুধবার প্রত্যূষে বর্ত্তমান কার্তিক মাসের সপ্তবিংশতি দিবসে শুভদিন সর্ব্বত্র প্রচার হইল, কেন শুভ দিন? কারণ, তর্কালঙ্কার মহাশয় গণিয়া বলিয়াছেন ঐ দিবসই শুভ-যাত্রিক, যাহা কিছু রিষ্ট আছে, অর্দ্ধপণ কপর্দ্দক, অর্দ্ধসের

লবণ, অর্দ্ধসের তৈল, একটি ক্ষুদ্র কাটারি ও একটি অঙ্গার-খার-বিধৌত বস্ত্র রাহু গ্রহকে দান করিলেই তাহার অশুভ চিন্তা বন্ধ হইবে। গ্রহগণ এক্ষণ অপেক্ষা তখন অনেক নির্লোভী ছিলেন, অতি অল্পতেই সন্তুষ্ট হইতেন। একে অনেকের নিকট পূজা পাইতেন তাহাতে দেশ দরিদ্র বলিয়া জানিতেন। এখন শুনিতে পান দেশে ধনবৃদ্ধি হইতেছে, অনেক প্রকার বাহুও আসিয়া একত্র হইয়াছে ও তাহাদের লোভও ভয়ানক বৃদ্ধি হইতেছে। পূর্ব্বে কড়িতেই অনেক কার্য্য লব্ধ হইত, কড়িতে বুড়োর বিয়ে হইত, কড়িতেই পাথর দগ্ধ মিলিত, কড়িতেই পরিণয় হইত, এখন স্বর্ণমুদ্রা মেকেরের ঘড়ি ও গোরাকারিগরের নির্ম্মিত সোণার পেটেণ্ট চেন ভিন্ন কন্যাদায়গ্রস্তের বর ক্রয় করা দুষ্কর। তখন যে মুদ্রায় এক ভরি মকরধ্বজ পাওয়া যাইত, এখন সেই মূল্যে এক শিশি শোডা পাওয়া দুষ্কর। শুষ্কসময়ে তখন অর্দ্ধ মুদ্রায় এক বিঘায় ফসল রক্ষা পাইত। এখন শোণভদ্র, মহানদী প্রভৃতি বান্ধিয়া কি দুর্ভিক্ষ নিবারণ হইতেছে?

এখন হউক্ না হউক্ তখন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের ব্যবস্থায় আমাদের গ্রহবৈগুণ্য খণ্ডন হইয়াছিল। কিন্তু যাহাদের অনেক অর্থ, তাহাদের গ্রহও ভারী—আমাদের গ্রহদেব অন্নদানেই প্রফুল্ল হইলেন, নীলমণির গ্রহের পূজার আড়ম্বর বেশী হইল। আবার অন্তঃপুর হইতে শুভচণ্ডী পূজার আদেশপত্র বাহির হইল, এখন শ্রীমন্ত সওদাগরের সিংহলযাত্রা, ঢাকিয়া গেল। গঙ্গানন্দের গৃহদেবী সিংহবাহিনীর মন্দির বেলয়ারি সাজে সুসজ্জিত হইল, সম্মুখে একটী চন্দ্রাতপ উঠিল, চণ্ডীযাত্রার উদ্যোগ হইতে লাগিল—মঙ্গলবার প্রাতে গ্রামের কুলকামিনীগণ কবরীবন্ধন করিতে লাগিলেন। সোণার অলঙ্কারের বাক্স বাহির করিলেন, চেলীর ফুলদার শাটী পরিধান করিতে লাগিলেন, সুসজ্জিতা প্রতিমাপার্শ্বে লক্ষ্মী, সরস্বতীর ন্যায় সজ্জিতকলেবর মরালগামিনীগণ গঙ্গানন্দের চণ্ডীর মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কোন কোন যুবতী কেশবন্ধন করিতে সময় পান নাই, তাহাতে ক্ষতি নাই, স্বর্ণালঙ্কারভূষিতা প্রচুর মুক্তকেশীর বেশ কিছু মন্দ নহে; প্রাতঃসলিল-স্নাত চাঁচর অলকাগুচ্ছগুলি প্রাতঃসমীরণে মস্তকপার্শ্বে দুলিতেছে, এক একটি যুবতী স্তম্ভপার্শ্বে ঠেস দিয়া গণ্ডদেশ হস্তে রাখিয়া, চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় দেখিতেছেন, কি দেখিতেছেন? একটী গৌরাঙ্গী এলোকেশী কিশোরী ব্রাহ্মণকন্যা নীলাম্বরী পরিধানে মন্দিরের সম্মুখে প্রাঙ্গণে বসিয়াছেন ও এক হস্তে শীলাতলে ভর দিয়া অন্য হস্ত তুলিকাসহ দুগ্ধরেখাতে আল্পনা আঁকিতেছেন। মধ্যদেশে একটি বড় শ্বেতপদ্ম, চারিপার্শ্বে গোল করিয়া আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্প বা কলিকা, পাতা, লতা ও আরও দূরে কয়েকটি খঞ্জহংসের

আকার আঁকিলেন। কোন কামিনী কহিতেছেন, "এরূপ আমরা শিখিলাম না, এর পরে কে আল্পনা দিবে?" একটী দোজবরের সোহাগী সুন্দরী কহিতেছেন, "ছাই। ও আবার কি কাবিকুবি যে শিখতে হবে।" তাহার নাক চোক নড়াতে অনেকে ক্ষান্ত হইলেন—তাহার প্রখরতায় কেহ বা ভীত হইলেন, কিন্তু বনওলের উপর বাগা তেঁতুল আছে। বুড়সাহেবানী গোপিনী তাঁহার মুখে শ্বেত পাউডর ভস্ম প্রলেপ দেখিয়া কহিয়া উঠিল সেকালে আমরা পিটালির আল্পনা দিতাম, এখন সুন্দরীরা পিটালির গুঁড় মুখে মেখে রং উজ্জ্বল করেন। এইত এলো কেশী দিদির বং ইনিত পাউডর মাখেন নাই, আল্‌তা গুলে ঠোঁটে দেন নাই তবু কেন পদ্ম গোলাপ হেবে যায়? যাকে ভগবান্ রঙ্গ দিয়াছেন, তাকে কি রং মাখাতে হয়? এখন যুবতীরা সাবান আর পাউডর নিয়ে ব্যস্ত থাকবে না আল্‌পনা লিখতে শিখবে? অনেকের মুচকি মুচকি হাসি দেখিলাম, পাগলিনীর মত সাহেবানী কটা কথা কহিয়াই পলাইল। এদিকে আল্‌পনা লেখা সাঙ্গ হল, ঘটস্থাপনা হল, পূর্ণ ঘটে আম্রশাখা দেওয়া হল, তর্কালঙ্কার মহাশয় চসমা নাকে, পুথি ক্রোড়ে করিয়া উপস্থিত, একটি থামের পার্শ্বে আসনে বসিলেন, সঙ্গে সঙ্গে এক ঝারি জল আসিল, নীলমণির গর্ভধারিণীর প্রতিরূপা গজাননের গৃহিণী সেই জলে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের পদপ্রক্ষালন করিয়া কেশদলে শ্রীচরণ মুছিয়া লইলেন। তর্কালঙ্কার পাঠক হইলেন, পুথি খুলিলেন, পুথিটী গৈরিক রঙ্গের বস্ত্রের উপর লেওয়ার বদ্ধ, তাহার উপর আবার প্রচুর চন্দন ছিটা বিকীর্ণ, সম্মান পুরঃসর তাহা সম্মুখে রাখিয়া প্রণাম করিলেন, আবার উঠাইয়া লেওয়ার ও বস্ত্র খুলিলেন, পত্র মধ্য দিয়া একটী ছিদ্র পারাপার হইয়াছে, তন্মধ্য দিয়া একটী সূত্র চলিয়া গিয়াছে; পুস্তকটী বিস্তার করিয়া রাখিলেন, চসমাটি আবার নাসিকাগ্রে স্থাপিত হইল। যেরূপ মৌলবি সাহেবের চসমা স্বর্ণ পাশে আবৃত ইহা সেরূপ নহে, কেবল আঁখিদ্বয়ের কাঁচ দুখানি বিশেষ বড় পিতলের পরিধিবেষ্টিত, একটি ধনুকাকার তারে নাকের উপরিস্থিত, সেই তার হইতে একটি সূত্র ভ্রূযুগলের কপালের শিরোদেশের মধ্যদেশ হইয়া ব্রহ্মরন্ধ্রের শিখাতে আবদ্ধ। আচমন করিয়াই ভট্টাচার্য্য মহাশয় উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিতে লাগিলেন। বুঝিবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু সকলই সাধ্যাতীত বোধ হইল। একে সংস্কৃত তাহাতে দন্তহীন স্বরে বৃদ্ধ কণ্ঠের উচ্চারিত। এদিকে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের সম্মুখে কিঞ্চিৎ দূরে ললাটাংশ সুন্দর সিন্দুর বিন্দু শোভাময় শুভ চণ্ডীর এয়োতী সুন্দরীশ্রেণী দণ্ডায়মান। প্রদীপ জ্বলিতেছে, ধূপ ধূনার গন্ধে প্রাঙ্গণ আমোদিত, চন্দনফুলে পুষ্পপাত্র পরিপূরিত। অবশেষে দেবীর আসনের চতুষ্পার্শ্বে শুভ্র রাশি রাশি আতপ

তণ্ডুল চুড় সুগোল সন্দেশ মুণ্ডিতে শোভিত, উপকরণ ফলের ছটাও সুরম্য। আজন্মকৃপণ গজাননের গৃহে অদ্য প্রচুর সামগ্রী সংগৃহীত হইয়াছে, নীলমণি তাঁহার একান্ত স্নেহের পদার্থ, তাহার শুভ সাধন জন্য কৃপণ হইলে নিজেরই অশুভ হইবার সম্ভাবনা। এই সুদৃশ্যস্থানে তর্কালঙ্কার মহাশয় পুস্তক পাঠসময়ে মনে করিতেছেন যে এ মিষ্টান্ন সকল আমা বই নির্ব্বিবোধের ধন। সকলে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান, অল্পসময়মধ্যে উপক্রমণিকা পরিচ্ছেদ অনর্গল পাঠে সমাপ্ত হইল। ভৈরব ভৃত্য কহিয়া উঠিল "হা, যার বিয়ে তার মনে নাই, নীলমণি বাবু কই?" "এই ডে ডাট্টি" বলিয়া নীলমণি স্বয়ং গজানন চৌধুরীমহাশয়ের সম্মুখে আসিলেন। নীলমণি হরিদ্রারঙ্গের চেলির কাপড় পরিয়া উপস্থিত, দেখিতে অতি গৌরবর্ণ কিন্তু চুল গুলি কুচির ন্যায় এক একটি পৃথক্ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, কপালটি প্রায় তিন আঙ্গুল প্রশস্ত, নাকটি আর একটু খান্দা হইলেই পাঁচ অঙ্কের রেখার ন্যায় মুখভঙ্গি প্রকাশ পাইত, শ্বেত চন্দন ফোঁটাতে প্রায় ক্ষুদ্র কপাল পরিপূরিত। শুভচণ্ডীর নাম শুনিয়া সত্বর দণ্ডবৎ হইলেন। অমনি সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়াইয়া কহিলেন, "ঐ নৈবিড্ডের সন্দেশটা খাব?" গজানন কহিলেন ক্ষেপা ছেলে, আবার প্রণাম কর! নীলমণি আবার প্রণাম করিলেন। জটাধারী যাইয়া কাণে কাণে কহিলেন "স্থির হও পূজা শেষ হউক।" নীলমণি নিবারণ স্রোতে বদ্ধ হইলেন। এখন তর্কালঙ্কার পূণগাসনে ঘটপার্শ্বে আসিয়া বসিলেন, পূজা একদণ্ডে সমাপ্ত হইল। এলোকেশী দিদি চণ্ডীর কথা কহিবে, তাহার সঙ্গে বরণ ডালা হস্তে এয়োতিগণ চলিল। প্রাঙ্গণপার্শ্বে বাদ্য বাজিয়া উঠিল। শীতু ক্ষেপা নীলমণির নামসম্বলিত একটি আশীর্ব্বাদসূচক গীত গাইতে গাইতে নাচিতে লাগিল। তর্কালঙ্কার মহাশয় চণ্ডী পুস্তকের পরিশিষ্ট পাঠে আবার উপবিষ্ট। পৃথক্ প্রাঙ্গণে বাজনা বাজিতেছে, চারি দিকে গোলযোগ বৃদ্ধি হইতেছে, তর্কালঙ্কার মহাশয় অনন্যমনে চণ্ডী পাঠ করিতেছেন, নৈবেদ্য চুড় হইতে মণ্ডা গুলি ক্রমে ক্রমে বেমালুম অন্তর্হিত হইতেছে, বালক বৃদ্ধের ঘন ঘন আগমনে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের সন্দেহ উত্তেজিত হইল, শেষে একবার দেখিলেন নাচিতে নাচিতে একটী ক্ষুদ্র হস্তে একটী মণ্ডা চুড় উত্তোলিত হইল। যোগাসন ত্যাগ করিলে পাঠভ্রষ্ঠ হয়, প্রাঙ্গণে শিশুর আগমনে দুই হাত উঠাইয়া স্ব! স্ব! করিয়া তাড়াইয়া দেন, ইহারা অবলীলাক্রমে মণ্ডা উঠাইয়া প্রস্থান করে। অবশেষে অত্যন্ত বিভ্রাট্ দেখিয়া অধ্যাপক মহাশয় পাঠ সংক্ষিপ্ত করিয়া লইলেন। এদিকে শীতু খুড় স্তুতি করিয়া দেবীকে প্রণাম করিলেন যে "কার শ্রাদ্ধ কেবা করে, খোলা কেটে বামুণ মরে, কোথা ছেলে, কেবা বাপ কোথা এসে ছাড়ে

হাঁপ, কাব বা কণ্যে, কেবা বব, বামুণ যবন একাকাব, সুন্দবী তোব কি বাহাব সাড়ী না ঘাগরী পর, কৃষ্ণ না খোদারে ডব।। যাব জেলার আদালতে জীতিব বাজি পাঁপরেতে, পেয়ে বৃত্তি সুন্দরী যেন চণ্ডী গাঁয় ফিরি।"

অশনি।

১

ছুটিছে অশনি মেঘের গায়,
কে ধবিবি তোরা আয়রে আয়,
মরত ত্যজিয়া, গগনে উঠিয়া,
জলদে মিশিযা হাসিয়া সুখে,
বসি ঘনাসনে, ঘন গবজনে,
কে ধবিবি আয় অশনি বুকে ?

২

জলন্ত পাবকাসনে,
দেখে, ভয় কি পেযেছ মনে,
হৃদয়ে জ্বালাবি দ্বিগুণ অনল,
ধক্ ধক্ তাব জলিবে শিখা,
"অদম্য উদ্যম" উৎসাহ প্রবল,
অনল অক্ষবে বহিবে লেখা।
জ্বালাবি অনল, অনন্ত প্রবল,
মুহূর্ত্তে ব্রহ্মাণ্ড কবিতে লয়।
(সে তেজ স'বেনা অশনির তেজ)
তবে আব তোব কিসেব ভয়।

৩

এই ত দধীচি হাড ?
তুলনা নাহি কি তাব ?
হৃদয় ভাঙ্গিয়া দেখা না জগতে
এমন নাহি কি আর ?
দেখারে জগতে দেখুক জগৎ,
এ জগতে নাই তুলনা যাব,
জলন্ত পাবক উগবে সঘনে,
প্রতি পঞ্জবায় দধীচি-হাড।

৪

এ মাটীব দেহ ক্ষণে,
না হয মিশিবে মাটীব সনে।
এ মাটী যখন মাটীতে মিশিবে,
বিফলে মিশিবে কেনে ?
লও বজ্র তুমি আসুক ছুটিয়া,
জলন্ত পাবকে ব্রহ্মাণ্ড পুডিয়া,
লও বজ্র তুমি বক্ষ বিস্তাবিয়া,
কি ভয় তোমাব মনে ?
এ মাটী যখন মাটীতে মিশাবে,
বিফলে মিশাবে কেনে ?

৫

চিবস্থায়ী কিছু নয,
মাটীব শরীব মাটীতে মিশাবে,
কেন রে কবিবি ভয় ?
আসুক্ অশনি ভীম গবজনে
কাঁপুক মেদিনী টল টল টল
ভাঙ্গুক সদর্পে মহীধর গণে

সে দর্পে বসুধা যাক্ রসাতল—
এ বক্ষ পাতিয়া, লইবি সে বজ্র
　সে দর্প হইবে ক্ষয়
না হয়, মাটির শরীর মাটীতে মিশাবে
　কেন রে করিবি ভয় ?

৬

　জীবনে বিশ্বাস কিবা ?
কে বলিতে পারে তোমার জীবনে,
　আবার ফিরিবে দিবা ?
এই অমাবস্যা গাঢ় অন্ধকারে
গর্জ্জিছে অশনি ভৈরব হুঙ্কারে
ভ্রমিছে মস্তকে কাল সর্পাকারে
　সংহার এ তেজ তবে ;
লও বক্ষ পাতি তোমার অস্থিতে
　শত শত বজ্র হবে ।

৭

　করো না আশঙ্কা তবে
দেখ, সাহসে বিজয় ভবে,
এক ধ্যানে যেই করেছে সাধনা
　অসিদ্ধ হয়েছে কবে ?
লও বজ্র তবে পাতি বক্ষস্থল,
ভীম ভুজবলে ভাঙ্গ হিমাচল,
তৃণ হেন জ্ঞানে উপাড়ি ভূধর
হেলায় মথিয়ে অনন্ত সাগর
কাঁপাও সঘনে ব্রহ্মাণ্ড ভৈরবে,
সভয়ে এ বিশ্ব রহুক নীরবে,
কাঁপিয়া উঠুক জলধিজল,
কাঁপুক অনন্ত পাতাল তল,
লও বজ্র তুমি আসুক ছুটিয়া,
জলন্ত পাবকে ব্রহ্মাণ্ড পুড়িয়া,
লও বজ্র তুমি বক্ষ বিস্তারিয়া,
　কি ভয় তোমার মনে ?
এ মাটী যখন মাটীতে মিশাবে
　বিফলে মিশাবে কেনে ?

৮

ওই শিখা দেখে করিও না ভয়,
দেবতা তোমারে দিতেছে অভয়,
পতঙ্গ যেমন পড়ে রে অনলে,
ওই বজ্রানলে পড় কুতূহলে,
দৃঢ় বক্ষে তার ভাঙ্গি কর গুঁড়া
সে বজ্র যেমতি ভাঙ্গে গিরি-চূড়া,
　মহাসুখে মুখে গাওরে "জয়" ।
আসুক অশনি ভীম গরজনে,
কাঁপুক মেদিনী টল টল টল
ভাঙ্গুক সদর্পে মহীধরগণে,
সে দর্পে বসুধা যাক্ রসাতল,
এ বক্ষ পাতিয়া লও রে সে বজ্র,
　সে দর্প হউক ক্ষয় ।
না হয়, মাটির শরীর মাটীতে মিশাবে
　কেন রে করিবি ভয় ?

শ্রীমনোরঞ্জন গুহ

মাধবীলতা।

৩

রাজ-অনুগৃহীত ব্যক্তির মধ্যে এক জনের নাম পীতাম্বর ছিল, লোকে তাহাকে পিতম পাগ্‌লা বলিত। পীতাম্বরের কোথা জন্ম, সে কাহার সন্তান, তাহা কেহ জানে না। প্রবাদ ছিল, যে যখন চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রম তখন পিতম ছেলেধরার ভয়ে পলাইয়া শান্তিশত গ্রামে আসিয়া আশ্রয় লয়। "কে পিতা ছিল?" জিজ্ঞাসা করিলে পিতম নতমুখে মাথা নাড়িয়া বলিত, "জানি না," "কে মাতা ছিল?" জিজ্ঞাসা করিলে গম্ভীর ভাবে রাজার একটী বড় হাতী দেখাইয়া দিত।

পিতম প্রায় সর্ব্বদাই বিমর্ষ থাকিত। পথে বালকদের খেলিতে দেখিলে আর সেরূপ থাকিত না। তখন পিতম অনবরত কথা কহিত, অন্যকে না পাইলে একাই কথা কহিত, কখন কখন গীত পর্য্যন্ত গাইত। লোকে বলিত, পিতমের গীত গুলি অতি আশ্চর্য্য। কিন্তু গাইতে বলিলে পিতম বড় গোলে পড়িত, একটি গীতও আর তাহার স্মরণ হইত না।

প্রথম অবস্থায় পিতমের স্মরণশক্তি একেবারে ছিল না। লোকে যে তাহাকে পাগল ভাবিত, তাহার এই এক বিশেষ কারণ ছিল। ভাষা স্মরণ হইত না বলিয়া অনেক সময় পিতম কথার উত্তর পর্য্যন্ত দিতে পারিত না। লোকে ভাবিত পাগল, এই জন্য উত্তর দিল না। আবার, কথা কহিলে এক শব্দের পরিবর্ত্তে অন্য শব্দ মুখে আসিত। পিতম মনে করিত, প্রকৃত শব্দ ব্যবহার করিতেছি, কিন্তু লোকে হাসিত দেখিয়া পিতম আশ্চর্য্যান্বিত হইত। পিপাসা পাইয়াছে, পিতম বলিবে "জল খাব" কিন্তু জল শব্দের পরিবর্ত্তে "হাতী" শব্দ মুখে আসিল, পিতম বলিল, "হাতী খাব।" লোকে হাসিয়া উঠিল। জলের পরিবর্ত্তে হাতী খাইতে চাহিয়াছে ইহা পিতম কোন মতে জানিতে পারিত না, পুনঃ পুনঃ সেই ভুল করিত। লোকে জিজ্ঞাসা করিত, "কি খাবে?" পিতম আবার বলিত, "হাতী খাব," লোকে আবার হাসিত, আবার জিজ্ঞাসা করিত, আবার হাসিত।

সাধারণে পিতমের প্রকৃত অবস্থা জানিত না। পিতমের স্মরণশক্তি নাই, তাহারা ভাবিত পিতমের জ্ঞান নাই। পিতম ভুলিত, লোকেরাও ভুলিত। পিতমের ভুলে লোকের রহস্য বাড়িত, লোকের ভুলে পিতমের রাগ বাড়িত। পাগলের রাগ বাড়িলে লোকের আহ্লাদ বাড়ে। দুর্ভাগ্য পিতম জ্বালাতন হইয়া মধ্যে মধ্যে স্থানত্যাগ করিত। কিন্তু কিছু দিন পরে আবার ফিরিয়া আসিত। এ সকল প্রথম অবস্থার কথা।

এক দিন অপরাহ্নে রাজা ইন্দ্রভূপ কয়েকজন অমাত্য সমভিব্যাহারে পশু-শালা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বেড়াইতেছেন। পক্ষীদের কলহ শুনিতেছেন, বানরকে কদলী দিতেছেন, ভল্লুককে তিরস্কার করিতেছেন, বনমানুষকে কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ব্যাঘ্রকে বনের সংবাদ দিতেছেন, এমত সময় একজন পশ্চাৎ হইতে বলিল, "বন অপেক্ষা আপনার এ গৃহ ভাল, আমি গৃহস্থ হইব, আর বনে বনে বেড়াইতে পারি না, এই গৃহে আমায় স্থানদান করুন, আমি বাস করি।"

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে এ ব্যক্তি?" একজন সঙ্গী বলিল, "পিতম পাগ্‌লা।" রাজা কখন পিতমকে দেখেন নাই, দেখিবামাত্র তাঁহার দয়া হইল। পিতমের অঙ্গে বহুতর বেত্রাঘাতের চিহ্ন রহিয়াছে। কোন কোনটী রক্তোন্মুখ। রাজা অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "এ চিহ্ন কিরূপে হইল?" পিতম চিহ্ন গুলি একবার দেখিল, হাসিল, কোন উত্তর করিল না। রাজা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন। পিতম বলিল, "মহারাজ, যে দিনে আমি পেটে না খাই সে দিন পিটে খাই।" সকলে হাসিয়া উঠিল। রাজা গম্ভীর হইলেন, বলিলেন, "আমি বুঝিতে পারিলাম না। স্পষ্ট করিয়া বল।" পিতম বলিল, "পেট আমার, পিট পরের। হাতীরও তাই, ঘোড়ারও তাই, গরুরও তাই, গাধারও তাই, পেট আপনার, পিট পরের। না, না, ঠিক তা নয়, ভুলেছি। আমার সঙ্গে একটু প্রভেদ আছে। গোরু আর মানুষ সমান নয়। গোরুকে যে আহার দেয়, সেই তার পিট দখল করে। আমায় যে কখন আহার দেয় না, সেই আমার পিট দখল করে, যে আহার দেয় সে আদর করে। এই প্রভেদ, বুঝেছেন? এখন আমি গৃহস্থ হব।"

রামসেবক নামে একজন ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "গৃহস্থ হইতে গেলে বিবাহ করা চাই, এক্ষণে ত বিবাহ করিতে হয়।"

পিতম। বিবাহ আমি অনেক দিন হইল করিয়াছি।

রাজা। কোথায় বিবাহ করিয়াছ, কে তোমার স্ত্রী।

পিতম। জগন্নাথক্ষেত্রে বিবাহ করিয়াছি। তথায় গিয়া এক আশ্চর্য্য সুন্দরী দেখি। পৃথিবীর সকলের অপেক্ষা সুন্দরী। সমুদ্রের তুলনা নাই। আমি থাকিতে না পারিয়া বিবাহ করে ফেলি।

রাজা। সমুদ্র কি বড় সুন্দরী?

পিতম। চমৎকার সুন্দরী। রামধনুকে শ্যামাঙ্গীর কটীবন্ধন। এই জন্য তাহার যে বাহার তা আর কি বলিব। সুন্দরী অনবরত হেলিতেছে' দুলিতেছে আর খিলখিল করিয়া হাসিতেছে।

রাজা। কিন্তু তোমার স্ত্রীর কুল নাই।

পিতম। কুল না থাক, কিন্তু বড় ঘরের মেয়ে। যে তার কাছে স্থান পায়, সেই বড় হয়। দেখুন, চন্দ্র সূর্য্য

এখানে ক্ষুদ্র, কিন্তু যখন আমার স্ত্রীর পার্শ্বে উদয় হয়, তখন আর এক মূর্ত্তি, তখন সূর্য্য কত প্রকাণ্ড, কত মহৎ, কত সুন্দর দেখায়, সে সকল কিছুই সূর্য্যের গুণ নহে, সকলই আমার সুন্দরীর গুণ। আহা, তাহার কত রূপ, সে কত নির্ম্মল, কত গম্ভীর, তাহার কি দয়া, কি স্নেহ, সকলকে বুকে করে রহিতেছে।

রাজা। তোমার স্ত্রীকে ফেলে কেন এলে?

পিতম। সে অনেক কথা। আমি তার রূপে ভুলিলাম, একে একে আমার সর্ব্বস্ব দিলাম, আমার হুঁকা কলিকাটি পর্য্যন্ত তারে দিলাম। কত আদর করিলাম, কত কথা কহিলাম। প্রেমোন্মত্ত হইয়া শেষে এক দিন ঝাঁপ দিলাম, কিন্তু সে আমায় নিলে না। যতবার আমি তার অঙ্গে পড়িলাম ততবার সে আমায় ছুড়ে বালিতে ফেলিয়া দিল। আর আমি কত সহ্য করি বল। আমি উঠে গালি দিলাম, ঝগড়া করিয়া চলিয়া আসিলাম। সে অতি পাজি, স্বার্থপর; কেবল লোকের সর্ব্বস্ব লবে আর লুকাইয়া রাখিবে। রত্ন বল, পলা বল, আপনি একদিনও পরিবে না। তবে লোকের সর্ব্বস্ব লয় কেন? তোমাদের স্ত্রীর হাতে পার আছে কিন্তু এর কাছে আর পার নাই। বাঙ্গালির মেয়ে বড় জোর ঘর ভাঙ্গে, এ পাহাড় পর্ব্বত ভাঙ্গে। আর অন্তরের ভিতর তাহার যে কি আছে তাহা কে বলিতে পারে। উপরে হাসিতেছেন, খিল খিল করে হাসিতেছেন কিন্তু তাহার ভিতরে যাহা আছে তাহা আমিই জানি। তাই একবার একবার দয়া হয়, বলি আমি যদি কাছে থাকিতাম, তাহা হইলে হয় ত এত যন্ত্রণা তার হত না। হাজার হউক আমি পুরুষ।

এক জন পারিষদ এই সময় পিতমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি যে রাগ করিয়া আসিলে সমুদ্র তোমায় সাধিল না।"

পিতম। না, তবে যখন আমি একান্ত ফিরিলাম না দেখিল, তখন হা হুতাস করিতে লাগিল, আমি কত দূর পর্য্যন্ত তাহা শুনিতে শুনিতে আসিলাম। লোকে বলে বিরহযন্ত্রণায় সমুদ্র অদ্যাপি হু হু করিতেছে।

পারিষদ। আবার ফিরে যাও।

পিতম। আর না। আমার আর যাইবার শক্তি নাই, বুড়া হইয়াছি, আমি এইখানে এই বাঘের পাশের ঘরে থাকিব। মহারাজের অনুমতি হইলেই হয়।

রাজা। না, আমার অতিথিশালায় চল, তথায় তোমার বন্দবস্ত করিয়া দিব, সকলে যত্ন করিবে। কোন কষ্ট হবে না।

পিতম। অতিথিশালা দরিদ্রের নিমিত্ত, আমি সেখানে যাইব না। আমায় এইখানে স্থান দিন, ব্যাঘ্র সিংহের সঙ্গে থাকিলে আমার সম্মান বাড়িবে। আর কেহ তাড়না করিবে না।

রাজা। সম্মান চাও, তবে আমার সঙ্গে আইস, যাহাতে লোকে তোমাকে

সম্মান করে, তাহা আমি করিব। এখানে তুমি স্থান পাইবে না।

পিতম অমনি রাজার পাদমূলে পড়িল, মিনতি করিয়া ব্যাঘ্রের পার্শ্বে স্থান লইল।

পশুশালা হইতে রাজা ইন্দ্রভূপ বাহির হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পাগলটির নাম কি ভুলিয়া গিয়াছি।" পারিষদ রামসেবক চূড়ামণি উত্তর করিলেন, "পীতাম্বর।" রাজা অন্যমনস্কে কতক দূর গিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। সঙ্গীদিগের প্রতি চাহিয়া কিঞ্চিৎ পরে বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য পাগল।" সকলেই একবাক্যে বলিলেন "আজ্ঞা হা।" কেবল চূড়াধন বাবু কোন কথাই বলিলেন না। রাজা আবার কতকদূর যাইতে যাইতে দাড়াইলেন। সঙ্গিগণের দিকে ফিরিয়া বলিতে লাগিলেন, "যে এত স্থান থাকিতে বাঘের পার্শ্বে বাস করিতে চাহে তাহার অপেক্ষা পাগল কে?" এই সময় এক জন পশ্চাৎ হইতে বলিল, "পিতম একা নহে, মহারাজও বাঘ ভাল বাসেন। দেখুন আপনার লাঠির মাথা কার মুখ? বাঘের।" ইন্দ্রভূপ আগন্তুকের প্রতি না চাহিয়া প্রথমে লাঠির প্রতি চাহিলেন। তাহার পর আগন্তুক বলিতে লাগিল, "মহারাজ! মুখখানি সোণার। বাঘ আপনার নিকট সোণামুখী।"

সকলেই ফিরিয়া দেখিল, পিতম পাগলা আসিয়াছে। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ আবার কি? তুমি পলাইয়া অসিলে যে?"

পিতম বলিল, "আমি পলাই নাই, তাড়িত হইয়াছি। রক্ষকেরা আমার নিকট পয়সা চাহিল। আমি বাঘের মত তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া আঁচড় কামড় দিলাম, তাহারা আমাকে মেরে তাড়াইয়া দিল।"

রাজা। বল দেখি তুমি কি সত্যই পাগল?

পিতম। হাঁ আমি পাগল, আমি পিতম পাগল।

রাজা। তুমি জান কাহাকে পাগল বলে।

পিতম। জানি—আমাকে বলে।

রাজা। পাগলের অর্থ কি।

পিতম। অর্থ পিতম—অর্থাৎ আমি।

রামসেবক। পশুশালায় আর যাইবে না?

পিতম। না ওখানে যাবে?

রাজা ফিরিলেন। পশুশালায় যাইয়া দুই তিন জন রক্ষককে পদচ্যুত করিলেন, তত্ত্বাবধারককে বিশেষ ভর্ৎসনা করিলেন। পিতম সন্তুষ্ট হইয়া আবার পিঞ্জরে প্রবেশ করিল।

৪

এই সময়ে সকলেই মনে মনে পিতম পাগলের কথা অনুশীলন করিতেছিলেন। চূড়াধন বাবু ভাবিতেছিলেন, যে পিতম নির্ব্বোধ নহে, সময় বুঝিয়া কার্য্য করি-

য়াছে। পিতম ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষ ভাল সদুপায় করিয়াছে। আশ্রয় ও আহার ভিন্ন পাগলের আর কি প্রয়োজন হইতে পারে? সে আপনার প্রয়োজন সাধন করিতে পারে তাহারে পাগল কেন বলি? সে নির্ব্বোধ কিসে? পিতম আমার অপেক্ষা বুদ্ধিমান, আমি এ পর্য্যন্ত আপনার কার্য্যসাধন করিতে পারি নাই। পাগল হইয়াও পিতম আপনার কাজ হাসিল করিল। আমার নিজের ঔদাস্যে আমি সকল হারাইতেছি।

রামসেবক ভট্টাচার্য্য ভাবিতেছিলেন, পিতম কি উন্মাদ। এত স্থান থাকিতে বাঘের পার্শ্বে বাস করিতে গেল। মহারাজ অতিথিশালায় স্থান দিতে চাহিলেন, আপনার নিকট রাখিতে চাহিলেন, তাহা ভাল লাগিল না। যে মনে করে আমি সমুদ্রকে বিবাহ করিয়াছি সে এরূপ করিবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি?

দ্বারবান্ রামদীন দোবে ভাবিতেছিল পাগল কি আহার করিবে? রোটি বা ভাত তাহাকে কেহ দিবে না, আহারের বন্দোবস্ত রাজা ত কিছু করিয়া দিলেন না। বোধ হয় পাগলা চানা খাবে, তাহা মন্দ কি? ভোরপেট যদি চানা পাওয়া যায় আর তাহার সঙ্গে দুই চারি সের দুগ্ধ দেয় তবে আমিও নকরি ছাড়িয়া ওখানে থাকিতে পারি।

রাজা ইন্দ্রভূপও পিতম পাগলার কথা ভাবিতেছিলেন। পিতম সম্বন্ধে তাঁহার কি ঈষৎ মনে আসিতেছিল, অথচ আসিল না। মনের একাংশে যেন পিতমের ছায়া রহিয়াছে, তাহা দেখিতে গেলেই মিলিয়া যায়। রাজা ভাবিলেন, "পিতম কে? আর কি কখন দেখিয়াছি? কবে দেখিয়াছি? বাল্যকালে না যৌবন কালে? আমি কত লোক দেখিয়াছি তাহাদের দেখিলে এরূপ স্মরণ করিবার ত আকাঙ্ক্ষা হয় না, স্মরণ না হইলে এরূপ ত যন্ত্রণা হয় না। পিতম, পীতাম্বর! ইহার আর কি কোন নাম ছিল? কি নাম ছিল? কে এ ব্যক্তি? সত্যই কি পাগল? পিতমের কথাবার্ত্তা অসঙ্গত, কিন্তু অসংলগ্ন নহে। পাগলের কথা এরূপ হয় না। পিতমের জ্ঞান আছে, বোধ হয় পিতম পাগল নহে।"

জ্ঞান থাকিলে যে পাগল বলা যায় না এমত নহে। বরং অনেক সময় পাগল শব্দে কতকাংশে জ্ঞানসম্পন্ন বুঝায়। সাধু ভিক্ষা করে, পাক করে, আহার করে, ভয় করে, অথচ সাধুকে লোকে পাগল বলে। যে ভয় করে তাহার পরিণাম বোধ আছে, সে একেবারে জ্ঞানশূন্য নহে। অভয় পুষ্পচয়ন করে, পূজা করে, সতরঞ্চি খেলে, অথচ তাহাকে লোকে পাগল বলে। নিতাই খাজনা আদায় করে, দেনা পাওনা হিসাব করে, তর্ক করে অথচ লোকে তাহাকে পাগল বলে। ইহাদের সকলেরই কিছু কিছু জ্ঞান আছে, তবে কেন লোকে পাগল বলে।

সাধারণতঃ সকল বিষয়ে কোন ব্যক্তির যে পরিমাণে জ্ঞান দেখা যায়, কোন

কোন বিষয়ে সেই পরিমাণে জ্ঞান না দেখিতে পাইলে লোকে হয় ত পাগল বলে। অর্থাৎ জ্ঞানের সামঞ্জস্য না দেখিলে লোকে পাগল বলে। অন্ততঃ সকলে না বলুক কেহ কেহ বলে।

বালকে উলঙ্গ থাকে কেহ তাহাকে পাগল বলে না, অন্যান্য বিষয়ে বালকের যে রূপ জ্ঞান, এবিষয়েও তাহার সেইরূপ জ্ঞান, কাজেই, কেহ তাহাকে পাগল বলে না। ইতর লোকে চুন কালি মাখিয়া পর্ব্ব উপলক্ষে নৃত্য করে, কেহ তাহাকে পাগল বলে না, অন্য বিষয়ে তাহার যেরূপ বুদ্ধি, এ বিষয়েও তাহার সেইরূপ বুদ্ধি। কিন্তু একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যদি চুন কালি মাখিয়া পথে নৃত্য করেন, কে না তাঁহাকে পাগল বলিবে? অন্যান্য দিকে যেরূপ বোধাবোধ এ দিকে তাহার অন্যথা হইয়াছে লোকে বলিবে। অর্থাৎ জ্ঞানের আর পূর্ব্বমত সামঞ্জস্য নাই বলিবে। অভয় পাগল, সতরঞ্চ খেলে, সাংসারিক সকল কার্য্য করে, কিন্তু "জল পাব কোথায়" এই কথা কেহ তাহার শ্রুতিগোচর করিলেই সে গালি দিয়া উঠে আর চীৎকার করিতে থাকে। সতরঞ্চ ক্রীড়ায় বা সাংসারিক বিষয়ে তাহার জ্ঞানের যে পরিচয় পাওয়া যায়, এস্থলে তাহার জ্ঞানের সে পরিচয় পাওয়া যায় না। কাজেই তাহার জ্ঞানসম্বন্ধে সামঞ্জস্য নাই বলিয়া লোকে তাহাকে পাগল বলে।

কিন্তু জ্ঞানের সামঞ্জস্য অতি অল্প লোকের মধ্যে আছে। পূর্ব্বে কখন তাহা ছিল কি না সন্দেহ, এখনও বড় নাই। প্রথম অবস্থায় হয় ত অসম্ভব ছিল। এখন, কতক সম্ভব হইয়াছে। এই সামঞ্জস্যের এক নাম উন্নতি।

দশ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে একেবারে জ্ঞানের সামঞ্জস্য ছিল না। কাজেই তাৎকালিক সেই অসামঞ্জস্য কেহ আপনাদের মধ্যে জানিতে পারিত না। কেহ কাহাকেও পাগল বলিত না। "পাগল" নূতন গালি। সামঞ্জস্যের পরে আরম্ভ হইয়াছে। সেই আদিমকালে এতই গুরুতর অসামঞ্জস্য ছিল যে এক্ষণে আমরা সেই সময়ের লোক দেখিলে তাহাকে পাগল ভাবিবার সম্ভাবনা। অন্ততঃ আশ্চর্য্য হইবার সম্ভাবনা।

এই বর্ত্তমান সময়ে আমাদের মধ্যে জ্ঞানের যেরূপ অসামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা নিতান্ত সামান্য নহে। যে ব্যক্তিরা বাষ্পীয়যন্ত্র গঠন করিতেছে, চন্দ্র সূর্য্যের গতি গণনা করিতেছে, বাষ্প হইতে জলের সৃষ্টি করিতেছে, তাহারাই হয় ত বৃষ্টির নিমিত্ত দৈবচেষ্টা করিতেছে। মড়ক নিবারণ করিতে হইবে, তাহারাই হয় ত বলিবে "চল, ধর্ম্মমন্দিরে চল, বা অন্য অড্ডায় চল, প্রার্থনা গাই গিয়া, মড়ক অবশ্য নিবারণ হইবে।" বুদ্ধির এইরূপ বৈষম্য দেখিলে কেহ এক্ষণে অসঙ্গত বিবেচনা করে না, কিন্তু পরে করিবে, হয় ত তখন এ রূপ বুদ্ধিমান্‌কে লোকে পাগল বলিবে।

এ কথা অর্থে, পাগল এক্ষণে আমরা সকলেই। বুদ্ধির বৈষম্য বা জ্ঞানের অসামঞ্জস্য সকলেরই আছে। কিন্তু কেহ কাহাকে পাগল বলি না। পাগল রূঢ় কথা। তবে নির্ব্বোধ বলি, স্বার্থপর বলি, দাম্ভিক বলি, কৃপণ বলি, নিষ্ঠুর বলি, তিত্রক বলি। একই কথা। সকল গুলিই বুদ্ধির বিকৃতিবাচক, পাগলের পরিচায়ক। পাগলের সম্পূর্ণ নামকরণ অদ্যাপি বাকি আছে।

পিতম—পাগল, কিন্তু নিজে তাহা জানে না। বুদ্ধিতে অন্য লোক যে প্রকার, আপনিও সেই প্রকার এই পিতমের বিশ্বাস, কোন অংশে যে ব্যতিক্রম আছে, তাহা পিতম বুঝিতে পারে না। কিন্তু পিতমের বোধ আছে যে পাগল শব্দ তাহার নামের অংশ, এই জন্য লোকে তাহাকে পাগলা বলিয়া ডাকে।

পশুশালায় লৌহপিঞ্জরে স্থান পাইয়া পিতম শয়ন করিল, শয়ন অনেক সময় তৃপ্তিবাচক।

ইন্দ্রভূপ দেখিলেন, যে পিতম আর তাঁহার প্রতি লক্ষ্য করিল না। রাজা হাসিলেন, পিতমও হাসিল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাদিগকে আর তোমার মনে থাকিবে?"

পিতম। আজ মহারাজের পশুশালা সম্পূর্ণ হইল। ঝাঁকিয়া উঠিল।

রাজা। কেন? তোমার নিমিত্ত?

পিতম। আমারই নিমিত্ত, আমি মানুষপশু, এক প্রকার নরসিংহ, নৃসিংহ দেব। সে রাজা নৃসিংহকে গারদে পাঠাইতে পারেন নাই আপনি পারিলেন। আপনার জয়। মহারাজ কি জয়। এ অবতারে আমি বড় সুখী। ভক্তকে রক্ষা করিতে হয় না। ভক্তরাই আমায় রক্ষা করে। বরং ব্রূ! রাজা বর লও। তথাস্তু। এখন ঘরে যাও। আমি নিদ্রা যাই।

রাজা। নৃসিংহ দেব। তোমার প্রহ্লাদ কই?

পিতম। তুমিই আমার প্রহ্লাদ, তুমিই আমার ভক্ত, তুমিই আমার সর্ব্বস্ব।

রাজা। আর তোমার রাজা হিরণ্যকশ্যপ কই?

পিতম। চূঁড়াধন বাবুকে দেখাইয়া ঐ আমার হিরণ্যকশ্যপ।

রাজা। চূঁড়াধন ত রাজা নহে।

পিতম। শীঘ্র হবেন।

হঠাৎ রাজা ও চূঁড়াধন উভয়েই শিহরিয়া উঠিলেন। কেমন একটা ভয়ে রাজার হৃৎকম্প হইল কিন্তু তৎক্ষণাৎ গেল। একবার তাঁহার মনে হইল পাগল কেন অশুভ কথা হঠাৎ মুখে আনিল। পরক্ষণেই মনে হইল পাগলের কথা মাত্র। আমার সন্তান থাকিতে চূঁড়াধন কেন রাজা হইবে? চূঁড়াধনের মঙ্গল হউক, আমার সোণার চাঁদও চিরজীবি হউক।

চূঁড়াধন বাবুর চাঞ্চল্য কেহ দেখিতে পাইল না। তাঁহার নয়ন চকিতের

ন্যায় বিস্ফারিত হইয়া আবার তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বমত ক্ষুদ্র হইয়া শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিল।

৫

পশুশালা হইতে বহির্গত হইয়া রাজা ইন্দ্রভূপ অন্যমনস্কে অতিথিশালার দিকে চলিলেন। প্রথমে দুইজন ভোজপুরী পালোয়ান বুক ফুলাইয়া মাথা হেলাইয়া ঢাল তরওয়াল লইয়া যাইতে লাগিল। তাহাদের প্রায় বিংশতিহস্ত ব্যবধানে রাজা স্বয়ং, তাঁহার পশ্চাতে দ্বাদশ জন অধ্যাপক, রাজপুরোহিত এবং চূড়াধন বাবু। তৎপরে রাজচিকিৎসক, জাতিতে বৈদ্য, পরে খাজনাখানার একজন মুহুরি, জাতিতে কায়স্থ. তৎপরে একজন আচার্য্য ডম্বুরাকৃত ঘটীকাযন্ত্র দুই হস্তে ধরিয়া একাগ্রচিত্তে বালুকাক্ষরণ নিরীক্ষণ করিতে করিতে যাইতে লাগিল। আচার্য্যের পশ্চাতে পরিচারকগণ, কাহার হস্তে ব্যজন, কাহার হস্তে ক্ষুদ্র ছত্র, কাহার হস্তে পিকদানি, কাহারও হস্তে পানের বাটা। সর্ব্ব পশ্চাতে একখানি সুন্দর শিবিকা, বাহকস্কন্ধে হেলিতেছে দুলিতেছে। আর তাহার দুই পার্শ্বে চারি পাঁচ জন রক্ষক লাঠি শড়কি লইয়া শূন্য শিবিকা রক্ষা করিতে করিতে চলিতেছে।

রাজার বেশ ভূষা অতি সামান্য; মণি মুক্তা নাই, জরি জব্বড় নাই, সামান্য অধ্যাপকের ন্যায় একখানি পট্টবস্ত্র ত্রিকচ্ছ করিয়া পরিধান; গলায় উত্তরীয়, পদদ্বয়ে ভূর্জ্জপত্রের পাদুকা, হস্তে একটি যষ্টি। এক্ষণকার ব্যবহার দেখিয়া বিচার করিলে দণ্ডটি কিঞ্চিৎ দীর্ঘ বলিয়া বোধ হইবে—অনূন অর্দ্ধ হস্ত পরিমাণে দীর্ঘ অনুভব হইবে। রাজার লাঠি বলিয়া যে কিঞ্চিৎ দীর্ঘ, এমত নহে। ভদ্রলোক মাত্রের যষ্টি এইরূপ দীর্ঘ হইত। তৎকালের চৌকিদারের লাঠি মস্তক পরিমাণ হইত। বাহকের লাঠি স্কন্ধপরিমাণ হইত। ভদ্রলোকের যষ্টি প্রায় বক্ষপরিমাণ হইত।

রাজা দণ্ডটি মুষ্টিবদ্ধ করে—ধরিয়া চলিতেছিলেন, তৎকালের প্রথাই এইরূপ ছিল। সকল দ্রব্যই মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ধরিতে হইত, মুষ্টিবদ্ধ করিয়া কার্য্য করিতে হইত। তৎকালে অঙ্গুলির ব্যবহার বড় প্রচলিত হয় নাই। কারণ শিল্প জন্মে নাই। শিল্পের পূর্ব্বে কৃষী অবস্থায় সমাজের সকল কার্য্য মুষ্টিতেই চলে, অঙ্গুলির প্রয়োজন বড় অধিক হয় না। ভূমিখনন হইতে ঘণ্টাবাদন পর্য্যন্ত সকলই মুষ্টির কার্য্য। প্রহার মুষ্টি দ্বারা, ভিক্ষাদান মুষ্টি দ্বারা, লেখা (মুট কলম) মুষ্টি দ্বারা। কাজেই যষ্টি ধারণও মুষ্টি দ্বারা।

রাজা ইন্দ্রভূপ গৌরাঙ্গ পুরুষ, দীর্ঘ, ঈষৎ স্থূলকায়। চাহিবামাত্রই সর্ব্বাগ্রে তাঁহার নাসার প্রতি দৃষ্টি পড়ে। নাসা বিশেষ উন্নত নহে কিন্তু দীর্ঘ, ক্রমে উন্নত হয় নাই ভ্রূযুগ হইতে একই ভাবে

চলিয়া আসিয়াছে। ভ্রূ যুগ্ম। অঙ্গে কোথাও চন্দন নাই কিন্তু অনবরত সেই সদগন্ধ। বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চাশ বৎসর।

রাজা অতি মৃদুপাদবিক্ষেপে চলিতেছেন, দুই একবার মস্তক নাড়িতেছেন, আপনার মনের সঙ্গে আপনি কথা কহিতেছেন। রাজপথ দিয়া যে চলিতেছেন তাহা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন। এইরূপ কিয়দ্দূর গিয়া একস্থলে দাঁড়াইলেন। চারিদিকে নগরবাসীরা তাঁহাকে প্রণাম করিতেছে। রাজা তৎপ্রতি লক্ষ্য না করিয়া সঙ্গীদের জিজ্ঞাসা করিলেন, "গ্রহাচার্য্য কই?" গ্রহাচার্য্য অগ্রসর হইলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন "এক্ষণে কি যোগ?"

গ্রহাচার্য্য। ব্যতীপাত যোগ।

রাজা। আমার এক্ষণে কোন দশা?

গ্রহ। শনির শেষ দশা।

রাজা। কাহার অন্তর্দশা?

গ্রহ। মঙ্গলের।

রাজা মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "বটে বটে, আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম।"

রাজা এই বলিয়া আবার পূর্ব্বমত চলিলেন। কিন্তু ক্রমেই তাঁহার বিমর্ষ ভাব স্পষ্ট হইতে লাগিল।

রাজা যখন পশুশালায় ছিলেন, তখনই দিবাবসান হইয়াছিল। এক্ষণে শয়ন কাল উপস্থিত। গৃহে গৃহে শঙ্খধ্বনি হইতে আরম্ভ হইল। প্রথমে একটী দুইটি, এখানে সেখানে, ভগ্নস্বরে, নিম্নস্বরে, কম্পিত স্বরে, পরে একেবারে প্রতিগৃহে গম্ভীর স্বরে বাজিয়া উঠিল, শব্দে আকাশ পরিপূর্ণ হইল। রাজা আরও বিমর্ষ হইলেন। তাঁহার বোধ হইতে লাগিল, যেন মরণোন্মুখ কোন ভীষণ অসুর হতাশ স্বরে আর্ত্তনাদ করিতেছে। তাঁহার কর্ণে শঙ্খধ্বনি অমঙ্গলধ্বনি বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল।

রাজা আবার দাঁড়াইলেন। চূড়াধন বাবুকে ডাকিলেন। চূড়াধন বাবু সঙ্কোচিত ভাবে অগ্রসর হইলেন। রাজা বলিলেন, "আমার নিকটে আইস, আরও নিকটে আইস। তুমি আমার পিতামহের প্রপৌত্র আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, ইচ্ছা করে তোমায় আমি বুকে করি।" শেষ কথাগুলি ভগ্নস্বরে বলিয়া চূড়াধন বাবুর হস্ত ধারণ করিয়া রাজা চলিলেন; কতক দূর গিয়া রাজা চূড়াধনকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। "তুমি অরোগী হও, তুমি চিরজীবী হও।" চূড়াধন বাবু কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, নম্রমুখে সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। এমত সময় দেবমন্দিরে নহবদ বাজিয়া উঠিল। রাম সীতার আরতি আরম্ভ হইল। নগরবাসীরা ঠাকুর দর্শন করিতে বাহির হইল।

নহবদ, সানাই, কাঁশর, ঘণ্টা, শঙ্খ, মৃদঙ্গ সকল একেবারে বাজিতে লাগিল। বালকদিগের অন্তর নাচিয়া উঠিল, সকলে সেই দিকে ছুটিল, যে ছুটিতে পারিল না সে কাঁদিতে লাগিল। এক কুটীরসম্মুখে একটি বালিকা একা বসিয়া কাঁদিতেছে,

তাহার সহোদর তাহাকে লইয়া ক্রীড়া করিতেছিল বাদ্যোদ্যম হইবামাত্র ঠাকুর দর্শনে সে ছুটিয়া গিয়াছে, সঙ্গে লইয়া গেল না বলিয়া বালিকা কাঁদিতেছে। বালিকার বয়স প্রায় এক বৎসর, দরিদ্র-সন্তান কিন্তু হৃষ্টপুষ্ট, দেখিলেই বোধ হয় বড় স্নেহের ধন, অঙ্গে কোথাও ধূলার লেশ মাত্র নাই; নয়নে কজ্জল, ভ্রূযুগের মধ্যস্থানে একটি সূক্ষ্ম টীপ। মুখখানি অতি যত্নে মার্জ্জিত।

বালিকাকে কাঁদিতে দেখিয়া রাজা সেই স্থানে দাঁড়াইলেন। চূড়াধন বাবু রাজার ইচ্ছা অনুভব করিয়া বালিকাকে ভুলাইতে গেলেন। করতালি দিয়া বালিকাকে ক্রোড়ে আহ্বান করিলেন। বালিকা ভয় পাইয়া মুখ ফিরাইল, কুটীরে যাইবার নিমিত্ত পইঠায় উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ব্যাকুলিত স্বরে আরও কাঁদিতে লাগিল। রাজা তখন চূড়াধন বাবুকে সরিতে বলিয়া আপনি অগ্রসর হইলেন, দুই একবার ডাকিলেন, বালিকা ফিরিয়া দেখিল, দেখিবামাত্র দুই বাহু বিস্তার করিয়া হাসিল। একজন অধ্যাপক পশ্চাৎ হইতে বলিয়া দিলেন "কন্যাটি ব্রাহ্মণের সন্তান।" রাজা অতি আদরে বালিকাকে ক্রোড়ে লইয়া মুখচুম্বন করিলেন। কন্যাটি তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্তে করতালি দিয়া ঐক একবার পথের দিকে হস্ত বাড়াইয়া "ঐ ঐ" বলিতে লাগিল। রাজা বালিকার মুখচুম্বন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ঠাকুর দর্শন করিবে? চল, আমিও তোমার সঙ্গে ঠাকুর দর্শন করিব, অনেক দিন শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করি নাই, তোমার দ্বারা তিনি আমায় স্মরণ করাইয়া দিলেন। চল, তোমায় আমি বুকে করিয়া লইয়া যাই।" বালিকা আনন্দে হাসিতে লাগিল।

বালিকার গর্ভধারিণী জল আনিতে গিয়াছিল। কুটীরসম্মুখে অনেক গুলি ভদ্র লোকের সমাগম দেখিয়া অন্তরালে কলস কক্ষে দাঁড়াইয়া রহিল, কিছুই বুঝিতে পারিল না। সকলে চলিয়া গেলে ব্রাহ্মণী প্রতিবাসীদের নিকট সকল শুনিয়া মনে করিলেন, তাহার সন্তানকে রাজা আর ফিরাইয়া দিবেন না, অতএব রীতিমত কাঁদিতে বসিলেন।

রাজা কন্যাটিকে ক্রোড়ে লইয়া রাম-সীতার দ্বারে উপস্থিত হইলেন; সিংহ-দ্বারে নহবৎ বাজিতেছিল, বালিকা ঊর্দ্ধমুখে রাজাকে সেই বাদ্যস্থান দেখাইতে লাগিল। রাজা ক্রমে মন্দিরে উঠিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সকলেই সসম্মানে সরিয়া দাঁড়াইল। রাজা বালিকাকে বুক হইতে নামাইয়া অতি ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন। বালিকাটিও তাঁহার পার্শ্বে এক প্রকার শয়ন করিয়া প্রণাম করিল। প্রণাম করিতে করিতে রাজার প্রতি মুখ ফিরাইয়া দেখিতে লাগিল। রাজা উঠিলেন দেখিয়া বালিকাও উঠিয়া দাঁড়াইল। স্বর্ণালঙ্কারবিভূষিত দেবমূর্ত্তি দেখিয়া "ঐ ঐ" বলিয়া রাজাকে দেখাইতে লাগিল। আবার পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে লাগিল,

এই সময় বাদ্যোদ্যম স্থগিত হইল। বালিকা "যা—যা" বলিয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিল। শেষ রাজার জানু ধরিয়া দাঁড়াইল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন "ঘরে যাবে?" কন্যাটি আবার দেবমূর্ত্তির দিকে ক্ষুদ্র হস্ত নির্দ্দেশ করিয়া "ঐ ঐ" বলিতে লাগিল।

মন্দিরে একটী ব্রহ্মচারী উপস্থিত ছিলেন। তিনি অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "মহারাজ! সন্তানটি কি রাজকন্যা?" রাজা বলিলেন, "না।" এই বলিয়া বালিকাকে আবার পূর্ব্ব মত বুকে তুলিলেন। বালিকা বুকে উঠিয়া একবার রাজার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার পর রাজস্কন্ধে মস্তক রাখিয়া স্থিরভাবে রহিল। রাজা তখন ব্রহ্মচারীকে বলিলেন, "বালিকাটি কাহার কন্যা আমি তাহা এ পর্য্যন্ত জানি না, পথে কন্যাটি কাঁদিতেছিল, আমাকে দেখিয়া আমার ক্রোড়ে আসিল, কোনমতে আর কাহার ক্রোড়ে গেল না।"

ব্রহ্ম। আশ্চর্য্য! বালকদের ত এরূপ কখন দেখা যায় নাই, কখন অপরিচিত লোকের নিকট যায় না।

রাজা। বুঝি সন্তানটি নিদ্রা গেল। ইহার আত্মীয় কেহ আসিয়াছে?

"আসিয়াছে" বলিয়া একজন ব্রাহ্মণ যোড়করে সম্মুখে দাঁড়াইল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কন্যাটির কে হন?"

ব্রাহ্মণ। পিতা।

রাজা। আপনি বড় ভাগ্যধর। এ কন্যা আমার হইলে আমিও ভাগ্যধর মনে করিতাম। বুক হইতে নামাইতে ইচ্ছা করে না। কিন্তু আপনার কন্যা আমি কি বলিয়া রাখিব, নতুবা আমার ইচ্ছা করে আমি কন্যাটির লালনপালন করি।

এই কথায় ব্রাহ্মণ ভয়ে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল দেখিয়া একজন প্রতিবাসী বলিলেন, "মহারাজ, আপনি এ প্রদেশের রাজা, আমরা সকলেই আপনার সন্তানস্বরূপ। আপনি যাহাই ইচ্ছা করিবেন, তাহাই করিতে পারেন। আপনি যদি কন্যাটি গ্রহণ করেন, তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা আমাদের সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে। দরিদ্রের কন্যা আপনি ক্রোড়ে করিয়াছেন, ইহাতেই আমরা সকলেই চরিতার্থ হইয়াছি। দরিদ্রের প্রতি যে দেশে রাজার ঘৃণা নাই; সে দেশের প্রজা অপেক্ষা সুখী আর কোথায়?"

রাজা উত্তর দিবার পূর্ব্বেই চূড়াধন বলিলেন, "শিশুসম্বন্ধে রাজা প্রজা নাই, ধনবান্ দরিদ্র নাই। সন্তানমাত্রেই পবিত্র। যে শিশুকে ক্রোড়ে করে, সেই পবিত্র হয়, সেই চরিতার্থ হয়, সন্তানের কিছু গৌরব বৃদ্ধি হয় না।

রাজা বলিলেন, "তথাপি আমি কন্যাটিকে ক্রোড়ে করিয়াছি। আমার ক্রোড়ে করা ব্যর্থ হইবে না। কন্যাটি রাজকন্যার ন্যায় প্রতিপালিত হইবে। আমি তাহার বন্দোবস্ত আগামী প্রাতে করিয়া দিব।

আমার বড় যন্ত্রণা হইয়াছিল ; মন কাঁদিয়া উঠিতেছিল। কন্যাটি ক্রোড়ে করিয়া অবধি আমার সকল দুর্ভাবনা গিয়াছে। আবার স্বচ্ছন্দতা লাভ করিয়াছি ; কন্যাটী বড় চমৎকার, আমি আন্তরিক ভাল বাসিয়াছি। কন্যাটি যাহাতে সুখে থাকে, আমি তাহা অবশ্য করিব। এক্ষণে আপনার কন্যা আপনি লইয়া যান।" ব্রহ্মচারী বলিলেন, "দয়া! আশ্চর্য্য দয়া।"

দরিদ্র ব্রাহ্মন রাজার ক্রোড় হইতে কন্যাকে গ্রহণ করিতে সাহস করিল না। চূড়াধন বাবু কন্যাকে লইয়া ব্রাহ্মণকে সমর্পণ করিলেন। কন্যা নিদ্রা গিয়াছিল, চূড়াধন বাবুর হস্তে জাগ্রত হইয়া পিতৃ ক্রোড়ে গিয়া কাঁদিতে লাগিল। পিতা ভুলাইবার নিমিত্ত স্ত্রীলোকের ন্যায় "ও আয়, আয় রে" বলিয়া মাথা চাপড়াইতে লাগিলেন। কন্যাটি তাহাতে শান্ত হইল না। রাজা তখন অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "আমার ক্রোড়ে আসিবে ? আইস।" কন্যাটি এই আহ্বানে মাথা তুলিয়া রাজাকে দেখিল, দেখিবাই হস্ত-প্রসারণ করিয়া রাজক্রোড়ে যাইবার ইচ্ছা জানাইল। রাজা তৎক্ষণাৎ ক্রোড়ে লইলেন, বালিকা আবার পূর্ব্বমত রাজ-স্কন্ধে মাথা রাখিয়া নিদ্রা যাইতে লাগিল। সকলেই আশ্চর্য্য হইল, রাজাও আশ্চর্য্য হইলেন।

নিদ্রা কিঞ্চিৎ গাঢ় হইয়া আসিলে রাজা ব্রাহ্মণকে কন্যাটি প্রত্যর্পণ করিয়া বিদায় করিলেন। যাইবার সময় ব্রাহ্মণকে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কন্যাটির নাম কি ? ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন, "মাধবীলতা।"

চিত্তমুকুর।*

(পদ্যগ্রন্থ)

একবার একজন আয়র্লণ্ডদেশীর সহিত ইংরেজি কাব্য সম্বন্ধে আমাদের কথা হইতেছিল। ইংরেজি শিক্ষা গুণে আমরা তাঁহার সাক্ষাতে ইংরেজি কবিত্বের প্রশংসা করি। প্রশংসা তাঁহার অসহ্য হইল। তিনি ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন, "সে কি কথা ! ইংলণ্ড চিরসুখী, কখন কাঁদে নাই, ইংলণ্ডে কবিত্ব কি রূপে সম্ভব ?"

কথাটি কতদূর সত্য তাহা জানি না

* কলিকাতা ৪৪ নং বেনিয়াটোলা লেন, রায় যন্ত্রে শ্রীআশুতোষ ঘোষাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত। সন ১২৮৫। মূল ৷৹ আনা মাত্র। গ্রন্থকারের নাম লিখিত নাই।

তবে এই বলিতে পারা যায় যে, যে ব্যক্তি নিত্য অন্নধ্বংস করিয়া নিদ্রা গিয়াছে, এবং নিদ্রাভঙ্গে কেবল পান চিবাইয়াছে, যে শোক তাপ কিছুই জানে না, বা বুঝে না, কাব্যপ্রণয়নে তাহার অধিকার হয় না, প্রয়োজনও দেখি না। প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া যে লিখিতে যায়, কাব্যে সে অনধিকারী। প্রয়োজন বিবেচনায় যে কাঁদিতে বসে, সে ভাল কাঁদিতে পারে না। যে একান্ত অন্তরের জ্বালায় কাঁদে কেবল তাহারই চক্ষের জলে লোকে "আহা" বলে।

বোধ হয় চিত্তমুকুর লেখকের অন্তরে জ্বালা আছে। তিনি সেই জ্বালায় কাঁদিয়াছেন। অধিকাংশ কবিতা গুলি তাঁহার আন্তরিক ক্রন্দন। "কবিতা লিখেছি কত মনের বেদনে।" যাহাই তিনি লিখিতে গিয়াছেন, তাহাতেই যেন তাঁহার চক্ষে জল আসিয়াছে। সকল অবস্থাই তিনি দুঃখের চক্ষে দেখিয়াছেন; সকল অবস্থাতেই তিনি আপনার মর্ম্মবেদনা মিশাইয়াছেন। একস্থানে ভাটের ন্যায় স্তুতিপাঠ করিতে গিয়াও সেই মনোবেদনা কতক দেখাইয়াছেন।

দুই চারিটি কবিতা হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলে এ কথা প্রতিপন্ন হইবে।

উদাসীন নামক কবিতা হইতে উদ্ধৃত :—

"কিন্তু হায় এ পামর নির্ম্মম হৃদয়,
করুণা পরশে আর দ্রবিবার নয়।
পাষাণে বেঁধেছি প্রাণ পাষাণ রহিব,
এই তরু-তলে বসি একাকী কাঁদিব।
হইবে গভীর নিশি দূরে ঝিঁ ঝিঁরব,
আঁধারে ডুবিবে বিশ্ব জগত নীরব।
এই শুষ্ক তৃণদলে করিয়ে শয়ন।
খুলিয়ে প্রাণের দ্বার করিব রোদন।"

সলিল প্রতিমা হইতে উদ্ধৃত :—

""কত সাধ কত আশা, কত প্রেম ভালবাসা,
প্রাণেশ্বর নিরন্তর রেখেছি অন্তরে,
বারেক তোমায় যত্নে দেখাবার তরে;
সুচিকণ পুষ্প হার, গাঁথিয়াছি কতবার,
দোলাইতে তব গলে—কতই যতনে
কবিতা লেখেছি কত মনের বেদনে।
* * *
এতই বেদনা যদি, কেন দূরে নিরবধি,
এস কাছে প্রাণেশ্বর কাঁদি দুই জনে।
মুছাইব অশ্রুজল অঞ্চল বসনে
ধন নাই—দুখ তাই, ধনে প্রয়োজন নাই,
উভয়ে পরম সুখে রব তরুতলে'
পূরিল যুগল আঁখি পুনঃ অশ্রুজলে।"

দুঃখিনী রমণী হইতে উদ্ধৃত :—

"ইচ্ছা করে ছুটে যাই কানন-মাঝারে,
পড়িয়া তরুর তলে কাঁদি একাকিনী।
এ দুঃখ কহিব কারে নির্ম্মম সংসারে,
কে বুঝিবে—কে শুনিবে—আমারকাহিনী
* * *
ভাসাইয়া দেহ মোরে জাহ্নবীর নীরে,
এ মুখ দেখিয়া কেন পাইবে বেদন।
শুষ্ক পল্লবের মত যাইব ভাসিয়া,
প্রবল তরঙ্গ-স্রোতে সাগরের জলে।

এ ভগ্ন জীবন-তরি যাইবে ডুবিয়া,
দহিতে হবে না আর নিরাশা-অনলে।

* * *

শরবিদ্ধ বিহঙ্গিনী মর্ম্মবেদনায়,
অস্থির যখন পড়ি লতার বিতানে।
কে বুঝে কে দেখে তার তীব্র যন্ত্রণায়,
লুটায় সাপটি পক্ষ একাকী কাননে।

* * *

হেন চিত্রকর যদি থাকিত ভুবনে
হৃদয়ের প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিতে পারিত,
আশা তৃষ্ণা সুখ দুঃখ মনের বেদনে,
তুলিকায় চিত্রপটে হইত অঙ্কিত।
দগ্ধ হৃদয়ের ছবি তুলিয়া তোমারে
দেখাতেম সহোদরে যাতনা আমার,
দেখিতে জ্বলিছে চিতা হৃদয় মাঝারে,
আশা সুখ পরিবর্ত্তে দেখিতে অঙ্গার।"

কুলীন কামিনী হইতে উদ্ধৃত :—

"কি দুখে তটিনি! তুমি হেন শুষ্ক বেশে
করুণ সঙ্গীত তুলি, শৈলময় দেশে?
ললিত লহরী হায়,
বিষাদে মিশায়ে যায়,
সরস যৌবন মরি বিশুষ্ক এমন
কোন্ দুখে বল নদি এতেক বেদন।
হায় জানিতাম আমি অনন্ত সংসারে
একা অভাগিনী শুধু পাষাণে বিহরে,
শুষ্ক শুধু এই প্রাণ,
গায় বিষাদের গান,
লুকায়ে মরম জ্বালা কাঁদি নিরজনে।
একা অনাথিনী আমি অখিল ভুবনে!
তুমিও যে তটিনী রে আমারই মতন,
পাষাণে চাপিয়া বক্ষ কর সম্বরণ,
নির্দ্দয়ের পদতলে,
লুটাই নয়ন জলে,
নিষ্ঠুর গিরির পদে তুমি অভাগিনী।
লুটাইছ তরঙ্গিনি দিবস যামিনী।"

এইরূপ করুণরসের অবতারণা যে কেবল শিক্ষার গুণে বা যত্নের বলে হইয়াছে, এমত বোধ হয় না। কবির নিজের গুণে। ভাবের মধ্যে শোক তাঁহার মনে বিশেষ প্রবল বলিয়া বোধ হয়। এই জন্য করুণরসে তাঁহার এত অধিকার দেখা যায়। অন্য রসে যে তিনি সম্পূর্ণ বঞ্চিত এমত বলি না, তবে যে সকল রস তাঁহার চিত্ত স্পর্শও করে না সে সকল রস উদ্দীপন করিবার নিমিত্ত তিনি দুই এক স্থানে সময় নষ্ট করিয়াছেন, বোধ হয় তাহা কেবল অনুরোধে। কেন না লেখক আপনিই স্বীকার করিয়াছেন যে মধ্যে মধ্যে তিনি কাব্যের ফরমাইস্ লইয়া থাকেন। কিন্তু ফরমাইস বা চেষ্টা উভয়ই কবির পক্ষে কুপথ। যিনি তাহা অবলম্বন করিয়াছেন, তিনিই নিষ্ফল হইয়াছেন। "কাব্য কি?" যাঁহারা জানেন না, তাঁহারাই কাব্য লিখিতে চেষ্টা পান, বা লিখিবার নিমিত্ত অন্যকে অনুরোধ করেন। যে রস মনে কখন আসে নাই, সে রস অনুরোধে বা চেষ্টায় কি রূপে বর্ণিত হইবে। বোধ হয় তাঁহারা বলিবেন অনুভব দ্বারা। সত্য, মনে কোন ভাবের উদ্দীপন হইলে তাহার

দুই একটী কার্য্যকেলি অনুভব করা যাইতে পারে। কিন্তু যে স্থলে ভাব কি রস কিছুই নাই,সে স্থলে কে তাহার ক্রিয়া অনুভব করাইবে। যে স্থলে মেঘ নাই, সে স্থলে কে বৃষ্টি বর্ষণ করিবে? যদি তুমি জল ছিটাইয়া বল, এই বৃষ্টি হইল দুই একটী বালক ভিন্ন কে তোমার কথা বিশ্বাস করিবে? ইদানীং বাঙ্গালার অধিকাংশ কাব্যলেখক যে কবি নহেন তাহার কারণ এই। অনেকে জল ছিটাইয়া বলেন, বৃষ্টি করিলাম, ভাব বা রস কিছুই তাঁহাদের নাই, কেবল অনুভবের উপর তাঁহাদের নির্ভর। যে কখন স্বচক্ষে পর্ব্বত কি সমুদ্র দেখে নাই সে তাহা কি অনুভব করিবে? অন্যের মুখে যাহা শুনিয়াছে বা অন্যের গ্রন্থে যাহা পাঠ করিয়াছে তাহাই লিখিবে? চর্ব্বণে যাহার রস গিয়াছে তাহাই আবার পুনশ্চর্ব্বিত করিবে। পর্ব্বতে কি সমুদ্রে কাব্যরস নাই। তাহা কেবল দর্শকের অন্তরে থাকে। পর্ব্বত কি সমুদ্র দেখিলে চিত্তের যে চাঞ্চল্য জন্মে তাহাই কাব্যরস। যে পর্ব্বত বা সমুদ্র দেখিল না,কেবল অন্যের মুখে শুনিল,সে এ চাঞ্চল্য কোথা পাইবে, অনুভবে তাহা সম্ভবে না। কাজেই অনুরোধে কাব্যের সৃষ্টি হইতে পারে না।

সমুদ্র কি পর্ব্বত দেখিলেও অনেকের চিত্তে কোন চাঞ্চল্য জন্মে না এই জন্য সকলে কবি হইতে পারে না। যাঁহার চক্ষে পর্ব্বত কেবল প্রস্তরস্তূপ, সমুদ্র কেবল জলরাশি, কাব্যে তাঁহার অনধিকার, তিনি অন্য ব্যবসা করুন। সমুদ্র কি পর্ব্বত দেখিলে কবিদের চিত্ত একরূপ চঞ্চল হয় না; ভিন্ন কবির ভিন্ন রূপ হয়। এই জন্য কবি নানা প্রকার, কাব্যও নানা প্রকার। সমুদ্র ও পর্ব্বতের কথা উদাহরণ স্বরূপ আমরা উল্লেখ করিলাম। সমুদ্র ও পর্ব্বতের কথা যাহা বলা গেল, বাহ্যবস্তু মাত্রেরই কথা সেইরূপ বলা যাইতে পারে। সঙ্গীত বা শব্দ সম্বন্ধেও সেইরূপ বলা যাইতে পারে।

মূল কথা, ফরমাইসে কাব্য হয় না। চিত্তের চাঞ্চল্য না জন্মিলে কাব্য জন্মে না। চিত্তের কোন বেগ নাই, অথচ আমাদের কবিরা কাব্য প্রণয়ন করেন। কেহ বা অন্যের বেগ গ্রহণ করিয়া লেখেন, অর্থাৎ অন্য কবি আপন চিত্তের বেগে যাহা লিখিয়াছেন,তাহাই তাঁহারা অনুকরণ করেন। অনুকরণ অন্য বিষয়ে যাহাই হউক কাব্য সম্বন্ধে দোষের। অথচ অধিকাংশ কবি কিছু না কিছু নকল করেন। চিত্তমুকুরের লেখক দুই একটী ভাব বোধ হয় অন্য কবি হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। পুরন্দরের দৌত্য নামক কবিতায় এক স্থলে লিখিত হইয়াছে—

"আঘাতি অনল ছটা কন্দরে কন্দরে,
ভ্রমে যথা ক্ষণপ্রভা পর্ব্বত প্রদেশে,"

এই ভাব হেম বাবুর বিদ্যুৎ হইতে নীত। হেম বাবুর বিদ্যুৎ দেখুনঃ—

কিম্বা গিরিশৃঙ্গ বাজি
মধ্যে-যথা তেজে সাজি

ক্ষণপ্রভা খেলে রঙ্গে করি ঘোর ঘটা
খেলে রঙ্গে ভীমভঙ্গি,
শিখর শিখর লঙ্ঘি,
শৈলে শৈলে আঘাতিয়া স্থূল তীক্ষ্ণ ছটা॥"

এই অনুকরণটি নিতান্ত দোষের নয়। আর একস্থানে (৯৬ পৃষ্ঠা) আমাদের গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—

"এস তবে শশধর নামিয়া ভূতলে,
লিখে দিই তব অঙ্গে দুইটি চরণ
হেরিলে তোমার পানে, পড়িবে নয়নে তার
প্রাণের লুকান কথা, বুঝিবে বেদন।"

ইংরেজি কবি মুর এই ভাবটী লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল—

Sweet Moon! if, like Crotona's sage,
By any spell my hand could dare
To make thy disc its ample page,
And write my thoughts my wishes there;
How many a friend whose careless eye
Now wanders o'er that starry sky,
Should smile upon thy orb to meet
The recollection kind and sweet,
The reveries of fond regret,
The promise never to forget,
And all my heart and soul would send
To many a dear loved distant friend.

ইহা ভিন্ন অন্য দুই এক স্থলেও অনুকরণ আছে।

অনেক প্রধান প্রধান কবিরা অনুকরণ করিয়া গিয়াছেন। অনুকরণ নিমিত্ত বিশেষ দোষ দিই না। তবে এই বলি, যে এই গ্রন্থকারের ক্ষমতা আছে, ইনি দোষটি বর্জ্জন করিলে করিতে পারেন।

যে সকল কবিতা উদ্ধৃত করা গিয়াছে, তাহা করুণরসবিশিষ্ট। অন্য দিকে চিত্তমুকুর-লেখকের কিরূপ ক্ষমতা আছে, তাহা দেখাইবার নিমিত্ত আর দুই তিনটি অংশ উদ্ধৃত করা গেল।

গ্রন্থের প্রারম্ভে রাজপুতকুলকলঙ্ক জয়চন্দ্রের মানসিকভাবব্যঞ্জক একটি চিত্র আছে; তাহার এক স্থান বড় সুন্দর। স্বীয় দুষ্কৃতিচিন্তামগ্ন জয়চন্দ্র গভীর রাত্রে একাকী উদ্যানে ভ্রমণ করিতে করিতে সহসা—

"ত্যজিল সুদীর্ঘ শ্বাস চাহি শূন্যপানে,
নিবাবার তরে যেন গগনের আলো;
ভাবিল আলোকরাশি পশিয়া পরাণে,
অদৃশ্য ভাবনাগুলি করিছে উজ্জ্বল।
মুদিল নয়ন পুনঃ আবরিয়া কর,
কিন্তু হৃদয়েতে যাহা হয়েছে অঙ্কিত
মুদিলে নয়ন কেন হইবে অন্তর!
বরং উজ্জ্বলতর হবে অনুভূত।

(সমরসাহী-বিদায় হইতে)

মধুর সায়াহ্নে, প্রমোদ উদ্যানে,
সরসী-সলিলে, সঙ্গিনীর সনে,
সুবর্ণ তরীতে, হরষিত চিতে,
চিতোরের রাণী পূর্ণা বিহরে।

হৃদয়ের হর্ষ বিকাশে নয়নে,
চারু মৃদু হাসি ফুটিছে বদনে,
কুঞ্চিত কপোলে, যৌবন উথলে,
রজতের দাঁড়, শোভিছে করে।

মত্ত হংসরাজ, গ্রীবা উচ্চ করি,
আসিছে সাঁতারি পরশিতে তরী,
তরী বহি যায়, ধ[illegible]ন,
উঠে হাস্যধ্বনি, রমণী-মণ্ডলে।

এই সমরসাহী'বিদায় সুকবির রচনা. ইহা সমুদয় উদ্ধৃত করিবার মানস ছিল, কিন্তু স্থানাভাব।

স্থানান্তরে—

নিবিড় তরুর তলে শ্যাম দুর্ব্বাদলে
পড়িয়া শীতল ছায়া শান্তি-স্বরূপিণী,
বৃন্তে বৃন্তে ফুল গুলি, আনন্দে পড়েছে ঢলি,
অদূরে উঠিছে ধীরে মানবের ধ্বনি,
বোধ হইল যেন আজ নবীন ধরণী।

দেখিনু শিশিরবিন্দু গোলাপের দলে
কিরণে উজ্জ্বল হয়ে ঢল ঢল করে,
গোলাপ পড়িল হেলে, শিশির পড়িল ঝুলে,
দেখিতে দেখিতে বিন্দু খসিয়া পড়িল,
সূক্ষ্ম বৃন্তে চারু পুষ্প নাচিয়া উঠিল।

চিত্তমুকুর পাঠ করিয়া আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিয়াছে, যে লেখক সুকবি। এক্ষণে তাঁহার যে সকল দোষ আছে তাহা সামান্য, বোধ হয়, পরে তাহা কিছুই থাকিবে না। এই পুস্তক গ্রন্থকারের প্রথম উদ্যম। তিনি যে প্রথম উদ্যমেই অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই। গ্রন্থকার সাধারণের উৎসাহের পাত্র।

লোকশিক্ষা।

লোকসংখ্যা গণনা করিয়া জানা গিয়াছে, যে বাঙ্গালা দেশে না কি ছয় কোটি ষাটি লক্ষ মনুষ্য আছে। ছয় কোটি ষাটি লক্ষ মনুষ্যের দ্বারা সিদ্ধ না হইতে পারে, বুঝি পৃথিবীতে এমন কোন কার্য্যই নাই। কিন্তু বাঙ্গালির দ্বারা কোন কার্য্যই সিদ্ধ হইতেছে না। ইহার অবশ্য কোন কারণ আছে। লৌহ অস্ত্রে পরিণত হইলে তদ্দ্বারা প্রস্তর পর্য্যন্ত বিভিন্ন করা যায়, কিন্তু লৌহ মাত্রেরই ত সে গুণ নাই। লৌহকে নানাবিধ উপাদানে প্রস্তুত, গঠিত, শাণিত করিতে হয়। তবে লৌহ ইস্পাত হইয়া কাটে। মনুষ্যকে প্রস্তুত, উত্তেজিত, শিক্ষিত করিতে হয়,

তবে মনুষ্যের দ্বারা কার্য্য হয়। বাঙ্গালার ছয় কোটি ষাটি লক্ষ লোকের দ্বারা যে কোন কার্য্য হয় না, তাহার কারণ এই যে বাঙ্গালায় লোক-শিক্ষা নাই। যাঁহারা বাঙ্গালার নানাবিধ উন্নতিসাধনে প্রবৃত্ত, তাঁহারা লোকশিক্ষার কথা মনে করেন না, আপন আপন বিদ্যা বুদ্ধি প্রকাশেই প্রমত্ত। ব্যাপার বড় অল্প আশ্চর্য্য নহে।

ইহা কখন সম্ভব নহে, যে বিদ্যালয়ে পুস্তক পড়াইয়া, ব্যাকরণ সাহিত্য জ্যামিতি শিখাইয়া, সপ্তকোটি লোকের শিক্ষাবিধান করা যাইতে পারে। সে শিক্ষা শিক্ষাই নহে, এবং সে উপায়ে এ শিক্ষা সম্ভবও নহে। চিত্তবৃত্তি সকলের প্রকৃত অবস্থা, স্ব স্ব কার্য্যে দক্ষতা, কর্ত্তব্য কার্য্যে উৎসাহ, এই শিক্ষাই শিক্ষা। আমাদিগের এমনি একটুকু বিশ্বাস আছে, যে ব্যাকরণ জ্যামিতিতে সে শিক্ষা হয় না এবং রামমোহন রায় হইতে ফটিকচাঁদ স্কোয়ার পর্য্যন্ত দেখিলাম না, যে কোন ইংরেজী নবীস সে বিষয়ে কোন কথা কহিয়াছেন।

ইউরোপে এইরূপ লোকশিক্ষা নানাবিধ উপায়ে হইয়া থাকে। বিদ্যালয়ে প্রুসিয়া প্রভৃতি অনেক দেশে আপামর সাধারণ সকলেরই হয়। সম্বাদপত্র সে সকল দেশে লোকশিক্ষার একটী প্রধান উপায়। সম্বাদপত্র লোকশিক্ষার যে কিরূপ উপায়, তাহা এ দেশীয় লোক সহজে অনুভব করিতে পারেন না। এদেশে এক এক ভাষায় খান দশ পোনের সম্বাদ পত্র, কোন খানির গ্রাহক দুই শত, কোনখানির গ্রাহক পাঁচ শত, পড়ে পাঁচ সাত হাজার লোক। ইউরোপে এক এক দেশে সম্বাদপত্র শত শত, সহস্র, সহস্র। এক এক খানির গ্রাহক সহস্র, সহস্র, লক্ষ, লক্ষ। পড়ে লক্ষ লক্ষ, কোটি, কোটি লোক। তার পর নগরে নগরে সভা, গ্রামে গ্রামে বক্তৃতা। যাহার কিছু বলিবার আছে, সেই প্রতিবাসী সকলকে সমবেত করিয়া সে কথা বলিয়া শিখাইয়া দেয়। সেই কথা আবার শত শত সম্বাদপত্রে প্রচারিত হইয়া শত শত ভিন্ন গ্রামে, ভিন্ন নগরে প্রচারিত, বিচারিত এবং অধীত হয়; লক্ষ লক্ষ লোক সে কথায় শিক্ষিত হয়। এক একটা ভোজের নিমন্ত্রণেই স্বাদু খাদ্য চর্ব্বণ করিতে করিতে ইউরোপীয় লোকে যে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, আমাদের তাহার কোন অনুভবই নাই। আমাদিগের দেশের যে সম্বাদপত্র সকল আছে, তাহার দুর্দ্দশার কথা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বক্তৃতা সকল ত লোকশিক্ষার দিক্ দিয়াও যায় না; তাহার বহু কারণের মধ্যে একটি প্রধান কারণ এই, যে তাহা কখন দেশীয় ভাষায় উক্ত হয় না। অতি অল্প লোকে শুনে, অতি অল্প লোকে পড়ে, আর অল্প লোকে বুঝে, আর বক্তৃতা গুলি অসার বলিয়া আরও অল্প লোকে তাহা হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়।

এক্ষণকার অবস্থা এইরূপ হইয়াছে

বটে, কিন্তু চিরকাল যে এদেশে লোক-শিক্ষার উপায়ের অভাব ছিল, এমত নহে। লোকশিক্ষার উপায় না থাকিলে শাক্যসিংহ কি প্রকারে সমগ্র ভারতবর্ষকে বৌদ্ধধর্ম্ম শিখাইলেন? মনে করিয়া দেখ, বৌদ্ধধর্ম্মের কূটতর্ক সকল বুঝিতে আমাদিগের আধুনিক দার্শনিকদিগের মস্তকের ঘর্ম্ম চরণকে আর্দ্র করে, মক্ষমূলর যে তাহা বুঝিতে পারেন নাই, কলিকাতা রিবিউতে তাহার প্রমাণ আছে। সেই কূটতত্ত্বময়, নির্ব্বাণবাদী, অহিংসাত্মা, দুর্ব্বোধ্য ধর্ম্ম, শাক্যসিংহ এবং তাঁহার শিষ্যগণ সমগ্র ভারতবর্ষকে, গৃহস্থ, পরিব্রাজক, পণ্ডিত, মূর্খ, বিষয়ী উদাসীন, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, সকলকে শিখাইয়াছিলেন। লোকশিক্ষার কি উপায় ছিল না? শঙ্করাচার্য্য সেই দৃঢ়বদ্ধমূল দিগ্‌বিজয়ী সাম্যময় বৌদ্ধধর্ম্ম বিলুপ্ত করিয়া আবার সমগ্র ভারতবর্ষকে শৈবধর্ম্ম শিখাইলেন —লোকশিক্ষার কি উপায় ছিল না? সে দিনও চৈতন্যদেব সমগ্র উৎকল বৈষ্ণব করিয়া আসিয়াছেন। লোকশিক্ষার কি উপায় হয় না? আবার এ দিকে দেখি, রামমোহন রায় হইতে কালেজের ছেলের দল পর্য্যন্ত সাড়ে তিন পুরুষ ব্রাহ্মধর্ম্ম ঘুষিতেছেন। কিন্তু লোকে ত শিখে না। লোকশিক্ষার উপায় ছিল, এখন আর নাই।

একটা লোকশিক্ষার উপায়ের কথা বলি—সে দিনও ছিল—আজ আর নাই। কথকতার কথা বলিতেছি। গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে বেদী পিঁড়ীর উপর বসিয়া ছেঁড়া তুলট, না দেখিবার মানসে সম্মুখে পাতিয়া, সুগন্ধি মল্লিকা মালা শিরোপরে বেষ্টিত করিয়া, নাদুস নুদুস কালো কথক সীতার সতীত্ব, অর্জ্জুনের বীরধর্ম্ম, লক্ষ্মণের সত্যব্রত, ভীষ্মের ইন্দ্রিয়জয়, রাক্ষসীর প্রেমপ্রবাহ, দধিচীর আত্মসমর্পণ বিষয়ক সুসংস্কৃতের সদ্ব্যাখ্যা সুকণ্ঠে সদলঙ্কার সংযুক্ত করিয়া আপামর সাধারণ সমক্ষে বিবৃত করিতেন। যে লাঙ্গল চষে, যে তুলা পেঁজে, যে কাটনা কাটে, যে ভাত পায় না পায়, সেও শিখিত—শিখিত যে ধর্ম্ম নিত্য, যে ধর্ম্ম দৈব, যে আত্মান্বেষণ অশ্রদ্ধেয়, যে পরের জন্য জীবন, যে ঈশ্বর আছেন, বিশ্বসৃজন করিতেছেন, বিশ্বপালন করিতেছেন, বিশ্বধ্বংস করিতেছেন, যে পাপ পুণ্য আছে, যে পাপের দণ্ড পুণ্যের পুরস্কার আছে, যে জন্ম আপনার জন্য নহে পরের জন্য, যে অহিংসা পরম ধর্ম্ম, যে লোকহিত পরম কার্য্য—সে শিক্ষা কোথায়? সে কথক কোথায়? কেন গেল? বঙ্গীয় নব্য যুবকের কুরুচির দোষে। গুল্‌কি কাওরাণী শূয়ার চরাইতে অপারগ হইয়া কুপথ অবলম্বন করিয়াছে। তাহার গান বড় মিষ্ট লাগে, কথকের কথা শুনিয়া কি হবে? দক্ষযজ্ঞে, বিশ্বযজ্ঞে ঈশ্বরের জন্য ঈশ্বরীর আত্মসমর্পণ শুনিয়া কি হইবে? চল ভাই, ব্রাণ্ডি টানিয়া থিয়েটারে গিয়া কাওরাণীর টপ্পা শুনিয়া আসি। এই অল্প ইংরেজিতে শিক্ষিত, স্বধর্ম্মভ্রষ্ট,

কদাচার, দুরাশয়, অসার; অনালাপ্য, বঙ্গীয় যুবকের দোষে লোকশিক্ষার পরম আকর কথকতা লোপ পাইল। ইংরেজী শিক্ষার গুণে লোকশিক্ষার উপায় ক্রমে লুপ্ত ব্যতীত বর্দ্ধিত হইতেছে না।

কিন্তু আসল কথা বলি। কেন যে এ ইংরেজী শিক্ষাসত্ত্বেও বাঙ্গালা দেশে লোকশিক্ষার উপায় হ্রাস ব্যতীত বৃদ্ধি পাইতেছে না, তাহার স্থূল কারণ বলি—শিক্ষিতে অশিক্ষিতে সমবেদনা নাই। শিক্ষিত অশিক্ষিতের হৃদয় বুঝে না। শিক্ষিত অশিক্ষিতের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না। মরুক্ রামা লাঙ্গল চষে, আমার ফাউলকারি সুসিদ্ধ হইলেই হইল। রামা কিসে দিনযাপন করে, কি ভাবে, তার কি অসুখ, তার কি সুখ তাহা নদের ফটিকচাঁদ তিলার্দ্ধ মনে স্থান দেন না। বিলাতে কাণা ফসেট্ সাহেব এ দেশে সার অ্যাসলি ইডেন্ ইঁহারা তাঁহার বক্তৃতা পড়িয়া কি বলিবেন, নদের ফটিকচাঁদের সেই ভাবনা। রামা চুলোয় যাক্, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। তাঁহার মনের ভিতর যাহা আছে, রামা এবং রামার গোষ্ঠী—সেই গোষ্ঠী ছয়কোটি যাটি লক্ষের মধ্যে ছয় কোটী উনষাটি লক্ষ নব্বই হাজার নরশ—তাহারা তাঁহার মনের কথা বুঝিল না। যশ লইয়া কি হইবে? ইংরেজে ভাল বলিলে কি হইবে? ছয়কোটি ষাটলক্ষের ক্রন্দনধ্বনিতে আকাশ যে ফাটিয়া যাইতেছে—বাঙ্গালায় লোক যে শিখিল না। বাঙ্গালায় লোক যে শিক্ষিত নাই, ইহা সুশিক্ষিত বুঝেন না।

সুশিক্ষিত যাহা বুঝেন, অশিক্ষিতকে ডাকিয়া কিছু কিছু বুঝাইলেই লোক শিক্ষিত হয়। এই কথা বাঙ্গালার সর্ব্বত্রে প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু সুশিক্ষিত অশিক্ষিতের সঙ্গে না মিশিলে তাহা ঘটিবে না। সুশিক্ষিতে অশিক্ষিতে সমবেদনা চাই।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

শরীরপালন। ডাক্তার শ্রীযদুনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ৮ম সংস্করণ। চিকিৎসা প্রকাশ যন্ত্র সন ১২৮৫।

আগা মুণ্ড নাটক নবেল লিখিয়া নব্য বাবুগণ দেশের কি উপকার করেন, তাহা বলিতে পারি না। নাটক নবেল, অতিশয় উৎকৃষ্ট এবং লোকহিতকর সামগ্রী সন্দেহ নাই—যদি ভাল হয়। কিন্তু ভাল নাটক নবেল লিখিতে পারে এমন লোক শত বৎসরে একজন জন্মে কি না সন্দেহ।

সকল প্রকার প্রতিভাব অপেক্ষা সাহিত্যের উজ্জ্বলকারী প্রতিভাই দুর্লভ। কিন্তু বাঙ্গালায় যে কলম ধবিতে শিখিয়াছে সেই কাব্য নাটক উপন্যাসেব প্রণেতা। এই সম্প্রদায়েব লোককে আমবা পবামর্শ দিই, যে যদি তাঁহাদিগের সাধ্য থাকে তবে অন্য পথ ছাড়িয়া যদু বাবুব অনুকবণ করুন। যাহা লোকহিতকর, তাহাতে মনোযোগ দিন। বস্তুতঃ বিবেচনা কবিয়া দেখিলে যদুবাবুব ন্যায় কোন বাঙ্গালি লেখকই দেশেব হিতে নিযুক্ত নহেন। "ধাত্রীশিক্ষা" "চিকিৎসাদর্পণ" "শবীবপালন" প্রভৃতি গ্রন্থে চিকিৎসা শাস্ত্রেব দুরূহ ব্যাপাব সকল তিনি জনসাধাবণেব বোধগম্য কবিয়া সকলকে আত্মবক্ষায় সক্ষম করিয়াছেন। যে একজন মনুষ্যেব জীবন রক্ষা কবে সে মনুষ্যলোকে ধন্য— যদু বাবুব এই সকল পুস্তকে বহুলোকেব জীবন ও স্বাস্থ্য রক্ষা হইয়াছে অতএব বাঙ্গালি লেখকের মধ্যে তাঁহাব তুল্য লোকহিতকর আব কাহাকেই দেখি না।

বিশেষ এবিষয়ে তাঁহার উদ্যম, সাহস ও অধ্যবসায় অত্যন্ত প্রসংশাব বিষয়। এক চিকিৎসা কল্পদ্রুমে যে ব্যয়, পবিশ্রম, ও ক্ষতি স্বীকার তাহা আব কোন লেখকই সহ্য কবিতে পারেন না। এরূপ কার্য্যে যশ বা ধনলাভ নাই—কেন না সাধারণ পাঠকে ইহাব কিছুই বুঝে না পড়ে না বা উৎসাহ দেয় না। যিনি পুরস্কারের আকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া লোকের হিতে নিযুক্ত তিনিই যথার্থ মহাত্মা।

তাঁহার সকল গ্রন্থের মধ্যে ধাত্রীশিক্ষা ও শবীবপালন সর্ব্বাপেক্ষা লোকেব উপকাবী। ধাত্রীশিক্ষাব পবিচয় আমবা পূর্ব্বে দিয়াছি। তদপেক্ষা শবীবপালন আরও লোকহিতকর। আমবা যে সকল দৈনিক ক্রিয়া কবিয়া থাকি—স্নান, আহার, পান, শয়ন, নিদ্রা, সকলেতেই আমরা প্রায় প্রত্যহ স্বাভাবিক নিয়ম লঙ্ঘন কবিয়া থাকি—নিয়ম লঙ্ঘন করি বলিয়াই তাহার ফলে পীড়া জন্মে। আমাদিগের দেশে যে সকল রোগ সকলই রুগ্ন, জরজীর্ণ কান্তিব ক্ষীণজীবী তাহাব একমাত্র কাবণ দেশের দুরবস্থাবশত, এবং দেশাচারের দৌরাত্ম্যবশতঃ স্বাভাবিক নিয়ম সকলের উল্লঙ্ঘন। লোকেব দুরবস্থাব কাবণে যে সকল নিয়মেব ব্যতিক্রম ঘটে, শত সহস্র বিধান দিলেও তাহাব পালন হইবে না। যাহার অন্ন যোটে না, তাহাকে সহস্র বাব উত্তম আহাবেব ব্যবস্থা দিলেও তাহার স্বাস্থ্যবক্ষাব উপায় হইবে না। যে দেশে কোন গৃহই শুষ্ক হয় না, সে দেশে শুষ্ক গৃহে বাসের বিধান বৃথা। কিন্তু সকল নিয়মই এরূপ নহে। অধিকাংশ নিয়ম লঙ্ঘনের কারণ, লোকেব অজ্ঞতা, এবং প্রচলিত রীতি। এই সকল কুসংস্কার দূর করিলে জনসাধারণের বিশেষ মঙ্গলের সম্ভাবনা। এ শিক্ষা বালক যুবা বৃদ্ধ বণিতা সকলেবই হওয়া উচিত। এ দেশে কাহারও হয় না। শরীব-

বঙ্গদর্শন।

ষষ্ঠ বৎসর।

মন্দর পর্ব্বত।*

কয়েক মাস গত হইল, বঙ্গদর্শনে "বঙ্গের উন্নতি" নামক প্রবন্ধে 'মন্দরপর্ব্বতের নিকট প্রথমে আর্য্যেরা বাস করিয়াছিলেন,' উল্লেখ করা হইয়াছিল। কাম্বে উপসাগরের উপকূলে নর্ম্মদা নদীর সঙ্গম হইতে, বাঙ্গালার পশ্চিমোত্তর ভাগীরথীর মোহানা পর্য্যন্ত বিন্ধ্যাচল ব্যাপ্ত আছে। এই অচল রাজমহলের নিকট হইতে বক্রগতিতে ক্রমে দক্ষিণাভিমুখে বীরভূম, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের পশ্চিম দিয়া উড়িষ্যাপ্রদেশে নীলাচল নামে খ্যাত হইয়া, পরে মহেন্দ্র অর্থাৎ পূর্ব্বঘাট পর্ব্বতের সহিত মিলিয়াছে। সুতরাং ভারতবর্ষকে বিন্ধ্যাচল উত্তর দক্ষিণে দ্বিধাকৃত করিয়াছে। মন্দরভূধর এই বিন্ধ্যগিরির অন্যতর শিখর। ব্লাণ্ডফোর্ড্ প্রভৃতি ভূতত্ত্ববিদেরা বিন্ধ্যগিরিকে হিমাচল অপেক্ষা প্রাচীন অনুভব করিয়াছেন। যখন বিন্ধ্যগিরি উন্নতমস্তকে যেন দিবাকরের গতিরোধের উদ্যোগে ছিলেন, তখন নগাধিরাজ হিমবানের এক্ষণকার ন্যায় আধিপত্য হয় নাই। বিন্ধ্যাচলের গঠনে যে প্রস্তরসমূহ দেখা যায়, তাহা ভূগর্ভে অতিশয় নিম্নস্তরে লক্ষিত হয়, কিন্তু হিমালয় তদপেক্ষা উচ্চস্তরের প্রস্তর-গঠিত এবং তাহা অপেক্ষাকৃত ভঙ্গুর। অতএব হিমাচলের সৃষ্টির পূর্ব্বে বিন্ধ্যের উদ্ভব বোধ হয়। কিন্তু উন্নতি বা অবনতি কাহারও চিরদিন থাকে না। কখন সামান্য পশু-পদ-দলিত সমতলক্ষেত্র ক্রমশঃ উচ্চ পর্ব্বতমালায় পরিণত হইয়া অভ্রভেদ করিতেছে, কখন বা চন্দ্রসূর্য্যের গতিরোধকারী অচলরাজও ক্রমে নতশির হইয়া অবশেষে প্রান্তরের আকার ধারণ করিয়াছে। ফলতঃ রাসায়নিক প্রক্রিয়া

* Asiatic Society's Journal vol. xx.

দ্বারা উপর্য্যুপরি জলবায়ুর ঘাত প্রত্যভিঘাতে পর্ব্বতস্থ প্রস্তরখণ্ডসমূহ শিথিল হইয়া থাকে। পরে বেগবতী স্রোতস্বতী শিলাখণ্ড সকলকে চূর্ণীকৃত করিয়া সাগরাভিমুখে লইয়া ফেলে। এইরূপে কোথাও বা অধিত্যকা নিম্ন হইতেছে, কোথাও জলধি-ক্রোড়স্থ নদীমাতৃক প্রদেশ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া বিস্তৃত রাজ্য, নগরমালাবিরাজিত বাণিজ্য ব্যবসায়ীর আবাসভূমি হইতেছে। বিন্ধ্যাচল এক সময় হিমাচল অপেক্ষা উন্নতশির ছিল। পুরাণে দেখা যায়, যে বিন্ধ্যগিরি চন্দ্র সূর্য্যের গতিরোধ করায় দেবতারা বিন্ধ্যের গুরু অগস্ত্য ঋষিকে চন্দ্র সূর্য্যের নির্ব্বিঘ্নে গমনজন্য উপায় করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন; তাহাতে অগস্ত্য বিন্ধ্যের নিকট উপস্থিত হইলে অচল প্রণাম করিল। অগস্ত্য "তিষ্ঠ" বলিয়া চলিয়া গেলেন। সেই অবধি বিন্ধ্যাচল হেঁটমস্তক। গল্পটি অপ্রকৃত হইলেও এই প্রবাদ দ্বারা বুঝা যাইতেছে, যে বিন্ধ্যাচলের অবস্থান্তর ঘটিয়াছে। ক্রমেই হেঁট মস্তক।

পূর্ব্বে আর্য্যের আবাসভূমি বিন্ধ্যের উত্তরে সপ্তসিন্ধু ও সুরনদীর তীরে ছিল। তখন নর্ম্মদা গোদাবরী ও কাবেরী তীর্থ হইয়া উঠে নাই। দাক্ষিণাত্যে ও বাঙ্গালায় আর্য্যেরা প্রায় এককালীন বসতি আরম্ভ করেন। গঙ্গাসাগর ও কামাখ্যা সেই সময় পুণ্যস্থান হইয়া উঠিল। বেদে এ সকল তীর্থের উল্লেখ নাই। পুরাণে অপর তীর্থের নাম আছে, কেবল যোগিনী তন্ত্রে কামাখ্যার কথা সবিস্তারে আছে।

অগস্ত্য বিন্ধ্যাচলকে "তিষ্ঠ" বলিয়া দক্ষিণ দেশে চলিয়া যান, আর ফিরিয়া আসেন নাই। ইহাতে অনুভব করিলে করিতে পারা যায়, যে অগস্ত্যই দক্ষিণাপথে প্রথম আর্য্য-উপনিবেশ স্থাপন করেন। অযোধ্যাপতি রামচন্দ্র লঙ্কাজয় করিয়া দক্ষিণাঞ্চলে আর্য্যনিবাস স্থাপন করেন নাই। ইহার একটি প্রমাণ এই—যদি রামায়ণাদি গ্রন্থ সত্যমূলক বলিয়া প্রতীত হয়, এবং এক্ষণকার পুরাবিদেরাও তাহাই স্বীকার করেন, তবে রামচন্দ্রের লঙ্কাগমনের পূর্ব্বে তথায় আর্য্যদিগের বাস ছিল; কেননা তথায় আর্য্য দেবতাপূজা প্রচলিত ছিল। রাবণ স্বয়ং নিকষার গর্ভে বিশ্বশ্রবার পুত্র, অতএব রাবণও আর্য্য হইতে উৎপন্ন।

বিন্ধ্যাচলের পূর্ব্বসীমা রাজমহলের নিকটস্থ পর্ব্বতের সন্নিহিত, পূর্ব্বে অনার্য্য প্রদেশ ছিল। ঐ অনার্য্যজাতি এক্ষণে পর্ব্বতশিখরাদিতে বাস করিতেছে। তাহারা সন্তাল নহে; সন্তালদিগের অপেক্ষা ভীরু ও কার্য্যে অপটু। কিন্তু এই সকল পার্ব্বত্যপ্রদেশে প্রাচীন হিন্দুজাতির নিবাসের অনেক চিহ্ন পাওয়া যায়। দুই একটি প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ ও পাষাণময়ী প্রতিমা অঙ্গহীন হইয়া আছে। বর্ত্তমান সন্তালভূমির মধ্যে গিরিব্রজে নওগাছি নামক স্থানে একটি মন্দির আছে; তাহার অবয়বে বোধ হয়, উহা অনেক প্রাচীন কালে নির্ম্মিত হইয়াছিল। কেহ

কেহ অনুভব করেন, মুঙ্গেরে জরাসন্ধের রাজধানী ছিল। যাহা হউক আর্য্যেরা যে এই বিন্ধ্যগিরির সীমা "দামনই কূট" পর্ব্বতের অধিত্যকাদিতে প্রথমে বসতি করিয়া, পরে বাঙ্গালায় বাস করিয়াছিলেন, তাহা কথঞ্চিৎ অনুভূত হইতেছে।

মন্দরপর্ব্বত ভাগীরথীর নিকট ভগল পুর হইতে ন্যূনাধিক ২০ ক্রোশ দক্ষিণে। ইহা প্রায় ৫৩২ হাত উচ্চ ও গ্রানাইট নামক দুর্ভেদ্য প্রস্তরে গ্রথিত। সমস্ত বিন্ধ্যকূট যেমন ক্রমে নিম্ন হইয়া আসিয়াছে, মন্দরও বোধ হয় তদ্রূপ হইয়া থাকিবে, বর্ত্তমানকালে মন্দর অল্পোচ্চ মাত্র। এই মন্দরপর্ব্বতের নিকট দেবাসুরের সংগ্রাম হইয়াছিল। সমুদ্রমন্থন করিয়া যে সকল রত্নলাভ হইয়াছিল, তাহা কৌশলে দেবতাদিগের হস্তগত হইল। লক্ষ্মী উঠিলেন, বিষ্ণু লইলেন। উচ্চৈঃশ্রবা ঘোটক, ঐরাবত হস্তী ও পারিজাত পুষ্প ইন্দ্রের করে পড়িল। অবশেষে ধন্বন্তরি অমৃতপাত্র হস্তে অগাধজল রাশি হইতে উঠিলে, অমৃত লইয়া বিবাদ ঘটিল; এবং ভগবান্ বিষ্ণুর কুহকে দানবেরা অমৃতে বঞ্চিত হইল। ইহাতে বোধ হয়, বৈদ্যরাজ ধন্বন্তরি বাঙ্গালাপ্রদেশে জন্মিয়াছিলেন, তাঁহার বিদ্যাবলে ও ঔষধ দ্বারা মরণোন্মুখ আর্য্যসন্তানেরা প্রাণ পাইতেন। বৈদ্যকশাস্ত্র ও ঔষধাদি অনার্য্যদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয় নাই। ভারতে বৈদ্যের উদ্ভব বাঙ্গালায়, এ কথাটী অযৌক্তিক বোধ হয় না। কারণ জঙ্গলময় নিম্নভূমি আদৌ মনুষ্যের আবাসযোগ্য ছিল না, পরে ক্রমশঃ মনুষ্যের সমাগম হইলে পীড়া প্রকাশ পাইতে লাগিল। পীড়া হইলে তাহার নিবারণচেষ্টা স্বতই হইয়া থাকে। অভাব হইলেই পূরণের চেষ্টা হয়, এবং চেষ্টা দ্বারা জ্ঞানের উৎপত্তি। এইরূপে বাঙ্গালায় ভৈষজ্য শাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছিল, পরে মগধ ও কাশী প্রভৃতি স্থানে তাহার চর্চ্চা হয়। ধন্বন্তরির পর দিবদাস বৈদ্যশাস্ত্রে খ্যাতিলাভ করেন। কোন কোন পুরাবিদের মতে দিবদাস কাশীর রাজা ছিলেন। লক্ষ্মী প্রথমে বাঙ্গালার সাগর হইতে উঠিলেন। ইহার দুই অর্থ সম্ভব; এক, "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী।" বঙ্গবাসীরা যানাদি দ্বারা সমুদ্রপথে নানা দিগ্‌দেশ হইতে বাণিজ্যে অর্থসংগ্রহ করিয়া আর্য্যাদগের মধ্যে ধনাঢ্য হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ বঙ্গবাসীরা যে পুরাকালে বাণিজ্যে বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন, তাহা সংশয়াতীত। আর একটী অর্থ—বাঙ্গালার উর্ব্বরা ভূমি। প্রচুর শস্যসমাগম দ্বারা বাঙ্গালার লোক ভাগ্যবন্ত হইয়াছিলেন। মন্দরপর্ব্বতের খর্ব্বতার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার লক্ষ্মীও চঞ্চলা হইয়াছেন। সুরভি গো ও ঐরাবত হস্তী বাঙ্গালায় জন্মিয়াছিলেন, ইহা বিচিত্র নহে। গো, মহিষ, হস্তী, বাঙ্গালায় বহুকাল হইতে আছে, এবং যদিও এক্ষণে হীনবল ও লঘুকায় হইয়া আসিতেছে বটে, কিন্তু পূর্ব্বকালে অপেক্ষাকৃত বলিষ্ঠ ও দীর্ঘা-

কার ছিল, সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ তৃণজীবীদিগের আবাসভূমি বাঙ্গালাই সম্ভব। কিন্তু উচ্চৈঃশ্রবার বংশ কোথায় গেল? ইন্দ্র কি অমরাবতীতে লইয়া গিয়াছেন, না এই পথ দিয়া তিব্বতে গমন করিয়াছে? মন্দরের পাদদেশে আর্য্যকুল, লক্ষ্মী ভাগ্য গোমেষাদি লাভ করিয়া বাঙ্গালা সুখের স্থান মনে করিয়াছিলেন। পীড়া হইত বটে, কিন্তু উৎকৃষ্ট বৈদ্যের দ্বারা তাহা অল্প সময়েই নিবারিত হইত: বরং তাঁহারা দীর্ঘায়ু হইতেন। কালের বিচিত্র গতি! বাঙ্গালায় আর শ্রী নাই; আর বাণিজ্য নাই; আর বৈদ্য নাই। আবার বাঙ্গালা আর্য্যের আবাসের অযোগ্য হইয়া উঠিতেছে।

মন্দরের পূর্ব্বদিক ঐ পর্ব্বত হইতে স্খলিত প্রস্তরখণ্ড সকলে ব্যাপ্ত রহিয়াছে। দক্ষিণে সোপানাবলি, অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ, পাষাণমূর্ত্তি, অক্ষরাঙ্কিত প্রস্তরাদি ও তড়াগ প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ। এই সকল দেখিয়া বোধ হয়, প্রাচীনকালে এখানে একটি বিশিষ্ট সমৃদ্ধিশালী জনপদ ছিল। পর্ব্বতের দক্ষিণদিকে মনোহর কুণ্ড নামে এক প্রশস্ত পুষ্করিণী আছে। ঐ পুষ্করিণীর প্রান্তে বিচিত্র স্তম্ভমালা, অঙ্গহীন পাষাণমূর্ত্তি সকল আছে, এবং পর্ব্বতে উঠিবার জন্য ৪০০ সোপান আছে। পর্ব্বতের পাদদেশ হইতে প্রায় ১৩০ হস্ত উর্দ্ধে অনেক দূর ব্যাপিয়া প্রাচীরের গর্ত্ত আছে, কিন্তু প্রাচীরের কোন চিহ্ন নাই। মন্দিরের ভগ্ন ও খোদিত প্রস্তর সকল পড়িয়া আছে। দেখিলে বোধ হয়, যেন কেহ গঠিতে গঠিতে ফেলিয়া গিয়াছে। পর্ব্বতের মধ্যভাগে এক প্রকাণ্ড মনুষ্যমূর্ত্তি খোদিত আছে। মনুষ্যটি বসিয়া আছে, তথাচ প্রায় ৩৫ হাত উচ্চ। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে যখন ডাক্তার বুকানন তথায় গমন করিয়াছিলেন, তখন তিনি শুনিয়াছিলেন ঐ মূর্ত্তি মধুকৈটভের। বুকানন সাহেব সংস্কৃতানভিজ্ঞ, নতুবা মধু ও কৈটভ উভয়ের এক মূর্ত্তি হওয়া সম্ভব নহে অবশ্য বুঝিতে পারিতেন। ১৮৫১ খ্রীঃ অব্দে কাপ্তেন সারওইল শুনিয়াছিলেন যে মূর্ত্তিটি ভীমসেনের। ফলতঃ আকার পুরুষের বটে এবং মস্তকে কিরীট আছে। কিন্তু ইহার পূজা হয় না। মন্দরের শিখরে একটি ক্ষুদ্র দেবালয় আছে। তথায় মাঘ মাসে যাত্রী আসিয়া পূজা করিয়া থাকে।

হিমাচলের ঊর্দ্ধভাগেও হিন্দুদিগের নির্ম্মিত দেবালয় দেখিতে পাওয়া যায়। যেখানে গলিততুষাররাশি হইতে গোমুখাকৃতি পর্ব্বতমধ্যে ভাগীরথীর প্রবাহ পড়িতেছে, সেখানে হিন্দুদেবালয় কেদার, তন্নিম্নে হরিদ্বার। বাঙ্গালার উত্তরে জুর্জ্জয় লিঙ্গ, আসামে কামাখ্যা। এই প্রকারে প্রাচীন আর্য্যেরা পার্ব্বত্যপ্রদেশে দেবালয় স্থাপন করিতে ভাল বাসিতেন, বুঝা যায়। পাষাণে দেবমূর্ত্তি খোদিত করাও তাঁহাদের বিলক্ষণ স্বভাব ছিল। অধুনাতন পুরাবিদেরা কহিয়া থাকেন, যে এ বিষয়ে বৌদ্ধেরা হিন্দুদিগের গুরু। এরূপ

সিদ্ধান্ত ভ্রমমূলক, কেন না বৌদ্ধের জন্ম হিন্দু হইতে, হিন্দুদিগের নিকট বৌদ্ধের শিক্ষা এবং বৌদ্ধেরাও হিন্দুধর্ম্ম একেবারে পরিত্যাগ করেন নাই। কেবল তাঁহাদের সামাজিক ব্যবহার কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন ও ধর্ম্মসম্বন্ধে সামান্য ভাবে কিছু পরিত্যক্ত কিছু বা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল মাত্র। আবার সেই সকল মত হিন্দুধর্ম্মে মিশিয়া গিয়াছে। ফাহিয়ান নামক চীন পরিব্রাজকের ভ্রমণবার্ত্তা ও কহ্লনভট্টের রাজতরঙ্গিণী উভয়ই ইহার সাক্ষ্য। প্রথম গ্রন্থের রাবল্লুক, লাসেন প্রভৃতির টীকা পাঠ করিলে নিশ্চয় উপলব্ধি হয়, যে বৌদ্ধধর্ম্ম ব্রাহ্মণদিগের বিরোধী ছিল না, প্রত্যুত অনেকাংশে পোষক ছিল। শর্ম্মণ ও দেবশর্ম্মণ (ব্রাহ্মণ) উভয়ই পূজ্য ছিল। ইন্দ্রাদি দেবতাও পদচ্যুত হন নাই, অদ্যাপি বৌদ্ধেরা হিন্দুদেবতার পূজা করেন।* অতএব বৌদ্ধই হউক, আর হিন্দুই হউক, মন্দর প্রভৃতি পর্ব্বতাদিতে যে সকল দেবমূর্ত্তি খোদিত আছে, তাহা হিন্দুরই; তৎপক্ষে সংশয় নাই।

আকাশে মেঘ কি কুজ্ঝটিকা না থাকিলে মন্দরের শিখর হইতে উত্তরে হিমাচল ও পশ্চিমে বিন্ধ্য দেখা যায়। গঙ্গার তটস্থ পাটনা, ভাগলপুর প্রভৃতি সুরম্য নগরাদিও বিলক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। এদিকে ভাগীরথীর তটে নানা সমৃদ্ধিশালিনী নগরী বঙ্গলক্ষ্মীর আবাসভূমি হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত দুইটি ও আরও দুই চারিটি প্রাচীন। পদ্মরাগ মণি বাঙ্গালার পশ্চিম প্রদেশে পাওয়া যাইত। এক্ষণে উড়িষ্যা ও দাক্ষিণাত্যে পাওয়া যায়। এই মণিই কি ভগবান্ বিষ্ণুর কৌস্তুভ। অথবা ভাগীরথীরূপা রজ্জুতে বিচিত্ররত্নমালাসদৃশী নগরীসমূহ আর্য্যপ্রবরের কণ্ঠের হার হইয়াছিল। ফলতঃ সপ্তসিন্ধুর তট হইতে আর্য্যজাতি ক্রমে পূর্ব্বাভিমুখে আগমন পূর্ব্বক মন্দরভূধরের নিকট কিম্বা বিন্ধ্যের পূর্ব্বসীমা "দামনই কূ" র নিকট উত্তুঙ্গতরঙ্গরাজিবিরাজিত প্রশস্ত ভারতসাগরের সন্নিধি প্রথমে পাইয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে কখন রত্নাকর দেখেন নাই। অতএব বঙ্গদেশে আসিয়া পশুপালনকারী, গোধনে ধনী, আর্য্যেরা কৃষি ও বাণিজ্য যুগপৎ অভ্যাস করিয়া নানা রত্ন সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সকলই রত্নাকরের কল্যাণে। দূরস্থিত সুমাত্রা যব ও লঙ্কা আর্য্যদিগের গম্যস্থল হইয়া উঠিল। আবার গঙ্গা ও তাহার শাখানদীর তীরে উর্ব্বরাক্ষেত্রসকল কর্ষণে প্রচুর শস্যলাভ হইল।

পুরাণে কথিত আছে, দেবতারা বাসুকির লাঙ্গূলের দিকে, ও অসুরেরা মুখের দিকে ছিলেন। জ্যোতিষের মতে বাসুকি ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক এই তিন মাস পূর্ব্বশির হইয়া থাকেন। এইরূপে দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর দিকে তিনমাস করিয়া বাসুকির শির ফিরিয়া থাকে। আর্য্যেরা

* Cunningham's Ladak.

পশ্চিম ও উত্তর হইতে গঙ্গার প্রবাহ ধরিয়া বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন সন্দেহ নাই; এবং তৎকালে মন্দরপর্ব্বতের অনতিদূরেই উক্ত প্রবাহ ছিল; এক্ষণে চিরচঞ্চলা কল্লোলিনী অনেক উত্তরে সরিয়া গিয়াছেন। অতএব অনার্য্য অসুরেরা ঐ পর্ব্বতের দক্ষিণ ও পূর্ব্বধারে থাকাই সম্ভব। ইহাতে এক প্রকার অনুভব হয়, যে বর্ষার সময় আর্য্য পিতামহেরা অস্মদ্দেশে পদার্পণ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালায় আসিবার কিছু পূর্ব্বে যে মিথিলা মগধ দেশে আর্য্যেরা বাস করিযাছিলেন,তাহার সংশয় নাই। কারণ মানবধর্ম্মশাস্ত্রে উক্ত উভয় স্থল আর্য্য, ও বাঙ্গালা অনার্য্য বলিয়া নির্দ্ধারিত আছে। অতএব মগধ ও মিথিলা হইতে মন্দরপর্ব্বত দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত থাকায এক প্রকার অনুভূত হইতেছে, যে যখন তাঁহারা মন্দর পর্ব্বতের সন্নিধানে আসিয়াছিলেন, তখন বাসুকি দক্ষিণ কি পূর্ব্বশিব ছিলেন, অর্থাৎ বর্ষা ছিল।

সমুদ্রমন্থনে যে অমৃত উঠিয়াছিল, রাহু চণ্ডাল তাহা চুরি করিয়া রাখাতে চন্দ্র তাহা প্রকাশ করেন,এবং বিষ্ণু চক্র দ্বারা রাহুকে দ্বিধা করিয়া রাহু ও কেতুর সৃষ্টি করেন। এই গল্পটীর মূলে আমাদিগের বিবেচনায় একটি ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিহিত আছে। অনুমান হয়, ঐ সময় জ্যোতিষশাস্ত্রের আলোচনা বিশেষরূপে হইয়াছিল, এবং গ্রহণাদির গণনা আরম্ভ হয়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে জ্যোতিষের সামান্য সামান্য জ্ঞান প্রকাশ পায়। বৈদিক জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে উক্ত শাস্ত্রের আলোচনা যে পূর্ব্ব হইতে ছিল, তাহা বিলক্ষণ উপলব্ধি হয়; কিন্তু গ্রহণের প্রকৃততত্ত্ব বোধ হয় আর্য্যেরা বাঙ্গালায় আসিবার সময় প্রথমে জানিতে পারিয়াছিলেন। বঙ্গদর্শনের পাঠকগণ মনে করিতে পারেন, যে বাঙ্গালায় আসিয়া আর্য্যেরা বৈদ্যকশাস্ত্র, বাণিজ্য, জ্যোতিষ তত্ত্ব সকলই উত্তম শিক্ষা করিয়াছিলেন, এ কথা বলায় কেবল গরিমা প্রকাশ মাত্র। কিন্তু যথার্থপক্ষে আর্য্যেরা বাঙ্গালায় আসিবার কালে সভ্যতা ও জ্ঞান উভয়ে উন্নতি লাভ করিবেন তাহার বিচিত্র কি? সপ্তসিন্ধুর তীর হইতে অনার্য্য দস্যু, রাক্ষস প্রভৃতি বলবান্ অথচ অসভ্য এবং মূর্খ জাতিদিগকে ক্রমে ক্রমে পরাজিত ও নির্ব্বাসিত করিতে বহুকাল গত হইয়াছিল, তৎকালমধ্যে বহুতর শাস্ত্রালোচনা ও শ্রীবৃদ্ধি সম্ভবে না। ফলতঃ যে সময় আর্য্যপ্রবরেরা বাঙ্গালায় পদার্পণ করেন, তাহার অব্যবহিত পরে চন্দ্রগ্রহণ প্রকাশিত হইযা থাকিবে। প্রকৃত কাল নিরূপণের উপায় নাই,অথবা এক্ষণে আমাদিগের সন্ধানে নাই। আমাদিগের বিশ্বাস যে বেদ ও পুরাণে নৈসর্গিক ও ঐতিহাসিকতত্ত্ব রূপকাকারে অব্যক্ত আছে। বান্ধব পত্রিকার "সমাজবিপ্লব" নামক প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে, যে বিখ্যাত ইংরাজতত্ত্বজ্ঞ বেকনের ন্যায় "প্রাচীনদিগের জ্ঞানে" অর্থাৎ প্রাচীন

জাতিদিগের বিশেষতঃ ভারতীয় আর্য্যদিগেব ঐ সকল রূপকাকারে পরিণত তত্ত্বসমূহ আবিষ্কৃিয়া কবিলে সাধাবণেব উপকাব হয় এবং অন্ধকাবাবৃত ভাবতীয় পুবাবৃত্তেব পক্ষে যথেষ্ট আলোক পাওয়া যায়।

ভাবতবর্ষে নানাপ্রকার ধর্ম্মমতেব পরিবর্ত্তন ও এককালীন ভিন্নমতস্থ লোকেব অবস্থান এবং বাষ্ট্র ও সমাজবিপ্লবে পুবাতন হিন্দুকীর্ত্তিব লোপ হইয়াছে। কোন কোন স্থলে ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধদিগের মতেব বৈষম্যপ্রযুক্ত মন্দিব ও দেবতাদির পবিবর্ত্তন হইয়াছে। কোথাও মহাদেব বৌদ্ধ হইয়া বসিয়া আছেন, বা কোথাও বৌদ্ধ যোগীশ্বব মহাদেবের মূর্ত্তি পাইযাছেন, অথবা ভাস্করেব প্রসাদে শুণ্ডবিশিষ্ট গণপতিব আকাব ধারণ করিয়াছেন। আবাব কোথাও বৌদ্ধই হউন, আর কৈলাসপতিই হউন, গাজি সাহেবেব দরগায় গড়াগড়ি যাইতেছেন, কি ছিন্নমস্তক হইয়া সোপানের প্রস্তবে গ্রথিত হইয়াছেন। আলেখ্যেবও ঐ গতি। অতএব ভাবতের পূর্ব্ববৃত্তান্ত প্রাচীন দেবালয, বিহারস্তূপ, কি মস্জিদে প্রকৃত রূপে পাওয়া দুরূহ।

মন্দরের প্রতিমূর্ত্তির নিম্নে দুই পংক্তি অক্ষর খোদিত আছে। লেখা বহু দিনের। বর্ত্তমান দেবনাগব নহে। বৌদ্ধমতেব প্রাদুর্ভাবের সময় কুটীল অথবা লাঠের অক্ষব হইতে পাবে। প্রতিমূর্ত্তি ও লেখা এককালীন হইয়াছিল, এমত নিশ্চয় নাই: একারণ তাহার সময় ও উদ্দেশ্য নিরূপণ হইতে পারে না। কাব্যানুবাগী ভূতপূর্ব্ব ভাবতবাসীরা আপনাদেব ধর্ম্মতত্ত্ব ও ঐতিহাসিক ও নৈসর্গিক সকল তত্ত্বই গুহায নিহিত রাখিয়াছেন, এখন আমরা ঢেঁকিব কচকচি বিবেচনায় এক এক জন নূতন নূতন দেশী বা বিলাতী মহাজন ধবিয়া নানা পন্থা পাইতেছি। যে পথ ধবিয়া মহাত্মা অযোধ্যাপতি রামচন্দ্র ভাবতোদ্ধার কবিযাছিলেন, যে পথে বাল্মীকি বিচবণ কবিতে কবিতে সেই অলোকসামান্য রূপ সাক্ষাৎ কবিযাছিলেন, যে পথ অবলম্বন করিয়া পাণ্ডবগণ ভাবতে অক্ষয় কীর্ত্তিধ্বজা উত্তোলন করিয়াছিলেন, যে পথে ভ্রমণ কবিয়া মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তাঁহাদিগের ছবি ও তাঁহাদের উপদেষ্টা অগাধবুদ্ধি বাসুদেবেব চিত্রপট দেখিয়াছিলেন, যে পথে গৌতম, কনাদ প্রভৃতি মুনিগণ যাতাযাত কবিতেন, আজি তাহা সকলই জঙ্গলময়, গাঢ় তিমিরাচ্ছন্ন, কে আমাদিগকে তাহা দেখাইয়া দিবে? কেনই বা পিতামহেরা আমাদেব বুদ্ধিব পবীক্ষাজন্য সমস্ত তত্ত্ব গুহায় লুকাইয়াছেন? অথবা তাহাতেও কিছু নাই। এ সকল একবার সন্ধান করা প্রযোজন বটে।

রত্নরহস্য।

(মুক্তা)

ভৌজঙ্গম মুক্তাসম্বন্ধে বৃহৎ সংহিতায় লিখিত আছে "তক্ষকবাসুকিকুলজাঃ কামগমা যে চ পন্নগা স্তেষাম্ স্নিগ্ধা নীল-দ্যুতয়ো ভবন্তি মুক্তাঃ ফণস্যান্তে।" "নান্তেঽবনিপ্রদেশে রজতময়ে ভাজনে স্থিতে চ যদি বর্ষতি দেবোঽকস্মাৎ তজ্‌জ্ঞেয়ং নাগসম্ভূতম্।" অর্থাৎ যাহারা তক্ষক ও বাসুকির বংশে উৎপন্ন হইয়াছে, ইচ্ছাগামী, তাহাদের ফণান্তপ্রদেশে মণি জন্মে। তাহার কান্তি নীলবর্ণ ও অতি স্নিগ্ধ। তাহার পরীক্ষা এই যে অনাবৃত পবিত্র স্থানে রজত পাত্রে রাখিয়া দিলে যদি বৃষ্টি হয, তবে তাহা সর্পমণি।

অতঃপর শুক্তিজ মুক্তার কথা বলা যাইতেছে।

এই মুক্তাই সর্ব্বত্র সুলভ। "তেষান্তে শুক্ত্যোদ্ভব মেব ভূরি।"

রত্নলক্ষণজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলেন, যে সমুদ্র শুক্তির গর্ভেই মুক্তাফল জন্মিয়া থাকে। পরন্তু তাহার নিয়ম দৃষ্টহয় না, বঙ্গদেশের জলাস্থানের ও নদীর শুক্তিতেও মুক্তা পাওয়া যায়। অপিচ তাঁহারা মুক্তোৎপত্তির বৈজ্ঞিকতত্ত্ব সম্বন্ধে একটি আশ্চর্য্য কথা বলেন, তাহা সত্য কি কল্পনা মাত্র, তাহা আমরা জ্ঞাত নহি। তাঁহারা কহেন, বর্ষণ বিশেষের জলধারাই মুক্তোৎপত্তির বীজ। প্রবাদও আছে, যে স্বাতি নক্ষত্রের জল* শুক্তির গাত্রে লাগিলে তাহাদের গর্ভে মুক্তাজন্মে। যথা—

"যস্মিন্ প্রদেশেঽম্বুনিধৌ পপাতসুচারু
মুক্তামণিরত্নবীজম্।
তস্মিন্ পয়স্তোয়ধরাবকীর্ণং শুক্তৌ স্থিতং
মৌক্তিকতামবাপ।
স্বাত্যাং স্থিতে রবৌ মেঘৈ র্যে মুক্তা
জলবিন্দবঃ।
শীর্ণাঃ শুক্তিষু জায়ন্তে তেমুক্তা নির্ম্মল-
ত্বিষঃ।

যে জাতীয় মুক্তা আমরা পাইয়া থাকি, সেই মুক্তার এই কয়েক প্রকার শ্রেণী আছে যথা—

সিংহলিক পারলৌকিক সৌরাষ্ট্রিক
তাম্রপর্ণি—পারসবাঃ।

---

* ডাইওস্‌করিডেশ্‌ এবং প্লিনি বিশ্বাস করিতেন, যে বৃষ্টিবিন্দু শুক্তিগর্ভে পতিত হইলে মুক্তা উৎপন্ন হয়। কবিবর মূরও ইহার স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

"And precious the tear as that rain from the sky,
Which turns into pearls as it falls in the sea."

Moore.

কৌবের পাণ্ড্য বিরাট* মুক্তা ইত্যা-
বদয়াহ্যাষ্ট।

সৈংহলিক, পারলৌকিক, সৌরাষ্ট্রিক, তাম্রপর্ণ, পারসব, কৌবেব, পাণ্ড্য, ও বিবাট, এই ৮ প্রদেশে মুক্তা জন্মে এবং তাহাব আকাব ভিন্ন ভিন্ন প্রকাব, সুতরাং শুক্তিজ মুক্তা প্রধানতঃ ৮ প্রকাব। প্রত্যেক প্রকাব মুক্তাব লক্ষণ নির্দেশ কবা যাইতেছে। যথা—

"স্থূলা মধ্যাস্তথা সূক্ষ্মা বিন্দুমানানুসারতঃ।
সুস্নিগ্ধং মধুবচ্ছায়ং মৌক্তিকং সিংহলোদ্ভবম্।"
(শব্দ কল্পদ্রুম)

"বহুসংস্থানাঃ স্নিগ্ধা হংসাভা সিংহলাকবাঃ স্থূলা।"
(বৃহৎ সংহিতা)

সিংহলোৎপন্ন মুক্তা স্থূল, মধ্য, সূক্ষ্ম, ও বিন্দু পবিমাণ সকল প্রকাবই হয়। এই সকলের ছায়া বা কান্তি মধুব স্নিগ্ধ। বৃহৎ সংহিতার প্রমাণেবও এই রূপ অর্থ, বহুসংস্থান অর্থাৎ নানাপ্রকার পবিমাণ যুক্ত অর্থাৎ ছোট, বড়, মধ্যম, সকল প্রকাব। 'হংসাভা' অর্থাৎ মধুব শুভ্র বর্ণ। বৃহৎ সংহিতাব মতে কোন কোন সিংহলীয় মুক্তা ঈষত্তাম্র যুক্ত শুভ্রবর্ণ যথা "ঈষত্তাম্র শ্বেতাস্তামো বিযুক্তাশ্চ তাম্রাখ্যা।"

পারলৌকিক দেশীয় মুক্তাব লক্ষণ যথা—

"কৃষ্ণাঃ শ্বেতাঃ পীতাঃ সশর্করাঃ পারলৌকিকা বিষমাঃ।"
(বৃহৎ সংহিতা)

এতদ্ভিন্ন শব্দকল্পদ্রুমে একটি প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে যথা "পাবলৌকিকসম্ভূতং মৌক্তিকং নিবিড়ং গুরু।"

পাবলৌকিক দেশীয় মুক্তা কিছু নিবিড় (কঠিন জমাট) ও ওজনে ভারি। কাল, শ্বেত, পীত এই তিন বর্ণই হয়। 'প্রায়শঃ শর্করা' অর্থাৎ কাঁকব থাকে এবং বিষম অর্থাৎ উত্তমরূপ গোল হয় না।

সৌবাষ্ট্র দেশীয় শুক্তিজ মুক্তার লক্ষণ—

"সৌবাষ্ট্রিকভবং স্থূলং বৃত্তং স্বচ্ছং সিতম্ ঘনম্।"

"ন স্থূলা নাত্যল্পা নবনীতনিভাশ্চ সৌরাষ্ট্রা।"
(বৃহৎ সংহিতা)

সৌবাষ্ট্রদেশীয় মুক্তাফল স্থূল, সুগোল, সুন্দর নির্ম্মল, শুভ্রবর্ণ ও ঘন (কঠিন জমাট)। ইহার আকাব স্থূল নহে অর্থাৎ মধ্যম পবিমাণ এবং তাহাব আভা অথবা কান্তি নবনীতেব তুল্য।

তাম্রপর্ণদেশীয় মুক্তাব লক্ষণ—"তাম্রপর্ণভবং তাম্রং"—তাম্রপর্ণদেশোদ্ভব মুক্তা তাম্রাভ হয়। বর্ণভিন্ন ইহার অন্যান্য লক্ষণ পারশব মুক্তাব তুল্য।

---

* কোন পুস্তকে 'বিবাট' পরিবর্ত্তে বাটক পাঠ আছে। বাটক বা বাটধন নামক প্রাচীনকালে সমুদ্র তীরবর্ত্তী স্থান ছিল।

পারশবদেশীয় মুক্তার লক্ষণ—

"পীতং পারশবোদ্ভবম্।"

জ্যোতিষ্মন্তঃ শুভ্রা গুরবোঽতি মহা-
গুণাশ্চ পারশবাঃ।
(বৃহৎ সংহিতা)

বৃহৎ সংহিতার মতে পারশব মুক্তা সকল শুভ্র জ্যোতিষ্মান্ গুরু অর্থাৎ ভারে অধিক ও শুভ্রবর্ণ। পরন্তু কল্পদ্রুম-ধৃত প্রমাণ অনুসারে জ্ঞাত হওয়া যায় যে পারশব মুক্তা পীতাভ হইয়াও থাকে।

কৌবের অর্থাৎ উত্তরদেশীয় মুক্তাফলের লক্ষণ -

"ঈষৎ শ্যামঞ্চ রুক্ষঞ্চ কৌবেরোদ্ভব
মৌক্তিকম্।"

"বিষমং কৃষ্ণং শ্বেতং লঘু কৌবের
প্রমাণ তেজোবৎ।"
(বৃহৎ সংহিতা)

কৌবের আকরোৎপন্ন মুক্তাফল ঈষৎ শ্যামবর্ণ অথবা কৃষ্ণ শ্বেতবর্ণ, লঘু,ওরুক্ষ হয় কিন্তু প্রমাণ ও তেজোহীন নহে অর্থাৎ বড় বড হয় জ্যোতিও থাকে।

পাণ্ড্যদেশীয় মুক্তার লক্ষণ—

"পাণ্ড্যদেশোদ্ভবং পাণ্ডু"

"নিম্বফল ত্রিপুটধানাকচূর্ণাঃ স্যুঃ পাণ্ড্য
বাটভবাঃ।"
বৃহৎ সংহিতা

পাণ্ড্য বা পাণ্ডবাট দেশীয় মুক্তার বর্ণ পাণ্ডুর এবং গঠন নিম্বফল সদৃশ।

বিরাটদেশীয় মুক্তার লক্ষণ যথা—

সিতং রুক্ষং বিরাটজম্" (শব্দকল্পদ্রুম)

বিরাটদেশীয় মুক্তার বর্ণ শুভ্র এবং রুক্ষ অর্থাৎ লাবণ্যহীন। বৃহৎসংহিতায় ইহার কোন প্রসঙ্গ নাই।

এই সকল মুক্তা ভিন্ন বৃহৎসংহিতায় হৈম অর্থাৎ হিমপ্রধানদেশীয় মুক্তার বিষয় লিখিত হইয়াছে যথা—

"লঘুজর্জরং দধিনিভং বৃহৎবিসংস্থানমপি
হৈমম্।"

হৈম মুক্তা সকল লঘু (হাল্কা) জর্জর তুল্য, দধির বর্ণ ও বড় বড় হয়, ছোটও হয়।

"রুক্মিণী" নামক এক জাতি শুক্তি আছে। তাহাতে প্রায় মুক্তা জন্মে না, যদি জন্মে তবে তাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয়। রত্নতত্ত্ববেত্তারা এই জাতীয় মুক্তা দুর্লভ বলিয়া গিয়াছেন যথা—

"রুক্মিণ্যাখ্যাতু যাশুক্তিস্তৎপ্রসূতিঃ
সুদুর্লভা।
তত্র জাতং সিতং স্বচ্ছং জাতীফল সমং
ভবেৎ।
ছায়াবদ্বহুলং রম্যং নির্দোষ যদি লভ্যতে।
অমূল্যং তদ্বিনির্দিষ্টং রত্নলক্ষণকোবিদৈঃ।
দুর্লভং নৃপযোগ্যং স্যাদল্পভাগ্যৈর্ণ লভ্যতে।
(গরুড় পুরাণ)

অর্থাৎ রুক্মিণী নামা শুক্তিতে যে মুক্তা জন্মে তাহা দুর্লভ। রুক্মিণী শুক্তিতে যে মুক্তা জন্মে তাহা চন্দ্রকিরণ তুল্য বা শুভ্র বর্ণ, স্বচ্ছ, এবং প্রমাণে ও আকারে জাতীফল তুল্য হইয়া থাকে। রত্নলক্ষণজ্ঞেরা কহেন ছায়া থাকে ও কোন দোষ না থাকে ও দেখিতে রম্য ও বড় হয় যদি এতাদৃশ রুক্মিণীমুক্তা ভাগ্যবশতঃ

লাভ হয় তবে তাহা অমূল্য। ফলত এরূপ মুক্তা দুর্লভ, রাজার যোগ্য, অল্পভাগ্য মানবেরা ইহা পায় না।

পুরাতন রত্নতত্ত্ববেত্তাগণের মধ্যে দুই দল ছিল। এক দলের পণ্ডিতেরা কথিত প্রকারে দেশবিশেষে মুক্তার আকার বর্ণাদি ভিন্ন হয় বলিয়া স্বীকার করিতেন, অপর সম্প্রদায়ের পণ্ডিতেরা এই নিয়ম স্বীকার করিতেন না এবং কহিতেন যে সর্ব্বত্র সকল প্রকার মুক্তা হইতে পারে। যথা—

"সর্ব্বস্য তস্যাকরজা বিশেষাৎ রূপ
প্রমাণে চ যথৈব বিদ্বান্।"
নহি ব্যবস্থাঽস্তি গুণাগুণেষু সর্ব্বত্র
সর্ব্বাকৃতয়ো ভবন্তি।
(শব্দকল্পদ্রুমঃ)

মুক্তাধারণের শুভাশুভাদি কল্পনাকারী রত্নপরীক্ষকেরা মনুষ্যের ন্যায় শুক্তিরও চারি প্রকার জাতি কল্পনা করিয়া তদুদভব মুক্তাফলেরও চারিজাতি কল্পনা করিয়া গিয়াছেন যথা—

"ব্রহ্মাদি জাতিভেদেন শুক্তয়োপি
চতুর্বিধাঃ।
তাসু সর্ব্বাসু জাতং হি মৌক্তিকং স্যাচ্চতু
র্ব্বিধম্।
ব্রাহ্মণস্তু সিতঃ স্বচ্ছোগুরু শুক্লং প্রভা-
ন্বিতঃ
আরক্তঃক্ষত্রিয়ঃ স্থূল স্তথারুণবিভান্বিত।
বৈশ্যস্ত্বাপীত বর্ণোপি স্নিগ্ধঃ শ্বেতঃ
প্রভান্বিতঃ।
শূদ্রঃ শুক্লবপুঃ সূক্ষ্ম স্তথা স্থূলোঽসিত-
দ্যুতিঃ।
(শব্দকল্পদ্রুম)

শুক্তি সকল ব্রাহ্মণাদি জাতিভেদে চতুর্বিধ। ইহা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিজাতীয়। এই চারিজাতি শুক্তিতে উদ্ভূত মুক্তা ফলও সুতরাং চতুর্বিধ। যে সকল শুক্তি শ্বেত, নির্ম্মল, ভারি, শুক্লপ্রভাযুক্ত তাহারা ব্রাহ্মণ জাতীয়, যে সকল শুক্তি ঈষৎ রক্তবর্ণ, স্থূল ও অরুণিম প্রভা যুক্ত তাহারা ক্ষত্রিয় জাতি, যাহারা ঈষৎ পীতবর্ণ স্নিগ্ধ ও শুভ্র প্রভান্বিত তাহা বৈশ্যজাতীয় এবং স্থূল কৃষ্ণবর্ণ শুক্তি সমূহ শূদ্রজাতীয়।

শুক্তিজ মুক্তা সম্বন্ধে আমাদিগের অনেক বক্তব্য আছে তাহা পরে লিখিব এক্ষণে কেবল সকল শ্রেণীর মুক্তা সম্বন্ধে স্থূল স্থূল বিষয় বলা যাইতেছে। রত্নতত্ত্বানুসন্ধায়ীরা বলেন বেণু অর্থাৎ বাঁশেও পাথর জন্মে তাহাই বেণুজ মুক্তা নামে পরিগণিত যথা—

"বর্ষোপলানাং সমবর্ণ শোভং
ত্বক্সার মধ্যপ্রভবং প্রদিষ্টম।
তে বেণবো দিব্য জানোপভোগ্যে
স্থানে প্ররোহস্তি ন সর্ব্বজন্যে।
(কল্পদ্রুমঃ।)

ত্বক্সার অর্থাৎ বংশে যে মুক্তাফল জন্মে তাহা বর্ষোপলের (শিল) ন্যায় বর্ণ ও ও শোভাবিশিষ্ট। মুক্তাকর বংশ সকল স্থানে জন্মে না। কেহ কেহ বলেন যে স্বর্গীয় পুরুষদিগের উপভোগযোগ্য,তাদৃশ স্থানেই জন্মিয়া থাকে। কেহ কেহ "বংশলোচন" কেই বেণুজ মুক্তা কহেন

বস্তুতঃ তাহা নহে। বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে—

"কর্পূরস্ফটিকনিভং চিপিটং বিষমঞ্চ
বেণুজং জ্ঞেয়ম্।

বেণুজ মুক্তা কর্পূর কি স্ফটিক তত্তুল্য আভা যুক্ত চেপ্টা, বিষম অর্থাৎ অসমান হইয়া থাকে, এতদ্ভিন্ন "কল্পদ্রুমে" আর কয়েকটি বিশদ লক্ষণ আছে যথা—

"বংশজং শশিসঙ্কাশং কক্কোলী ফল
মার্দ্রকম্।
প্রাপ্যতে বহুভিঃ পুণ্যৈ স্তদ্রক্ষ্যং
বেদমন্ত্রতঃ।

বংশজাত মুক্তা চন্দ্ররশ্মি কি কর্পূরের ন্যায় প্রভাযুক্ত, কক্কোল নামক ফলের ন্যায় গঠন, স্নিগ্ধ। বহু পুণ্য না থাকিলে বংশজাত মুক্তা লাভ হয় না। ইহা বেদমন্ত্র দ্বারা গৃহে রক্ষা করিতে হয়।

ক্রমশঃ।

শ্রীরামদাস সেন।

বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি।

ইস্কুল ছাড়িয়া কালেজে ঢুকিবামাত্র ইংরেজি বাঙ্গালা ও সংস্কৃত তিন ভাষার রাশি রাশি সাহিত্য বঙ্গীয় যুবকের সম্মুখে বিস্তারিত হইল। চসার, স্পেনসার, সেক্সপীয়র, মিল্টন, ড্রাইডেন, পোপ, সেলি, বায়রণ, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, টেনিসন, কালিদাস, ভবভূতি, ভারবি, মাঘ, নৈষধ, ভট্টী, বাল্মীকি, বেদব্যাস, বেদপুরাণ, কাশীদাস, কৃত্তিবাস, ভারতচন্দ্র, মাইকেল, হেমচন্দ্র প্রভৃতি কবি; এডিসন গোল্ডস্মিথ স্কট, লিটন, ডিকুইন্সি, থাকারি; দণ্ডী বাণভট্ট, বিষ্ণুশর্ম্মা; হুতোম দীনবন্ধু বঙ্কিম; প্রভৃতি প্রসিদ্ধ লেখকের গ্রন্থে তাঁহার প্রবেশ অধিকার হইল। দিনকত তিনি এই অগাধ সাহিত্যকাননে যদৃচ্ছ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন কিন্তু যতই যান কাননের শেষ নাই, সকল বৃক্ষই সুমিষ্ট সকলেই আনন্দিত। যুবকহৃদয়—সংসারের ভাবনা নাই। জগতের সৌন্দর্য্য মাত্র তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত। হৃদয়ের বৃত্তি সকল এখনও বিকৃত হয় নাই—এখনও পাকিয়া শক্ত হয় নাই। তিনি ক্রমে সকল প্রকার সাহিত্যেরই আস্বাদ গ্রহণ করিলেন কিন্তু এই অগাধ সমুদ্রমধ্যে তিন জন লোকই তাঁহার অধিকতর প্রিয় হইল। এই তিনজনই তাঁহার চরিত্রনির্ম্মাণে নীতিশিক্ষা দানে তাঁহার সহায়তা করিল। ধর্ম্মপ্রচারকের রাশি রাশি বক্তৃতা, শিক্ষকের ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ, পিতামাতার লালন পালন ও তাড়ন এই সমস্ত একত্র হইয়া যাহা না করিতে পারিয়াছে তিনজন লোক (যাহা-

দের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবার কোন উপায় নাই) সেই নীতিশিক্ষাদানকার্য্য সম্পন্ন করিল। তাঁহাদের গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া তাঁহার মন ফিরিল, তাঁহার চিত্ত মথিত হইল, তিনি মনুষ্যের জন্য ভাবিতে, দুঃখ করিতে, সহানুভূতি করিতে শিখিলেন; কালেজের চারি পাঁচ বৎসরে এই তিন মহাত্মার স্পিরিট তাঁহাকে যেরূপ গড়িয়া পিটিয়া দিল জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি তাহাই থাকিবেন। সংসারে কত যন্ত্রণা পাইতে হইবে কত কত কষ্টে পড়িতে হইবে তাঁহার কত পরিবর্ত্ত হইবে কিন্তু আদত তিনি যাহা ছিলেন তাহাই থাকিবেন।

ভারতবর্ষে ইংরেজিবিদ্যা শিক্ষা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে, বঙ্গসাহিত্যের বর্ত্তমান উন্নতি হইবার আগে রামায়ণ ও মহাভারত যুবকদিগের চরিত্র নির্ম্মাণ করিয়া দিত। কথকের মুখ হইতে,গুরুমহাশয়ের পাঠশালা হইতে, কৃত্তিবাসের রামায়ণ হইতে বঙ্গীয় যুবক যে উপদেশ পাইতেন তাহা তাঁহার অস্থি মজ্জায় বিঁধিয়া থাকিত। আমরণ তিনি রাম বা যুধিষ্ঠিরকে দেবতা বলিয়া মনে মনে উপাসনা করিতেন ও উঁহাদিগেরই চরিত্র অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিতেন। বৃদ্ধবয়সে পুত্র পৌত্র দিগকে নিজ উপাস্য দেবতার মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া দিয়া যাইতেন। রামায়ণ ও মহাভারত হইতে তিনি দেবতা ব্রাহ্মণকে ভক্তি করিতে পিতামাতাকে শ্রদ্ধা করিতে ভাইকে ভাল বাসিতে প্রচলিত ধর্ম্ম যে পথে চালায় সেই পথে চলিতে শিখিতেন। ঐ দুই অগাধ সাহিত্যসমুদ্র মন্থন করিয়া আপনার কার্য্যপ্রণালী নিরূপণ করিতেন। আজিকার বঙ্গীয় যুবক রামায়ণ ও মহাভারত পড়েন না। যদিও পড়েন ত রাম বা যুধিষ্ঠিরকে তাঁহাদের উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য করিতে দেন না। যাঁহারা তাঁহাদের হৃদয়ে একাধিপত্য করেন তাঁহাদের নাম বায়রণ, কালিদাস ও বাবু বঙ্কিমচন্দ্র। তিনজনই যুবকদিগের চিত্ত আকর্ষণে মাধ্যাকর্ষণ শক্তিবিশেষ; তাঁহাদের গ্রন্থাবলী পাঠকালে যুবকহৃদয় এমনি গলিয়া যায় যে শেষে তাঁহারা যে পথে উহাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য ইচ্ছা করেন সেই পথেই উহা ধাবিত হয়।

রামায়ণ ও মহাভারত যে সময়ে লিখিত হইয়াছিল তখন পারিবারিক বন্ধন অত্যন্ত প্রবল। এই জন্য রামায়ণ ও মহাভারতের প্রধান উপদেশ সৌভ্রাত্র ও পারিবারিক প্রেম। রামায়ণ ও মহাভারতের রচনাকালে মনুষ্য দৌরাত্মময় অসভ্যাবস্থা হইতে সবেমাত্র স্থির সামাজিক অবস্থায় উপস্থিত হইতেছে। সুতরাং তৎকালীন সমাজের উপর বিশ্বাস ও ভক্তি উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের দ্বিতীয় উপদেশ, তৎসমাজের বিঘ্নকারীদিগের প্রতি বিদ্বেষ ভাব তৃতীয়। মনুষ্যগণের দুর্দ্দমনীয় ইন্দ্রিয়গণের দমন করিয়া শান্তিভাব ধারণ করাণই উক্ত কাব্যরত্নদ্বয়ের মূলমন্ত্র। বাল্মীকি ও বেদব্যাস অথবা তাঁহাদের

অনুবাদক কাশীদাস ও কৃত্তিবাস আপন আপন উদ্দেশ্যসাধনে এত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন যে বঙ্গীয় যুবক প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহাদের একান্ত ভক্ত ও নিতান্ত অনুগত ছিলেন। অসভ্যতা পশ্বাচার তাঁহার হৃদয় হইতে দূরীভূত হইয়াছিল। তাঁহারা তিন চারি পুরুষ পর্য্যন্ত একান্নবর্ত্তী থাকিতে ভাল বাসিতেন। দেবতা ব্রাহ্মণের তাঁহারা গোলাম হইয়াছিলেন, পরধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি তাঁহার বিদ্বেষভাব ভয়ানক প্রবল ছিল। পরধর্ম্মের লোক তাঁহার শান্তিময় সমাজের যত কেন উপকারী হউক না তিনি তাহাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। কিন্তু পশ্বাচার ও অসভ্যতা কমিতে কমিতে তাঁহাদের শক্তিরও হ্রাস হইয়া আসিয়াছিল। যাহা দমন করিবার জন্য বাল্মীকি বেদব্যাস হৃদয়বিদ্রাবিণী উন্মাদিনী কবিতাবলী রচনা করিয়াছিলেন সেই পদার্থ সেইশক্তি লোপ হইয়াছিল। দৌরাত্ম্যপ্রিয় উৎপাতপ্রিয় তেজস্বী আর্য্য যুবক কবিতার মোহিনী বলে মেষশাবকবৎ নিরীহ হইয়াছিলেন। বঙ্গদেশের শক্তি স্বাধীনতা তেজ গিয়া উহা কারখানার একটী একটী কলের মত হইয়াছিল। যেমন বাষ্পীয় বলপ্রভাবে সহস্র সহস্র নলী একই ভাবে সকালে ছয়টা হইতে সায়াহ্নে ছয়টা পর্য্যন্ত চলে তেমনি বঙ্গীয় সহস্র সহস্র লোক জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত একই ভাবে চলিত। চালাইত কে? কোন্ বাষ্পীয় যন্ত্রের এরূপ অসীম শক্তি? হিন্দুসমাজের দমন শক্তি। যেমন মধুর সঙ্গীতে বনের মত্তহস্তী পোষ মানিয়া চালকের বশে চলে তেমনি বাল্মীকি ও বেদব্যাসের মনোমোহিনী বীণার বশ হইয়া দুরন্ত শূরজ বংশীয়েরাও দমন হইয়াছিল, বাঙ্গালী ত কোন্ ছার।

আদিম অবস্থার সমাজশাসনের প্রধান বিঘ্ন এই যে মনুষ্য কেহ কাহার অধীন হইতে চাহে না এবং সকলেই যাহা খুসী তাই করিতে চায়, সমাজবন্ধন করিতে গেলে obedience প্রথম প্রয়োজন। এই জন্য যাঁহারা প্রথম সমাজ বন্ধন করিয়াছিলেন তাঁহারা ঐটী শিক্ষা দিবার জন্য চেষ্টা করেন। এক পুরুষে সকল উদ্ধতস্বভাব লোককে শাসনাধীন করা যায় না এই জন্য ১০।১৫ পুরুষ পর্য্যন্ত এক নিয়মে থাকিয়া সমাজমধ্যবর্ত্তী সমস্ত লোককে বশ্যতা স্বীকার করান চাহি। রামায়ণ ও মহাভারত এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য নির্ম্মিত। বহুকাল অবধিই হিন্দুরা রাম ও যুধিষ্ঠিরের চরিত্রানুকরণ করত সমাজশাসনের অধীন হইয়াছেন। সমাজও উত্তমরূপে দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু শুদ্ধ সমাজবন্ধনই ত মনুষ্যের উদ্দেশ্য নহে, সমাজবন্ধন পথ। এই পথে মনুষ্য সভ্যতাসোপানে আরোহণ করিবে, ক্রমে জড়জগতের উপর আধিপত্য করিবে, আপন জাতির সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিবে। প্রথম আপন জাতির, ক্রমে আপন দেশের, তাহার পর সমস্ত মনুষ্যের, তাহার পর

সমস্ত জীবলোকের উপকার করিবে। যাহাতে জীবলোক জড়ের সহায়তায় দীর্ঘকাল আনন্দ অনুভব করিয়া বিনা ক্লেশে দেহ ত্যাগ করিতে পারে তাহার চেষ্টা করিবে তবে ত পথ সার্থক হইবে, নচেৎ বনমধ্যে পথ কাটিয়া রাখিলে তাহাতে লাভ কি ?

সমাজবদ্ধ হইল কিন্তু সমাজের উদ্দেশ্য কিছু রহিল না। যেমন রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন দেখিয়া মনুষ্য শান্ত হইল সেইরূপ শান্ত হইয়া কি করিবে বুঝিতে পারিল না। তাহাতে এই হইল যে কতক লোক ভোগে আশক্ত হইল আর কতক এ জন্মের ভোগ ত্যাগ করত পরলোকের ভোগের জন্য ব্যস্ত হইল। কতক সুন্দরী রমণীসহবাসে বিচিত্র সুরাপানে রত হইয়া শীতে উষ্ণগৃহমধ্যে, গ্রীষ্মে প্রমোদ কাননে নির্ঝর গৃহে, জ্যোৎস্নায় ছাদোপরি, রৌদ্রে পুষ্করিণীমধ্যে বিহার করাই জীবনের উদ্দেশ্য মনে করিল। আবার অনেকে অগ্নিকুণ্ডোপরি উর্দ্ধপদে অধোশিরে তপঃ করতঃ পরলোকে নন্দনকাননে উর্ব্বসী মেনকাপরিবৃত হইয়া ইন্দ্রিয়সুখে অনন্তকাল কাটানই মনুষ্য হওয়ার সুখ ভাবিলেন। কেহ দানে স্বর্গ, কেহ স্নানে স্বর্গ, মনে করিলেন। ইন্দ্রিয়সুখই সকলের উদ্দেশ্য হইল— কাহারও ইহলোকে কাহারও পরলোকে। কেহই এ কথা বুঝাইয়া দিল না যে মনুষ্যসমাজের প্রধান উদ্দেশ্য জড়জগতের উপর মনুষ্যজাতীয় আধিপত্য বিস্তার, তুমি আমি এমন কি আমার সমসাময়িক যে কোন ব্যক্তি হউন সমাজ ছাড়িয়া ধরিলে কেহ কিছুই নহেন। যেমন আমরা আমাদের এক পুরুষ আগেকার লোকে যাহা রাখিয়া গিয়াছেন তাহা ভোগ করিতেছি, এইরূপ আমাদের পরে যাহারা আসিবে তাহাদের জন্য আমাদের পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু বেশী রাখিয়া যাওয়া অর্থাৎ জড়জগতের কিছু আধিপত্য বিস্তার করিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য। মনুষ্যসমাজ বৃক্ষের পত্র। যেমন পত্র আকাশস্থ বায়ু আকর্ষণ করিয়া বৃক্ষের আয়তন বৃদ্ধি করে পরে আপনার সময় আসিলে পড়িয়া যায় এবং পররর্ত্তী পত্রসকল যাহাতে একটু উচ্চ ও পুষ্ট হয় তাহা করিয়া যায় সেইরূপ মনুষ্য সমাজবিস্তার করিয়া সমাজপরিবর্ত্ত ও সমাজসংস্কার করিয়া নূতন আবিষ্ক্রিয়া করিয়া দেহ ত্যাগ করে। তাহাদের সন্তানেরা এই সকলের ফল ভোগ করতঃ আরও অধিকতর ক্ষমতা প্রকাশ করে।

এ কথা আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে কেহ বুঝাইয়া দেন নাই সুতরাং সেই শান্তভাবে সেই রামায়ণ ও মহাভারত শুনিয়া একই ভাবে চলিয়া আসিতেছিল। রামায়ণ ও মহাভারতের উদ্দেশ্য সাধন হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু উহাদের পরিবর্ত্তে গ্রহণ করা যায় এমন কোন গ্রন্থ হয় নাই এই জন্য উহারাই জাতীয় কাব্য বলিয়া পরিগণিত ছিল।

চল্লিশবৎসর পূর্ব্বে যখন ইংরেজি

বিদ্যার চর্চা আরম্ভ হইল তখন অবধি রামায়ণ ও মহাভারতের নীতিশিক্ষা সেকেলে বলিয়া পরিত্যক্ত হইল। সমালোচকেরা বাল্মীকির অদ্বিতীয় কবিত্ব শক্তির প্রশংসা করুন প্রত্নতত্ত্ববিদেরা রামায়ণ হইতে তৎসাময়িক বৃত্তান্ত রচনা করুন, রামায়ণ পাঠ করিয়া শত শত লোক আনন্দসাগরে মগ্ন হউক কিন্তু রামের চরিত্র আর কেহ অনুকরণ করিতে যাইবে না। যুধিষ্ঠিরের ত কথাই নাই। পূর্ব্বে লোকে রামায়ণ ও মহাভারত হইতে যে শিক্ষা পাইত এখন শিক্ষিত যুবকগণ কতক পরজাতীয় দৃষ্টান্ত দেখিয়া কতক ইতিহাস পড়িয়া কতক নানা পুস্তক ও ঘটনাবলী পর্য্যালোচনা করিয়া সেই শিক্ষা লাভ করেন। সুতরাং এরূপ সভ্য অবস্থায় একজন লোকের বা একখানি পুস্তকের যুবকচরিত্র নির্ম্মাণে সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা হইতে পারে না। তথাপি কোমলহৃদয় যুবকের মনে যে পুস্তক ভাল লাগে তাহা হইতেই তিনি কিছু না কিছু ভাল জিনিস চিরকাল মনে করিয়া রাখেন। যে কিছু জিনিস চিরকাল মনে থাকে তাহা অনেক সময়ে কার্য্যে প্রকাশ পায় তাহাই তাঁহার চরিত্র নির্ম্মাণে সহায়তা করে।

বঙ্গীয় যুবক যে সমস্ত রাশি রাশি গ্রন্থ পাঠ করেন তাহার মধ্যে সেক্সপীয়র সর্ব্বপ্রধান। কিন্তু বোধ হয় তাঁহার চরিত্র নির্ম্মাণে সেক্সপীয়রের কোন হাত নাই। কারণ সেক্সপীয়রের উদ্দেশ্য কেবল "to please" তাঁহার সৎলোকও যেমন সুন্দর অসৎও তেমনি সুন্দর। এই দুই প্রকার চরিত্র পাঠ করিয়া যে সকল ভাবের উদয় হয় তাহা পরস্পরকে কেন্সেল (cancel) করিয়া দেয়। মিল্টনে Puritanic spirit এত অধিক যে উহা কোন কালে লোকে অনুকরণ করিতে সাহস করিবে না। অনেকে বরং সয়তান হইতে চাহিবে ত কেহ যীশুখ্রীষ্ট বা সামসন হইতে চাহিবে না। ড্রাইডেন ও পোপে অনুকরণীয় কিছু নাই। Essay on Criticism প্রভৃতি পুস্তক হইতে যে জ্ঞান লাভ করা যায় তাহা উপদেশ মাত্র। স্কুল মাষ্টারের উপদেশ যেমন এ কাণ দিয়া ঢুকে ও ওকাণ দিয়া বাহির হইয়া যায় ঠিক সেইরূপ। চসার ও স্পেন্সারের বানান এত উল্টা রকম যে কাহারো সাহস হয় না যে পড়ে, যদিও কেহ পড়ে ত চসার সেকেলে গল্প একেলে লোকের ভালই লাগে না। যাহারা বৃদ্ধ তাহাদের বরং ভাল লাগিতে পারে যুবকের কখনই লাগিবে না। স্পেন্সরের যে Ideal তাহাও ইউরোপের অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন মধ্যসময়ের, এখনকার লোকে তাহা ভাল বাসে না। বিশেষ রূপকের দ্বারা যে শিক্ষালাভ হয় সে শিক্ষা সভ্যসময়ের নয়। সেলি চমৎকার কিন্তু সেলির লেখা এত জটিল ও উহার লেখার idealism এত উচ্চ যে তাহা অনুকরণের অতীত। টেনিসনের উদ্দেশ্য পুরাণ জিনিস ভাল করিয়া

দেখান সুতবাং তাহাতে চবিত্রনির্ম্মাণের সহায়তা কবে না। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ভালই হোক আর মন্দই হোক নিঙ্গড়িয়া তিত কবিয়া দেন। একটি ফুল যদি তিনি ধবিলেন ত তাহাব প্রতি পাপড়ি বর্ণনা হবে, তাব কেশবেব বর্ণনা হবে, তাহার বেণুব বর্ণনা হবে, তবে ছাড়িবেন। বাকী বায়বণ, তিনি পীড়িতেব বন্ধু, পীড়কেব শক্র, প্রণয়েব আধাব, যৌবন মূর্ত্তিমান্‌, মহা তেজস্বী, সর্ব্বদা চঞ্চল, আলস্যেব জনসমাজেব অত্যাচাবে একান্ত চটা। যৌবনেব মন আকর্ষণে যা কিছু চাই বাযরণেব সব আছে। সুতবাং ইংবেজী সাহিত্যে এক বাযবণই বঙ্গীয় যুবকেব চবিত্র নির্ম্মাণে অংশী।

সংস্কৃত কব্যেব মধ্যে বামাযণ মহাভাবত ত সেকেলে। বেদ পুবাণেব চর্চ্চা নাই। থাকিলেও এখন আব কেহ গর্গ বিশ্বামিত্র অগস্ত্য হইতে চাহিবে না এ একপ্রকাব ঠিক। সে সমাজ নাই সে কালও নাই। কালেজেব ছাত্র দূরে থাক, ভট্টাচার্য্যদিগেব টোলেব ছাত্রেবাও আব বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র বেদব্যাস হইতে চাহে না। ভাববির অর্জ্জুন, মাঘেব কৃষ্ণ, নৈষধেব নল, বাণভট্টের তাবাপীড় শ্রীহর্ষ সব সেকেলে, একটিও আমাদেব মনেব মত নয়। ভাববি মাঘ নৈষধ প্রভৃতি গ্রন্থের বর্ণনা প্রণালী সমালোচকেরা ভাল বলিতে পাবেন, স্থানে স্থানে ভালও আছে কিন্তু সব সেকেলে। আমবা ক্ষুদ্রবুদ্ধি উহাদের রস বোধ করিয়া উঠিতে পাবি না। কবিতে পারিলেও আমাদেব চরিত্র পবিবর্ত্তন বা শোধন ভাববি পড়িয়া হয় না। বঙ্গীয় যুবক ভবভূতিকে ভাল বাসেন। ভবভূতি তাঁহাদেব ভালও লাগে, উহা তাঁহাব চবিত্রেও কতক প্রকাশ পায় কিন্তু তাহা নিতান্ত অল্প বিষয়ে, কাজেই এ স্থলে গৃহীত হইল না। দশকুমাব চবিতেব মধ্যে অপহাব বর্ম্মাব চবিত্র সুন্দব, বড চমৎকাব কিন্তু তিনি চোব ডাকাৎ ইত্যাদি ইত্যাদি। যদি অপহাব বর্ম্মাব চবিত্র হইতে বঙ্গীয়যুবক নিজে কিছু লইযা থাকেন তাহা তিনি মানেব খাতিরে লুকাইযা বাখিবেন কখন প্রকাশ কবিবেন না। বাকী কালিদাস, কালিদাসেব লেখা এমনি মধুর যে পড়িবা মাত্র মন আকৃষ্ট হয়। তাব পব কালিদাসেব অনেক গুলি পাত্র (character) লোকে এত ভাল বাসে যে খানিকটা সেই বকম হইযা যায। সুতবাং আমাদেব যুবকগণেব উপব কালিদাসেব ক্ষমতাও অনেক অধিক।

বাঙ্গালা সাহিত্যেব অনেক গ্রন্থকারেবই কিছু কিছু অংশ আমবা পাইযা থাকি। তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বঙ্কিম বাবু। বঙ্কিম বাবুব পুস্তকাবলী এত লোকে পাঠ কবে ও এত আদবেব সহিত পাঠ কবে যে তাঁহাব সকল পুস্তক হইতেই কিছু না কিছু লোকেব অস্থি মজ্জায় প্রবেশ করে। লোকে দীনবন্ধুব ইয়ারকি মুখস্থ কবে, হুতুমের গান গুলি কণ্ঠস্থ করে, মাইকেলেব কতক কতক অনুকবণ করে।

কিন্তু অধিকাংশ আজগবি কথা লইয়া ভিরকুটী করে। হেমচন্দ্রের ভারত-সঙ্গীত সকলের কণ্ঠস্থ আছে—বৃত্রসংহার পাঠে চরিত্র পরিবর্ত্তন কতদূর হইবে আজি জানিবার উপায় নাই। ভারতচন্দ্রের অনুকরণ দূরে থাকুক এক্ষণে অনেকে লজ্জায় তাহা পড়িতেই পারে না। আরও অনেক গ্রন্থকার অছেন কিন্তু তাঁহাদের ক্ষমতা অতি সামান্য।

এখন দেখিতে হইবে এই তিন জন কবির কে কতদূর ও কিরূপ শিক্ষা দিয়া থাকেন। আমরা গ্রন্থকারদিগের দোষ গুণ পর্য্যালোচনা করিতেছি না কেবল শিক্ষিত যুবকদিগের চরিত্রনির্ম্মাণে ইহাঁরা কে কিপ্রকার ও কি পরিমাণে মাল মসলা দিয়া থাকেন তাহাই দেখিব। ইহারা একজন ইংলণ্ডের একজন মালবের আর একজন বঙ্গের। এই তিন জনের মধ্যে একজন ফরাসিবিপ্লবের সময় শিক্ষিত, একজন হিন্দুদিগের গৌরব সময়ের ব্যক্তি আর একজন ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজ্যকালীন ইংরেজি রূপে শিক্ষিত। একজন সমাজ ভাঙ্গিতে সমাজের অত্যাচারী নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন করিতে শিক্ষা দেন, সমাজ ছাড়িয়া গেলে কিরূপ সুখ হয় তাহাই দেখান। একজন সমাজে থাকিয়া কতদূর সুখ ভোগ করা যাইতে পারে তাহাই দেখান আর একজন সমাজের সহায়তায় ও উহার বিরোধে কিরূপ আনন্দ অনুভব করা যায় দেখাইয়া শেষ করেন।

তিনজনই প্রণয়ের কবি, প্রণয়গত অবশ্য তারতম্য আছে তাহা আমাদের এখানে বলার প্রয়োজন নাই। তিন জনই স্বভাবের সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে শিক্ষা দেন। তিনজনই নিজে স্বভাবের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ এবং তিনজনেই লোককে আপন আপন মুগ্ধতায় অংশী করিতে পারেন। বাঙ্গালায় পর্ব্বত নাই, পাহাড় নাই, কেবল এক হরিদ্বর্ণ শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র আর মাঝে মাঝে বিশালনিতম্বা স্রোতস্বিনী আর নির্ম্মেঘ ও সমেঘ আকাশ। হঠাৎ মনে হইতে পারে বাঙ্গালায় স্বভাবসৌন্দর্য্য নাই, কিন্তু বঙ্কিম বাবুর প্রতিছত্রে বাঙ্গালার সেই সৌন্দর্য্য প্রকটিত। বাঙ্গালার সৌন্দর্য্য তিনিই সর্ব্বপ্রথম কবির চক্ষে দেখিয়াছেন ও আমাদের সৌভাগ্য ছিল বলিয়া আমরাও তাঁহার হৃদয়দর্পণে প্রতিফলিত সেই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য আরও সুন্দর বলিয়া দেখিতে পাইয়াছি। সেকালে স্বভাবের শোভানুভবের নাম দেবতার আরাধনা ছিল। প্রসন্ন পুণ্যসলিলা গঙ্গা দেবতা, আকাশ ঋষী পূর্ণ, চন্দ্র দেবতা, সূর্য্য দেবতা, বঙ্কিম বাবু দেবতা দিগকে অন্তরিত করিয়া শুদ্ধ সৌন্দর্য্য মাত্র দেখাইয়াছেন ও দেখিতে বলিয়াছেন। বাঙ্গালার যে কিছু সৌন্দর্য্য তাহার প্রায় কিছুই বঙ্কিম বাবু দেখাইতে ছাড়েন নাই। হীরার বাড়ীর দেয়ালে পাখী আঁকা হইতে সূর্য্যমুখীর বিচিত্র চিত্রবর্দ্ধিত গৃহ পর্য্যন্ত সবই দেখাইয়া-

ছেন। তাঁহাব চিত্রে অপরিষ্কার কিছুই নাই। সব পবিষ্কার ঝর ঝবে।

কালিদাসের বর্ণনা ভারতময়। সিংহলদ্বীপ হইতে আরম্ভ করিযা কৈলাস পর্ব্বত পর্য্যন্ত সব কালিদাস বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনা শুদ্ধ পবিষ্কার নয় বড় উজ্জ্বল ও চাকচিক্যময়,যেন ইলেকট্রিক আলোকে electric light প্রতিফলিত। স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে ভারতবর্ষ জগতেব অনুকৃতি, আর কালিদাস এই সমস্ত ঘুঁটিয়া ফেলিয়াছেন। তন্ন তন্ন কবিয়া দেখান তাঁহাব কর্ম্ম নয় সে জন্য ওয়ার্ডস ওয়ার্থ চাই। তাঁহার দেখান বাছিয়া বাছিয়া, ভাল ভাল বস্তু গুলি। তাঁহাব বর্ণনায় শুদ্ধ সৌন্দর্য্য নয় কিছু না কিছু অলৌকিক উহাব সঙ্গে মিশ্রিত আছে। যথা রামেব পুষ্পক রথ, মেঘের দৌত্য। তাঁহার ঋতুসংহারে স্বভাবেব বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্য অতি উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত আছে। এখানকার বর্ণনায় অলৌকিকতা নাই এবং পরিষ্কার অপরিষ্কাব জ্ঞানও বড় বেশী নাই। কিন্তু বর্ণনীয় বস্তু পবিষ্কাবই হউক আব অপবিষ্কারই হউক বর্ণনায় হৃদয়গ্রাহিত্ব সমানই আছে।

বায়রণের বর্ণনীয় ইউবোপ। সমস্ত ইউরোপে যা কিছু বর্ণনযোগ্য—আল্পসেব চূড়া, রাইনের বিশাল জলপ্রবাহ,গ্রীসের দ্বীপমালা, মাইকেল এঞ্জিলোর চিত্র ভিনিস ও রোমের ভগ্নাবশেষ। শিল্পে ও স্বভাবে যে কিছু মহান্ ও মনোহর, সকলই তাঁহার গ্রন্থমধ্যে স্থান পাইয়াছে। তাঁহার বর্ণনা মধ্যে এক জিনিস আছে যাহা আর প্রায় কাহারও নাই। ঐতিহাসিক দৃশ্য বর্ণনে বায়রণের অসাধারণ ক্ষমতা, ওয়াটরলুব যুদ্ধ রুসেব নিবাসস্থান বল্ভেরেব গির্জ্জা বর্ণনায় বায়রণ তাঁহার বিশাল হৃদয়ের পূর্ণ প্রতিকৃতি প্রদান করিয়াছেন। এই সকল বর্ণনাব পর তাঁহার উপদেশ গুলি যুবকমণ্ডলীর অন্তঃকরণে এরূপ অঙ্কিত হয় যে তাহা আর অপনীত হইবাব নহে।

পাঠক জিজ্ঞাসা কবিতে পারেন যে যুবকদিগেব চবিত্রনির্ম্মাণেব কথায় স্বভাবেব বর্ণনা আসিল কেন? এ ধান ভানিতে শিবেব গীত কেন? তাহার উত্তব এই স্বভাব বর্ণনায়ও নীতিশিক্ষা আছে, আর সেটি দেখানও বড় সহজ, এই জন্য আগে স্বভাবের শোভা বর্ণিত দেখিযা কি শিক্ষা পাই দেখাই, তাহার পব অন্য প্রকার শিক্ষা যথাশক্তি দেখাইতে চেষ্টা কবিব।

প্রথম কালিদাসের বর্ণনায় সব শান্তিময় সব সুখময়, পড়িলে মনের শান্তিময় ভাব জন্মে। যখন ভট্টাচার্য্য মহাশয়েবা, পাদরি সাহেবেরা ও ব্রাহ্ম মিসনরিগণ দিনরাত জগৎ দুঃখময় পাপের ভরে ডুবলো ডুবলো বলিতেছেন, তখন ওরূপ পুস্তক পড়িলে বাস্তবিকই জগৎ দুঃখময় নহে বলিয়া বোধ হয়। এ বড় সামান্য শিক্ষা নহে। বঙ্কিম বাবু স্বভাববর্ণনায় শুদ্ধ শান্তি নয় তাহার উপর যেন একটু কিছু আছে, যেন যে আনন্দ যৌবনের

বড় প্রিয় সেইরূপ আনন্দ যেন বেশী আছে। বায়রণের বর্ণনায় শান্তি নাই, কেবল পরিবর্ত্ত হইতেছে, অসংখ্য পরিবর্ত্ত, এটা ছেড়ে ওটা, ওটা ছেড়ে সেটা, যেন তৃপ্তি হইতেছে না, যেন একটু চটা চটা ভাব উদয় হইতেছে যেন যাহার অন্বেষণে স্বভাবের শোভা দেখিতে আসিয়াছি সে সুখটুকু পাইতেছি না কেবল কৌতূহলতৃষ্ণায় কাতর হইয়া যাহা কিছু সুন্দর দেখিতেছি দেখিতে যাইতেছি, দেখিতেছি, তৃপ্তি হইতেছে, কিন্তু সে তৃপ্তি বেশীক্ষণ থাকিতেছে না।

সংক্ষেপে তিনজনের বর্ণনায় তিনরূপ উদ্দেশ্য আর এক প্রকারে দেখান যায়। কালিদাস উপরে বসিয়া বিশুদ্ধ আনন্দের সহিত নীচেকার শোভা দেখিতেছেন আর দেখাইতেছেন। নিজে মনুষ্যের উপর উঠিয়া, বসিয়া মনুষ্যের কার্য্য আচার ব্যবহার নৃত্যগীত দেখিতেছেন। পাহাড় পর্ব্বত কেমন ছোট ছোট দেখাইতেছে, নদীটি একছড়া হারের মত কেমন পড়িয়া আছে তাই দেখিতেছেন আর কাছে কোন ভাল বাসার জিনিস আছে তাহাকে দেখাইতেছেন। যেন শাঙ্খ্যমতে পুরুষ নির্লিপ্ত বসিয়া প্রকৃতির রঙ্গ দেখিতেছেন। কালিদাস বলিতেছেন আগে মানুষের চেয়ে উচ্চ জীব হও তাহার পর স্বভাবের শোভা দেখিও কত আনন্দ পাইবে। তাঁহার আশা বড় উচ্চ। বঙ্কিমবাবু স্বভাব শোভার কেন্দ্র মনুষ্য, নগেন্দ্রনাথই হউন আর অমরনাথই হউন, আর গোবিন্দলালই হউন বা স্বয়ং বঙ্কিম বাবুই হউন, তাঁহারও নির্লিপ্ত দেখা, স্বভাব শোভা মধ্যে বসিয়া স্বভাবের শোভা দেখ আর কাছে যদি কেহ থাকে দেখাও কেমন সুন্দর কেমন গভীর। পৃথিবী ও আকাশ দেখিয়া ঈশ্বরের প্রেমে শরীর পুলকিত হউক। বায়রণের তা নয়। স্বভাবের শোভা দেখিতে চাও ঘর দোর ছাড়িয়া বাহির হও যা তোমার সম্মুখে পড়িবে তাই দেখিয়া বসিয়া থাকিবে? তা নয়। চল যেখানে সুন্দর বস্তু সেইখানে যাইতে হইবে। তুমি নির্লিপ্ত থাকিলে সব দেখিতে পাইবে কেন? ঘরে বসিয়া দুনিয়ার কারচুপি দেখিয়া শান্তিসুখ ভোগ করিবে কেন? মনুষ্যের জীবন অল্প, ইহাতে সব দেখিয়া শুনিয়া লও, যত দেখিবে ততই জ্ঞান বাড়িবে আনন্দ অধিক হইবে এই আনন্দই আনন্দ, আর সব কেবল দুঃখ আর অত্যাচার, সমাজ অত্যাচার, প্রণয় অত্যাচার, মানুষ মানুষের উপর অত্যাচার করিতে ভাল বাসে। সবই কষ্ট কেবল স্বভাবের আনন্দই পরমানন্দ।

একজন উপর হইতে স্বভাব দেখিতেছেন। একজন মধ্য হইতে দেখিতেছেন আর একজন মাতিয়া বেড়াইতেছেন। একজনের মতে মনুষ্যজীবন অপেক্ষা অন্য জীবনে সুখ অধিক। আর একজনের মতে এ জগতেও যথেষ্ট আনন্দ। তৃতীয়ের সবই এই জগতে।

বায়রণের জন্ম ১৯ শতাব্দীর প্রজা-বিপ্লবে। সুতরাং বর্ত্তমান সমাজের উপর তাঁহার শ্রদ্ধা নাই। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে বর্ত্তমান সমাজে অত্যাচার ভিন্ন আর কিছুই নাই। তাঁহার উৎকৃষ্ট মনুষ্য চিত্র গুলি সমাজের বাহিরে। সেগুলি সকলেই সমাজের উপর চটা। কেহ কেহ আবার সমাজের শত্রু, হয় দস্যু না হয় মনুষ্যবিদ্বেষী। (Misanthrope) সমাজের যত গুলি নিয়ম আছে সব গুলিই তাঁহার চক্ষুঃশূল। কনরাড, লারা, ডনজুয়ান প্রভৃতি পাত্রগণের বাক্যেও অপার্য্যে এই সমাজবিদ্বেষ ভাব প্রতি মুহূর্ত্তে প্রকাশিত হইতেছে।

কালিদাসের সমাজ মনুর সময় হইতে এক ভাবে চলিয়া আসিতেছে। চুল-মাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই। তাঁহার মত এই এরূপ সমাজে সকলই সুখ।

বঙ্কিম বাবুর সমাজ শিক্ষিত বঙ্গীয় যুবকদিগের সমাজ। তিনি দেখাইয়াছেন সমাজের বিরোধী কাজ করিয়া কেহ সুখী হইতে পারেন না। এবং করিলেই শেষ আত্মদুষ্কৃতের জন্য সকলকেই অনুতাপ করিতে হয়। নগেন্দ্রনাথের অবৈধ প্রণয়ের ফল তাঁহার ঘোর আধ্যাত্মিক বিকার, শৈবলিনীর অবৈধ অনুরাগের ফল পর্ব্বতগুহায় ঘোর প্রায়শ্চিত্ত। গোবিন্দলালের ও রোহিণীর যেরূপ অন্ত হইল তাহাতেও ঐ কথা দৃঢ়তররূপে প্রতিপন্ন করিতেছে।

বায়রণেরও একটী মানুষ সুখী নহে, তাহাদের মধ্যে মধ্যে অলৌকিক অতিমানুষিক হৃদয়প্রমাদক আনন্দ আছে বটে কিন্তু দুঃখই সকলের স্বভাবসিদ্ধ। কিন্তু তাহারা ঠিক জানে যে যত দিন বর্ত্তমান সমাজ এই ভাবে চলিবে তাহাদের দুঃখের অবসান হইবে না। সুতরাং তাহারা অনুতাপ করিয়া ফিরিয়া আসিতে চাহে না। তাহাদের আমোদ সমাজের উপর অত্যাচারে। কেহ দিবারাত্র লুঠ পাঠ করিতেছে, কেহ নির্জ্জন কারা-গৃহ মধ্যে উচ্চে রোদন করিয়া সমাজ-ধ্বংসের জন্য শাপ দিতেছে, কেহ সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘনের জন্য দিনরাত্রি ফিরিতেছে। তাহারা দুঃখী বটে কিন্তু দুঃখে কাতর নহে, তাহাদের দুঃখের কারণ মনুষ্যসমাজ, সুতরাং মনুষ্যসমাজ ও যাহারা সেই সমাজ চালায় তাহাদের উপর দাদ তোলা চাই। বায়রণের মানুষ মনুষ্যসমাজের উপর চটা। কিন্তু মনুষ্যের প্রতি, দুর্ব্বলের প্রতি, স্ত্রীলোকের প্রতি তাহাদের সহানুভূতি বিলক্ষণ আছে। তাহারা মানুষ ভাল বাসিতে চায় কিন্তু সমাজের অত্যাচারী নিয়ম আপনার মনের মত করিয়া ভাল বাসিতে দেয় না; সুখে তাহারা ঘোর চটা। কালিদাসের মানুষ মানুষ হইতে কিছু উচ্চ। সব দেবতার অংশ, কেহ দেবতার অবতার, কেহ দেবতা স্বয়ং, কেহ অপ্সরা কেহ অপ্সরার কন্যা, কেহ ঋষি কেহ রাজা। ঋষি ও রাজা মানুষ কিন্তু বায়রণের মানুষ অপেক্ষা তাহাদের অতিমানুষিক ক্ষমতা

অধিক। এই স্বর্গে যাইতেছে মুহূর্ত্তে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছে সমস্ত পৃথিবী মুহূর্ত্তে পরিভ্রমণ করিতেছে, দেবতার সঙ্গে যুদ্ধ বিগ্রহ করিতেছে অপ্সরাব সহিত প্রণয় পাশে আবদ্ধ হইতেছে। কিন্তু সকলেই সেই মনুপ্রণীত সমাজেব নিয়ম যত্ন পূর্ব্বক প্রতিপালন করিতেছে। মানুষেব অসীম ক্ষমতা কিন্তু যথেষ্টাচার নাই।

জ্ঞানে মৌনং ক্ষমা শক্তৌ, ত্যাগে শ্লাঘা বিপর্য্যয়ঃ। এই শ্লোকে তাহাদেব চরিত্রের কতকটা আদর্শ পাওয়া যায়। তাহাদের যেমন ক্ষমতার পাব নাই মনের জোরও তেমনিই অধিক। সেই ক্ষমতা তাঁহারা সৎপথে চালাইতে জানেন সুতরাং তাঁহাদের জীবনে কষ্ট নাই দুঃখ নাই। ইচ্ছার স্বাধীনতা নাই, যেমন স্বভাবের নিয়ম অলঙ্ঘনীয় তেমনি তাঁহাদের মতে সমাজেব নিয়মও অলঙ্ঘনীয়। লঙ্ঘনেব চেষ্টাও নাই, পীড়াও নাই, অনুতাপও নাই।

বঙ্কিম বাবুব লোক সব সমাজের লোক, শিক্ষিত বঙ্গীয় যুবক। শিক্ষিত যুবকেব জীবন কেবল অনন্ত বিবাদসঙ্কুল। তিনি দুই প্রকার শিক্ষা পান। এক প্রকাব বাড়ীতে আর এক প্রকার স্কুলে। উভয় প্রকার শিক্ষা সময়ে সময়ে পরস্পব বিলক্ষণ বিরোধী। এই জন্য শিক্ষিত যুবকের চরিত্রে সময়ে সময়ে বিলক্ষণ অসামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্কিম বাবুর পাত্র গুলিতেও এই বিরোধী ভাব কতক কতক প্রকটিত আছে কিন্তু সম্পূর্ণ নহে। যেখানে আছে সেখানে অতি মনোহর। বঙ্কিমবাবুর মানুষ গুলি দেশী বাঙ্গালী, নিরীহ ভাল মানুষ। বাঙ্গালীবা যে স্বভাব ভালবাসে তাহাবা সকলেই ঠিক সেই স্বভাবেব লোক। বুদ্ধিমান্ চতুর দযালু সামাজিক ও গুণগ্রাহী তাঁহাদেব হৃদয়েব ভাব গভীর। এরূপ লোকেব হৃদযবৃত্তিব সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম সন্ধান অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ, তাহা হইতে আমাদের অনেক জ্ঞানলাভ হয়। বঙ্কিম বাবু ইহাদিগের সেইরূপে দেখাইয়াছেন।

রামায়ণ মহাভাবতাদি প্রাচীন পুস্তকাবলীর প্রথম শিক্ষা এই যে পিতামাতার বশ হইবে ভাইকে স্নেহ কবিবে জ্ঞাতিদিগেব সহিত সদ্ব্যবহার কবিবে কিন্তু আমাদের হৃদয়ক্ষেত্রে যে কবিত্রয় আধিপত্য কবেন তাঁহাদের পিতামাতাব সঙ্গে খোঁজ নাই। বঙ্কিম বাবু একবার গোবিন্দলালের মাকে বাহির করিলেন কিন্তু পাছে কোনরূপ গোল ঘটে চটপট উদ্যোগ কবিয়া তাহাকে কাশী পাঠাইয়া দিলেন। বঙ্কিম বাবুর কোন নায়ক বা নায়িকাব ভাই নাই। দুই একটী ভগিনী আছে। গোবিন্দ লালেব পিতৃব্যপুত্র হবলাল সেও কলিকাতায় থাকে। বায়রণেবও বাপ মা ভাইএর সঙ্গে বড় সম্পর্ক নাই। ডনজুয়ানের মুখে ডপাইনেজের নামও শুনিতে পাওয়া যায় না। আজো পারিসিনার কথার উল্লেখই আর প্রয়োজন নাই। কালিদাসের পুস্তকেও পিতামাতা বড়ই অল্প কিন্তু অপরদ্বয়ের

ন্যায় লোপাপত্তি নাই। অনেক অন্যান্য বিষয়েব মধ্যে মধ্যে দুই একবার বিশুদ্ধ সৌভ্রাত্র পিতৃভক্তি প্রভৃতিও দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু বড় অল্প।

এইসকল পাবিবাবিক অনুবাগের পবিবর্ত্তে আমাদের কবিরা প্রতিনিধি দেন দাম্পত্যপ্রণয। দাম্পত্যই বা কেন বলি? বায়বণ ত দাম্পত্যেব কোন ধাবই ধারেন না। শুধু প্রণয় বলি। সুতবাং বায়বণে পাবিবারিক অনুবাগের কিছুই নাই। বঙ্কিম বাবুব পুস্তকে পাবিবারিক অনুবাগেব মধ্যে শুদ্ধ দাম্পত্যপ্রণয় আছে। অন্যান্য অনুবাগেব পবিবর্ত্তে বঙ্কিম বাবুব স্বদেশানুবাগ, বাযবণেব মানবজাতির প্রতি অনুবাগ। একজন অত্যাচারপীড়িত স্বদেশেব জন্য কাঁদিতে শিখাইয়াছেন আব একজন অত্যাচারপীড়িত মনুষ্য জাতির উদ্ধাবের জন্য অস্ত্র ধারণ কবিতে শিখাইয়াছেন। যাহার ক্ষমতা বলে অত্যাচাবেব হস্ত হইতে মুক্তি পায় তাহাদিগকে বাহবা দিতে শিখাইয়াছেন।

কালিদাসের সমাজ ঠিক মনু হইতে এক আকাবে চলিয়া আসিতেছে। তাঁহাব যাহা কিছু আছে সকলই শাস্ত্রসঙ্গত যুক্তিসঙ্গত অণুমাত্র তফাৎ নাই। সুতরাং তাঁহাব গ্রন্থে প্রলোভন নাই। পাপ পুণ্যের মধ্যে পাপ বড় কম সবই পুণ্য। ইচ্ছার স্বাধীনতা নাই। সুতরাং তাঁহাব গ্রন্থ কেবল সুখের ছবি, নিববচ্ছিন্ন বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক আমোদের ছবি। বায়রণ পাপ পুণ্য বলিয়া দুইটী পদার্থ স্বীকার করিতে চান না। সুতবাং লোকে যাহাকে প্রলোভন বলে সে বস্তু তিনি স্বীকার কবেন না। তাঁহার মতে মনুষ্য আপন ইচ্ছায় যাহা করে তাহাই ঠিক, আপন ইচ্ছায় যাহাকে ভাল বাসে সেই প্রণয়ের পাত্র। সুতবাং মনুষ্য আপনার সুখের জন্য আত্মইচ্ছাব উপব নির্ভর করে; কখন কৃতকার্য্য হয় কখন অকৃতকার্য্য হয়, পবেব কথায় কিছুই করিতে চাহে না সমাজেব যে সকল নিয়ম আছে মানিতে চাহে না। বর্ত্তমান সমাজের যেরূপ গঠন তাহাতে সমাজ এরূপ স্বেচ্ছাচাবীদিগকে দমন কবিতে চায সুতরাং উহারা সমাজেব শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। যে সমাজে ইচ্ছাব প্রতিবোধ না থাকে তাহারা সেই রূপ নূতন সমাজ চাহে, তাহা পায় না বলিয়া ঘোরতর সমাজদ্বেষী হইয়া পড়ে।

বঙ্কিমবাবুব এক হাতে কালিদাস আর এক হাতে বায়রণ কিন্তু কালিদাসের আধিপত্য তাঁহাব উপর অধিক। তিনি সমাজ সেই প্রাচীন রীতিতে চালাইতে যান। সেই জিতেন্দ্রিয়ভাব সেই সুখ সেই শান্তি কিন্তু ইচ্ছাশক্তি এক এক সময়ে দুর্দ্দম হইয়া উঠে। এইটি বায়রণের। তিনি লাগাম ছাড়িয়া দিয়া দেখান যে ইন্দ্রিয় বশ কবিতে না পারিলে লোকেব পদে পদে বিপদ ঘটে। তিনি একবার প্রলোভন লোকের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া দেন; দেখান সকলেই

প্রলোভনে ভুলে কিন্তু কেহ অন্তরের ভাব অন্তরেই রাখে, দমন করে। ইহারাই জিতেন্দ্রিয় যথা প্রতাপ। কেহ বা রাখিতে পারে না দমন করিতে পারে না যথা শৈবলিনী ও নগেন্দ্রনাথ। যেই জিতেন্দ্রিয় সেই সুখী সাহসী সর্ব্বত্র প্রশংসাপাত্র। যে অজিতেন্দ্রিয় সেই দুঃখী সাহসশূন্য এবং আত্মগ্লানি পূর্ণ।

কালিদাসের প্রলোভন নাই। বায়রণের সবই প্রলোভন কিন্তু তাহা হইতে উঠিবার ইচ্ছা নাই। বঙ্কিমবাবুর প্রলোভন আছে; তাহার দুঃখ আছে ও তাহা হইতে উদ্ধার হইলে সুখও আছে। সুতরাং আধুনিক সমাজে আমরা বঙ্কিম বাবুর গ্রন্থ হইতে উচ্চতর নীতিশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া থাকি।

বায়রণ হইতে আমরা মানবজাতির প্রতি অনুরাগ করিতে শিখি বটে কিন্তু তিনি স্পষ্ট শিক্ষা কোথাও দেন নাই। তিনি বর্ত্তমান সমাজের অনেক নিন্দা করিয়াছেন। অত্যাচারপীড়িত দিগের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতেই তাঁহার মতলব টের পাওয়া যায়। কিন্তু বঙ্কিমবাবুর গ্রন্থ হইতে আমরা যে স্বদেশানুরাগের উপদেশ পাই সে আর একরূপ। তাঁহার গ্রন্থাবলীর মধ্যে কতকগুলি মূর্ত্তিমান্ স্বদেশানুরাগ আছে। যথা রমানন্দ স্বামীর। এই সকল লোকের কি আশ্চর্য্য গঠন। তাঁহারা যে ব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন তাহার নাম পরহিত ব্রত। পীড়িত যে ধর্ম্মাবলম্বী হউক না কেন, মুসলমান হউক, হিন্দু হউক, খ্রীষ্টিয়ান হউক, তাহার উপকারের জন্য সর্ব্বদাই উদ্যুক্ত। ইঁহারা নিজ জীবন পরের উপকারের জন্য তৃণবৎ ত্যাগ করিতে কাতর হন না। নৈতিক উন্নতির বোধ হয় রমানন্দ স্বামীই পরাকাষ্ঠা, কালিদাস হইতে আমরা আর একপ্রকার অনুরাগের উপদেশ পাই। তাহার নাম সর্ব্বভূতানুরাগ। এ অনুরাগ বুদ্ধধর্ম্মের ফল। কালিদাসের সময়ে যদিও উক্ত ধর্ম্মের লোপাপত্তি হইয়াছিল তথাপি উহা অনেক অংশে হিন্দুদিগের মনে দৃঢবদ্ধ হইযাছিল। কিন্তু অস্মদ্দেশীয় মাংসাশী যুবকবৃন্দ সর্ব্বভূতে দয়ার বড় একটা সম্পর্ক রাখেন না। তাঁহাদের মতে মানবজাতির প্রতি অনুরাগই মুখ্য ধর্ম্ম।

কালিদাসের শকুন্তলার লতা পাতা হরিণ মৃগ প্রভৃতি সোদরস্নেহ। আমরাও ফুলগাছ পুঁতি গোরু বাছুর পুষি কিন্তু তাহাদের উপর আমাদের সোদরস্নেহ হয় না। কিন্তু কালিদাসের হৃদয় পশুদিগের জন্যও কাঁদিত, আমাদের কাঁদে না। বঙ্কিমবাবুর নগেন্দ্রনাথ প্রজাদিগকে সন্তানের ন্যায় স্নেহ করেন। আমাদের স্নেহ বড় ঐ পর্য্যন্তই নামে। বায়রণ সকল মানুষেরই প্রতি স্নেহ করেন। তাহার সাক্ষী তাঁহার গ্রন্থে দুর্দ্দশাপন্ন গ্রীকদিগের জন্য গভীর রোদন ও তাহাদের দুর্গতিনাশের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লোকের মন আকৃষ্ট করা।

আর একটি কথা। ইহাঁদের শিক্ষা দিবার প্রণালী কি একরূপ? সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা বলেন যে, বেদ হইতে যে উপদেশ পাই তাহা আজ্ঞা, পুরাণ হইতে যে উপদেশ পাই তাহা বন্ধুর উপদেশের ন্যায় সুপরামর্শ, কিন্তু কাব্য হইতে যে উপদেশ পাই তাহা কান্তার উপদেশের ন্যায়। কান্তা যেমন নানা প্রকার গল্প গুজব করিয়া মনটি লওয়াইয়া শেষ উপদেশটি বাহির করেন সেটী বাহির করেন সেটী কিন্তু অমোঘ। কবি রাম রাবণের যুদ্ধ বর্ণন করিলেন; নানারূপ বিচিত্র পদার্থ দেখাইলেন, কখন হাসাইলেন কখন কাঁদাইলেন, শেষ একটি উপদেশ দিলেন যে ইন্দ্রিয় অশ্বের লাগাম ছাড়িয়া দিলে অনেক নাস্তানে পড়িতে হয় শেষ রাবণের ন্যায় সপুরী বিনাশও হইতে পারে। ইহাদের তিন জনেরও শিক্ষাপ্রণালী মূলত তাই কেবল কিছু তারতম্য মাত্র আছে।

কালিদাসের উপদেশপ্রদানপ্রণালী ঠিকই এইরূপ। তিনি কোথাও preach করেন না। তাঁহার কাব্যের মুখে যাহা পড়ে তাহাই বলিয়া যান কখনও উপদেশ দিব বলিয়া দোকান খুলিয়া বসেন না। বায়রণের প্রত্যেক চিত্রেই কিছু না কিছু উপদেশ আছে। তাঁহার যেখানে একটি সুন্দর বর্ণনা তাহার নীচেই দুটী বর্ত্তমান সমাজের অত্যাচারের নিন্দা। যেখানে যাও দুপাঁচটী ব্যঙ্গাত্মক উপদেশ নিশ্চয়ই পাইবে। যেমন কোন গোর স্থানে ভ্রমণকালে গোরস্তম্ভ দেখিতে দেখিতে তাহার নীচে যে সকল খোদা অক্ষর দেখিলে তাহা অনেক দিন মনে থাকে, সেইরূপ বায়রণের খোদা কথা অন্তরের সঙ্গে গাঁথা থাকে। রাইনের ধারে রাইনের শোভা দেখিতে দেখিতে বা আল্পসের চূড়ায় আল্পসের শোভা দেখিতে দেখিতে অথবা হাএদী ও জুয়ানের নিশীথ প্রণয় দেখিতে দেখিতে, বায়রণ যে সকল গভীর নৈতিক তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন তাহা পাঠক-হৃদয়ে অঙ্কিত থাকিবে। বায়রণের মাঝে মাঝে preaching ও আছে। কিন্তু বঙ্কিম বাবুর preaching বড় উচ্চ। তাঁহার কমলাকান্তের দপ্তর একটি preaching এর খনি। কত নীতিশিক্ষা উহা হইতে লাভ করা যায় তাহা বলা যায় না। তাঁহার preach করার লোকও আছে, তাঁহার সন্ন্যাসী গুলি সব নীতিশিক্ষার প্রচারক। তাঁহার নগেন্দ্রনাথ প্রভৃতির স্বগত বাণী গুলিও প্রচারক ভিন্ন কিছুই নহে। হরদেব ঘোষালের পত্র অনেক মনোবিজ্ঞান-তত্ত্বের গূঢ়তত্ত্ব সত্য আবিষ্কার করিয়াছে।

লোকে মনে করেন যে বায়রণ হইতে আবার কি নীতিশিক্ষা, বায়রণ অতি অশ্লীল কবি। যাঁহারা একরূপ মনে করেন তাঁহাদের বায়রণ নীতিশিক্ষা দেন না। তাঁহাদের নীতি সেকেলে, বায়রণ, একেলে নীতি শিক্ষা দেন। তিনি রুসোর স্কুলে তৈয়ারি হইয়াছেন। মানুষ সব সমান। সমাজবন্ধন শুদ্ধ দুপাঁচ জন

লোকের হাতে, অত্যাচারের ও যথেচ্ছাচারের ক্ষমতা দিয়া তাহারা অবশিষ্ট মানবমণ্ডলীকে নির্ব্বীর্য্য ও নিস্তেজ করে। এ অবস্থায় পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। তাঁহার কাব্যেও এই ভাব নিরন্তর প্রকাশিত। তাঁহার নিজের ও তৎকল্পিত মানবগণ যদিও দেখিতে মনুষ্যবিদ্বেষী যদিও তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিয়া যুবক ও অনেকে এই ভাবই বিলক্ষণ প্রাপ্ত হয় তথাপি একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে এটী বাহিরে মাত্র, তাঁহার বিদ্বেষ শুদ্ধ বর্ত্তমান সমাজের উপর কিন্তু উহার নীচে মনুষ্যের জন্য সহানুভূতিপরিপূর্ণ।

বঙ্কিমবাবুর পুস্তকের পরহিতব্রত যদিও বায়রণের পরহিতব্রত অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন কিন্তু উহা তাঁহার পুস্তকে অধিকাংশ স্থলেই শুদ্ধ স্বদেশানুরাগেই পর্য্যবসিত। এই জন্য আমরা তাঁহার পুস্তকের উদ্দেশ্য স্বদেশানুরাগই বলিলাম।

উপসংহার কালে সংক্ষেপে বলি, বঙ্কিম বাবুর উদ্দেশ্য স্বদেশানুরাগ ও সামাজিক সুখ, কালিদাসের ভূতানুরাগ ও সামাজিক সুখ, বায়রণের মনুষ্যানুরাগ (Humanelarianism) ও সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘনের সুখ।

তবু বুঝিল না মন।

প্রয়োগ।

তবু বুঝিল না মন!
সুধু চিত্ত ভেঙ্গে গেল, সুধু প্রাণ দগ্ধ হ'ল,
আশার একটি কক্ষ হ'ল না পূরণ;
তবু কেন তার আশা, তবু কেন ভালবাসা,
জাগ্রত নয়নে তবে কেন সে স্বপন?
হায় বুঝিল না মন!

এইরূপে যাবে দিন—
যাবে মাস যাবে বর্ষ, যাবে সুখ যাবে হর্ষ,
গিয়াছে হৃদয় যাবে হতাশ জীবন;
এমনি অতৃপ্ত বক্ষে, এমনি সজল চক্ষে,
অন্তিম শয্যায় শেষে করিব শয়ন,
তবু পাব না সে ধন!

ভীষণ কালের করে—
খসে ভূধরের শির, শুষ্ক হয় সিন্ধুনীর,
মানবের দগ্ধ মন সেও কি রে ডরে?
ভূতল সুখের ঠাঁই, দয়ার অভাব নাই,
অভাগারে সুধু কেহ দয়া নাহি করে,
দুখে হৃদয় বিদরে।

বিরাম।

সে ত নারীর হৃদয়—
করুণার স্রোতস্বিনী, বিপুল স্নেহের খনি,
সুধামাখা প্রণয়ের অনন্ত নিলয়,
বিরাগের লেশ নাই, অতি নিরমল ঠাঁই,
হতভাগা মানবের শান্তির আলয়!
তবে কেন নিরদয়?

প্রয়োগ।

তুমি নিষ্ঠুর সংসার!
নারীর কোমল মন, কেন কর নিদারুণ,
কেন দগ্ধ কর তার হৃদয় আগার?
পাষাণ হৃদয় তব, নাহি কর অনুভব,
নারীর নীরব প্রেম কত যন্ত্রণার!
দোষ নহে অবলার।

বিশাল নয়নে তার—
রুদ্ধ প্রেম প্রবাহিণী, নিরন্তর উন্মাদিনী,
দুখানি পল্লবে ত্রাসে ঢাকে অনিবার;
সদা যেন সশঙ্কিত, সদা আঁখি মুকুলিত,
পাছে নিরখিতে পায় নিষ্ঠুর সংসার;
পাছে দোষে দেশাচার!

সদা আনত বদন!
যেন কত ম্রিয়মাণ, কত উদাসীন প্রাণ—
ফাটে ওষ্ঠাধর তবু ফোটেনা বচন;
সদা ত্রাসে কথা কয়, পাছে প্রেম বাহিরায়,
নিষ্ঠুর সংসার পাছে করয়ে শ্রবণ!
সদা অস্ফুট বচন।

পত্রে কি রহে গোপন!
হৃদয় পিঞ্জর আঁকি, ছেড়ে দেয় প্রাণপাখী,
নরের মনের কথা কহে অনুক্ষণ,
হেন অবারিত পত্রে, দেখিয়াছি ছত্রে ছত্রে,
প্রেমের তরঙ্গ যেন রয়েছে গোপন;
পাছে দেখে অন্যজন!

মর্ম্মে মরি দুই জন—
সে খোঁজে আমার মন, আমি খুঁজি তার মন,
দুজনায় পরস্পরে ভাবি নিদারুণ;
সে ভাবে সে অভাগিনী, আমি হতভাগ্য জানি,
সে ভাবে বুঝে না নর রমণীর মন;
ভাবি আমিও তেমন!

উন্মত্ত উভয় চিত।
দুধারে দু সিন্ধু নাচে, অতি সূক্ষ্ম বাঁধ মাঝে,
খসিলে প্রস্তর এক হইবে মিলিত—
সন্নিকটে দুইজন, চারি চক্ষে সম্মিলন;
দুইটি বচন মুখে হ'লে উচ্চারিত—
ভাসে দুজনার চিত!

সুধু দুইটি বচন!
সুধু করে কর ধরে, সুধু পরস্পরে হেরে,
"প্রিয়তমে" "প্রাণনাথ" হলে উচ্চারণ—
সূক্ষ্ম বাধ ভেঙ্গে যাবে, দুই সিন্ধু উথলিবে,
নিষ্ঠুর সংসার তায় হইবে মগন;
তাত হবেনা কখন।

বিরাম।

তাহা হবে না কখন!
এমনি অতৃপ্ত বক্ষে, এমনি সজল চক্ষে,
অন্তিম শয্যায় শেষ করিবে শয়ন;
এমনি নীরব মুখে, এই তুষানল বুকে,
সহিবে এ তীব্র জ্বালা যাবৎ জীবন—,
তবু কবে না বচন!

প্রয়োগ।

এযে নিষ্ঠুর সংসার—
(হেথা) পাপ প্রণয়ের নাম, বন প্রেমিকের ধাম
স্বার্থত্যাগ আত্মদান যত দুরাচার;
পরিণয়ে যাহা পাবে, অন্ধ খঞ্জ তাই লবে,
হয় প্রেম নয় নেই কপাল তোমার;
তবু চাহিবে না আর!

থাকে হেন কোন স্থান—
যথা পাপ পুণ্য নাই, স্বর্গ মর্ত্ত্য এক ঠাঁই,
উদার কবির মত সকলের প্রাণ,
প্রণয়ে কলঙ্ক নাই, মিলনে বিচ্ছেদ নাই,
অনর্গল প্রেমিকের যুগল পরাণ,
তথা করি অবস্থান।

যথা নারীর হৃদয়,
না চাহিতে প্রাণ খুলে,দেয় প্রেম হাতে তুলে,
না ধরিতে করতল নিজে ধরি লয়,
না করিতে সম্ভাষণ, দেয় প্রেম আলিঙ্গন,
না কহিতে কথা নারী আগে কথা কয়—
যাই ছুটিয়া তথায়।

যথা নারীর বদন —
স্ফুট পঙ্কজের মত, প্রফুল্লিত অবিরত,
কালের কলঙ্ক তাহে হয় না পতন,
মুখে চির মৃদুহাস, বুকে মধু বারমাস,
চিরদিন বাল্যভাব বাল্য আলাপন—
দেখি সে দেশ কেমন।

যথা নারীর নয়নে—
কভু না পলক পড়ে,নিদ্রা না কাতর করে
দিবানিশি উন্মাদিনী সুধা ক্ষরে কোণে,
যথা প্রতি আলিঙ্গনে,লোকে বারমাস গণে,
নিশি অবসান হয় প্রত্যেক চুম্বনে.
তবে যাই সেই স্থানে।

বিরাম।

নাহি ভূতলে তেমন—
তবে কেন তার আশা? তবে কেন ভালবাসা?
জাগ্রত নয়নে তবে কেন সে স্বপন?
সুধু চিত্ত ভেঙ্গে যাবে,সুধু প্রাণ দগ্ধ হ'বে,
আশার একটি কক্ষ হবে না পূরণ।
তবে কেন অকারণ?

প্রযোগ।

তবে কেন অকারণ?
জ্বলন্ত চিতায় যাবে, এই দেহ দগ্ধ হবে,
বিদারিয়া বক্ষস্থল ক'রো দরশন—
অবাধ্য চিত্তের সহ, যুদ্ধ করি অহরহ,
কত অস্ত্রাঘাত তায় হয়েছে পতন,
কত সহেছি বেদন!

নিরমল মুখ তার—
কি গোপনে কি বেদনে,ভাবিয়াছি নিশিদিনে,
নিরাশায় মরিয়াছি মর্ম্মে কতবার;
কত যে উদাস মনে,কাঁদিয়াছি সঙ্গোপনে,
তুমি কি বুঝিবে তাহা নিষ্ঠুর সংসার?
চিত্ত পাষাণ তোমার!

যাও শয়ন মন্দিরে—
দেখ গিয়া উপাধানে, বাতায়নসন্নিধানে,
কলঙ্কিত হইয়াছে নয়নের নীরে,
প্রত্যেক স্মরণে তার,ঝরিয়াছে নেত্রাসার,
বহ্নিস্রোত সম রক্ত বহিয়াছে শিরে—
যাও শয়নমন্দিরে।

দেখ চিত্রপট তার—
উন্মত্ত চুম্বনে তার, কলঙ্কিত চারিধার,
প্রত্যেক চুম্বনে বক্ষ ভেঙ্গেছে আমার;
আন তার পত্র গুলি,পাতে পাতে দেখ খুলি,
ভয়ঙ্কর অশ্রুচিহ্ন অঙ্গে চারি ধার;
চিত্ত কাঁপিবে তোমার।

আর যথায় নির্জ্জন—
প্রাসাদের উচ্চ শিরে, গঙ্গার নির্জ্জন তীরে,
উদ্যানে তরুর মূলে কর অন্বেষণ;
অশ্রু চিহ্ন অভাগার, কোনস্থানে আছে তার,
প্রদোষে সায়াহ্নে যথা করেছি ভ্রমণ—
দেখ করি অন্বেষণ।

এইরূপে সঙ্গোপনে—
কিবা দিবা বিভাবরী, নিষ্ফল তপস্যা করি,
ভ্রমিব এ মরুময় সংসার প্রাঙ্গণে;
এই আশাপূর্ণ মনে, বিমোহিত দুনয়নে,
আজীবন নিরখিব তাহার বদনে?
সহি অনন্ত বেদনে!

বাঙ্গালা বর্ণমালা সংস্কার।

বর্ণমালা সংস্কার বিষয়ে বঙ্গদেশে দুই প্রবাদ প্রচলিত আছে, প্রথম—দিধীতিকার রঘুনাথ শিরোমণি যখন গুরুমহাশয়ের পাঠশালায়, ক খ, শিখিতে আরম্ভ করেন তখন গুরুমহাশয়ের শ্রীমুখ হইতে সমুদয় ব্যঞ্জনবর্ণের একবার উচ্চারণ* শ্রবণ করিবামাত্র রঘুনাথ বর্ণমালার সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন। বলিয়া উঠিলেন "হ্যাগা দুটা 'জ' দুটা 'ব' তিনটা 'শ' রাখিবার প্রয়োজন কি?"

দ্বিতীয়—বঙ্গদেশীয় কোন কলেজের প্রিন্সিপাল সাহেব একদিন কলেজের পণ্ডিতকে স্বীয় কামরায় ডাকাইয়া বলিলেন "ওএল পণ্ডিট টোমাডের বর্ণমালার টৃটীয় এবং চটুর্ঠ বর্গের কিছু ভিন্নটা ডেকাইটে পার? আমি ট অনেক পরিশ্রম করিয়া ডেকিয়াছি ডুইরই একরূপ উচ্চারণ।"

উপরে বর্ণমালার সংস্কারবিষয়ে যে দুইটি প্রবাদ উদ্ধৃত হইল আমাদের প্রস্তাব সেরূপ সংস্কার সম্বন্ধে নহে; রঘুনাথ শিরোমণির ন্যায় আমাদের বুদ্ধির তাদৃশ প্রতিভা নাই যে পাঠারম্ভেই কতকগুলি বর্ণ এবালিস করিতে চাই এবং দ্বিতীটীর ন্যায় বিদেশীয় নহি যে তৃতীয় এবং চতুর্থ বর্গের উচ্চারণপার্থক্য দেখিতে পাই না। আমাদের প্রস্তাব স্বতন্ত্র তাহার কারণও স্বতন্ত্র।

ভারতের এই অসংখ্য নির্ব্বাক্ মনুষ্যের সুখ দুঃখ, ন্যায় অন্যায়, শিক্ষা অশিক্ষা সকলই ইংরেজ কর্ম্মচারীর হাতে। এই সকল কার্য্য সুশৃঙ্খল রূপে

* আমাদের দেশে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় সচরাচর ব্যঞ্জনবর্ণের প্রথম অভ্যাস করান হয়।

নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত তাঁহাদের এ দেশী ভাষা সকল অভ্যাস করিতে হয়, কেবল অভ্যাস নয় মধ্যে মধ্যে পরীক্ষাও দিতে হয়। বিপদের উপর বিপদ!!! তাও কি ছাই ভারতবর্ষে দেশী ভাষা একটি—মহারাষ্ট্রা, কর্ণাটি, মালবী, তৈলঙ্গী, উড়ে, বাঙ্গালা, হিন্দি, পঞ্জাবী, উর্দ্দূ প্রভৃতি অসংখ্য। এই অসংখ্য ভাষার বর্ণমালাও অসংখ্য, অর্থাৎ প্রত্যেক ভাষার বর্ণমালার আকার বিভিন্ন রূপ।

এই বর্ণমালাগত বৈষম্যই দূর করিবার নিমিত্ত ইটন কলেজের সহকারী শিক্ষক ড্রু সাহেব একটী সুদীর্ঘ প্রস্তাবের অবতারণা করেন। প্রস্তাবের মর্ম্ম এই যে, ভারতীয় ভাষাসমূহের বর্ণমালাগত ঐক্য সম্পাদনের নিমিত্ত রোমান বর্ণমালার ব্যবহার করা সম্পূর্ণ উচিত। তিনি নিজ মত সমর্থনের জন্য যে সকল যুক্তির উপন্যাস করিয়াছেন তাহাদের ভাবার্থ নীচে কতিপয় বাক্যদ্বারা প্রকাশ করা যাইতেছে।

প্রথম—রোমান বর্ণমালার মত অল্পাক্ষর অথচ সকল কথা লিখিবার উপযোগী বর্ণমালা আর দৃষ্ট হয় না। তাহার সকল অক্ষর গুলি পৃথক্ পৃথক্। ইহাতে বাঙ্গালা বা হিন্দি প্রভৃতির ন্যায় সংযুক্তবর্ণ নাই এবং উর্দ্দূর ন্যায় নোক্তা (বিন্দু) বিশিষ্ট অধিক বর্ণ নাই। অতি অল্প মাত্র আয়াসে ইহাকে আয়ত্ত করা যায়। আরও দেখ ইহা দ্বারা যখন ইংরেজী, আইরিস, স্কচ, ফ্রেঞ্চ, লাটিন প্রভৃতি ইউরোপীয় বিভিন্ন রূপ ভাষা সকল অনায়াসে লিখিত হইতেছে, তখন ভারতীয় ভাষা সকল কেন না লিখিত হইতে পারিবে?

দ্বিতীয়—জ্ঞানোন্নতিই সভ্যতার মূল। জ্ঞানোন্নতির মূল উত্তম উত্তম পুস্তক অধ্যয়ন করা। তাদৃশ পুস্তক অধ্যয়নের সৌকর্য্য বিষয়ে মুদ্রাঙ্কণ একটী প্রধান উপায়। অতি অল্প লোকেই সমুদয় পুস্তক স্বহস্তে লিখিয়া পাঠ করিতে সমর্থ হয়। ইহাতে এই সিদ্ধান্ত হইল যে মুদ্রাঙ্কণ যত অল্পব্যয়ে সম্পন্ন হইবে ততই জ্ঞান, সভ্যতা এবং ভাষার উন্নতি হইবে। উত্তম পুস্তক সকল অল্পমূল্যে বিক্রীত হইলে অধিক লোকে তাহা পাঠ করিয়া জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হয়। এ দিকে অক্ষরসংখ্যার অল্পতাই মুদ্রাঙ্কণব্যয়লাঘবের এক প্রধান উপায়। মুদ্রাঙ্কণব্যয়ের লঘুতা হইলেই পুস্তকের মূল্য অল্প হয়। এই নিমিত্ত সচরাচর চারি আনা মূল্য ইংরেজী পুস্তকের তুল্যাকার এ দেশী পুস্তকের মূল্য প্রায় ১ টাকা হইয়া থাকে। আরও দেখ, রোমান অক্ষরে মুদ্রিত পুস্তক সকল যে পরিমাণে পরিশুদ্ধ হয় সেরূপ পরিশুদ্ধ পুস্তক এ দেশী অক্ষরে অল্পই মুদ্রিত হইয়া থাকে। ইহার কারণ আর কিছুই নয় অশিক্ষিত কম্পোজিটরেরা দেশী অক্ষরের অসংখ্য বিভিন্নতাগুলি বিস্মৃত হইয়া একস্থানে অপরের বিন্যাস করিয়া ফেলে।

তৃতীয়—আদলত সমুদয়ে যে সকল হস্তলিপির ব্যবহার হয় তাহাদের নাম

ভাঙ্গা বা সিকস্তা। সিকস্তা লেখা এরূপ কদর্য্য যে বিদেশীয় হাকিমের কথা দূরে থাকুক তাহা পাঠ করিতে দেশীয় মুহুরীরাও সময়ে সময়ে ঘর্ম্মাক্তকলেবর হয়। বিশেষ উর্দ্দূর সিকস্তা অতি ভয়ানক। প্রথমে, উর্দ্দূর পবিষ্কৃত হস্তলিপিতেও সকল অক্ষর স্পষ্ট রূপে থাকে না অনেকস্থলে কেবল নোক্তাব দ্বারা অক্ষবেব অনুমান কবিতে হয়। নোক্তাব একটু ন্যূনাধিক হইলে 'বাপে'ব জায়গায় 'তাপ' এবং তাপের স্থলে 'পাপ' পঠিত হইতে পাবে। সিকস্তা লেখায় আবার সেরূপ নোক্তাও দেওয়া হয় না। এক্ষণে বিবেচনা কব এরূপ লিপি পাঠ কবা কত কঠিন। কাযে কাযেই বিদেশীয় হাকিমগণ কথাব অর্থ জানিয়াও আর্জ্জী বা দলিল প্রভৃতি স্বয়ং পাঠ কবিতে অসমর্থ হইয়া সেবেস্তাদাবের অধীন হইয়া পড়েন। সেরেস্তাদাব মহাশয়েবা এ বিষয়ে নিজের অপ্রতিহত ক্ষমতা জানিয়া যে পক্ষ হইতে লম্বোদব পূর্ণ হয় দলিল গুলিকে সেই পক্ষেব অনুকূলে পাঠ কবেন; ধর্ম্মাবতাবেবা চক্ষু থাকিতেও অন্ধেব মত রামেব বিষয় শ্যামকে দিতে অনুমতি করেন। রোমান অক্ষরের ব্যবহার হইলে হাকিমেবা নিজে দলিল প্রভৃতি পাঠ কবিতে সমর্থ হইবেন সুতরাং এতাদৃশ বঞ্চনা বা ব্যভিচারের অনেক হ্রাস হইবে।

চতুর্থ—এক্ষণে বিজ্ঞানের অনুবাদ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে দুইটী বিভিন্ন মত দেখা যায়। প্রথম মতে বৈজ্ঞানিক পদ সকল অনুবাদিত হইয়া ব্যবহৃত হওয়া উচিত—যেমন অক্সিজেন (Oxygen) স্থলে প্রাণপ্রদ বাষ্প, হাইড্রজন (Hydrogen) স্থলে জলযান বাষ্প ইত্যাদি রূপে লেখা উচিত। দ্বিতীয় মতে এসকল কথাব অনুবাদ কবাই উচিত নয়। কাবণ ইহারা ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় অনুবাদিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ ধাবণ করিলে কালে মূল পদার্থজ্ঞানেব প্রতি অনেক ভ্রম জন্মিতে পাবে। আবও দেখ সকল ভাষায় ইহাদের এক স্বরূপ থাকিলে ঔষধালয়ের কম্পাউণ্ডব প্রভৃতির অনেক সুবিধা হয়। এই সকল কাবণে অধিকাংশ পণ্ডিতেরা এই দ্বিতীয় মতের পোষকতা কবেন। এক্ষণে বিবেচনা কর ঐ সকল কথাব স্বরূপ বোমান অক্ষরে যেরূপ ঠিক্ ঠিক্ লেখা হয় অন্য বর্ণমালায় সেরূপ হইতে পাবে না, বিশেষ উর্দ্দূ বর্ণমালায়যাহাতে Act, এক্‌ট, Lecture, লেক্‌চর, Tax, টেক্স বিদেশীয় কথা সকল এতাদৃশ বিরূপ করিয়া লিখিত হয়।

পঞ্চম—ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ অনুসন্ধানে স্থির কবিয়াছেন যে বোমান বর্ণমালা প্রাচ্য বর্ণমালাব সহিত সগোত্র অর্থাৎ এক বংশসম্ভূত। অদ্যাপি প্রাচ্য ভাষা সকলের বর্ণ বিন্যাসের সহিত ইহার বর্ণবিন্যাস সম্পূর্ণ ঘনিষ্টতা রক্ষা করিতেছে। অতএব রোমান বর্ণমালায় প্রাচ্য ভাষা সকল লিখিত হইলে তাহাদের উচ্চারণ পূর্ব্ববৎ বিশুদ্ধই থাকিবে।

ইত্যাদি বিবিধ যুক্তি দ্বারা ড্রু সাহেব আত্মমত সমর্থন করিয়াছেন। ড্রু সাহেবের এ উদ্যম নূতন নয়। ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে সার বিলিয়ম জোন্‌স প্রথমে ভারতবর্ষীয় বাক্য সকল রোমান অক্ষরে লিখিতে প্রবৃত্ত হন। তদনন্তর সার চার্লস ট্রিবিল্যান, ডাক্তর ডফ, মিষ্টর পার্শ্ব, মিষ্টর টমাস প্রভৃতি তৎকালীন প্রধান প্রধান ইংরেজগণ কলিকাতায় এই বিষয়ে উদ্যম করেন কিন্তু কেহই কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারেন নাই। এক্ষণে ড্রু সাহেব পুনর্ব্বার সেই প্রাচীন উদ্যমকে জীবিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সিবিলিয়নগণ অতিশয় আনন্দের সহিত তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অনেক স্থলে এই মতানুসারে কার্য্য করিবার নিমিত্ত সভাও সংস্থাপিত হইয়াছে। লাহোরের 'রোমান উর্দ্দূ' নামক একটি সভা হইয়াছে এবং এতন্নামধেয় একখানি মাসিক পত্রও প্রকাশিত হইতেছে।

প্রোফেসর মনিয়র বিলিয়ম প্রভৃতি এই মতের পৃষ্ঠরক্ষক; কেবল লাহোর গবর্ণমেণ্ট কলেজের অধ্যক্ষ পঞ্জাব মহাবিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তর লাইটনর এবং অপর দুই একজন ইংরেজ ইহার প্রতিবাদী।

ডাক্তর লাইটনর বলেন "ভারতবর্ষস্থিত বর্ণমালা সমূহের পরিবর্ত্তে রোমান বর্ণমালার ব্যবহার সহজ উপায় নহে। কারণ দেশীয় লোকেরা স্বস্ব বর্ণমালাকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে। তাহারা চিরসমাদৃত বর্ণমালাসমূহের স্থানে নূতন বর্ণমালাকে অভিষিক্ত করিতে কখনই স্বীকৃত হইবে না। রোমান বর্ণমালা দেশীয় লোকের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত; ইহার ব্যবহার হইলে দেশী লোকেরও কোন উপকার নাই অধিকন্তু ইহার ব্যবহার করিলেই যে বিদেশীয়েরা অতি সহজে দেশীভাষা সকল শিক্ষা করিতে পারিবেন ইহাও সম্পূর্ণ সন্দেহস্থল। কারণ রোমান অক্ষরে লিখিত দেশী কথার যদি বিশুদ্ধ উচ্চারণ না শিক্ষা করা যায় তবে কখনই তাহা পাঠ করা যায় না। দেখ রোমান অক্ষরে ফরাসী প্রভৃতি ইউরোপীয় ভাষা সকল লিখিত হইয়া থাকে কিন্তু কয়জন ইংরেজ রীতিমত শিক্ষকের নিকট অধ্যয়ন না করিয়া কেবল পুস্তক পাঠ করিয়া সেই সকল ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন? যদি রোমান অক্ষরে লিখিত দেশীভাষার উচ্চারণ শিক্ষা করিবার নিমিত্ত দেশী শিক্ষকের আবশ্যক হইল তবে আর ইহাদ্বারা কি সৌলভ্য উৎপন্ন হইল।"

"আমি পঞ্জাবে দীর্ঘকাল অবস্থান এবং তদ্দেশীয়দিগের সহিত আন্তরঙ্গ লাভ করিয়া ইহা স্থির করিয়াছি, যে দেশীয় লোকেরা স্বদেশপ্রচলিত প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতিকে অনেক উৎকৃষ্ট বিবেচনা করে, বাস্তবিকও তাহা উৎকৃষ্ট। তদনুসারে শিক্ষালাভ করিলে শাস্ত্রে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি লাভ হয়। ঐ সকল শিক্ষাপদ্ধতি ধর্ম্মযাজক এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি দ্বারা প্রচ-

লিত; অতএব সেই সকল সমাজের মূর্দ্ধন্য ব্যক্তিদিগের হৃদয়স্থিত সংস্কার অস্মদীয় সংস্করণের অনুগত না করিলে কোন বিষয় সংস্করণ চেষ্টা বিফল মাত্র। কিন্তু সেই সকল লোক স্ব স্ব ধর্ম্মপুস্তকের বর্ণমালা দেবনাগরী এবং ফার্সি আরবী পরিত্যাগ করিয়া রোমান বর্ণমালা গ্রহণ করিতে কখনই প্রবৃত্ত হইবে না।"

"ভারতবর্ষীয় ভাষাসমূহে এমন অনেক উচ্চারণ আছে, যাহা রোমান বর্ণমালা দ্বারা প্রকাশিত হইতে পারে না। তাহাদের প্রকাশের নিমিত্ত কতকগুলি নূতন রোমান বর্ণের আবিষ্কার করিতে হইবে,অথবা বর্ত্তমান অক্ষরনিচয়ে বিশেষ সঙ্কেত সংযোগ করিতে হইবে। তাহা হইলে রোমান বর্ণমালায় দেশীয় বর্ণমালা-সমূহের ন্যায় বিভিন্নতা আসিয়া পড়িল। আরও দেখ, ইংরেজেরা যে রোমান অক্ষরে লিখিত স্বভাষা বিশুদ্ধরূপে পাঠ করেন, তাহা কেবল বহুকালকৃত অভ্যাসের ফল। অভ্যাসের বশেই তাঁহারা light কে "লাইঘট" না পড়িয়া "লাইট" রূপে পাঠ করেন। সেইরূপ অভ্যাস করিলে তাঁহারা সিকস্তা পাঠ করিতেও সমর্থ হইবেন।"

"রোমান অক্ষরে দেশীয়ভাষা লিখিত হইলে অনেকে আগ্রহ প্রকাশ করিতে পারে, কারণ ইহাদ্বারা ইংরেজী লেখা সহজ হইয়া যাইবে। কিন্তু তাহাদিগকে ইংরেজী শিক্ষা করান কেবল তাহাদের হৃদয়ে অসন্তোষ জন্মান মাত্র। কেন না দেশীলোকেরা কেবল চাকরী পাইবার প্রত্যাশায় স্কুলে বা কলেজে শিখিতে প্রবিষ্ট হয়। কিন্তু এখনই ত কেরাণীর সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে, যে সাত আট টাকা বেতনে একজন উত্তম কেরাণী পাওয়া যায়। তাহার উপর আরও বৃদ্ধি করা কেবল অসন্তোষের কারণ।"

"ইংরেজেরা অপর ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন,ইহা সম্পূর্ণ অভীপ্সিত, কিন্তু ভারতবর্ষে সেটি কঠিন হইয়া পড়িয়াছে; কারণ এখানে তাঁহাদের ক্ষমতা অপ্রতিহত। এখানে তাঁহারা যথেচ্ছ শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত করিতে পারেন। এখানকার লোক নির্ব্বাক্। রাজপ্রদর্শিত শিক্ষা-পদ্ধতি সম্পূর্ণ অনুপযোগী হইলেও ইহারা তাহার প্রতিকূলে একটী কথা কহিতে পারে না। একটি উদাহরণ দেখান যাইতেছে। কতকগুলি ব্রিটীস্ অফিসর্ বিবেচনা করিলেন,পূর্ব্বে এ দেশীয় কোন কথা রোমান অক্ষরে লিখিবার সময় যে যে স্থানে 'u' ব্যবহার করা হইত তাহা অতি ভুল, সেই সেই স্থানে 'a' ব্যবহার করা উচিত; অমনি 'u' স্থানে 'a' ব্যবহার হইতে লাগিল। এমন কি 'Mussulman' কে 'Massalman' এই রূপ লিখিতে আরম্ভ করিলেন। কোন পণ্ডিত আবার 'a' র উপর জোর উচ্চারণ চিহ্নও দিয়া থাকেন।"

পরিশেষে ডক্তার লাইটনর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে,—

"The proper way to get over the difficulties of the native character was to improve that character itself and though this might appear a gigantic task, it was not greater than that had been achieved in other cases."

ডাক্তর লাইটনর নিতান্ত নিঃসহায় নন। দুই একজন দেশী এবং ইংরেজও ইঁহার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন।

রেভরণ্ড জেমস্ লঙ্ সাহেব বলেন, যে তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া অবধি ভারতবর্ষীয় কথা সকল রোমান অক্ষরে লিখিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তাহার ফল এই হয়, যে কেবল এক বাঙ্গালা ভাষা (যাহা ৮ কোটী মাত্র লোক দ্বারা ব্যবহৃত হয়) তাহাতেও তিনি রোমান বর্ণমালা ব্যবহার করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট কোন বাধা দেন নাই; পরীক্ষাও যত্নসহকারে হইয়াছিল, কিন্তু একখানি ষ্ট্যাটেষ্টমেণ্টের অনুবাদ ঐ অক্ষরে মুদ্রিত হয় মাত্র। সে পুস্তকখানি কাগজের মূল্য দিয়াও কেহ গ্রহণ করে নাই, আর দশ জনের অধিক লোক সেখানি পাঠ করিয়াছে কিনা সন্দেহ।

তিনি আরও বলেন, যে ডাক্তর ডফসাহেব প্রথমে রোমান অক্ষর ব্যবহারের সম্পূর্ণ সহযোগী ছিলেন। কিন্তু তিনিও পরিশেষে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে রোমান অক্ষর দ্বারা ভারতবর্ষীয় ফারসী এবং সংস্কৃত ভাষা লিখিত হইতে পারে না। ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের মত একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ নয়, ইহা একটি বিস্তৃত প্রদেশ। এত বড় বিস্তৃত প্রদেশে বর্ণমালাগত একতা সম্পাদন একপ্রকার অসম্ভব।

রাইশউদ্দীন আহমদ্ বলেন, যে আরবী ভাষাও কখনই রোমান অক্ষরে লিখিত হইতে পারিবে না, এবং উর্দ্দূর বিষয়েও ইহা বলা যাইতে পারে, যে উর্দ্দূর এবং আরবীর বর্ণমালাগত কোন বৈষম্য নাই। তবে উর্দ্দূ বর্ণমালায় সংস্কৃত হইতে কতকগুলি অক্ষর দেওয়া হইয়াছে মাত্র। উর্দ্দূ বর্ণমালায় ৫৫টী অক্ষর; প্রত্যেকের উচ্চারণ ভিন্ন ভিন্ন রূপ। ইংরেজি বা রোমান বর্ণমালায় ২৬টী অক্ষর মাত্র। তাহার মধ্যে w, x এবং y এই তিনটি অক্ষর অনায়াসে পরিত্যাগ করা যায়। তাহা হইলে ২৩টী বর্ণ অবশিষ্ট থাকে; ২৩টী দ্বারা ৫৫টীর কার্য্য যে কিরূপ সুশৃঙ্খলে হইতে পারে, তাহা বুদ্ধিমান্ একটু বিবেচনা করিলে বুঝিতে পারিবেন। উর্দ্দূ এবং আরবী বর্ণমালায় কিছুই বিভিন্নতা নাই। কোরাণ আরবী অক্ষরে লিখিত, ভারতবর্ষে প্রায় ৮।৯ কোটি মুসলমানের বাস। এই সকল মুসলমান যত দিন কোরাণকে মান্য করিবে, তত দিন উর্দ্দূ অক্ষরকে কখনই পরিত্যাগ করিবে না কারণ অন্য অক্ষরে কোরাণ পাঠ নিষিদ্ধ।

মিষ্টর পার্সনসাহেব বলেন, যে রোমান বর্ণমালার হস্তলিপিতে যদি (i) র মস্তকে

বিন্দু না দেওয়া হয়, এবং (t)র মস্তকচ্ছেদ না করা হয় তাহা হইলে যে যে কথায় ঐ দুই বর্ণ থাকে তাহা পাঠ করিবার সময় বিষম ভ্রম উৎপন্ন হয়। এক্ষণে বিবেচনা কর, রোমান অক্ষরে লিখিত উর্দ্দূ বা অন্য কোন দেশী কথার উপর উচ্চারণ চিহ্ন অবশ্যই দিতে হইবে, নতুবা যথার্থ উচ্চারণের সহিত কথাটিও বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। সেই সকল উচ্চারণ চিহ্নের সম্যক্ বিধান করা অল্প দিন বা অল্প পরিশ্রমের কার্য্য নয়; আবার সেই উচ্চারণচিহ্নের এ দিক ও দিক হইলে, যে বিপদ সেই বিপদই থাকিবে।

লাইটনর সাহেবের পক্ষে যে সকল লোক আছেন, তাঁহাদের মধ্যে ইঁহারাই প্রধান। এক্ষণে ড্রু সাহেবের পক্ষপাতীদিগের মত কি দেখা যাক।

সরজর্জ্জ কাম্বেল সাহেব বলেন—"প্রায়ই ভাষার উচ্চারণ অনুসারে তদীয় বর্ণমালার প্রবৃত্তি হইয়াছে। প্রত্যেক ভাষার উচ্চারণ ভিন্নপ্রকার, সুতরাং ইহা সচরাচর দৃষ্ট হয় যে, এক ভাষার বর্ণমালা অপর ভাষায় ব্যবহার করিলে একপ্রকার অসামঞ্জস্য উৎপন্ন হয়। ইহার উদাহরণ—ইংরেজি ভাষায় রোমান বর্ণমালার ব্যবহার। ইংরেজি উচ্চারণের সহিত বর্ণবিন্যাসের কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই।"

"যতদিন ভাষার রূপ বিশুদ্ধ থাকে, ততদিন তাহাদিগকে নিজ নিজ বর্ণমালা দ্বারা প্রকাশ করা উচিত, কিন্তু এক্ষণে ভারতবর্ষে যে সকলভাষা প্রচলিত, তাহাদের মধ্যে একটিরও রূপ বিশুদ্ধ নাই। এখনকার বাঙ্গালা ভাষায় শতকরা ৫টা হিন্দি, দশটা উর্দ্দূ এবং পঞ্চাশটা ইংরেজি কথা ব্যবহৃত হয়; হিন্দি, উর্দ্দূ প্রভৃতি অপরাপর ভাষারও এইরূপ খিচুড়ী হইয়াছে। এরূপস্থলে ইহাদের সকলের নিমিত্ত একটী রোমান বর্ণমালা ব্যবহার করা অনুচিত নহে।"

কোন ব্যক্তি লিখিয়াছেন, "এক্ষণে বিশুদ্ধ হিন্দি বা বাঙ্গালা ভাষার ব্যবহার প্রায় দৃষ্ট হয় না, এক্ষণে উহাদের মধ্যে কতকগুলি ইংরেজি কথা আসিয়া অধিকার স্থাপন করিয়াছে।

"ঐ সকল ইংরেজি কথা নানা উপায়ে আসিয়াছে, কতকগুলি ডাক্তর প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকদিগকে অবলম্বন করিয়া, কতকগুলি স্কুলের শিক্ষক বা ছাত্রদিগকে অবলম্বন করিয়া, কতকগুলি আফিসের কর্ম্মচারীদিগের সাহায্যে, আর কতকগুলি ইংরেজদিগের সহিত অতিশয় ঘনিষ্টতা হওযায় আসিযাছে। অধিক কি এক্ষণে একজন সামান্য কেরাণী বাবুর স্ত্রী তাঁহার স্বামীকে বলেন, "এখন কি অফিস যাবার টাইম হয় নি?" ইহাতে অনুমান হইতেছে যেরূপ আঙ্গলো-সাক্‌সন (Anglo-Saxon) ভাষা নরম্যান (Norman) ভাষার সহিত মিলিত হইয়া ইংরেজি ভাষায় পরিণত হইয়াছে, ক্রমশঃ এদেশী ভাষা সকলের পরিণামও সেই রূপ হইবে। এমনস্থলে রোমান বর্ণমালা

ব্যবহারের যে উৎকৃষ্ট ফল, তাহা বলা বাহুল্য।"

আর একজন লিখিয়াছেন, "যাঁহারা রোমান বর্ণমালা ব্যবহারের প্রতিবাদ করেন, তাঁহাদের যুক্তিসকল সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। তাঁহারা বলেন, সপ্ততি বা ততোধিক বর্ণমালার পরিবর্ত্তে একটী পঠনোপযোগী বর্ণমালা সংস্থাপন করা সম্ভাবিত নহে। কিন্তু এতাদৃশ বর্ণমালার অভাবে তাঁহারা অনেকস্থলে এরূপ ইংরেজির ব্যবহার করেন, যাহার তাৎপর্য্য সুস্পষ্ট অক্ষরে লিখিত দেশী ভাষায় প্রকাশ করিলে নিঃসন্দেহ অনেক উপযোগী হইত। প্রতিবাদীরা বলেন, কতকগুলি ইউরোপীয়দিগের সুবিধার নিমিত্ত ভারতবর্ষের চিরসমাদৃত বর্ণমালাস্থলে রোমান বর্ণমালার ব্যবহার উচিত নহে। সত্য, কিন্তু বিবেচনা কর ইউরোপীয়েরা যখন ভারতবর্ষ শাসন করিতেছেন, তখন তাঁহাদের যে অত্রত্য প্রচলিত এবং অপ্রচলিত ভাষা সমূহে ব্যুৎপত্তি লাভ করা উচিত, এ বিষয়ে বোধ হয় কাহারও দ্বিধা নাই। এবং এই প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ হইলে ইহার অনুমান স্বরূপ ইহাও স্থির বুঝিতে হইবে, যে যাহাতে ইউরোপীয়গণ সহজে ভারতবর্ষীয় ভাষা সকল অভ্যাস করিতে পারেন, প্রত্যেক হিতৈষী ব্যক্তির তাদৃশ উপায় উদ্ভাবন করা উচিত।

এ দেশীয় বর্ণমালাস্থলে রোমান বর্ণমালার ব্যবহার হইলে ইউরোপীয়দিগের পক্ষে এ দেশীভাষা সম্যক্ শিক্ষা করিবার যে সহজ উপায় হইবে, এবিষয় প্রত্যক্ষই প্রমাণ। কোন পুস্তক ফারসী এবং রোমান অক্ষরে কাপি করিয়া দুইজনকে পড়িতে দিলে রোমান অক্ষরে লিখিত পুস্তকপাঠী নিশ্চয়ই অগ্রসর হইবেন। যদি বল ইংরেজেরা যেমন সমধিক চর্চ্চা এবং মনোনিবেশের সহিত অভ্যাস করিয়া জর্ম্মণ এবং গ্রীক অক্ষর অনায়াসে পাঠ করিতে পারেন, সেইরূপ অভ্যাস করিলে দেশী অক্ষরেও প্রভুতা লাভ করিবেন। ইহা অতি ভ্রান্তযুক্তি। কেন না দেশী অক্ষরের সহিত জর্ম্মণ বা গ্রীক অক্ষরের তুলনা হইতে পারে না, কারণ ঐ উভয় বর্ণমালায় এ দেশী বর্ণমালা সমূহের মতবিভিন্নতা বা সংযুক্তাক্ষরের বাহুল্য নাই। সত্য বটে, প্রাচ্যভাষাসমূহে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে হইলে ব্যাকরণ অভিধান এবং তদ্ভাষায় ব্যুৎপন্ন শিক্ষকের সাহায্য আবশ্যক করিবে, তথাপি রোমান বর্ণমালা ব্যবহার করিলে একদিনে যে ফল লাভ হইবে, এ দেশীয় অক্ষরে দশ দিনে তাহা হয় কি না সন্দেহ।"

কোন ব্যক্তি লিখিয়াছেন, "আমরা ফারসী তুর্কী প্রভৃতি যে সকল মুসলমান রাজ্যের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করি, সেই সকল স্থানের লোকদিগকে অসভ্য, অশিক্ষিত, নিরুৎসাহী, দুর্ব্বল এবং ধর্ম্মনীতিশূন্য দেখিতে পাই। অর্থাৎ খৃষ্টানদিগের সহিত তুলনা করিলে মুসলমানেরা অনেক হীন বলিয়া বোধ হয়। খৃষ্টান-

দিগের মধ্যে যে এতাদৃশ সভ্যতাদির উন্নতি হইয়াছে, ইহার কারণ কেবল মুদ্রাযন্ত্র। যে পর্য্যন্ত মুসলমানদিগের মধ্যে মুদ্রাযন্ত্র প্রচলিত না হইবে, তত দিন তাহাদের উন্নতিও হইবে না, আর রোমান অক্ষরের ব্যবহার ব্যতীত মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলিত হওয়া না হওয়া তুল্য।”

এইরূপ অনেক সাহেব যথাশক্তি অধিক বা অল্পপরিমাণে নিজ নিজ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া রোমান অক্ষর ব্যবহারের পক্ষপাত করিতেছেন। পঞ্জাবে উর্দ্দূর স্থানে রোমান অক্ষর ব্যবহারের নিমিত্ত বিশিষ্ট উদ্যমও হইতেছে। আমরা দেখিতে পাই, আজকাল সকল কার্য্য বিশেষতঃ ইংরেজদিগের কার্য্য, ভারতীয় দুর্ভিক্ষ বা এপিডেমিকের ন্যায় দেখিতে দেখিতে দেশময় বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ভারতবর্ষের একদেশে যখন এরূপ হইতেছে তখন দেখিতে দেখিতে অপর দেশেও যে এরূপ উদ্যম হইবে সে বিষয়ে অল্প মাত্র সন্দেহ করা যাইতে পারে।

যখন আমাদের পরিচ্ছদ ইংরেজি, ভোজন ইংরেজি, গৃহসজ্জা ইংরেজি, চিকিৎসা ইংরেজি, তখন বর্ণমালা ইংরেজি হইলে আর বিশেষ দুঃখ কি? বরং এক্ষণে বারিষ্টর মুখোপাধ্যায় এবং সিবিলসর্জ্জন চট্টোপাধ্যায়, কখন কখন বাঙ্গালা অক্ষরে তাঁহাদের নাম লেখা হয় বলিয়া যে দুঃখভোগ করেন, বাঙ্গালা বর্ণমালা রোমান অক্ষরে হইলে তাঁহাদের সে দুঃখ আর থাকিবে না। বিশেষ বাঙ্গালা বর্ণমালা পূর্ব্বকালে স্বতন্ত্র রূপে অবস্থান করিত না, সংস্কৃত বা দেবনাগরী বর্ণমালা পরিবর্ত্তিত হইয়া ক্রমশঃ বাঙ্গালা বর্ণমালায় পরিণত হইয়াছে। বিদ্যাপতির সময়ের হস্তলিপির সহিত এখনকার বঙ্গীয় হস্তলিপির তুলনা করিলে তাহা অনায়াসে বুঝা যাইতে পারে। যখন পরিবর্ত্তনই আমাদের বর্ণমালার অদৃষ্টলিপি, তখন আর একটু পরিবর্ত্তন সহকারে ‘ক’ যদি K আকার ধারণ করে এবং তাহাতে যদি বিশেষ উন্নতি হয়, তা হলে আমাদের কিসের ক্ষোভ বরং আনন্দেরই সম্ভাবনা। বিশেষতঃ আমরা বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি করিবার নিমিত্ত বাঙ্গালা বর্ণমালায় কমা (,) সেমিকোলন (;) গুণচিহ্ন × ভাগচিহ্ন ÷ ধনচিহ্ন + গণচিহ্ন — কোষ্ঠ ( ) প্রশ্নচিহ্ন (?) বিস্ময় চিহ্ন (!) ষ্টার * প্রভৃতি কতকগুলি বর্ণ বা চিহ্ন রোমান বর্ণমালা হইতে বহুদিন অবধি সংগ্রহ করিয়াছি, তখন বিশেষ উন্নতি লাভের জন্য রোমান অক্ষর গ্রহণ করা আমাদের লজ্জাকর নহে।

তবে ডাক্তর লাইটনের বাক্য নিতান্ত অযৌক্তিক নয়। যদি আমাদের বর্ণমালার কোনরূপ সংস্কার করিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, তবে পরিবর্ত্তন করিবার প্রয়োজন কি? অতএব প্রথমে বর্ণমালার সংস্কারের চেষ্টা করা উচিত।

অক্ষর সৃষ্টির বিষয় বৃহস্পতি এইরূপ বলিয়াছেন।—

"ষাণ্মাসিকে তু সময়ে ভ্রান্তিঃ সঞ্জায়তে নৃণাম।

ধাত্রাক্ষরাণি স্পষ্টানি পত্রারূঢ়ান্যতঃ পুরা।"

অর্থাৎ—

"প্রতিভাশালী মনুষ্যেরা কোন বিষয় প্রথম শিক্ষা করিয়া ছয় মাস কাল অবধি তাহা ভালরূপে মনে রাখিতে পারেন; তাহার পর ভ্রান্তির উদয় হয়, এই নিমিত্ত বিধাতা অক্ষর সকল পত্রে আরূঢ় করিয়াছিলেন, অর্থাৎ লিখিবার সৃষ্টি করিয়াছিলেন।" এবং সেই অবধিই লেখন পদ্ধতি চলিয়া আসিতেছে।

ইহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, যে বর্ণ সকল ভাষার উচ্চারণ অনুসারে সৃষ্ট হইয়াছে; যে ভাষায় যত উচ্চারণভেদ, সেই ভাষায় তত বর্ণভেদ হয়। এবং উচ্চারণ বৃদ্ধির সহিত বর্ণভেদও বাড়িতে থাকে। যখন ফারসী ভাষায় কতকগুলি সংস্কৃত কথা মিলিত হইয়া উর্দ্দূ ভাষার সৃষ্টি হইল, তখন ফারসী বর্ণমালায় সেই সকল সংস্কৃত কথার উচ্চারণোপযোগী কতকগুলি বর্ণের যোগ করাতে উর্দ্দূ বর্ণমালার সৃষ্টি হইল। এই রূপ বাঙ্গালা কথায় যত ইংরেজি কথা মিলিত হইতেছে, বাঙ্গালা বর্ণমালার অক্ষর সংখ্যার ততই বৃদ্ধি হইতেছে। দেখ বক্স প্রভৃতি কথা লিখিতে আমাদের 'ক্স' এই অক্ষরটির ব্যবহার করিতে হয়, কিন্তু বাঙ্গালা বর্ণমালায় এরূপ অক্ষর পূর্ব্বে ছিল না; বিশেষ সংস্কৃতের নিয়ম অনুসারে ইহা 'ক্ষ' হইয়া যায়। এইরূপ ইংরেজি উচ্চারণের অনুরোধে আমরা ক্স, ষ্ট, প্রভৃতি অক্ষরের সৃষ্টি করিয়াছি।

ভারতবর্ষীয় ভাষাসমূহের মূল প্রাকৃত, এবং প্রাকৃতের মূল সংস্কৃত। অতএব সমুদয় দেশী ভাষায় সংস্কৃতের উচ্চারণ পরম্পরা সম্বন্ধে প্রতিবিম্বিত হওযায় দেশী ভাষার বর্ণমালা সকল সংস্কৃতের অনুসরণ করিয়াছে। সুতরাং এস্থলে সংস্কৃত বর্ণমালার বিষয় কিঞ্চিৎ সমালোচন অসঙ্গত নহে।

তন্ত্রশাস্ত্রীয় মাতৃকাধ্যানে বলা হইয়াছে

"পঞ্চাশল্লিপিভি র্বিভক্ত মুখদোঃ পন্মধ্য বক্ষঃস্থলাং

ভাস্বন্মৌলিনিবদ্ধচন্দ্রশকলা মাপীন গণ্ডস্থলীম্।"

ইহা দ্বারা বোধ হইতেছে সংস্কৃত ভাষায় পঞ্চাশটী মৌলিক বর্ণ। যথা—

অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৠ, ঌ, ৡ, এ, ও, ঐ, ঔ,—[১৪] স্বর। ক, খ, গ, ঘ, ঙ,। চ, ছ, জ, ঝ, ঞ,। ট, ঠ, ড, ঢ, ণ। ত, থ, দ, ধ, ন। প, ফ, ব, ভ, ম। য, র, ল, ব, শ, ষ, স, হ।—[৩৩]। ব্যঞ্জন ড় ঢ় য় অথবা ং, ঃ, ঁ,—[৩]।

এই পঞ্চাশটি মৌলিক বর্ণ অর্থাৎ বিশুদ্ধ আর সকল বর্ণ ইহাদের পরস্পর সংযোগাদি দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে। এক্ষণে দেখা যাউক তন্ত্রশাস্ত্রের এ বাক্যটি কতদূর বিচারসহ।

সংস্কৃত ব্যাকরণের সৃষ্টিকর্ত্তা মহেশ্বরের মতে সংস্কৃত ভাষায়—

অ, ই, উ, ঋ, ৯, এ, ও, ঐ, ঔ—[৯] স্বর। ক, খ, গ, ঘ, ঙ। চ, ছ, জ, ঝ, ঞ। ট, ঠ, ড, ঢ, ণ। ত, থ, দ, ধ, ন। প, ফ, ব, ভ, ম। য, র, ল, ব, শ ষ স হ।—[৩৩] ব্যঞ্জন* এই বিয়াল্লিশটি মৌলিক বর্ণ।

এই বিয়াল্লিশটীর মধ্যে স্বরবর্ণ সকল প্রথমে হ্রস্ব দীর্ঘ এবং প্লুত এই তিন প্রকার। তাহার পর প্রত্যেকে আবার উদাত্ত, অনুদাত্ত এবং স্বরিত এই তিন প্রকারে বিভক্ত হওয়ায় এক একটি স্বরের নয়টী করিয়া ভেদ হইয়াছে। অনন্তর সানুনাসিক এবং নিরনুনাসিক ভেদে প্রত্যেক স্বর অষ্টাদশবিধ রূপ ধারণ করিয়াছে। পরন্তু ৯ কারের দীর্ঘ নাই, এবং এ, ও, ঐ, ঔ ইহাদের হ্রস্ব না থাকায় ইহারা প্রত্যেকে দ্বাদশবিধ মাত্র। অবশিষ্ট অ, ই, উ, ঋ, ইহারা প্রত্যেকে অষ্টাদশবিধ। সকল মিলিত হইয়া স্বরের ভেদ একশত বত্রিশ প্রকার [১৩২]।† কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্রে চতুর্দ্দশ নির্দ্দেশ করা নিতান্ত অসঙ্গত হইয়াছে। যদি দীর্ঘ ভেদকে মৌলিক বলিয়া গণনা করা হয়, তবে অপর ভেদ গুলিকেই বা কি নিমিত্ত মৌলিকের মধ্যে গণনা করা না হয়। যদি বল, স্বরের এই দুইটি ভেদে আকার বৈলক্ষণ্য হয় বলিয়া তন্ত্র শাস্ত্রে এই দুই ভেদকে মৌলিক বর্ণের মধ্যে গণনা করা হইয়াছে। একথা তাদৃশ যুক্তিযুক্ত নয়। তথাপি স্বরসংখ্যা চতুর্দ্দশ না হইয়া ত্রয়োদশ হয়, কারণ ৯ কারের যে দীর্ঘ নাই ইহা নাগোজী ভট্ট স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন "৯ বর্ণস্য দ্বাদশতস্য দীর্ঘাভাবাৎ।" সুতরাং মূল বর্ণ পঞ্চাশটী না হইয়া ঊনপঞ্চাশটি হয়। আরও দেখ ড়, ঢ, য় ইহারা কেবল ড, ঢ, য এর উচ্চারণ ভেদ মাত্র। যদি স্বরের উচ্চারণ ভেদ গণনা না করা হয়, তবে ব্যঞ্জনের উচ্চারণ ভেদে বর্ণভেদ স্বীকার করা যে কিরূপ যুক্তিসঙ্গত, তাহা বুদ্ধিমান্ মাত্রেই অনুভব করিবেন। আর যদি ড়, ঢ, য় এই তিনটিকে না ধরিয়া ং, ঃ, ঁ, এই তিনটি ধরিয়া পঞ্চাশের পূরণ করা হয় তাহা হইলে ᳵ [গুংকার], ᳶ [জিহ্বামূলীয়] এবং ᳲ [উপাধ্মানীয়] ইহাদিগকে কেন এক একটি বর্ণ বলিয়া পরিগণিত করা না হয়। অতএব তন্ত্রশাস্ত্রে যে কোন হিসাবে পঞ্চাশটী মৌলিকবর্ণ গণনা করা হইয়াছে তাহা বুঝা গেল না। বিশেষে সিদ্ধান্তকৌমুদীকার অনুস্বারকে অচ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। "যথা অনুস্বারস্যাপি অচ্ত্বাৎ।"

যাহাহউক এক্ষণে ব্যাকরণ শাস্ত্রের

---

* সিদ্ধান্ত কৌমুদীর মাহেশ্বর সূত্র দেখ।

† তদিত্থং অ, ই, উ, ঋ, এষাং বর্ণানাং প্রত্যেক মষ্টাদশ ভেদাঃ। ৯ বর্ণস্য দ্বাদশ, তস্য দীর্ঘাভাবাৎ, এচামপি দ্বাদশ তেষাং হ্রস্বাভাবাৎ। নাগোজী ভট্টঃ।

নিয়ম অনুসারে বিয়াল্লিশটি মৌলিকবর্ণ ধরা গেল। ইহার মধ্যে স্বর নয়টি। এই নয়টি স্বরের [১৩২] একশত বত্রিশ ভেদ।

ব্যঞ্জন বর্ণ—ইহার মৌলিক সংখ্যা (৩৩) ত্রয়স্ত্রিংশৎ মাত্র। ইহাদের মধ্যে য ব ল ইহারা অনুনাসিক এবং নিরনুনাসিকভেদে প্রত্যেকে দুই প্রকার। যথা "অনুনাসিকাঽননুনাসিকভেদেন যবলা দ্বিধা।" এতদনুসারে ব্যঞ্জনবর্ণ ষট্‌-ত্রিংশৎ (৩৩+৩=৩৬) হইল; কিন্তু কোন না কোন প্রকার স্বরের সাহায্য ব্যতীত ব্যঞ্জন স্বয়ং উচ্চারিত হইতে পারে না। ব্যঞ্জনের উচ্চারণ করিবার নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত এক শত বত্রিশটি স্বরের মধ্যে একটী না একটি স্বরের যোগ করিতে হইবে, তাহা হইলে কেবল স্বরসংযোগে ব্যঞ্জনের ভেদ [১৩২ × ৩৬ = ৪৭৫২] ইহার উপর তাহাদের পরস্পর সংযোগ জন্য ভেদ আছে। এই পরস্পর সংযোগ উপর নীচে এই দুইপ্রকারে হইয়া থাকে। ব্যঞ্জনদিগের পরস্পর সংযোগজনিত ভেদ অসংখ্য এবং ইহা নানাকারণে হইয়া থাকে।

১ম, প্রতিশাখ্য অর্থাৎ বৈদিক ব্যাকরণে নিয়ম আছে যে, বর্গের* আদি চারি বর্ণের যদি নীচে পঞ্চমবর্ণ সংযুক্ত হয়, তাহা হইলে যে বর্ণ পঞ্চমবর্ণের সহিত সংযুক্ত থাকিবে, উহা স্বসদৃশবর্ণের সহিত পূর্ব্বে সংযুক্ত হইবে। ঐ সংযুক্তাক্ষরের নাম যম। যথা "পলিক্‌ক্নী" "চখ্‌খ্নতু" ইত্যাদি।

দ্বিতীয়। দ্বিত্ব বিধান দ্বারা কতকগুলি সংযুক্ত অক্ষর বর্দ্ধিত হইয়াছে। যথা "অচোরহাভ্যাং দ্বে" এই সূত্র দ্বারা "হর্য্যনুভবঃ" "ন হ্যাস্তি" ইত্যাদি স্থলে র এবং হ তে দুইটি 'য' কার সংযুক্ত হইয়াছে। 'বা হত জগ্ধয়োঃ' এই বার্ত্তিক সূত্র বলে 'পুত্ত্রহতী' 'পুত্ত্রজগ্ধী' এই দুই স্থলে পুত্র শব্দের ত কারের সহিত আর একটী ত কারের সংযোগ হইয়াছে। "ত্রি প্রভৃতিষু শাটকায়নস্য" এই সূত্র দ্বারা 'বায়্‌ব্ব্রিং' 'ইন্‌দ্দ্র' ইত্যাদি পদস্থিত 'য' কার এবং 'ন' কার আর একটি করিয়া 'য' এবং 'ন' কারের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। ইত্যাদি।

৩য়। সন্ধি প্রকরণ দ্বারা। সন্ধি শব্দের অর্থ মিলন; বর্ণদ্বয়ের সংহিতা† অর্থাৎ পরম সন্নিকর্ষ হইলে তাহাদের

---

* ক হইতে ম পর্য্যন্ত ব্যঞ্জনবর্ণকে বর্গ বলে। ক খ গ ঘ ঙ। এই পাঁচটি কবর্গ। চ ছ জ ঝ ঞ। চবর্গ ইত্যাদি।

বর্গেষ্বাদ্যানাঞ্চতুর্ণাম্পঞ্চমে পরে মধ্যে যমো নাম পূর্ব্বসদৃশোবর্ণঃ প্রতিশাখ্যে প্রসিদ্ধঃ।" সিদ্ধান্ত কৌমুদী।

† "সংহিতৈক পদে নিত্যা, নিত্যা ধাতূপসর্গয়োঃ।
নিত্যাসমাসে, বাক্যেতু সা বিবক্ষামপেক্ষতে।"

পরম সন্নিকর্ষরূপ সংহিতা, এক পদ, ধাতূপসর্গযোগ এবং সমাসে নিত্য হয়; অর্থাৎ এ কয়স্থলে পরম সন্নিকর্ষ হইলেই সন্ধি করিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন অন্যস্থলে বিবক্ষাধীন।

সন্ধি অর্থাৎ মিলন হয়। এই সন্ধি দুই প্রকার; প্রথম 'অচ সন্ধি' দ্বিতীয় 'হল সন্ধি।' অচের সংহিতায় যে মিলন হয়, তাহার নাম 'অচসন্ধি,' হলের সংহিতায় যে মিলন হয় তাহার নাম হলসন্ধি। এই উভয়বিধ সন্ধি দ্বারাই অনেক সংযুক্ত অক্ষর সৃষ্ট হইয়াছে। অচ সন্ধি দ্বারা 'সুধী উপাস্যঃ = সুধ্যুপাস্য' দ্বিত্বাদি সূত্রের নিয়মে সুধ্যুপাস্যের আবার চারি প্রকার রূপ হয় যথা 'সুধ্যুপাস্যঃ' 'সুদ্ধ্যুপাস্যঃ' 'সুদ্ধ্যুপাস্যঃ' 'সুধ্য্যুপাস্যঃ' এইরূপ মধ্বরিঃ পিত্রর্থঃ গব্যং নাব্যং, গব্যূতি, ক্ষয্যং, জয্যঃ, ক্রয্যঃ, কৃষ্ণর্দ্ধিঃ, তবল্‌কারঃ, তবল্‌কারঃ, তবল্কারঃ, তবল্‌কারঃ* ইত্যাদি বিবিধ সংযুক্তাক্ষর সৃষ্ট হইয়াছে। হলসন্ধি দ্বারা সচ্চিত্ত, শার্ঙ্গিঞ্জয়ঃ, বিশ্বঃ, রামষ্‌ষষ্ঠং, রামষ্টীকতে, তট্টীকা, চক্রিণ্ঢৌকসে। ষন্নবতি, ষণ্ণগরী, সন্‌ষষ্ঠঃ, তল্লয়ঃ,উত্থান,উত্তম্ভন, উথ্‌থান, উথ্‌তম্ভন, বাগ্‌ঘরিঃ, বাগ্‌হরিঃ, তচ্‌শিবঃ, তচ্ছিবঃ,তচ্‌শ্লোকেন, তচ্ছ্লোকেন, অঞ্চিতঃ অঙ্কিতঃ, কুণ্ঠিতঃ, শান্তঃ, গুম্ফিতঃ, কিম্মন্নয়তি, কিন্ধ্বলয়তি, কিল্‌হ্লাদয়তি, প্রাঙ্খষষ্ঠঃ, প্রাঙ্ক্ষষ্ঠঃ, সুগণট্‌ষষ্ঠ, ষটৎসন্ত, সঞ্ছম্ভুঃ, সঞ্চ্ছম্ভু, সঞ্শম্ভুঃ, সঞ্চ্শম্ভুঃ,† প্রত্যঙ্ঙাত্মা,সুগণ্ণীশঃ, সন্নচ্যুত। সংস্কর্ত্তা সংস্স্কর্ত্তা, সঁস্কর্ত্তা সংস্স্কর্ত্তা, সংস্কর্ত্তা, সংস্কর্ত্তা সংস্কর্ত্তা‡। ইত্যাদি।¶

৪র্থ। কতকগুলি সংযুক্তাক্ষর প্রত্যয়ের§ সাহায্যে উৎপন্ন হইয়াছে। সুপ্, তিঙ্, কৃৎ, তদ্ধিৎ, যঙ্, সন্ ণ্যচ, ক্যঙ্ ইত্যাদি প্রত্যয়। আমরা সামান্য রূপে প্রত্যয়ের সংযোগে যে সকল সংযুক্তাক্ষর উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদের উদাহরণ দেখাইতেছি, অদ্ব্যাং, বাক্ষঃ, দগ্ধা, দংদহ্যতে, জিগৎক্ষতি, অপীপ্যৎ, জগ্ম্ঃ,

* "দ্বিত্বং নবৈস্যর কবৈস্যর লোপভয়োরুভয়োরপি।
তবল্কারাদিষু বুধৈর্বোধ্যংপদ চতুষ্টয়ম।" কারীকা

† ঞ্চৌ ঞ্ছা ঞ্চ্শা ঞ্শা ইতি চতুষ্টয়ং।
রূপাণামিহ তুক্‌ছত্ব চলোপানাং বিকল্পনাৎ।" কারীকা

‡ 'সমোবালোপমেকে ইতি ভাষ্যম লোপস্যাপি ক প্রকরণ স্থত্বাদনুস্বারানুনাসিকাভ্যামেক সকারং রূপদ্বয়ং দ্বিসকারং রূপদ্বয়ং। তত্রানচি চেতি সকারস্য দ্বিত্ব পক্ষে ত্রিসকার মপি রূপদ্বয়ং × × × শরঃ খর ইতি কদ্বিত্বে ষঠ। অনুস্বারস্য দ্বিত্বে দ্বাদশ" ইত্যাদি সিদ্ধান্তকৌমুদী দেখ।

¶ যে যে পদের সংহিতা হইয়া পূর্ব্বোক্ত সন্ধি সকল হইয়াছে তাহা ক্রমশঃ দেখান যাইতেছে। মধু অরি, গো যং, নৌ যং, গোঃ যুতি ক্ষে যঃ, জে যঃ, ক্রে যঃ, কৃষ্ণ ঋদ্ধিঃ, তবৎকারঃ, শার্ঙ্গিন্ জয়,রামস ষষ্ঠ,তৎ টীকা, ষট্ নবতি,ষট্‌নগরী,তৎ লয়, উৎস্থানং, উৎ স্তম্ভনং, বাক্‌হরিঃ, তৎশিবঃ, তৎশ্লোক, অংচিত, অংকিত কুংঠিতঃ, শাংতঃ গুংফিতঃ, কিংহ্মলয়তি, কিংহ্ধনয়তি, কিংহ্লাদয়, প্রাঙষষ্ঠ, সুগণষষ্ঠ, ষট্‌সন্ত, সন্‌শম্ভু, প্রত্যঙ্ আত্মা সুগণ্ ঈশঃ, সন্‌অচ্যুতঃ, সংকর্ত্তা।

§ প্রত্যয়—যাহা বিধান করা যায় তাহার নাম প্রত্যয়।

জগন্নাতুঃ, উপাস্যঃ, বিষ্ণুঃ, কৃষ্ণঃ, রুগ্নঃ, ভগ্ন,পক্ক, আত্মা,বাক্যং দৈত্যঃ, মাহাত্ম্যং ইত্যাদি।

৫ম। কতকগুলি সংযোগ আগমের* দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে। যথা কধ্যতি, প্রাপ্নুহি, অশ্নাতি, অস্যতি, পচন্তী, দিবান্তী, কম্পয়তি, গুম্ফিতা সম্বজ্ঞে, ইত্যাদি।

তদতিরিক্ত কতকগুলি প্রাকৃতিক সংযুক্ত অক্ষর আছে। যে সকল সংযুক্তাক্ষর কোন নিয়ম অনুসারে উৎপন্ন হয় নাই তাহাদিগকে প্রাকৃতিক সংযুক্ত নামে অভিহিত করা হইল। যথা ধ্বন, ঈর্ষ্য, ভ্রা, স্না, চক্ষ, ধ্মা, প্রী, স্ত্রী, শ্রি, শ্যামল, শ্বেত। ইত্যাদি।†

চিহ্ন—পূর্ব্বোক্ত বর্ণ ভিন্ন (ং) অনুস্বার, (ঃ) বিসর্গ ঁ চন্দ্রবিন্দু, ৺ গুংকার, ᳵ জিহ্বা মূলীয়, ᳶ উপাধ্মানীয়। ছেদ, এবং () কুণ্ডলনা এই কয়েকটী চিহ্ন সংস্কৃত বর্ণমালায় সন্নিবেশিত আছে। পরন্তু ইংরেজি বর্ণমালায় যেরূপ চিহ্নের বিস্তৃতি সংস্কৃত বর্ণমালায় তাহার তুলনায় চিহ্ন নাই বলিলে হয়। বর্ণের অল্পতা হেতু ইংরেজি ভাষায় লিখিবার যেরূপ অসুবিধা, চিহ্নাধিক্য জন্য ইহাতে সেইরূপ বোধসৌকর্য্য হইয়াছে। এ দিকে বর্ণের আধিক্য বশতঃ সংস্কৃত ভাষায় যেমন সকল কথা সহজে লেখা যায়, চিহ্নের অল্পতা হেতু সংস্কৃতভাষায় অর্থাবগতির তেমনই কাঠিন্য। তবে এখন ইংরেজি হইতে অনেক চিহ্ন সংস্কৃতভাষায় ব্যবহৃত করা হইতেছে।

ক্রমশঃ

গঙ্গাধর শর্ম্মা

ওরফে

জটাধারীর রোজনামচা।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

শিকার খেলা।

আশুতোষ বাবুর রমণা কাননের পশ্চিম ভাগে একটি চতুক্রোশব্যাপী "বাথা জঙ্গল" ছিল। সারি সারি শাল মউল ও পিয়াল তরু সুশোভিত, স্থানে স্থানে উচ্চ ক্ষুদ্র পাহাড়ের ন্যায় রাঙ্গা মৃত্তিকা-স্তূপ। কোথাও প্রকৃতি দেবী স্বয়ং মনোহর বেশে সজ্জিতা, কোথাও মানবচেষ্টায় বৃক্ষরাজিমণ্ডিত, আবার কোথাও ক্ষুদ্র নদী চাকচিক্যমান শ্বেত

* প্রকৃতি এবং পত্যয়ের সংযোগ হইলে যে বর্ণ আগমন করে তাহার নাম আগম।

† পাঠকগণ আমাদিগের উদাহরণ নিচয়ের কেবল সংযুক্তারকেই গ্রহণ করিবেন।

বালুকা শয্যোপরি ঝির ঝির করিয়া দক্ষিণাভিমুখে বড় নদীর দিকে যাই-তেছে। একটু উচ্চস্থানে দাঁড়াইলে এই প্রকৃতি ছবির সুললিত বিচিত্রতা বিশেষ প্রকাশ পায়, কোন দিকে থরে থরে রঙ্গভূমির সোপানস্বরূপ, নবীন উজ্জ্বল পত্রধারী নানাজাতীয় বন্য তরু দণ্ডায়-মান। কোথাও মাধবী মালতি প্রাতঃ-সমীরণে দোদুল্যমান। একদিকে উচ্চ-তর নিবিড় বন, একদিকে ক্রমান্বয়ে নিম্ন সুদূরবর্ত্তী বালুকারাশি ব্যাপ্ত বড় নদীর কূল,তাহার পরেই রায় বাঁধ। তাহার বৃহৎ স্বচ্ছ দর্পণ স্বরূপ বারিব্যাপ্তি নয়নকে আকৃষ্ট করিতেছে, দেখিলে আবার দে-খিতে ইচ্ছা হয়। বৃহৎ খর্ব্ব মরালদল, সেই জলে ভাসমান! কেহ শীলাতল-শায়ী হইয়া একবারে সুষুপ্ত, কেহ এক পদে মাত্র ভর করিয়া সান্ত্রির ন্যায় ঢুলিতেছে, তবু সজাগ। কেহ বধূসহ স্থির জলে সন্তরণ করিতেছে!! পশ্চিম দিকে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দেখিলে নীলাভ ক্ষীণ রেখাস্বরূপ ক্ষুদ্র পর্ব্বতশৃঙ্গ আকাশ-প্রান্তে চিত্রিত রহিয়াছে বোধ হয়, কিন্তু সে রেখা এত দূরে যে একবার নয়ন পথে আসে ত আবার তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইয়া যায়, সে রেখা প্রকৃত কি আঁখি-ভ্রম তাহা অনভ্যাসী জনের স্থির করা দুষ্কর। মৌল ফলের সময় কচিৎ ঋক্ষ ব্যাঘ্র কখন কখন কৃষ্ণসার হরিণদল প্রত্যূষে বিচরণ করিতে দেখিতে পাওয়া যায় (রক্ষকেরা গল্প করে)। রাশি রাশি ফুলশয্যায় কিম্বা বারিসিক্ত জলাশয়তটে বালুকার উপর পশুগণের পদচিহ্ন সময়ে সময়ে দেখা যায়। যৌবনাবস্থায় আশু-তোষ বাবু সতত শিকারপ্রিয় ছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায়, যে শীত ঋতু সময়ে তিনি মাসত্রয় মৃগয়া দ্বারা মাংস সংগ্রহ করিয়া ও বন ভোজনে সকলকে পরিতৃপ্ত করিতেন। তাঁহার উভয় পুত্র নরেন্দ্র ও অমরেন্দ্র বাবুকে কেবল পুঁথিগত বিদ্যায় পাকা করিয়া ক্ষান্ত পান নাই। শস্ত্র-শিক্ষায় উভয়কে সমান নিপুণ করিয়া ছিলেন, ধনুতে বাঁটুল সংযোজনায় তাঁহারা হিংস্র ডাঁরকাক, চিল, প্রভৃতি শিকারী পক্ষী সকল স্বীকার করিতেন; তীর বা বন্দুকের অপেক্ষা করিতেন না; এবং সময়ে সময়ে দুর্ম্মদ পাঠানের শিক্ষায় তলোয়ার হস্তে বনে বনে ঋক্ষ ব্যাঘ্রের লুক্কায়িত শয্যানুসন্ধানে ফিরিতেন। বঙ্গ-ভূমির দৌর্ব্বল্যসাধিনী বায়ু বারি এ ক্ষত্রিয় বংশজাত যুবকগণকে শান্তি সুখ সম্ভোগে এ পর্য্যন্ত শিথিলাঙ্গ করে নাই; এখনও তেজীয়ান্ রক্তস্রোতে তাঁহাদের শিরাপ্রণালী বলবৎ ছিল।

আজ উষা সময়ে জঙ্গলের একজন রক্ষক গদাধর রাখালের সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত। গদাধর কান্দিয়া অস্থির। তাহার ধলো বকনাকে বাঘে লইয়া "ডবরি কুদের" পাশে কড় মড় করিয়া ভক্ষণ করিতেছে, কারণ সেই দিকেই রাত্রি শেষে ফেও ডাকিয়া ছিল। সম্বাদ পাইবা মাত্র বাজনা ও লোক একত্রিত

[illegible] কখন কখন [illegible]

[illegible] বিচরণ করিতে [illegible] সম্মা[illegible]

যায় (রক্ষকেরা গল্প করে,) [illegible] একটি [illegible]

করিয়া রঘুবীর ও পদাতিক দলকে "রাখায়" যাইতে আদেশ হইল। অমরেন্দ্র ও নরেন্দ্র কোমর বন্ধন করিয়া দুইটী তুর্কি ঘোড়ায় আরোহিত হইয়া জঙ্গলের দিকে ধাবমান হইলেন। স্বল্পকাল মধ্যে জঙ্গলের ভিতর একটি ভগ্ন দুর্গের তিন দিক শিকারী দ্বারা বেষ্টিত হইল। বাজনা বাজিয়া উঠিল। তাহার সঙ্গে হাকোয়াদের স্বর মিলিত হইয়া জঙ্গল ভেদ করিল, পশ্চাৎভাগ হইতে অমরেন্দ্র ও নরেন্দ্র ভ্রাতৃদ্বয় ভগ্ন দুর্গের স্তূপের উপর ঘোড়ার সহিত আরোহণ করিলেন। গঙ্গাধর কখনই তামাসা দেখিতে পেছ পাও কি কাহার পশ্চাতে থাকিবার নহে—একটী ক্ষুদ্র শিকারী বেশে ক্ষুদ্র ঘোড়ায় বন্দুক হস্তে নরেন্দ্র বাবুর পশ্চাতেই উপস্থিত। প্রকৃত সাহসী পুরুষ সাহস দেখিলে কি বিরক্ত হয়! আমাকে দেখিয়া উভয় সহোদর কহিয়া উঠিলেন "বাহবা গঙ্গু।" কিন্তু ব্যাঘ্রশিকার যে কি বিপদ আমি তাহা জানিতাম না, আমি উৎসাহিত হইলাম, ঘোটক হইতে অবতরণ করিলাম, পাহাড়ীয় লম্বধারে যাইয়া দেখি, নীচে লম্বতলে একটী ক্ষুদ্র জলনালীপার্শ্বে চতুর্দ্দিক্ জঙ্গলবেষ্টিত স্থানে হত গাভীটি সম্মুখে করিয়া ব্যাঘ্র ইতস্তত অবলোকন করিতেছে। আমিই প্রথমে দেখিয়া, উভয় ভ্রাতাকে কহিলাম, সত্বর তাঁহারা উভয়ে আমার নিকট আসিলেন। রাইফল হস্তে ধরিলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন, "কই?" বাঘটি দেখিতে পাওয়া বড় সহজ ছিল না। তাহার চতুষ্পার্শ্বে লতা, পাতায় আবৃত ছিল। আমি একটি ক্ষুদ্র কঙ্কর লইয়া সেইখানে ফেলিয়া দিলাম। কে জানিত বাঘ এমত ভয়ানক জন্তু! লোক, কোলাহল, অস্ত্র, শস্ত্র তৃণবৎ জ্ঞান করে! কঙ্করটী তাহার গাত্রে স্পর্শ করিতে না করিতে একটি হুঙ্কার দিয়া উচ্চ লম্ফ ত্যাগ করিয়া বন কম্পিত করিল। কত শিকারীর হস্ত হইতে অস্ত্র পড়িয়া গেল, কত হাকোয়া বনে লুকাইল, কত কত পক্ষী কেকা রবে বৃক্ষে বৃক্ষে উড়িতে লাগিল। ব্যাঘ্র আবার একটি নিভৃত স্থানে লুকাইল। আমরা পশ্চাৎ ভাগে আসিয়া দাঁড়াইলাম। কিয়ৎকাল পরেই দেখা গেল শ্যাম গিয়ারি ও মতি গজ নামক দুইটি শিকারী হস্তিপৃষ্ঠে শিকারীরা ব্যাঘ্রের গুপ্ত গুহা অনুসন্ধানে আসিতেছে। একজন মাহুতের দৃষ্টি আমাদের দিকে পড়িল। আমরা ইঙ্গিত করিয়া দিলাম। অনিচ্ছা পূর্ব্বক শনৈঃ শনৈঃ হস্তিদ্বয় সেই দিকে চালিত হইল। হস্তী দুই একপদ অগ্রসর হয় আবার কি এক ভয়ানক ঘ্রাণ পাইয়াই হউক, বা অন্য কারণ বশতঃই হউক ফুৎকার করিয়া হেলিতে দুলিতে আরোহীদলকে প্রায় ফেলিয়া প্রস্থান করিবার চেষ্টা করে; কিন্তু ঘন ঘন অঙ্কুশাঘাতে প্রত্যাগত হইয়া নির্দ্দিষ্ট ডুবরীতলে আনীত হয়। একবার হস্তিদ্বয় উভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল। অমনি গোপনীয় গুহা হইতে ব্যাঘ্র পুন-

র্ব্বার গর্জ্জন পূর্ব্বক লম্ফ প্রদান করিয়া একবারে ক্ষুদ্রতর করীটির শুণ্ড সজোরে টানিল, হস্তীর বাছা অমনি কর পাতিলেন, শিকারীরা আশেপাশে পড়িয়া গেল, মাহুতপুত্র বৃহৎ হস্তিকর্ণপাশে লুকাইল। এমন সময়ে অমরেন্দ্র বাহাদুরের বন্দুক হইতে একটি গুলি ব্যাঘ্রের কর্ণমূলে লাগিল, এই সময় নরেন্দ্র বীর আর একটি গুলি প্রয়োগ করিলেন। "বাঘ মরিয়াছে" "বাঘ মরিয়াছে" বলিয়া চতুর্দ্দিকে শব্দ হইল। ব্যাঘ্রটী মৃতপ্রায় পতিত হইল, কিঞ্চিৎ দূর হইতে অমরেন্দ্র বাবু আর একটি গুলি করিলেন; তাহাতেই যেন মৃত জন্তু জীবন প্রাপ্ত হইয়া লম্ফ ত্যাগ ক[illegible]কবারে অমর বাবুর উরুদেশে ম[illegible]ড দিয়া তাঁহাকে ভূমিশায়ী ক[illegible]য়! কি হইল!" চারি দি[illegible] এই শব্দ হইতে লাগিল।

বীর পুরুষের হতাশ নাই; পড়িবার সময় অমর বাবু ব্যাঘ্রের গলার উপর পড়িয়াছিলেন, অমনি পৃষ্ঠদেশ হইতে বৃহৎ ছুরিকা টানিয়া এক প্রহারেই তলদেশ হইতে ব্যাঘ্রের গলদেশের অর্দ্ধভাগ পার করিয়া দিলেন, যাহা কিছু বাকি ছিল রঘুবীর পশ্চাৎ হইতে নিকট আসিয়া শেষ করিল। একটি পেশোয়ারি ফারসি বয়েত অঙ্কিত কিরীচফলক আমূল পর্য্যন্ত ব্যাঘ্রের পার্শ্বদেশে প্রবিষ্ট করিয়া বহির্গত করিল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে শ্বাপদের নাড়ী ভুঁড়ী সমস্ত বাহির হইয়া পড়িল। ব্যাঘ্র এখন নিস্পন্দ, মৃত শব মাত্র!

আমি এখন উচ্চ স্থান হইতে অবতরণ করিলাম ও একটি ক্ষুদ্র ছড়ি হস্তে লইয়া মৃত ব্যাঘ্রকে টুক টুক করিয়া কয়েকটি বার প্রহার করিলাম। বাটীতে যাইয়া গল্প করিতে পারিব, যে আমিও ব্যাঘ্র মারিয়াছি। পাঠক আমার কথা শুনিয়া হাসিতেছ? তোমরা কি গল্পচ্ছলে দিল্লী জয় কর না? বাঘ মার না?

আমার বীরত্ব দেখিয়া অমরেন্দ্র আপনার ব্যথা ভুলিয়া মুচকি মুচকি হাসিতেছেন। তাঁহার জখম তাদৃশ গুরুতর হয় নাই তথাপি রক্ত অনর্গল পড়িতেছিল। সত্বর আহত স্থান বন্ধন করা হইল। প্রায় পঞ্চ ক্রোশ পথ যাইতে হইবে। আর বিলম্ব করা হইবে না, কাহার কথা না শুনিয়া আবার অশ্বারোহী হইলেন। একজন সওয়ারকে অগ্রে শিকারের সম্বাদ দিবার জন্য কর্ত্তা মহাশয়ের নিকট ত্বরিত প্রেরণ করিলেন। রঘুবীরকে একখান পাগড়ি ও রজত বলয় এক যোড়া পুরস্কার দিবার হুকুম হইল। মৃত ব্যাঘ্রটি হাতীর পৃষ্ঠে বোঝাই হইল। আমাদের অশ্বশ্রেণী শ্রীনগরাভিমুখে ধাবিত হইল।

তিন ক্রোশ আসিয়া রমণা পার হওয়া গেল। জলে জঙ্গলে যে দিকে ঋজু পথ সেইদিকেই অশ্ব চালিত হইতেছে। ঘর্ম্মে অশ্ব স্নাত, সেই ঘর্ম্মে তাপ উঠিতেছে। অশ্বমুখে লৌহখানিতে ফেণা উঠিতেছে। নাসারন্ধ্র বিস্তার করিয়া লোহিত বর্ণ অশ্বদল দৌড়িতেছে। সকলের কৌতুকের বিষয় এই যে আমিও আমার ঘোড়ায় বৃহৎ অশ্ব সুনিপুণ আরোহীদের সহিত সমধাববান হইয়াছি। এখন শান্তিপুর ও শ্রীনগরের মধ্য প্রান্তরে যে ক্ষুদ্র নদী ছুটিতেছিল, তাহার কূলে কূলে আমরা যাইতেছিলাম; ছায়া

হীন বিস্তৃত শস্য ক্ষেত্র মধ্য দিয়া পথ। সূর্য্য প্রখর হইয়া উঠিতেছে, বোধ হইল যেন অমরেন্দ্র নাথের ব্যথা বৃদ্ধি হইতেছে, অমর বাবুর মুখশ্রী কিঞ্চিৎ মলিন বোধ হইতেছে, তিনি আহত শরীরে ক্লান্তি বোধ করিতেছেন, অমরেন্দ্র কহিলেন, "সম্মুখে ঐ নদীর তটে কুটীরটি কার?" এক সওয়ার কহিল, "তর্কালঙ্কার মহাশয়ের আবাসভূমি।"

অম। আমি তাই ভাবিয়াছিলাম। শ্রীনগর এখান হইতে কত দূর?

সওয়ার। প্রায় দুই ক্রোশ। অমর বাবু কহিলেন, "আমি তর্কালঙ্কার মহাশয়ের আশ্রমে একবার আরাম করি। তোমরা সকলে যাও, অপর কোন যান লইয়া আইস। সকলে শ্রীনগরাভিমুখে চলিল কেবল একটি বিশ্বস্ত ভৃত্যসহিত অমরেন্দ্র নাথ তর্কালঙ্কারের গৃহমুখে চলিলেন, গঙ্গাধরও ক্লান্ত হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহার সঙ্গী হইলেন। রোজনামচায় নূতন সম্বাদের দিকে আমার সর্ব্বদাই দৃষ্টি। ভাবিলাম সঙ্গে যাই দুই এক নূতন বিষয় দেখিব। নূতন কথা শুনিবই শুনিব।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

"খুলিল মনের দ্বার না লাগে কপাট।"

সামাজিক ঘটনাসূত্রের পাক জাল খুলিতে কোন শাস্ত্রীই আজ পর্য্যন্ত সক্ষম নহেন; বাহ্য জগতের বানিজ্য ব্যবসায়ের দুই একটি সামান্য ঘটনার উদাহরণ দিয়াই ইদানীন্তন সমাজশাস্ত্রপ্রবর্ত্তক মহাত্মারা সন্তুষ্ট হইয়াছেন, কিন্তু সামাজিক ঘটনার দীর্ঘ সূত্র আজ পর্য্যন্ত মানবপরিমিতির সাধ্যাতীত। কি হইতে কি হয়! পাশক্রীড়া হইতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। নৃশংস মৃগয়াপরিশিষ্টে স্বর্গীয় নির্ম্মল প্রণয়ের উৎপত্তি! মৃগয়ার শেষেই পুরুরবা উর্ব্বসী লাভ করেন—দুষ্মন্ত নিষ্কলঙ্ক শকুন্তলার প্রণয়পাশে বদ্ধ হন —আজ আবার শিকার খেলান্তে অমরেন্দ্র নাথ কাদম্বিনীর সরল কটাক্ষকলে চিরবদ্ধ হইলেন, তাহাতেই আবার শান্তিপুরে শান্তির ভিত্তি পত্তন হইল।

বাঘ মারিয়া আমরা তর্কালঙ্কার মহাশয়ের আশ্রমাভিমুখে আসিয়া তাঁহার অটবীনিকট পৌঁছিলাম। স্থানটি রম্য। উত্তর পার্শ্বে নদী; অপর তিন দিকে বিস্তৃত হরিতময় শস্যক্ষেত্র। পূর্ব্বদিকে প্রথমতঃ একটি চতুষ্পাঠী, তাহার পশ্চিমে নারীগণের প্রাচীরবেষ্টিত আবাসস্থান; তাহার পশ্চিমে একটি বৃহৎ অটবী, আম্র, পনসের অনেক গুলি সুন্দর তরু; একপার্শ্বে কতকগুলি কদলি বৃক্ষ ও নিত্যপূজোপকরণ পুষ্পপ্রদায়ী জবা [illegible] বী, বেল চামেলিবেলা, যুঁই বৃক্ষ। [illegible] নর প্রান্তরে ঈশান কোণে [illegible] দী-কূলে একটি বৃহচ্ছায়াশাল [illegible] তা-বেষ্টিত পুরাতন বটবৃক্ষ। [illegible] ই বটবৃক্ষের প্রকাণ্ড শাখাতলে একটী বেদি, ফুল, ফল, সুগন্ধ চন্দন প্রভৃতি উপচারে সুশোভিত। বেদির কিঞ্চিৎ দূরে একটি বৃদ্ধ মালতিতলে, নীলাম্বরপরিধানা মুক্তকেশী একটি পদ্মমুখী এক হস্তে পুষ্পপাত্র ও অন্য হস্তে একটি আকর্ষণী ধরিয়া সুগোল কাঞ্চন আভাময় বাহু উত্তোলন করিয়া পুষ্পশাখা টানিতেছেন। এই ছবিটি সর্ব্বাগ্রে অমরেন্দ্র নাথের নয়নপথে পড়িল। তিনি কি ভাবিতেছিলেন বলিতে পারি না—আমার বোধ হইল, যেন হিমালয়ে জাহ্নবীতটে পতিপ্রাপ্তি কামনায় ভগবতী পুষ্পচয়ন করিতেন, এই কুলকামিনীও সেইরূপ কোন নিগূঢ় কামনায় এখানে পূজার আয়োজন করিতেছেন। অমরেন্দ্রনাথ কহিলেন,

"এই তর্কালঙ্কার মহাশয়ের পবিত্র গৃহ, এখানেই আরাম করা যাউক।" গৃহ হইতে তর্কালঙ্কার মহাশয় এই বাক্য শুনিয়াই কহিলেন, "অহো! ভাগ্য! কে অমরেন্দ্র নাথ বাবু! আসুন আসুন মুখশ্রী একবারে পরিম্লান দেখিতেছি কেন?" এই কথা কহিতে ক হতে একটি বংশ-ছিলকা নির্ম্মিত কপাট খুলিলেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় শশব্যস্ত; ব্রাহ্মণেরা লোভী আর দক্ষিণাপ্রিয়, কিন্তু অতিথি সৎকারে, অন্নদানে কখন কাতর নহেন। বিশেষ অমরেন্দ্র তাঁহার গোষ্ঠিপালক; এই উদ্যান এই ব্রহ্মোত্তর তাঁহারই পিতা আশুতোষ বাবুর দত্ত। অমরেন্দ্র বাবুকে কিসে আপ্যায়িত করিবেন, এই ভাবিয়াই তর্কালঙ্কার মহাশয় ব্যস্ত, বেদির নিকট যে জলপাত্র ছিল, তাহা স্বয়ং লইয়া [illegible]ন্দ্রের মুখে সিঞ্চন করিলেন; পরক্ [illegible] তিনটী চতুষ্পাঠীর ছাত্র ধরিয়া [illegible]টি আনিয়া বটতলে সংস্থা[illegible]! তর্কালঙ্কার মহাশয় কহিয়া [illegible]ঠলেন, "কাদম্বিনী, মা! জলমানয় তুমি একান্ত বালিকা লজ্জা কি মা?" ক্ষুদ্র ঘটকক্ষে কাদম্বিনী নদী-তীরে ধীরে ধীরে গমন করিলেন, অমরেন্দ্রনাথ এখন শয্যাশায়ী, নদীর দিকেই তাঁহার দৃষ্টি। মুক্তকেশীর মরালগমন সন্দর্শনে তাঁহার নয়ন তৃপ্ত হইতে লাগিল; বোধ হইল, যেন দেখিতে দেখিতে ব্যথার অর্দ্ধেক লাঘব হইল। শীতল বটচ্ছায়াতে হউক, বা শ্যামা স্ত্রী সন্দর্শনে হউক, বা ক্লান্তি বশতই হউক, স্বল্প কাল মধ্যেই অমরেন্দ্র নিদ্রিত হইলেন। কিঞ্চিৎ কাল পরে একজন চিকিৎসক লাউসেন দত্ত শ্রীনগর হইতে উপস্থিত হইলেন, তিনি অতি যত্নে আহত স্থান দেখিলেন, ও প্রক্ষালিত করিয়া বন্ধন করিলেন। দুই এক বার মস্তক হেলাইলেন, মনে করিলেন, আঘাত নিতান্ত সহজ নহে, পুনর্ব্বার বাঘের বিষ নামাইবার জন্য মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন, ঝাড়িলেন, ফুকিলেন, ধুলা ছড়াইলেন, আবার কহিলেন, বাবুর নিদ্রা ইচ্ছা থাকে কিঞ্চিৎকাল এখানে আরাম করুন। সকলেই উদ্যান হইতে বাহিরে আসিল, তর্কালঙ্কার অনতিদূরে বেদিপার্শ্বে উপবেশন করিয়া স্বস্ত্যয়নে নিযুক্ত হইলেন, তাঁহারই অনুমত্যানুসারে কাদম্বিনী তালবৃন্ত লইয়া ব্যজন করিতে লাগিলেন, কিঞ্চিৎকাল পরেই অমরেন্দ্রনাথের তন্দ্রা ভঙ্গ হইলে নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলেন, সম্মুখে তালবৃন্ত হস্তে মুক্তকেশী দণ্ডায়মানা। এ মিলন অরুণ উষার মিলন!

"নিত্য নব, নিত্য হাসে, হাসায় জগতে"

অমরেন্দ্র হস্ত প্রসার করিয়া কহিলেন, "ধর, আমি বসিব।" মুক্তকেশী যেন মনের কোন অনিবার্য্য ভাবোদ্রেকে অমরেন্দ্রের ব্যথায় একান্ত ব্যথিত হইয়া করাবলম্বনে তাঁহাকে বসিতে সহায়তা করিলেন, করস্পর্শ সুখলাভে অমরেন্দ্র নাথ তেজীয়ান্ হইলেন, ব্যাঘ্রকে ধন্যবাদ দিলেন। আহত স্থান যেন এককালে ব্যথাচ্যুত হইয়াছে বোধ হইল।

এদিকে সন্তানের বিপদসংবাদে আশুতোষ বাবু একান্ত অস্থির হইয়া স্বয়ং তর্কালঙ্কার মহাশয়ের গ্রামে আসিলেন, কিন্তু তিনি অধ্যাপক মহাশয়ের ভদ্রাসন বা উদ্যানে প্রবেশ করিলেন না। যখন এই সকল ভূমি তর্কালঙ্কার মহাশয়কে দান করিয়াছেন, তখন তিনি স্বয়ং বা তাহার উত্তরাধিকারিগণ ভবিষ্যতে কেহ কখন সেই সীমামধ্যে পদার্পণ করিলে পতিত হইতে হইবে, কাজেই অন্য স্থানে একটী নিম্ব বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া রহিলেন; কিন্তু অমরেন্দ্র নাথ তর্কা-

লঙ্কারের ব্রহ্মস্ব বৃত্তিতে প্রবেশ করিয়াছেন দেখিয়া বড় কষ্ট পাইলেন, শেষ দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করিয়া সত্বর অমরেন্দ্র নাথকে তাঁহার নিকট আনিতে বলিলেন; তাঁহার আগমন বার্ত্তা শুনিবা মাত্র তর্কালঙ্কার মহাশয় নিকট আসিয়া কহিলেন, "কোন চিন্তা নাই, সামান্য ব্যথা হইয়াছে মাত্র, সপ্তাহ মধ্যে আরোগ্য হইবে।" আশুতোষ বাবু কহিলেন "সে মহাশয়ের আশীর্ব্বাদ—এখন আর একটি অনিষ্ট দেখিতেছি। আপনি স্মরণ করিয়া দেন নাই, যে এ স্থান আমাদের প্রবেশনিষিদ্ধ; অমরেন্দ্রকে কেন আপনার অধিকারের মধ্যে যাইতে অনুমতি দিলেন?" তর্কালঙ্কারের হাসি রাখিতে জায়গা নাই, একটি বচন পাঠ করিলেন ও কহিলেন, "ইহার আর দ্বিগুণ স্থান দান করিলেই ত প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে।" আপাততঃ আশুতোষ বাবু কোন উত্তর দিলেন না।

এদিকে অমরেন্দ্র নাথ শয্যা ত্যাগ করিয়া শিবিকাতে উঠিতে ইচ্ছা করিতেছেন, আবার মনে মনে এ চিরস্মরণীয় স্থান ত্যাগ করিতেও অনিচ্ছুক; কাতর ভাবে বলিলেন "এই ব্যথার স্থানটী আর একবার ধুইয়া ভাল করে বান্ধিয়া লইলে ভাল হয়, কে বান্ধিবে? গঙ্গু তুমি পারিবে? তোমার নিতান্ত কোমল হাত।" আমি কহিলাম, "এই মুক্তকেশী দিদির হাত আরও কোমল, দিদি দাও তো।" উভয়ের মনের মত কথা হইল বলিয়া বোধ হইল। মুক্তকেশীর সুকুমার হস্ত দ্বারা আহতস্থান ধৌত হইল। বস্ত্র বন্ধন সমাধা হইলে অমরেন্দ্র ভাবিলেন, "আর ব্যথা নাই," বসিলেন, দাঁড়াইলেন, দুই এক পদ চলিলেন; আবার কহিলেন "কেমন বন্ধন? খুলে গেল।" আমি কহিলাম, মুক্তকেশী দিদি আবার বেন্ধে দাও। এবার অমরেন্দ্র নাথ দণ্ডায়মান, মুক্তকেশী পদতলে উপবিষ্ট; কোমল হস্তযুগলে পাদস্পর্শ করিয়া শুভ্র বস্ত্রাংশ বন্ধন করিতেছেন। বোধ হইতেছে যেন চন্দ্রশেখরের পদপার্শ্বে মোহিনী মূর্ত্তিধারিণী উমা সুন্দরী মর্ত্তে অবতীর্ণা। এমন শ্রীমান্ শ্রীমতীর এক স্থানে মিলন বিরল। এখন বন্ধন শেষ হইল, মনেও মন বাঁধা পড়িল, অমরেন্দ্র নাথ পাল্কিতে শুইলেন, তর্কালঙ্কার আশীর্ব্বাদ করিলেন, ও ক্র উত্তোলন করিয়া কহিতে লাগিলেন।

ধেনুবৎস প্রযুক্তা বৃষ, গজ, তুরগা, দক্ষিণে তপ্ত বহ্নি।

দিব্য স্ত্রী, পূর্ণ কুম্ভ, দ্বিজ নৃপ গণিকা পুষ্প মালা পতাকা।

সদ্য মাংস, ঘৃতৌধা, দধি মধু রজত কাঞ্চন; শুক্ল ধান্য দৃষ্ট্বা স্পৃষ্ট্বা পঠিত [illegible] গ্রন্থি কামঃ।"

সকলে আশ্রম হই[illegible]লেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় [illegible] বাবুর নিকট আগত হইলেন [illegible]লেই উৎসাহিত কেবল দেখিলাম, মুক্তকেশী নিমেষশূন্য লোচনে অমরেন্দ্রনাথের দিকে যেন কিঞ্চিৎ হতাশ বদনে চাহিতেছেন।

আমি কিঞ্চিৎ দূর যাইয়া ভাবিলাম, এ মুক্তকেশী কে? তর্কালঙ্কার মহাশয় কহেন, তাঁহার শিষ্যকন্যা। আমি ইহাকে আর কোথাও দেখিয়াছি। সেই গজাননের চণ্ডীর মন্দিরে ইনিই না আলপণা দিতেছিলেন? না আর কোথাও দেখিয়া থাকিব, আভাষ মাত্র স্মরণ হইল ইনিই বোধ হয় ছদ্মবেশী কুলকামিনী সেই কাদম্বিনী, দাঙ্গার সময়ে ইহাকেই না বাবু শিবসহায় সিংহের অট্টালিকায় দেখি! বিসর্জ্জনের দিন এই রত্ন হারাইয়াই অমরেন্দ্র নাথ কি অস্থির হইয়াছিলেন?

বঙ্গদর্শন।

ষষ্ঠ বৎসর।

গুরুগোবিন্দ।

নানক শিখসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা, গোবিন্দ সিংহ শিখসম্প্রদায়ের উন্নতি-বিধাতা। নানকের সময়ে শিখগণ একটি বিশেষ সম্প্রদায়নিবদ্ধ হইয়া পরমাত্ম-সংযত যোগীর ন্যায় আপনাদের ধর্ম্ম-পদ্ধতির অনুমোদিত কার্য্য সম্পাদনে ব্যাপৃত থাকে; গোবিন্দ সিংহের সময়ে শিখসমাজে রাজনৈতিক সাধারণতন্ত্রের সূত্রপাত হয়। আমরা নানকের বিবরণ বঙ্গদর্শনের পাঠকবর্গকে উপহার দিয়াছি, এক্ষণে শিখদিগের রাজনৈতিক সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা গোবিন্দ সিংহের বিবরণ লইয়া তাঁহাদের সমক্ষে উপস্থিত হইতেছি।

১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দে নানকের মৃত্যু হইলে অঙ্গদ নামে তাঁহার একজন প্রধান শিষ্য শিখদিগের গুরু হন। অঙ্গদের পর অমর দাস ও রামদাস যথাক্রমে শিখ সম্প্রদায়ের অধিনায়কতা করেন। চতুর্থ গুরুর নাম অর্জ্জুন মল। এপর্য্যন্ত যে যে ব্যক্তি শিখদিগের গুরু হন, তাঁহাদের মধ্যে অর্জ্জুনেরই নানকের প্রচারিত ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশিষ্ট অধিকার ছিল। অর্জ্জুন আপনাদের ধর্ম্মপুস্তক আদিগ্রন্থ একত্র সংগৃহীত ও বিধিবদ্ধ করেন। এই সময়ে জহাঙ্গীরের পুত্র খসরু বিদ্রোহী হইয়া পঞ্জাবে বাস করিতেছিলেন, অর্জ্জুন তাঁহার অনুকূলে আপনাদের ধর্ম্মানুশাসনের অনুমোদিত কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করাতে জহাঙ্গীর তাঁহাকে দিল্লীতে আনিয়া কারাবদ্ধ করেন। ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে কারাগারের কষ্টে অথবা ঘাতকদিগের কুঠারাঘাতে অর্জ্জুনের মৃত্যু হয়। অর্জ্জুনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র হরগোবিন্দ গুরুর পদ অধিকার করেন। পিতার শোচনীয় হত্যাকাণ্ডে মুসলমানদিগের প্রতি হরগোবিন্দের মর্ম্মান্তিক বিদ্বেষ জন্মে। প্রতিহিংসা বৃত্তি হরগোবিন্দকে অস্ত্রধারণ ও যুদ্ধ-

কার্য্যে উত্তেজিত করিয়া তুলে। হরগোবিন্দ সর্ব্বদা দুই খানি তরবারি ধারণ করিতেন, কেহ ইহার কারণ জিজ্ঞাসিলে তিনি অম্লান বদনে উত্তর দিতেন। "একখানি পিতার অপঘাত মৃত্যুর প্রতিশোধের জন্য, অন্য খানি মুসলমানদের শাসন উচ্ছেদের জন্য রক্ষিত হইতেছে।" হরগোবিন্দই শিখসমাজে অস্ত্রশিক্ষার প্রথম প্রবর্ত্তক।

হরগোবিন্দের পাঁচ পুত্র গুরুদিত্য, সুরতসিংহ, তেজবাহাদুর, অন্নরায় ও অটল রায়। ইহাদের মধ্যে পিতার জীবদ্দশাতেই সর্ব্বজ্যেষ্ঠটীর মৃত্যু হয়। শেষ দুই জন অপুত্রক অবস্থায় পরলোকগত হন, এবং অবশিষ্ট দুইজন মুসলমানদের অত্যাচারে পঞ্জাবের উত্তরবর্ত্তী পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন। গুরুদিত্যের দাহর মল ও হররায় নামে দুই পুত্র ছিল। ইহার মধ্যে দ্বিতীয়টী হরগোবিন্দের পদ গ্রহণ করেন। ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তদীয় দুই পুত্র রামরায় ও হরেকৃষ্ণের মধ্যে গুরুর পদ লইয়া মহাগোলযোগ আরম্ভ হয়। কোন প্রকারে এই গোলযোগের মীমাংসা না হওয়াতে উভয় পক্ষ দিল্লীতে গমন করেন। সম্রাট্ অওরংজেব শিখদিগকে আপনাদের গুরু নির্ব্বাচন করিয়া লইতে অনুমতি দেন। এই অনুমতিক্রমে শিখগণ হরেকৃষ্ণকে আপনাদের গুরুর পদে বরণ করে। কিন্তু দিল্লী পরিত্যাগের পূর্ব্বে ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বসন্তরোগে হরেকৃষ্ণের মৃত্যু হয়; কাজেই রামরায় মনে করিলেন হরেকৃষ্ণের অবর্ত্তমানে আমিই গুরুর পদে বরণ হইব কিন্তু শিখেরা তাঁহাকে গ্রহণ না করিয়া তাঁহার খুল্ল পিতামহ তেজবাহাদুরকে গুরু করিল।

হরগোবিন্দের ন্যায় তেজবাহাদুরও কষ্টসহিষ্ণু ও পরিশ্রমশীল ছিলেন। যখন শিখগণ তাঁহাকে গুরুর পদে বরণ করে, তখন টেগবাহাদুর নম্রভাবে কহিয়াছিলেন, তিনি হরগোবিন্দের অস্ত্রধারণ করিবার উপযুক্ত পাত্র নহেন। তাঁহাকে অস্ত্রও বড় ধরিতে হইল না; রামরায়ের চক্রান্তজালে তিনি জড়িত হইয়া কারারুদ্ধ হইলেন। কারাগারে তাঁহার দুইবৎসর অতিবাহিত হয়। পরিশেষে তিনি জয়পুররাজ জয়সিংহের বিশেষ অনুগ্রহে মুক্তিলাভ করিয়া কিছু কাল আসাম, পাটনা প্রভৃতি স্থানে অবস্থান করেন। যৎকালে ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে পাটনা নগরে বাস করেন তৎকালে তাঁহার এক পুত্র সন্তান জন্মে। সেই পুত্র গুরুগোবিন্দ।

তেজবাহাদুর নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া শেষ আবার পঞ্জাবে উপনীত হন। পঞ্জাবে প্রত্যাবৃত্ত হইলে তেজবাহাদুর দিল্লীশ্বরের বিরাগভাজন হইয়া উঠেন। তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরিত হয়। তৎকর্ত্তৃক তেজবাহাদুর পরাজিত ও বন্দীভূত হইয়া দিল্লীতে আনীত হইলে অওরঙ্গজেব তাঁহার মৃত্যুদণ্ড ব্যবস্থা করেন।

দিল্লীতে গমন সময়ে তেজবাহাদুর

স্বীয় তনয় গোবিন্দকে পিতৃদত্ত তরবারি দিয়া গুরুর পদে বরণপূর্ব্বক এই কথা বলিয়া যান যে,মৃত্যুর পর তাঁহার দেহ যেন শৃগাল কুকুরের ভক্ষ্য না হয়, এবং এক সময়ে যেন এই মৃত্যুর প্রতিশোধ দেওয়া হয়। ১৬৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ঘাতকদিগের হস্তে তাঁহার মৃত্যু হয়। ধর্ম্মান্ধ অওরঙ্গজেব নিহত শিখগুরুর দেহ প্রকাশ্য রাস্তায় নিক্ষেপ করেন।

যখন তেজবাহাদুরের মৃত্যু হয়, তখন গোবিন্দ সিংহের বয়স পঞ্চদশ বৎসর মাত্র। পিতার শোচনীয় হত্যাকাণ্ড স্বজাতির ও স্বদেশের অধঃপতন গোবিন্দ সিংহের মনে এমন গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়া ছিল যে, যবনবিনাশ ও যবনরাজ্য হইতে স্বদেশের উদ্ধারসাধনই তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইয়া উঠিল। তিনি সকলকে একভূমিতে আনিয়া একটি মহাজাতি করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন কিন্তু বয়সের অল্পতা ও মোগল শাসনকর্ত্তৃগণের সাবধানতা প্রযুক্ত গোবিন্দ পিতার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই এই সঙ্কল্প অনুসারে কার্য্য করিতে সমর্থ হন নাই। যাহাহউক তিনি জনৈক নীচ্‌জাতীয় লোক দ্বারা পিতার শব আনাইয়া প্রেতকৃত্য সম্পাদন পূর্ব্বক যমুনার তটবর্ত্তী পার্ব্বত্য প্রদেশে গমন করেন। এই স্থানে মৃগয়া, পারস্য ভাষা অধ্যয়ন ও স্বজাতির গৌরবকাহিনী শ্রবণে তাঁহার সময় অতিবাহিত হয়।

মোগল সাম্রাজ্য অওরঙ্গজেবের সময়েই সাতিশয় উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়। অওরঙ্গজেব ছলে বলে ও কৌশলে অনেককে দিল্লীর শাসনাধীন করেন। যে কয়েকটী পরাক্রান্ত রাজ্য পূর্ব্বে আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিল, অওরঙ্গজেবের সমকালে তাহা নানা কারণে উচ্ছৃঙ্খল ও ক্ষমতাশূন্য হইয়া পড়ে। একদিকে প্রতাপ সিংহের অভাবে রাজপুতরাজ্য ক্ষীণতেজ হয়, অপর দিকে শিবজীর বিরহে নব অভ্যুদিত মহারাষ্ট্ররাজ্য মস্তকশূন্য হইয়া পড়ে। অওরঙ্গজেবের সময়ে শিবজীই কেবল স্বাধীনতার গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু অসময়ে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হওয়াতে মোগল রাজত্ব অনেকাংশে নিষ্কণ্টক ও নিরুদ্বেগ হয়। শিবজীর অভাবে অওরঙ্গজেবের প্রতাপ সকলেরই ভীতিস্থল হইয়া উঠে। মোগল সাম্রাজ্যের এই প্রতাপের সময়ে গোবিন্দ সিংহ শিখদিগের নূতন রাজত্ব স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হন।

যমুনার পার্ব্বত্য প্রদেশে অপরিজ্ঞাত অবস্থায় গোবিন্দ প্রায় বিংশতিবর্ষ যাপন করেন। ইহার মধ্যে তাঁহার অনেক শিষ্য সংগৃহীত হয়। গোবিন্দ এক্ষণে পঞ্জাবে আসিয়া এই শিষ্যদল লইয়া জীবনের মহৎ ব্রত সাধনে সমুদ্যত হইলেন। শিক্ষাদ্বারা তাঁহার অন্তঃকরণ প্রশস্ত হইয়াছিল, ভূয়োদর্শন তাঁহার বিচারশক্তি পরিমার্জ্জিত করিয়াছিল, এবং প্রগাঢ় কর্ত্তব্য জ্ঞান তাঁহার স্বভাব সমুন্নত করিয়াছিল, এক্ষণে একতা ও স্বার্থ

ত্যাগ তাঁহার বীজমন্ত্র হইল। তিনি সাধনায় অটল, সহিষ্ণুতায় অবিচলিত ও মন্ত্রসিদ্ধিতে অনলস হইলেন। তিনি শিষ্যদিগের হৃদয়ে নূতন তেজ ও নূতন সাহস সঞ্চারিত করিলেন। গোবিন্দ প্রবল পরাক্রান্ত মোগল রাজত্বে বাস করিয়া সেই রাজত্বই বিপর্য্যস্ত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং বদ্ধমূল হিন্দুধর্ম্মের আশ্রয়ক্ষেত্রে অভ্যুদিত হইয়া সেই ধর্ম্মানুশাসনেরই বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিলেন।

গোবিন্দ সাহসী, কর্ত্তব্যপরায়ণ ও স্বজাতিবৎসল ছিলেন। তিনি পৃথিবীর পাপাচার দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেন এবং বিধর্ম্মীর অত্যাচারে আপনাদের জীবন সঙ্কটাপন্ন দেখিয়া ক্রোধ প্রকাশ করিতেন। তিনি জানিতেন, মানবজাতি সাধনাবলে মহৎকার্য্য সাধন করিতে পারে, তিনি বুঝিয়াছিলেন যে মানবী ইচ্ছার একাগ্রতা ও মানবহৃদয়ের তেজস্বিতা সম্পাদনার্থ এক্ষণে প্রগাঢ় সাধনার সময় উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহার স্মৃতি বিগত সময়ের ঋষি ও যোদ্ধৃবর্গের কার্য্যকলাপে পরিপূর্ণ থাকিত, তাঁহার কল্পনা পৃথিবীর শিক্ষাপথ সুপরিস্কৃত করিবার উপায় উদ্ভাবনায় নিয়োজিত থাকিত এবং তাঁহার অন্তঃকরণ কুসংস্কারের সুদৃঢ় আবরণ ভেদ করিতে সচেষ্ট থাকিত। শিষ্যদিগকে মহাসত্ত্ব করিবার জন্য তাহাদের সম্মুখে ভূতপূর্ব্ব কাহিনী কীর্ত্তন করিতেন, দেবতাগণ কি প্রকার কষ্ট স্বীকার করিয়া দৈত্যগণের উপর আধিপত্য করিয়াছেন, সিদ্ধগণ কি প্রকারে আপনাদের সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছেন, গোরক্ষনাথ ও রমানন্দ কিপ্রকারে আপনাদের অনুশাসন প্রচারিত করিয়াছেন, মহম্মদ কিরূপ কষ্ট বিপত্তি অতিক্রম পূর্ব্বক আপনাকে ঈশ্বরপ্রেরিত বলিয়া লোকের মনের উপর আধিপত্য করিয়াছেন ইহাই তাঁহার বর্ণনীয় বিষয় ছিল। তিনি আপনাকে সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের একজন ভৃত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। তাঁহার মতে হিন্দু ও মুসলমানদিগের অনুমোদিত ক্রিয়াপদ্ধতি অকার্য্যকর, তাঁহার ধারণায় ঈশ্বরজ্ঞানে পুত্তলী অথবা ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগের উপাসনা ক্ষুদ্রতার পরিচায়ক। তিনি কহিতেন, ঈশ্বর কোন নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অথবা কোন নির্দ্দিষ্ট পুস্তকে আবদ্ধ নহেন; হৃদয়ের সরলতা ও মনের সাধুতাতেই তিনি বিরাজ করিতেছেন।

গোবিন্দ এইরূপে আপনার মত প্রচার করিলেন, এইরূপে তাঁহার শিষ্যগণ পৌরাণিক কাহিনী ও উদার উপদেশ শ্রবণ করিয়া মহাপ্রাণ ও মহাসত্ত্ব হইতে লাগিল। গোবিন্দ যত্নপূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন করিতেন, যত্নপূর্ব্বক বৈদিকতত্ত্ব ও বৈদিক ক্রিয়াকলাপের পর্য্যালোচনা করিতেন। ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা করিয়াও তিনি শারীরিক তেজস্বিতালাভের প্রতি উদাসীন হন নাই। কথিত আছে,

তিনি লইশ পর্ব্বতে যাইয়া অর্জ্জুনের বীর্য্য,অর্জ্জুনের তেজস্বিতা লাভের নিমিত্ত গভীর তপস্যায় নিমগ্ন থাকিতেন। ঈদৃশ আত্মসংযম ও ঈদৃশী গভীর চিন্তায় শিখ-সমিতিতে গোবিন্দের সম্মান ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

গোবিন্দ এক্ষণে নূতন পদ্ধতিতে শিখ-সমাজ সংশোধিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি শিষ্যদিগকে একত্রিত করিয়া কহিলেন, "সর্ব্বান্তঃকরণে একেশ্বরের উপাসনা করিতে হইবে। কোন রূপ পার্থিব পদার্থ দ্বারা সেই সর্ব্বশক্তিমান্ পরমপিতার মাহাত্ম্য বিকৃত করা হইবে না। সকলেই সরল হৃদয়ে ও একান্ত মনে ঈশ্বরের দিকে চাহিয়া থাকিবে, সকলেই একপ্রাণ হইয়া একতাসূত্রে সম্বদ্ধ হইবে। এই সমাজে জাতির নিয়ম থাকিবে না, কুলমর্য্যাদার প্রাধান্য লক্ষিত হইবে না। ইহাতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্র, পণ্ডিত মূর্খ, ভদ্র ইতর সকলেই সমান ভাবে পরিগৃহীত হইবে, সকলেই এক পংক্তিতে এক হাঁড়িতে ভোজন করিবে; ইহা হিন্দুদিগের ক্রিয়াপদ্ধতি, মুসলমানদিগের ধর্ম্মানুশাসন পরিত্যাগ করিবে, তুরুকদিগকে বিনাশ করিতে যত্নপর থাকিবে, এবং সকলকেই সজীব ও সতেজ হইতে শিক্ষা দিবে।" গোবিন্দ ইহা কহিয়া স্বহস্তে একজন ব্রাহ্মণ, একজন ক্ষত্রিয় ও তিনজন শূদ্রজাতীয় বিশ্বস্ত শিষ্যের গাত্রে চিনির সরবত প্রক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে "খালসা"* বলিয়া সম্বোধন করিলেন; এবং যুদ্ধকার্য্য ও বীরত্বের পরিচয়সূচক "সিংহ" উপাধি দিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন। গোবিন্দ স্বয়ংও "সিংহ" উপাধি গ্রহণ করিয়া গোবিন্দসিংহ নামে প্রসিদ্ধ হইলেন।

গোবিন্দ সিংহ এইরূপে জাতিগত পার্থক্য দূর করিয়া সকলকেই এক সমভূমিতে আনয়ন করিলেন, এবং সকলের হৃদয়েই নূতন জীবনীশক্তি ও নূতন তেজ সঞ্চারিত করিলেন। জাতিভেদ রহিত হওয়াতে উচ্চ বর্ণের শিষ্যগণ প্রথমে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিল, কিন্তু গোবিন্দ সিংহের তেজস্বিতা ও কর্ত্তব্যকুশলতায় সে অসন্তোষ দীর্ঘস্থায়ী হইল না। শিষ্যগণ গুরুর অনির্ব্বচনীয় তেজোমহিমা দর্শনে আর বাঙ্নিষ্পত্তি না করিয়া যথানির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহারা একেশ্বরবাদী হইয়া আদিগুরু নানক এবং তাঁহার উত্তরাধিকারিবর্গের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিল, রাজপুতদিগের ন্যায় সিংহ উপাধিতে বিশেষিত হইয়া দীর্ঘকেশ ও দীর্ঘ শ্মশ্রু রাখিতে লাগিল, এবং অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া

* আরব্য ভাষা হইতে "খালসা" শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহার অর্থ পবিত্র, বিমুক্ত। যে ভূমির সহিত অপরের কোন সংশ্রব নাই সচরাচর সে ভূমিকে খাল্‌সা বলা যায়। গুরু গোবিন্দ এই জন্য শিখদিগের সাধারণ সংজ্ঞা "খালসা" দেন।

প্রকৃত যুদ্ধবীরের পদে সমাসীন হইল। তাহাদের পরিচ্ছদ নীলবর্ণ হইল।† "ওয়া! গুরুজি কি খালসা! ওয়া! গুরুজি কি ফতে!" (গুরু কৃতকার্য্য হউন, জয়শ্রী তাঁহাকে শোভিত করুক) তাহাদের সম্ভাষণ বাক্য হইল। গোবিন্দ সিংহ গুরুমঠ নামে একটি শাসনসমিতি প্রতিষ্ঠিত করিলেন। অমৃতসরে এই সমিতির অধিবেশন হইতে লাগিল। যাহাতে সর্ব্ব প্রকার কুসংস্কারের মূলোচ্ছেদ হয়, যাহাতে শিখশাসন অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রুর আক্রমণে অটল থাকে, সংক্ষেপে যাহাতে একপ্রাণতা সমবেদনা প্রভৃতি শিখদিগের অস্থিতে অস্থিতে মজ্জায় মজ্জায় প্রসারিত হয়, তাহাই গুরুমঠের লক্ষ্য হইল।

গোবিন্দ সিংহ এইরূপে ধীরে ধীরে নূতন উপাদান লইয়া নূতন সিখসমাজ সংগঠিত করিলেন, এবং এইরূপে ধীরে ধীরে নবঅভ্যুদিত শিখসমাজে রাজনৈতিক সাধারণতন্ত্র স্থাপিত করিলেন। যে শিখগণ পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকিয়া সংযতচিত্ত যোগীর ন্যায় নিরীহভাবে কালাতিপাত করিত, তাহারা এক্ষণে একপ্রাণ হইয়া সাধারণতন্ত্রসমাজে সম্মিলিত হইল। গোবিন্দ সিংহ জীবনের এক সাধনায় সুসিদ্ধ হইলেন; কিন্তু ইহা অপেক্ষা আর এক উৎকট সাধনা তাঁহার সম্মুখে পতিত রহিল। তিনি মোগলদিগের মধ্যে সশস্ত্র খালসাদিগকে "সিংহ" উপাধিতে বিশেষিত করিয়াছিলেন, ধর্ম্মান্ধ পণ্ডিত ও পীরদিগের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমানদিগকে একসমাজে নিবেশিত করিয়াছিলেন, কিন্তু সম্রাটের সৈন্যধ্বংস করিতে পারেন নাই। গোবিন্দ আসন্নমৃত্যু পিতার বাক্য, পিতৃসমীপে নিজের প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিলেন এবং কালবিলম্ব না করিয়া পিতৃহন্তা অত্যাচারী যবনদিগের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইলেন।

ভারতবর্ষের সমুদয় স্থলে শাসন বদ্ধমূল ছিল না। অন্তর্ব্বিদ্রোহ প্রভৃতিতে মোগলসাম্রাজ্য প্রায়ই ব্যতিব্যস্ত থাকিত। মোগলসাম্রাজ্যের সংস্থাপয়িতা বাবর নিরুদ্বেগে রাজত্ব করিতে পারেন নাই। তৎপুত্র হুমায়ুন পাঠানবংশোদ্ভব সের সাহের পরাক্রমে রাজ্যতাড়িত হইয়া দেশান্তরে ষোড়শ বর্ষকাল অতিবাহিত করেন। আকবর প্রগাঢ় রাজনীতিজ্ঞতা ও যুদ্ধকুশলতা প্রভাবে প্রায় পঞ্চাশৎ বর্ষকাল ভারতবর্ষে আধিপত্য করেন। তাঁহার বিচক্ষণতায় হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে জাতিবৈর অনেকাংশে তিরোহিত হয়; তথাপি তাঁহাকে স্বীয় তনয় সেলিমের কঠোর ব্যবহারে ও বঙ্গদেশের বিদ্রোহে বিব্রত হইতে হইয়াছিল। সাজিহান জীবদ্দশাতেই সিংহাসন লইয়া তনয়দিগকে পরস্পর যুদ্ধ

† গোবিন্দ সিংহের প্রতিষ্ঠিত অকালী নামক শিখসম্প্রদায় অদ্যাপি নীলবর্ণের পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া থাকে।

করিতে দেখেন, পরিশেষে ইহাদের মধ্যে অধিকতর ক্ষমতাপন্ন অওরঙ্গজেবের ক্রূরাচারে কারাগারে আবদ্ধ হন। অওরঙ্গজেব ধর্ম্মান্ধতা ও কুটিলতায় ভারতইতিহাসে প্রসিদ্ধ। তাঁহার কঠোর রাজনীতিতে অনেকেই তৎপ্রতি বিরক্ত ও হতশ্রদ্ধ হইয়া উঠেন। আকবর হিন্দু ও মুসলমানদিগকে পরস্পর ভ্রাতৃভাবে মিলিত করিতে যে যত্ন করেন, সে যত্ন অওরঙ্গজেবের রাজ্যহইতে সর্ব্বাংশে দূরীভূত হয়। অওরঙ্গজেব নিজের সন্দিগ্ধতা, ধর্ম্মান্ধতা ও কঠিন ব্যবহারে অনেক শত্রুসংগ্রহ করেন। একদিকে দুর্গাদাস স্বজাতির অপমানে উত্তেজিত হইয়া সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হন, অপরদিকে শিবজী বিধর্ম্মীর শাসনে উত্ত্যক্ত হইয়া স্বদেশীয়ের মুহ্যমান হৃদয়ে তাড়িত তেজ সঞ্চারিত করেন। এক্ষণে গোবিন্দসিংহ পুনর্ব্বার সেই তেজের উৎপত্তি করিয়া জাঠদিগের উপর নূতন রাজ্য স্থাপন করিতে উদ্যত হইলেন। তেজস্বী শিখগুরুর এই অভ্যুত্থান অসাময়িক বা হঠকারিতাজনক বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

গোবিন্দ সিংহ এই উৎকট সাধনায় সফল হইবার জন্য আপনার সৈন্যদিগকে এক এক দলে বিভক্ত করিয়া শিক্ষিত সৈন্যশ্রেণীতে পরিণত করিলেন। অপেক্ষাকৃত বিশ্বস্ত ও উন্নত শিষ্যদিগের প্রতি এই সৈন্যদিগের অধিনায়কতা সমর্পিত হইল। এতদ্ব্যতীত গোবিন্দ সিংহ শিক্ষিত পাঠানসৈন্য আনিয়া আপনার দল পরিপুষ্ট করিলেন। শতদ্রু ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বত সমূহের পাদদেশে তিনটী দুর্গ প্রতিষ্ঠাপিত হইল। নাহনের নিকটবর্ত্তী পবন্ত নামক স্থানে তাঁহার একটী সেনানিবাস ছিল, এই সেনানিবাস ব্যতীত তাঁহার পিতৃদেবের প্রতিষ্ঠিত আনন্দপুর মাখোয়ানে আর একটি আশ্রয়স্থান তাঁহার অধীনস্থ হয়। গোবিন্দ সিংহের তৃতীয় আশ্রয়স্থান চম্পাকুনার। ইহা শতদ্রুর তটে অবস্থিত। পার্ব্বত্য প্রদেশে সৈন্যস্থাপন পূর্ব্বক মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ করা সুবিধাজনক ভাবিয়া গোবিন্দ সিংহ দুই দুর্গ ও আশ্রয় স্থানসমূহ সুব্যবস্থিত করিয়া পার্ব্বত্যপ্রদেশের সর্দ্দারদিগের সহিত সম্মিলিত ও তাহাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে চেষ্টা করিলেন। এইরূপে ১৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দে গোবিন্দ সিংহ বিধর্ম্মী মোগল দিগের সহিত যুদ্ধ করিবার ব্যবস্থা করেন। তিনি ধর্ম্মপ্রচারক ও ধর্ম্মোপদেষ্টা হইয়া নানাস্থান হইতে শিষ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এক্ষণে যুদ্ধবীর সেনানায়কের পদে সমাসীন হইয়া সেনানিবেশ নিরাপদ ও দুর্গসমূহের শৃঙ্খলাবিধানে যত্নপর হইলেন।

নাহনের সর্দ্দারের সহিত গোবিন্দ সিংহের প্রথম যুদ্ধ হয়। গোবিন্দের সেনাদলে যে সমস্ত পাঠান ছিল, বেতন বাঁকি পড়াতে তাহারা গোবিন্দ সিংহের সম্পত্তি লুঠ করিবার জন্য শত্রুর পক্ষ

অবলম্বন করে। কিন্তু এই যুদ্ধে গোবিন্দ সিংহের জয়লাভ হয়। শিখগুরুর এই প্রথম কৃতকার্য্যতা দর্শনে অনেকেই আসিয়া গোবিন্দ সিংহের দল পরিপুষ্ট করে; ইহার কিয়ৎকাল পরে মিয়া খাঁ নামক জনৈক মোগল সর্দ্দার নাদোনের রাজা ভীম চাঁদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। নাদোন রাজ্য শ্রীনগরের উত্তর পশ্চিম ও জম্বুর দক্ষিণ পূর্ব্বে অবস্থিত। জম্বুরাজ এই যুদ্ধে মিঁয়া খাঁর পক্ষ অবলম্বন করাতে ভীম চাঁদ গোবিন্দ সিংহের সাহায্য প্রার্থনা করেন। গোবিন্দ সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে ভীমচাঁদের সাহায্যার্থ সমরস্থলে উপনীত হন। এ যুদ্ধেও গোবিন্দ সিংহ ও ভীমচাঁদের সম্পূর্ণ জয়লাভ হয়। মোগল সর্দ্দার ও জম্বুরাজ পরাজিত হইয়া শতদ্রু উত্তরণ পূর্ব্বক পশ্চাদ্ধাবিত শত্রুর হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করেন।

মিয়া খাঁর সহিত যুদ্ধের পর দিলির খাঁর পুত্র গোবিন্দ সিংহের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন কিন্তু শিখদিগের কৌশলে তাঁহাকেও অকৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়। দিলির খাঁ পুত্রের অকৃতকার্য্যতায় ক্রুদ্ধ হইয়া সমুদয় সৈন্যসংগ্রহ পূর্ব্বক হুসেন খাঁকে প্রেরণ করেন। প্রথম যুদ্ধে শিখদিগের কয়েকটী দুর্গ হুসেনের অধিকৃত হয়। কিন্তু পরিশেষে হুসেনখাঁ পরাজিত ও নিহত হন। গোবিন্দ সিংহ এই যুদ্ধের সময় উপস্থিত ছিলেন না, কেবল তাঁহার অনুচরগণই বিশিষ্ট পরাক্রম প্রকাশ করিয়া এই যুদ্ধে জয়ী হইয়াছিল।

গোবিন্দ সিংহ ও তাঁহার শিষ্যগণের এইরূপ পরাক্রম দর্শনে অওরঙ্গজেব চিন্তিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া লাহোর ও সর্হিন্দ প্রদেশের শাসনকর্ত্তাকে ইহার প্রতিবিধান করিতে কঠোর ভাবে আদেশ করিলেন। সম্রাটের এই কঠোর আজ্ঞায় এবার যুদ্ধের সমৃদ্ধ আয়োজন হইল। ১৭০১ অব্দে দিলির খাঁ ও রস্তম খাঁ গোবিন্দের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। অওরঙ্গজেবের পুত্র মোজাইমও ইহাদের সহিত সম্মিলিত হইলেন। এই সংবাদে শিষ্যগণের অনেকে ভীত হইয়া সন্নিহিত পর্ব্বতে আশ্রয় লইল। গোবিন্দ সিংহ তাহাদিগকে ভীরু বলিয়া অনেক তিরস্কার করিলেন, কিন্তু তাহারা নিবৃত্ত হইল না। অবশেষে ৪০ জন সাহসী শিখ গুরুর জন্য আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইল। গোবিন্দ সিংহ আনন্দপুরে মোগল সৈন্যকর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইলেন। তাঁহার মাতা ও স্ত্রী দুইটী শিশু সন্তানের সহিত সর্হিন্দে পলায়ন করিলেন। কিন্তু শিশু সন্তান দুইটী মুসলমানদিগের হস্তে পতিত হওয়াতে নির্দ্দয়রূপে বিনষ্ট হইল। এ দিকে গোবিন্দ সিংহ রাত্রিকালে মোগলসৈন্যগণের দৃষ্টি পরিহার করিয়া চম্পকুমারে উপনীত হইলেন।

শত্রুগণ চম্পকুমারও আক্রমণ করিল। এই আক্রমণে খোজা মহম্মদ ও লহর খাঁ

মোগল সৈন্যের অধিনায়ক হন। যুদ্ধ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে এই সেনাপতিদ্বয় গোবিন্দ সিংহকে আত্মসমর্পণ করিতে অনুরোধ করিয়া একজন দূত প্রেরণ করেন। কিন্তু গোবিন্দ সিংহের পুত্র অজিত সিংহ আত্মসমর্পণের প্রস্তাবে ক্রুদ্ধ হইয়া দূতকে তিরস্কার পূর্ব্বক বিদায় দেন। দূত তিরস্কৃত হইয়া শিবিরে প্রত্যাগত হইলে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হয়। অজিত সিংহ বিশিষ্ট পরাক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত হন। গোবিন্দ সিংহ জয়ের কোন সম্ভাবনা না দেখিয়া অন্ধকার রাত্রিতে চম্পকুমার পরিত্যাগ করেন। প্রস্থানসময়ে দুই জন পাঠান তাঁহাকে দেখিতে পায়; এই পাঠানদ্বয় পূর্ব্বে গোবিন্দ সিংহের নিকট উপকার পাইয়াছিল বলিয়া এ সময়ে তাঁহার বিশেষ সাহায্য করে। গোবিন্দ সিংহ এইরূপে চম্পকুমার হইতে বিলোলপুরে উপনীত হন। এই স্থানে পীর মহম্মদ নামে একজন মুসলমানের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। গোবিন্দ সিংহ পীর মহম্মদের সহিত একসময়ে একত্র কোরাণ পাঠ করিয়াছিলেন, পীর মহম্মদ এজন্য সহাধ্যায়ীর প্রতি বিশিষ্ট সৌজন্য প্রদর্শন করেন। গোবিন্দ পীর মহম্মদের সহিত আহার করিয়া ছদ্মবেশে ভাটিণ্ডায় উপস্থিত হন। এই স্থানে শিষ্যগণ পুনর্ব্বার যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইয়া তাঁহার নিকট সমাগত হয়। গোবিন্দ শিষ্যদলসহকারে অনুসরণকারী মোগলদিগকে যুদ্ধে নিরস্ত করিয়া হালসী ও ফিরোজপুরের মধ্যবর্ত্তী দমদমায় উপস্থিত হন। যে স্থানে গোবিন্দ সিংহ মোগলদিগকে তাড়িত করেন, সেই স্থান অদ্যাপি "মুক্তার" নামে প্রসিদ্ধ আছে।

দমদমায় অবস্থান কালে গোবিন্দ সিংহ বিচিত্র নাটক ও একখানি ধর্ম্মগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। গোবিন্দ শিখদিগের দশম গুরু। এজন্য তৎপ্রণীত পুস্তক "দশম পাৎসাকা গ্রন্থ" নামে প্রসিদ্ধ হয়। গোবিন্দ সিংহ যে সমস্ত যুদ্ধ করেন, বিচিত্র নাটকে তৎসমুদয়ের বর্ণনা আছে, এই বর্ণনা সাতিশয় ওজস্বী ও হৃদয়োদ্দীপক। যাহাহউক; গোবিন্দ সিংহ যখন এইরূপ নির্জ্জনবাসে পুস্তকরচনাকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন তখন অওরঙ্গজেব তাঁহাকে নিজের নিকট উপস্থিত হইতে অনুরোধ করেন। কিন্তু গোবিন্দ এই অনুরোধ প্রথমে রক্ষা করেন নাই। প্রত্যুত ঘৃণাসহকারে কহিয়াছিলেন তিনি সম্রাটের প্রতি কোন রূপ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন না। এক্ষণেও খালসাগণ সম্রাটের পূর্ব্বকৃত অপরাধের প্রতিশোধ লইবে। ইহার পর তিনি নানকের ধর্ম্মসংস্কার, অর্জ্জুন ও তেজবাহাদুরের শোচনীয় হত্যাকাণ্ড এবং নিজের অপুত্রকাবস্থার উল্লেখ করিয়া কহেন, "আমি এক্ষণে কোনরূপ পার্থিব বন্ধনে আবদ্ধ নই। স্থির চিত্তে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছি। সেই রাজার রাজা অদ্বিতীয় সম্রাট্ ব্যতীত কেহই আমার

ভীতিস্থল নহেন।” এই উত্তর পাইয়াও অওরঙ্গজেব তাঁহার সহিত সাক্ষাতে পুনর্ব্বার বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। গোবিন্দ সিংহ এবার সাক্ষাৎ করিতে প্রস্তুত হন। কিন্তু তাঁহার পৌঁছিবার পূর্ব্বেই বৃদ্ধ মোগল সম্রাটের পরলোক-প্রাপ্তি হয়।

১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারি অওরঙ্গজেবের মৃত্যু হয়। তৎপুত্র মোজাইম “বাহাদুর সা” নাম ধারণ করিয়া দিল্লীর শাসনদণ্ড গ্রহণ করেন। বাহাদুর সা যখন তদীয় ভ্রাতা কামবক্সের সহিত দক্ষিণাপথে যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন,তখন গোবিন্দ সিংহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আহূত হন। বাহাদুর সা গোবিন্দের প্রতি বিলক্ষণ সম্মান ও সৌজন্য প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে সৈন্যাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করেন। গোবিন্দ সিংহ এইরূপে দিল্লীর সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া আপনার শিষ্যসম্প্রদায়ের শৃঙ্খলাবিধানে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে তিনি জনৈক পাঠানের নিকট কতকগুলি ঘোটক ক্রয় করেন। ঘোটকের মূল্যের জন্য পাঠান একদা গোবিন্দ সিংহের প্রতি কঠোর ভাষা প্রয়োগ করে। গোবিন্দ এই অপমান সহিতে না পারিয়া পাঠানকে নিহত করেন। কিন্তু এই ঘটনার বিষয় নিহত পাঠানের পুত্রের মনে গাঢ় রূপে অঙ্কিত থাকে। একদা সুযোগ পাইয়া এই পাঠানতনয় গোবিন্দের শিবিরে প্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহাকে অস্ত্রাঘাত করে। এই আঘাতেই গোবিন্দ মানবলীলা সম্বরণ করেন। ১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দে গোদাবরীর তীরবর্ত্তী নান্দর নামক স্থানে এই শোচনীয় কাণ্ড সংঘটিত হয়। মৃত্যুর সময় গোবিন্দ অষ্টচত্বারিংশ বর্ষে উপনীত হইয়াছিলেন।

গোবিন্দ সিংহ শিখসমাজের জীবনদাতা। তাঁহার সময় হইতেই শিখগণ তেজস্বী বলিয়া সর্ব্বত্র বিখ্যাত হয়। গুরু নানক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু গোবিন্দ সিংহ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের এক প্রণেতা ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার নিদান। তাঁহার উদ্দেশ্য মহৎ, তাঁহার সাধনা গভীর, তাঁহার বীরত্ব অসাধারণ এবং তাঁহার মানসিক স্থিরতা অতুল্য। তিনি সমুদয় জাতিকে একতাসূত্রে আবদ্ধ ও এক ধর্ম্মাক্রান্ত করিতে প্রয়াস পাইয়া নিজের গভীর উদারতার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি জাতীয় জীবনের গৌরব বুঝিতে পারিয়াছিলেন, সকলে এক উদ্দেশ্যে একসূত্রে আবদ্ধ না হইলে যে নির্জ্জীব ভারতের উদ্ধার নাই, ইহা বিলক্ষণ রূপে তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল। এইজন্যই তিনি হিন্দু ও মুসলমানকে একভূমিতে আনয়ন করেন, এই জন্যই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্রকে একসূত্রে নিবদ্ধ করেন,এইজন্যই তিনি গর্ব্বসহকারে সম্রাট্ অওরঙ্গজেবকে লিখেনঃ—“তুমি হিন্দুকে মুসলমান করিতেছ, কিন্তু আমি মুসলমানকে হিন্দু করিব। তুমি আপনাকে নিরাপদ

ভাবিতেছ কিন্তু সাবধান! আমার শিক্ষাবলে চটক শ্যেনকে ভূতলে পাতিত করিবে।" তেজস্বী শিখগুরুর এই তেজস্বী বাক্য নিষ্ফল হয় নাই, তাঁহার মন্ত্রবলে চটকগণ যথার্থ শ্যেনকে যথোচিত শিক্ষা দিয়াছে।

গোবিন্দ সিংহ আরও কিছুদিন জীবিত থাকিলে অনেক মহৎকার্য্য সম্পন্ন করিয়া যাইতে পারিতেন। মহম্মদ নিরাপদে মদিনায় পলায়ন করিতে না পারিলে সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাস বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইত, গোবিন্দ সিংহ আপনার মহামন্ত্র সাধনে প্রবৃত্ত না হইলে শিখদিগের নাম ইতিহাস হইতে বিলুপ্ত হইত। যাহা হউক, গোবিন্দ সিংহ এই অল্পবয়সে অল্প সময়ের মধ্যে শিখসমাজে যে জীবনী শক্তি, যে তেজ, যে ওজস্বিতা প্রসারিত করেন তাহারই বলে নির্জ্জীব, নিশ্চেষ্ট, নিষ্ক্রিয় ভারতে শিখগণ আজ পর্য্যন্ত সজীব রহিয়াছে, তাহারই বলে রামনগর ও চিলিয়ান ওয়ালার নাম আজ পর্য্যন্ত ইতিহাসপত্রে অক্ষয় অক্ষরে লিখিত আছে।

গঙ্গাধর শর্ম্মা

ওরফে

জটাধারীর রোজনামচা।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ।

পরামর্শ।

শিবসহায় সিংহ উচ্চ আদালতে অর্পিত হইয়াছেন, এই কথা দেশবিদেশে রাষ্ট্র হইল। সকলেই দুঃখিত, কারণ শিবসহায়ের সহৃদয়তা ও সরলতায় সকলে মুগ্ধ ছিলেন। কেবল গজাননের ও রঘুবীরের আনন্দের সীমা নাই; একে শত্রুদমন হইবার সম্ভাবনা, তাহাতে আর একটি গুহ্য অভিসন্ধি সাধনের বিলক্ষণ সুযোগ উপস্থিত। শিবসহায় নগরে গিয়াছেন, তাঁহার গৃহে কয়েকটি অবলা মহিলা মাত্র আছেন, কিন্তু তাঁহার গৃহ নানাবিধ দ্রব্যের ভাণ্ডার। গজানন ভাবিতেছেন ডাকাতি করিলে কি হয়? রঘুবীর মনে করিতেছেন একবার হুকুম পাইবার অপেক্ষা। আজ শুক্লাষ্টমী, জ্যোৎস্না প্রায় দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত দীপ্তিমান্‌ থাকিবে, তার পর অন্ধকার, অন্ধকারই ত ডাকাতের সহায়; অন্ধকারে কার্য্য অনায়াসে সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা।

গোলাবাটীতে একটি মঞ্চে আজ গজানন সন্ধ্যার পর বসিয়াছেন। বাহিরে কেহ আসিলে "দেওয়ানজী বাটীতে নাই" শুনিয়া চলিয়া যাইতেছে। সব নিস্তব্ধ, প্রদীপ জ্বলিতেছে না কেবল গোয়াল ঘরের মধ্যে "গুজ্ গুজ্" বাক্য ও "হুঁকার ভুড়ভুড়ি" শব্দ হইতেছে। গজানন কহিলেন, রঘুবীর, আমার কতক গুলি টাকা বৃথা অপচয় হইল, এই স্ত্রীলোকের অনুরোধে—একটি ছেলেখেলা বলিলেই হইল—কি না শুভচণ্ডী পূজায় শত টাকা ব্যয় হইয়া গেল!

রঘু। এক যাত্রাওয়ালাই ত শখানেক টাকা লয়ে গেল মহাশয়।

গ। তুমি সব খবর রাখ, ভৃত্যের দরদ না থাকিলে প্রভুর কখন কি ভাল হয়? সে যা হবার হয়ে গেল, আবার বাবাজিকে—কি করি, কর্ত্তামহাশয়ের কথা ঠেলিতে পারি না—দূরদেশে পাঠাইতে হইবে।

রঘু। প্রায় পনর, বিশ ত্রিশ ক্রোশ। সেও ত আর এক শয়ের ধাক্কা।

গ। এ সকল আঞ্জাম কিসে হয়, ঘরের টাকা ভেঙ্গে বাহিরের কাজ করা কর্ত্তব্য নয়। বাজে আদায়ের উপর দিয়ে গেলেই ভাল হয়।

রঘু। আপনি একবার মহলে শুভাগমন করুন "এবার ধান আবাদ বেশ, প্রজারা সা অন্ন, একটি চাঁদার যোগাড় করুন" এই বলিয়া রঘুবীর একবার চতুষ্পার্শ্ব দেখিল, আবার উঠিয়া প্রাঙ্গণের চতুষ্পার্শ্বে মায় গৃহের ফটক পর্য্যন্ত দৌড়িয়া দেখিয়া গেল ও আবার আরম্ভ করিল "কেহ কোথায় নাই।"

গ। ও দিকে কেহ কোথাও নাই।

র। জাল ফেলা যাক্।

গ। পাছে মাছি লাগে।

র। এ কি "নড়িস চড়িস পড়িস্ না", তেমন শিকারী কি আমি?

গজানন কহিলেন, সেরূপ শিকারীকে কি আমি শিকার করিতে বলি। যদি এদেশে তোমার মত পালওয়ান, তোমার মত খেলী, তোমার মত বীর আর একটি থাকিত তাহাকেও এ বৈঠকে আনাইতাম। কিন্তু এদেশে আর দ্বিতীয় নাই, ক্রমে আমরাই দেখিতেছি সকল লোপ হইতেছে। তোমার পিতামহ দল বল সহ এই গ্রাম হইতে মারহাট্টা অশ্বারোহীদিগকে তাড়িত করে, কত প্রজার প্রাণ, কত লোকের মান সেই পঞ্চম সর্দ্দার হইতে রক্ষা পায়। তার গর্জ্জনে ভূকম্প হত, এখানে হাঁক দিলে সেই দূরে নদীর জল কাঁপিয়া উঠিত, নারিকেল পত্র সিহরিয়া উঠিত, সে বীরদর্প আর কোথায়! যা কিছু আছে তা রঘুবীরেই আছে ওই গেলেই সব গেল, গেলরে রঘু গেল।

রঘু। আর যে আইন কানন, আর থাকে!

খুঁটির পাশে একটি বালস্বর কহিয়া উঠিল "কেম টাকবে না জেটা আম্বি বীর হব।"

গজানন চমৎকৃত হইয়া কহিয়া উঠি-

লেন "এ কে! বাবা নীলমনি, তুমি এ খানে কেমন কোরে এলে?"

নী। তোমার দপ্তরের কাগজে কালী ঢেলে দিয়ে লুকিয়ে আছি। মশায় বেটা হাটে করে ডোরে এসেছিল ও ঐ গরুর জিন পালানের ভিতর লুকিয়ে ছিলাম।

গ। ক্ষেপা ছেলে, কাগজ কলম দপ্তর কার? গুরুমহাশয় জানে না? সব তোমার,কালি পড়েছে বৈ ত নয়।

রঘু কহিল, কালি পড়া ভাল লক্ষণ। গজানন কহিলেন বাবু, আমাদের কথা ত শুনিস নাই, শুনে থাক ত কাহাকেও বল না।

নী। আমি ছেলে মানুষ। কি বুঝি।

গ। বুঝ না বুঝ কাহাকেও বল না। এখন হরি সেকরাকে দোকান জাঁতা লয়ে এখানে আনাতে হবে যে, সঙ্গে সঙ্গে মাল পার করা চাই, গলান চাই।

রঘু কহিল, সে ছুই ফুকে সব ফুকে দিবে—আমি এখন সাজ সরঞ্জম করি।

গজানন কহিলেন, রঘু, আজ শিব-সহায়ের গোমস্তা এসেছিল, মোকর্দ্দমার খরচের জন্য দেড়টি হাজার টাকা রাঙ্গা ঠাকুরুনকে বলে কয়ে কর্জ্জ দেওয়াইয়াছি। ঠাকুরাণী নোট দিতে ছিলেন, আমি রোক্ টাকাটী এই সন্ধ্যার পূর্ব্বাহ্নে দেওয়াইয়াছি। সে শিবসহায়ের বাহিরের সিন্ধুকেই থাকিবে, দেখিস্ মাল যেন হস্তগত হয়! আমার পাল্‌কিবাহক প্রস্তুত,আমি এই রাত্রেই মহলে বেরোব, সকল তোমার জিম্বা।

রঘুবীর প্রণাম করিয়া কালী মায়িকে স্মরণ করিয়া গোলাবাটী হইতে বাহির হইলেন।

নীলমণি কহিল, "বাবা কিসের কথা হতেছিল?"

গজানন কহিলেন তুমি সহরে যাবে, নূতন অলঙ্কার হবে তাই হরি সোনার আসবে—

নী। আর যে সব কথা কহিতেছিলে?

গ। সে সব শুনে তোমার কি আবশ্যক, তুমি ছেলে মানুষ।

নী। আমি এই বড় হইছি, তুমি যে বলে ছিলে টোড্ড বটরের। কথা কহিতে কহিতে হরি সোনার উপস্থিত। তলব হওয়াতেই সে অভিপ্রায় জানিতে পারিয়াছে, সোনা রূপা গলাইবার সমস্ত সরঞ্জাম লইয়া প্রস্তুত হইয়া এক ঘরে গোপনে বসিয়া রহিল। এ দিকে গজানন তেল মশালের হুকুম দিলেন, লোকে জানিল তিনি রাত্রেই মহলে গমন করিবেন কিন্তু গজাননের মনের কথা এক মনই জানে, আর রঘুবীর জানে।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

চাঁদ ডুবিল।

শুক্লাষ্টমীর চাঁদ! নিজের আলোকে জগৎ শুদ্ধ আলোকময় করিয়াছেন। দূরে উচ্চ নারিকেল খর্জ্জুরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

পত্ররাশির মন্দ বায়ুচালনে কম্পিত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খদ্যোত পত্রপুঞ্জে হীরকখণ্ডের ন্যায় মহীর কুন্তলে জ্বলিতেছে, শিশিরবিন্দু-সমূহ বিচ্ছিন্ন মুক্তাহারের স্বরূপ বসুমতীর উরসে ছড়িয়া পড়িয়াছে। আরও নিকটে আশুতোষ বাবুর প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মী নারায়ণের উচ্চ শুভ্র মন্দিরচূড়ে সুবর্ণ চক্র চক চক করিতেছে ও একটি যন্ত্র কৌশলে সামান্য বায়ুর তেজে থর থরিত হইয়া যেন রত্নকণা নিঃক্ষেপ করিতেছে। মন্দিরসম্মুখে থরে থরে সোপানসেতুর চরণে সুন্দর সরসী আরসী স্বরূপ চন্দ্রমণ্ডলের ছবি বক্ষে ধরিয়া ঢল ঢল করিতেছে, জল কিনারার প্রস্ফুটিত কুমুদিনীনিচয় সুধাকরের স্বর্গীয় অমল কিরণ ভোগ করিতেছে। সুমধুর চন্দ্রকিরণ সুন্দর-হরিত-দূর্ব্বাদলময়-নিম্নগসরসীকূল-কোমল-শয্যাশায়ী।

এ দিকে আশুতোষ বাবুর সুবৃহৎ অট্টালিকার পশ্চিমভাগ সেই আলোকে ধপ্ ধপ্ করিতেছে, এবং সেই পশ্চিম ধারে উচ্চ কক্ষে একটি বারেন্দায় সুকোমল শয্যায় অমরেন্দ্র বাবু শয়ন করিয়া প্রকৃতির এই ছবিখানি মধ্যে মধ্যে দেখিতেছেন। প্রায় সব নিস্তব্ধ, প্রহরীএকা শশী জাগিতেছেন, আবার এক এক বার ফিণ ফিণে শুভ্র মেঘের চাদরে কলানিধির মুখ ঢাকিতেছে, মেঘ উড়িয়া গেলে হাসিতেছেন, জগৎকে হাসাইতেছেন। অমরেন্দ্র বাবুর হৃদয়াকাশও এইরূপ মধ্যে মধ্যে চিন্তামেঘে আবৃত হইতেছে আবার তৎক্ষণাৎ আশার আলোকে হাসিতেছে। "তর্কালঙ্কার মহাশয়ের আশ্রমে যে সুকুমারী আমার কাতরতায় এত কাতরা হইয়াছিলেন তিনি কে? এ কথা কাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেও বা কেন লজ্জা হয়? তাঁহাকে কি এ জন্মে আর দেখিব না" এইরূপ ভাবিতেছেন, আবার চিন্তা করিতেছেন যে, "আমার আহত স্থান ত প্রায় ব্যথাশূন্য হইয়াছে, আর দুই এক দিন পরেই ঘোড়ায় চড়িব, আবার সেই আশ্রমের দিকে গমন করায় দোষ কি?" এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এমন সময় বারেন্দার পার্শ্বে একটি দ্বার নড়িয়া উঠিল ও পরক্ষণেই দেখিলেন তাঁহার পিতৃব্যপত্নী সমদুঃখশালিনী কোমলমুখী রাঙ্গা ঠাকুরাণী একটি তালবৃন্ত হস্তে সমাগতা।

রাঙ্গা। কি বাবা, ব্যথায় নিদ্রা আসিতেছে না, রাত্রিও প্রহর অতীতপ্রায়, আমি বস্‌ব? এই বলিয়াই উপবেশন করিলেন। তালবৃন্ত স্বয়ং হেলাইতে আরম্ভ করিলেন ও কহিলেন, "বাবা তোমার শিকারের গল্প কর, কেমন করে বাঘ মারিলে?

অমরেন্দ্র অতিযত্নে সে সমস্ত কথা বর্ণন করিয়া আশ্রমে বিশ্রামের বার্ত্তা কহিতে কহিতে বলিলেন "সে মেয়েটী কে? কত যত্নে আহত স্থান ধুইয়া দিল, তার ত ঘৃণা মূলেই দেখিলাম না।"

রাঙ্গা ঠাকুরাণী কহিলেন, "সেটি কে

তুমি জান না, বাবা তাকে বৌ করিলে কেমন হয়।"

এখন ঝিলমিলির পার্শ্বে পশ্চিম আকাশের চাঁদ হেলিয়া পড়িয়াছে, সেই আলোকে রাঙ্গাঠাকুরাণী দেখিলেন যে অমরেন্দ্রনাথের মুখভঙ্গী তাঁহার কথা মাত্রেই প্রফুল্ল হইল, ও অমরেন্দ্র কহিলেন, "হবার হয় ত তাতে ক্ষতি কি।" কথা উচ্চারিত হইবা মাত্র আবার অমরেন্দ্র লজ্জায় গলিত হইলেন। নাশাগ্রে ভ্রূযুগলোপরে শ্বেত সলিলবিন্দু চন্দ্রকিরণে পদ্মকেশরে শিশিরবিন্দু সম উজ্জ্বলরূপে দেখা দিল আবার কিঞ্চিৎ স্তব্ধ থাকিয়া কহিলেন "খুড়ি মা সে কে? তুমি ত ঐ আশ্রমের নিকটবর্ত্তী শান্তিপুর গ্রামের ঝিয়ারি!"

রাঙ্গা ঠাকুরাণী প্রফুল্লবদনে কহিলেন "তুমি জান না আমার পিতৃগৃহের নিকটবর্ত্তী সেই মহাদেব প্রসাদ—নাম করিতে নাই—"

অ। কে, শিবসহায়?

রাঙ্গা। হাঁ। যাহাকে "পশ্চিমে বাবু" কহে, ঐ বালিকা সেই বাবুরই কন্যা, বাল্যকাল অবধি উহাকে কোলে কাঁকে লইয়া মানুষ করিয়াছি, সে আমার নিতান্ত স্নেহের পাত্রী, উহার নামটি কাদম্বিনী। উহার যত খানি রূপ দেখেছ বাবা, উহার গুণ তার চতুর্গুণ; বাবুর এক মেয়ে, ঐ সর্ব্বস্ব, প্রাণতুল্য প্রিয়!

অমরেন্দ্র কহিলেন "উহার সোদর আর কেহ নাই?"

রাঙ্গা ঠাকুরাণী আবার আরম্ভ করিলেন, "কালীপূজা করে ঐ একটী কন্যা হয়েছিল কিন্তু যেমন রূপগুণসম্পন্ন তেমনি হতভাগী, তোমাদেরই সঙ্গে ত ৪।৫ বৎসর জায়গিরের মোকর্দ্দমায় ঐ বাবুরা খরচান্ত হন, তার পর সে ঝঞ্ঝাট না শেষ হইতেই মেয়েটির মাতৃবিয়োগ হইল—ওদের আবার সেই পশ্চিম থেকে বর এনে বিবাহ দেওয়া প্রথা আছে, এই সব নানা কারণে মেয়েটি অত বড় হয়ে পড়েছে, তার উপর আবার এখনকার বিপদ শুন নাই?"

অমরেন্দ্র কহিয়া উঠিলেন, "তবে ঐ সেই কন্যা যার মিথ্যা মরণ সম্বাদ দিয়াছিল?"

"বাবা সেই ঐ—ঐ বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য ওদের অধিষ্ঠাতা কি না—তাই গুরুর আর ওকে লুকিয়ে রেখেছে, তা তুমি দেখেছ? আজ রাত্রে কিন্তু তাকে ঘরে লয়ে গেছে—ওদের বাটীতে আজ সত্যনারায়ণের পূজা—পূজা হয়ে গেলে মোকর্দ্দমা চালাইতে কাল লোক যাবে—এই ভোরেই যাবে।"

অমরেন্দ্র ব্যগ্রচিত্তে কহিলেন "আপনি এ সকল কথা কেমন করে জানিলেন?"

রাঙ্গাঠাকুরাণী কহিলেন "তোমায় সব কথা ভেঙ্গে বল্‌বো, আজ সন্ধ্যার পূর্ব্বে ওদের লোক এসেছিল, দেওয়ানজি থেকে ওদের দুই হাজার টাকা আমি কর্জ্জ দিলাম। কি করি দায়গ্রস্ত, পরের বিপদ শুনিলে কি স্থির থাকা যায়!

আবার আমার বুড়ো বাপের সঙ্গে ঐ বাবুর বড় সদ্ভাব ছিল; তাঁহাকে সাহায্য করে কি মন্দ কাজ করেছি?”

অমরেন্দ্র কহিলেন“পরোপকারই আপনার চিরব্রত, আপনার মতই আপনার কাজ,আমি কি সুখী হইলাম বলিতে পারি না—”কিঞ্চিৎ স্তব্ধ থাকিয়া কহিলেন, “তবে কাদম্বিনীর কোথায় বিবাহ হবে?” মনে মনে ভাবিলেন, আমরাও ত ক্ষত্রিয়। ভাবিতে ভাবিতে চক্ষু মুদিলেন, রাঙ্গা ঠাকুরাণী মনে করিলেন রাত্রিবৃদ্ধি হইতেছে। এই জন্য তিনি ত্বরায় আপন মহলে চলিলেন। এ দিকে চন্দ্রঠাকুর অস্ত-শয্যাশায়ী। কাল মেঘ ধীরে ধীরে তাঁহার চতুষ্পার্শ্ব ঘিরিতেছে, দিঙ্মণ্ডল আঁধার হইতেছে, অমরেন্দ্রের নয়ন সেই দূরে পশ্চিম গগনে নিপতিত। এই দেখিতে দেখিতে চন্দ্রমণ্ডলের পরিধির ক্ষীণরেখা নয়নান্তরিত হইল,যেন বিশাল জাহ্নবীবক্ষে একটী দীপ টলমল করিয়া ডুবিয়া গেল। এই সময়েই একটি “বম্‌ কালী” শব্দ দূর হইতে অমরেন্দ্রের কর্ণগোচর হইল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে একটি বোমের শব্দ হইল ও কপাটার্গল ভাঙ্গিবার জন্য ডক ডক কর্ণভেদী শব্দ ঘন ঘন দূর হইতে আসিতে লাগিল। অমরেন্দ্র বাবু ভাবিতেছেন এ কি বিজাতীয় রব! বিকট হুঙ্কার! নরক ঘোষিল,ভূত নাচিল, দেশে আবার কি মারহাট্টা আসিল। বহির্দ্দেশ হইতে একটি সান্ত্রী কহিয়া উঠিল “মানুষের বিপদ যখন হয় এমনই হয়! কালিন্দী সায়েরের পাহাড়ে চড়িয়া দেখিলাম আলো দৌড়াদৌড়ি করিতেছে, উত্তরে ডাকাতি হইতেছে ও দিকে আর লক্ষ্মীমন্ত লোক কে আছে, তর্কালঙ্কারের আলো চাল, কাঁচকলা চুরি করিতে কি আর ডাকাত আসিবে? না! এ পশ্চিমে বাবুদের বাড়িতে ডাকাতি। ব্যাটারা খালি ঘর পেয়েছে কি না!”

কথা শুনিবামাত্র অমরেন্দ্র বাবু কহিলেন আমার আরব ঘোড়া সাজাইতে বল। তাঁহার মনে আশঙ্কা হইল পাছে তাঁহার কাদম্বিনীর কোন বিপদ ঘটে, এমন চিন্তাকালে প্রণয়িনীর বিপদাশঙ্কা উপস্থিত হইলে সাহসী স্বজন কি স্থির থাকিতে পারে? সে উন্মত্ততায় আর কোন জ্ঞান থাকে? শয্যা হইতে ত্বরিত উত্থিত, দণ্ডায়মান। সজ্জাগৃহে যাইয়া নিমেষমধ্যে অমরেন্দ্রনাথ রণবেশ লইয়া বহির্দ্দেশে আসিলেন। পদের ব্যথা কি আর থাকে, কেহ কিঞ্চিন্মাত্র কাতরতা দেখিল না, স্বয়ং অশ্বশালার সান্নিধ্যে যাইয়া আপন প্রিয় বিশ্বাসী বাহনোপরি আরূঢ় হইয়া ডাকাতি দেখিব বলিয়া শান্তিপুরের দিকে ধাবিত হইলেন।

বাঙ্গালা বর্ণমালা সংস্কার।

প্রাকৃত প্রকরণ।

সংস্কৃত হইতে প্রাকৃত ভাষা এবং সংস্কৃত বর্ণমালা হইতে প্রাকৃত বর্ণমালার উৎপত্তি হইয়াছে। প্রসিদ্ধ অভিধানকার হেমচন্দ্র বলিয়াছেন "প্রকৃতি শব্দের অর্থ সংস্কৃত, তাহা হইতে উৎপন্ন ভাষার নাম প্রাকৃত।"

সংস্কৃত অক্ষর সকলের উচ্চারণ অতিশয় কঠিন, স্ত্রী, বালক এবং মূর্খলোক দ্বারা ইহার কঠিন উচ্চারণ সকল কোমলরূপে পরিণত হইয়া প্রাকৃত ভাষার এবং তদীয় বর্ণমালার উৎপত্তি করিয়াছে।

দেশভেদে প্রাকৃত ভাষার স্বরূপ ও সংজ্ঞা বিভিন্নরূপ হইয়াছে। যথা শৌরসেনী, মাগধী, কর্ণাটী, মহারাষ্ট্রীয় ইত্যাদি। যাহা হউক কঠিন সংস্কৃত বর্ণকে কোমল করিয়া উচ্চারণ করাতে প্রাকৃতিক বর্ণমালার অক্ষরসংখ্যার অনেক ন্যূনতা হইয়াছে, যথা—ইহাতে ঋ, ঌ, ঐ, ঔ এই চারটী স্বরের ব্যবহার একবারে দৃষ্ট হয় না। ব্যঞ্জনের মধ্যে ঙ, ঞ; ন, য শ, ষ, ইহাদের এবং এতৎসংযুক্ত বর্ণের ব্যবহারও প্রাকৃত ভাষায় হইতে পারে না। ইহাতে ন স্থলে ণ, য স্থালে জ, শ, ষ স্থানে স ব্যবহৃত হয়।*

প্রাকৃতিক বর্ণমালায় ভিন্নরূপ বর্ণদ্বয়ের সংযোগ দৃষ্ট হয় না, অর্থাৎ ইহাতে ক্ক, ব্দ, ষ্ট্র জ্ঞ ড্ড প্রভৃতি সংযুক্ত বর্ণ দেখা যায় না। ইহাতে কেবল একরূপ বর্ণের সংযোগই দৃষ্ট হয়। যথা—ক্ক, চ্চ, স্ম, প্প, স্স, ব্ব ইত্যাদি। এ স্থলে ইহাও বক্তব্য যে প্রাকৃত ভাষায় যত গুলি সংযুক্ত বর্ণ আছে সমুদয়ই দ্বিবর্ণনিষ্পন্ন। ইহাতে তিন বা ততোধিক বর্ণের সংযোগ দৃষ্ট হয় না।

প্রাকৃত ভাষায় অনুস্বার ভিন্ন অপর কোন চিহ্নেরই ব্যবহার নাই। স্থলবিশেষে ইহাতে বিসর্গের স্থানে "ও" লেখা হয় মাত্র।

পূর্ব্বোক্ত বাক্য দ্বারা ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, প্রাকৃতের বর্ণসংখ্যা সংস্কৃত অপেক্ষা অনেক ন্যূন; ইহাতে ক, খ, গ, চ, ছ, জ, ঝ প্রভৃতি যে কয়টী বর্ণও আছে, অনেক স্থলে তাহাদের আবার সকলটির ব্যবহার হয় না। কারণ ইহাতে 'মুকুল' শব্দ স্থলে 'মুউল' 'মুখ'

---

* "নোণঃ সর্ব্বত্র" "আদের্য্যোজঃ" "শষোঃ সঃ" ইত্যাদি প্রাকৃতপ্রকাশ দেখ।

যদ্যপি প্রাকৃত প্রকাশকার বররুচি বলিয়াছেন প্রাকৃতে 'ঋ ণ বর্ণোঃ ন স্তঃ' কেবল ঋণ বর্ণ নাই তথাপি "ঐৎ এৎ" "ঔৎ ওৎ" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা প্রাকৃতে ঐ ও ঔ কারের ব্যবহার নিষিদ্ধ হইয়াছে।

স্থলে 'মুহ' 'আগার' স্থানে আআর, সূচী স্থানে সূঈ এইরূপ লেখা হয়। প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণে এইরূপ লিখিবার নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়াছে।*

এই প্রাকৃত হইতেই বাঙ্গালা হিন্দী প্রভৃতি দেশী ভাষা সকল উৎপন্ন হইয়াছে। যদ্যপি এই সকল ভাষার বর্ত্তমান অবস্থা দেশ কাল পাত্রভেদে ভিন্নরূপে পরিপুষ্টিলাভ করিয়াছে, কিন্তু ইহাদের বাল্যাবস্থা দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে ইহারা এক প্রাকৃতরূপ মূল প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন। কারণ তৎতৎকালের হিন্দী এবং বঙ্গভাষার আকারগত অনেক সাদৃশ্য ছিল এবং তাহাতে প্রাকৃতের চিহ্ন অনেক পরিমাণে লক্ষিত হইত। হিন্দী প্রভৃতি ভাষা অদ্যাপি অধিকপরিমাণে সেই বাল্যকালের প্রাকৃতভাব ধারণ করিতেছে। এই সকল ভাষায় অদ্যাপি ন্ত, ন্দ, ম্প, প্রভৃতি বর্গের পঞ্চমবর্ণসংযুক্ত বর্ণস্থলে প্রাকৃতের নিয়ম অনুসরণ করা হয়। প্রাকৃতে এইরূপ স্থলে ং পূর্ব্বে দিয়া লেখা হয়, যথা—দন্ত স্থলে দংত ইত্যাদি কিন্তু আজ কালকার বঙ্গভাষা "বাঁশ অপেক্ষা কঞ্চী শক্ত" হইয়াছে। ইহাতে অনেক স্থলে প্রাকৃতের অনুযায়ী উচ্চারণ অবস্থান করিলেও লেখনপদ্ধতি প্রাকৃতকে তুচ্ছ করিয়া সংস্কৃতানুরূপ রূপ ধারণ করিয়াছে। আমরা যদিও উচ্চারণ করিবার সময় কাজ, দ্দার, বিস্‌সাস কৃশ্ন বা কৃস্ন ইত্যাদি রূপ উচ্চারণ করি কিন্তু লিখিবার সময় কার্য, দ্বার, বিশ্বাস, কৃষ্ণ এইরূপ লিখি, এরূপ না লিখিলে সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তাও মূর্খ হন। সুতরাং এক্ষণে বাঙ্গালা বর্ণমালা প্রায় সংস্কৃতের ন্যায় বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে।

আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে বাঙ্গালাভাষার উন্নতি প্রার্থনা করি, কিন্তু বাঙ্গালা বর্ণমালার বিস্তার আমাদের অল্পমাত্রও অভীপ্সিত নয়। কারণ বর্ণমালার বিস্তারের সহিত মুদ্রণ (ছাপা) বিষয়ে প্রায়াস এবং ব্যয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে মুদ্রণব্যয় অনুসারে পুস্তকের মূল্য বর্দ্ধিত হয়। পুস্তকের মূল্যাধিক্যই সাধারণের জ্ঞানলাভের প্রতি একটি মহৎ অন্তরায়। এই নিমিত্ত আমরা বাঙ্গালা বর্ণমালার সেইরূপ সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলাম, যাহাতে পুস্তক মুদ্রণসম্বন্ধে ব্যয় এবং আয়াসের লাঘব হয়, অথচ ভাষার উচ্চারণাদি সম্বন্ধে কোন ক্ষতি না হয়, এবং বিদেশীয় ও অস্মদ্দেশীয় প্রথম শিক্ষার্থীরা সহজে বর্ণপরিচয় করিতে পারেন।

এক্ষণে অভীপ্সিত সংস্কারের সহিত প্রথমে বাঙ্গালার বর্ত্তমান বর্ণমালার স্বরূপ নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

এ স্থলে ইহাও বলা যাইতেছে আমরা যে সকল সংস্কার করিব তাহা কেবল বাঙ্গালা ভাষার নিমিত্ত। যাঁহারা সংস্কৃত

* "ক গ চ জ ত দ প যবাং প্রায়োলোপঃ" "খ ঘ ধ ভাং হঃ" ইত্যাদি সূত্র দেখ।

ভাষা শিক্ষা করিবেন তাঁহাদিগের সংস্কৃত অক্ষর লিখিতে ও পড়িতে শিক্ষা করা উচিত। কারণ তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প সুতরাং তাঁহাদের জন্য অধিক লোকের ক্ষতি সহ্য করা উচিত হয় না।

*   *   *

স্বরবর্ণ—

সংস্কৃতে যে একশত বত্রিশ প্রকার স্বরভেদ দেখান হইয়াছে, তন্মধ্যে সাধারণতঃ কেবল হ্রস্ব এবং দীর্ঘ এই উভয় ভেদে স্বরের আকারভেদ লক্ষিত হয়। অবস্থান অনুসারে উচ্চারণবৈলক্ষণ্য হওয়ায় অপর ভেদ গুলি উৎপন্ন হইয়াছে। পরন্তু সানুনাসিক ভেদের উচ্চারণবৈলক্ষণ্য আবার অনেক প্রাচীন কাল হইতে উঠিয়া গিয়াছে। নাগোজীভট্ট বলেন "প্রতিজ্ঞানুনাসিক্যাঃ পাণিনীয়াঃ।" পাণিনীর শিষ্যেরা কেবল পরম্পরা প্রবাদ অনুসারে সানুনাসিক এবং নিরনুনাসিক ভেদজ্ঞানে সমর্থ হন উচ্চারণ দ্বারা নহে। যাহা হৌক ক্রমশঃ কালবশে উচ্চারণ জন্য ভেদের লোপ হওয়ায় দেশীবর্ণমালাসমূহে স্বরের হ্রস্ব দীর্ঘ এই দুইটি ভেদ মাত্র ব্যবহৃত হয়।

বাঙ্গালা বর্ণমালায় সচরাচর—

অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৠ, ঌ, ৡ, এ, ঐ, ও, ঔ, এই চতুর্দ্দশ স্বরের ব্যবহার হয়। এক্ষণে বক্তব্য এই যে সংস্কৃত ভাষায় ৡ কারের ব্যবহার নাই বলিয়া সিদ্ধান্তকৌমুদীকার স্বরভেদ গণনার সময় কখন ৡ কারকে পরিত্যাগ করিয়াছেন তখন আমরা বাঙ্গালার ৠ, ঌ, ৡ, এই তিনের কুত্রাপি ব্যবহার না দেখিয়া এই তিনটীকে অনায়াসে বর্ণমালা হইতে বিদায় দিতে পারি। এই তিনটীকে বর্ণমালা হইতে বিদায় দিলে বাঙ্গালা স্বরবর্ণ চতুর্দ্দশ না হইয়া একাদশ হইল। যথা—

অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, এ, ঐ, ও, ঔ।

ইহাদের মধ্যে 'অ' যখন কোন ব্যঞ্জন বর্ণের সহিত যুক্ত থাকে তখন উহা সেই ব্যঞ্জনবর্ণের আকারে অলক্ষিত রূপে মিশ্রিত হয়। অপরগুলি ব্যঞ্জন সংযোগে সেরূপ হয় না, তাহারা তখন যথাক্রমে নিম্নলিখিত আকার ধারণ করে। যথা—

া, ি, ী, ু, ূ, ৃ, ে, ৈ, ো, ৌ, এই দশটী।

আমাদের বর্ণমালা সংস্কারের প্রধান উদ্দেশ্য মুদ্রাঙ্কণের সৌলভ্যসাধন। অর্থাৎ ভাষার উচ্চারণের কোন হানি না হয় অথচ মুদ্রাঙ্কণের সৌলভ্য হয় ইহাই আমাদের অভিপ্রেত। এক্ষণে দেখা যাউক পূর্ব্বোক্ত একবিংশতি প্রকার স্বরাকারের মধ্যে কিছু লাঘব করা যায় কি না। আমরা দেখিতেছি 'অ' এর সহিত 'া' যোগ করিলে 'আ' হয় এবং 'ে' র সহিত 'া' র যোগ করিলে 'ো' হয় সুতরাং মুদ্রাকারেরা এই দুইটী বর্ণকে অনায়াসে পরিত্যাগ করিতে পারেন। এবং 'ো' কে তাঁহারা সর্ব্বদাই ঐরূপে লিখিয়া থাকেন তবে 'আ' একটি স্বতন্ত্র বর্ণ রক্ষা করেন বটে। এই দুইটী ভেদ

উঠাইয়া দিলে আমাদের স্বরাকার কেবল ঊনবিংশ প্রকার থাকে। যথা—

অ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, এ, ও, ঐ, ঔ,—১০

া, ি, ী, ু, ূ, ৃ, ে, ৈ, ৌ,* — ৯

আবার দেখ যদি ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, এ, ও, ঐ, ঔ, ইহাদিগকে যথাক্রমে অি, অী, অু, অূ, অে অো, অৈ, অৌ, এইরূপ করিয়া লেখা যায়, তাহা হইলে আপাতত দেখিতে কিছু কেমন কেমন ঠেকে মাত্র, আসলে কিছুই হানি হয় না। ওদিকে কম্পোজিটর এবং ডিষ্ট্রিব্যুটরদিগের অনেক সুবিধা হয়, প্রেসের অধিকারীরও ঐ সকল অক্ষর ক্রয় করিতে হয় না এবং উহাদের স্থাপনের নিমিত্ত কেসবক্স অর্থাৎ অক্ষরাধারের কোষ্ঠ বাড়াইতে হয় না। মনোনিবেশ পূর্ব্বক দেখিলে বরং ইহা জানিতে পারা যায় যে পূর্ব্বে 'ই' প্রভৃতির আকার 'অি' 'অী' ইত্যাদি রূপ ছিল, কালবশে পরিবর্ত্তন লাভ করিয়া 'অি' ই এবং 'অী' ঈ হইয়াছে, কারণ অদ্যাপি আমরা অনেক নাগরাক্ষরে লিখিত পুস্তকাদিতে 'ও' স্থলে 'অো', ঔ স্থলে 'অৌ' এবং ঋ স্থলে 'অৃ' লিখিতে দেখি। হিন্দীভাষায় সচরাচর 'ঔর' এই কথাটী ত 'অৌর' এই রকমে লিখিত হয়।

যাহা হৌক প্রস্তাবিত পদ্ধতি অবলম্বন করিলে আমাদের স্বরাকারের ভেদ কেবল দশটী থাকে। যথা—

অ, া, ি, ী, ু, ূ, ৃ, ে, ৈ, ৌ,—১০

অর্থাৎ প্রেসওয়ালাদিগের এই দশটীর অধিক স্বর রাখিতে হয় না। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে সচরাচর মুদ্রাকারেরা শব্দের আদি, মধ্য, এবং অন্তে ব্যবহার করিবার নিমিত্ত া, ি, প্রভৃতি 'সমাত্রিক' এবং 'নির্ম্মাত্রিক' এই দুই ভেদ রক্ষা করেন। যথা া, া, ি, ি, ইত্যাদি রূপ। কিন্তু আমরা এরূপ প্রভেদের কোন উপযোগিতা বিবেচনা করি না কারণ দধি' এই কথাটিকে যদি দধি' এই রকমে লেখা যায় তাহা হইলে কিছুই হানি লক্ষিত হয় না, তবে অল্পমাত্র শোভার জন্য আমরা এতগুলি বিভিন্নতা রাখিব কেন?

ব্যঞ্জন বর্ণ—

বাঙ্গালা বর্ণ মালায়—

ক, খ, গ, ঘ, ঙ। চ, ছ, জ, ঝ, ঞ। ট, ঠ, ড, ঢ, ণ। ত, থ, দ, ধ, ন। প, ফ, ব, ভ, ম। য, র, ল, ব, শ, ষ, স হ। এই তেত্রিশটি এবং ৎ, ড়, ঢ়, য়, এই চারটী ত, ড, ঢ, য, এর প্রকার ভেদে সর্ব্বশুদ্ধ সপ্তত্রিংশৎ অর্থাৎ সাঁইত্রিশটি অমিশ্র ব্যঞ্জনবর্ণ লক্ষিত হয়। পূর্ব্বে এই অমিশ্র ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত 'ক্ষ' এই অক্ষরটি লিখিত হইত। কিন্তু এক্ষণে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়া দিয়াছেন যে উহা একটি সংযুক্তবর্ণ। এখনকার বর্ণমালা

* যদ্যপি মুদ্রাকারদিগের 'ৌ' এরূপ একটি অক্ষর নাই তাঁহারা এস্থলে 'ে' র সহিত ী র যোগ করেন ী র অনুরোধে আমরা 'ৗ' যুক্ত করিয়া লিখিলাম।

গ্রন্থে উহা সংযুক্তবর্ণের সহিত লিখিত হয়।

বাঙ্গালা বর্ণমালায় ং, ঃ, ঁ, এই তিনটি চিহ্ন অতি প্রাচীন কাল অবধি নিবেশিত হইয়া আসিতেছে। ইহাদের স্বতন্ত্র রূপে ব্যবহার নাই, অপর বর্ণের সহিত সর্ব্বদাই সংযুক্ত থাকে। কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রের অধিকারীরা এই তিনটি চিহ্নকে স্বতন্ত্র রূপে রাখিয়া থাকেন। তবে এক্ষণে অনেক চন্দ্রবিন্দুযুক্ত অক্ষরও প্রস্তুত হইয়াছে।

সংযুক্তবর্ণ—

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ব্যঞ্জনবর্ণ-স্বরের সাহায্য ব্যতীত উচ্চারিত হইতে পারে না, অতএব ব্যঞ্জন বর্ণের উচ্চারণের নিমিত্ত কোন না কোন প্রকার স্বরের সাহায্য আবশ্যক করে। অতএব পূর্ব্বোক্ত একাদশবিধ স্বরের সংযোগে, সাঁইত্রিশটি ব্যঞ্জনবর্ণের চারি শত সাত চল্লিশ (৪৪৭) ভেদ হয়। এতদ্ভিন্ন—

হলোঽনন্তরাঃ সংযোগাঃ। ১। ১। ৭।

এই সূত্রানুসারে অচ্ রহিত ব্যঞ্জনবর্ণ সংযুক্ত হয়। যেখানে দুই বা ততোধিক ব্যঞ্জনবর্ণ একত্র হয় এবং তাহাদের মধ্যে এক বা ততোধিক ব্যঞ্জনবর্ণে অচের যোগ না থাকে তাহা হইলে অচ্‌রহিত ব্যঞ্জনবর্ণ সকল অচ্‌যুক্ত পরবর্ত্তী ব্যঞ্জন বর্ণের সহিত সংযুক্ত হয়। কারণ একটি পারিভাষিক সূত্র আছে যে "অজ্ঝীনং পরেণ" অচ্ রহিত ব্যঞ্জন অচ্‌যুক্ত পরবর্ত্তী ব্যঞ্জনের সহিতই যুক্ত হয় পূর্ব্বের সহিত নয়। এই সূত্রানুসারে সংযুক্ত অক্ষর অসংখ্য হইতে পারে বটে কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় ক্ল, গ্ল, প্ল, ম্ল, ল্ল, শ্ল, হ্ল ল্ক, ল্গ, স্ল,—এই ১০টি ল সংযুক্তবর্ণ গ্ন, হ্ন, ত্ন, ন্ন, ঘ্ন, হ্ন, শ্ন, এবং ন্ত, ন্থ, ন্দ, ন্ধ— এই ১১টি ন সংযুক্তবর্ণ ক্ম, গ্ম, ঙ্ম, ট্ম, ণ্ম, ত্ম, দ্ম, ধ্ম, ন্ম, স্ম, ল্ম, ক্ষ্ম শ্ম, ষ্ম, স্ম হ্ম, এবং ম্প, ম্ফ, ম্ব, ম্ভ, এই ২৪টী ম সংযুক্তবর্ণ ঙ্ক, ঙ্খ, ঙ্গ, ঙ্ঘ, ঙ্ক্ষ এই পাঁচটি ঙ সংযুক্তবর্ণ ঞ্চ, ঞ্ছ, ঞ্জ, ঞ্ঝ, জ্ঞ, জ্ঞ, এই ৬টি ঞ সংযুক্ত বর্ণ, ণ্ণ, ষ্ণ, হ্ণ, ক্ষ্ণ, গ্ণ, ঘ্ণ, ণ্ট, ণ্ঠ, ণ্ড, এই ৯টী ণ সংযুক্ত-বর্ণ।

স্ক, স্খ, স্ত, স্থ, স্প, স্ফ	এই ৬টী স সংযুক্তবর্ণ
ষ্ক, ষ্ট, ষ্ঠ, ষ্প, ষ্ফ,	এই ৫টী ষ সংযুক্তবর্ণ
শ্চ, শ্ছ,	এই ২টী শ সংযুক্তবর্ণ
দ্গ, দ্ঘ, দ্দ, দ্ভ, দ্ধ,	এই ৫টী দ সংযুক্তবর্ণ
গ্গ, গ্ধ,	এই ২টী গ যুক্তবর্ণ
ক্ষ, ক্ক, ক্ত,	এই ৩টী ক যুক্তবর্ণ
চ্চ, চ্ছ	ঐ ২টী চ যুক্তবর্ণ
জ্জ, জ্ঝ, জ্জ	এই তিনটী জ সংযুক্ত
ট্ট	এই ১টী ট সংযুক্ত
ত্ত	ঐ ঐ ত সংযুক্ত
থ্থ	ঐ ঐ থ সংযুক্ত
ড্ডা	ঐ ঐ ড সংযুক্ত

এই তিরানব্বাই টী সংযুক্তবর্ণের ব্যবহার হয় মাত্র। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে আমরা একস্থলে যে অক্ষরটীর গণনা করিয়াছি অপর স্থলে তাহাদিগের গণনা করি নাই, যেমন ম্ম ইহাকে 'ম' সংযুক্তের সময় গণনা করিয়াছি এই জন্য ঙ

সংযুক্তের সময় গণনা করি নাই। আমরা 'য' সংযুক্ত অক্ষরের এখানে গণনা করি নাই কারণ প্রকরণে তাহার রূপ দেখান যাইবে। বাঙ্গালাতে 'ত্‌প,' 'ত্‌ক,' ইত্যাদি ত কার সংযুক্ত অক্ষর আছে কিন্তু তাহারা সংযুক্ত রূপে লেখা হয় না, 'ৎক', 'ৎপ', এই রূপ লেখা হয়। (ৎ) খণ্ড ত কে যখন আমরা স্বতন্ত্র বর্ণ বলিয়া গণনা করিয়াছি তখন 'ৎক' কে সংযুক্ত বর্ণের মধ্যে গণনা করা উচিত বিবেচনা করিলাম না। উপরে যে সকল সংযুক্ত বর্ণ কথিত হইল তদ্ব্যতীত যদি দুই একটি সংযুক্ত বর্ণ বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহৃত হয় তবে ইংরাজী কথায় লিখিত অন্য রূপ সংযুক্ত বর্ণেরও ব্যবহার হইতে পারে। যাহাহউক সংযুক্ত অক্ষরের সংখ্যা ১০০ একশতই রাখা গেল। ইহাদিগের উচ্চারণও স্বরের সাহায্য অপেক্ষা করে, এই নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত একাদশ বিধ স্বর সংযোগে সংযুক্তবর্ণ (১০০ × ১১) একাদশ শত (১১০০) প্রকার হয়।

ফলা—

যে সকলবর্ণ স্বাভাবিক আকার পরিত্যাগ করিয়া বিশেষ আকার ও উচ্চারণের সহিত অপর বর্ণের নীচে বা উপরে সংযুক্ত হয় তাহাদিগের নাম ফলা। প্রাচীন কাল হইতে বাঙ্গালা ব্যাকরণে নিম্নলিখিত কয়টি ফলা নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

্য, ্র, ্ন, ্ব, ্ম, ্ল, ৃ, ৯, ´, এই নয়টী

ইহাদের মধ্যে ৯ কারের ব্যবহার বাঙ্গালায় নাই ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। 'ৃ' কে আমরা স্বরের মধ্যে গণনা করিয়াছি। ল, ন, ম, ইহারা যে সকল বর্ণে সংযুক্ত হয়, তাহাও সংযুক্ত বর্ণ গণনার সময় দেখান গিয়াছে। আমাদের মতে এই তিনটিকে 'ফলা' বলা উচিত নয়, যেহেতু অন্য বর্ণ সংযোগের সময় ইহাদের আকার কিছু বৈলক্ষণ্য-প্রাপ্ত হয় না, এবং 'ল' ও 'ন' ফলার উচ্চারণেরও বৈলক্ষণ্য, নাই। তবে 'ম' ফলার উচ্চারণটা আমাদের হয় না বটে; আমরা 'পদ্ম'কে 'পদ্দ' 'লক্ষ্মী'কে লক্ষী 'লক্ষ্মণ'কে 'লক্ষঁণ' 'শ্মশান'কে সশান উচ্চারণ করি। যাহাহউক অবশিষ্ট ্য, ্ব, ্র, ´, এই চারটি ফলাযুক্ত যে কটি অক্ষর বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহৃত হয় দেখান যাইতেছে।

্য = ক্য, খ্য, গ্য, ঘ্য, চ্য, ছ্য, জ্য, ট্য, ঠ্য, ঢ্য ণ্য, ত্য, থ্য, দ্য, ধ্য, ন্য, প্য, ফ্য, ব্য, ভ্য ম্য, ল্য, শ্য, ষ্য, স্য, হ্য। ঙ্গ্য ক্ষ্য স্থ্য, র্ম্য, র্য্য, র্য্য, র্দ্য, র্ণ্য, ন্দ্য, ন্ধ্য। এই (৩৬) ষট্‌ত্রিংশৎ এবং যথাযোগ্য স্বর সংযোগে ইহাদের আরও কতগুলি ভেদ।*

্ব = ক্ব, জ্ব, ত্ব, দ্ব, ধ্ব, ন্ব, য্ব, শ্ব, স্ব। চ্ছ্ব, জ্জ্ব, ত্ত্ব, দ্ব, ন্ধ্ব, র্শ্ব, ক্ষ্ব এই (১৬) এই

* সমুদয় ফলাযুক্তবর্ণে কিছু সকলগুলি স্বরের যোগ হয় না, কোন স্থলে, কোনটির। সুতরাং বাঙ্গালা ভাষায় স্বরসংযুক্ত ফলা নির্দ্ধার করা কঠিন।

ষোডশ এবং যথাযোগ্য স্বর সংযোগে ইহাদেব আবও কতকগুলি ভেদ।

্র, ক্র, গ্র, ঘ্র, জ্র, ত্র, দ্র, ধ্র, প্র, ব্র, ভ্র, ম্র, শ্র, স্র, হ্র, ক্ষ্র, জ্জ্র, ন্ত্র, ন্দ্র, ন্ধ্র, স্প্র, ম্ব্র, স্ত্র, ষ্প্র, ষ্ট্র, চ্ছ্র এই (২৫) এই পঞ্চবিংশতি এবং যথা যোগ্য স্বর সংযোগে ইহাদেব আবও কতগুলি ভেদ।

র্ = র্ক, র্গ, র্ঘ, র্চ, র্ছ, র্জ্জ, র্ত্ত, র্থ, র্দ, র্দ্ধ, র্ণ, র্প, র্ব্ব, র্ত্ত, র্ভ, র্ম্ম, র্য্য। এই (১৭) এবং ইহাদেব যথাযোগ্য স্বর সংযোগে ভেদ।

এক্ষণে দেখা যাউক এইসকল ভেদেব মধ্যে কিরূপ সংস্কাব হইতে পাবে। ঙ = বঙ্গভাষায 'ঙ' ব পৃথক্‌রূপে ব্যবহার নাই অর্থাৎ ইহাতে এরূপ একটি কথা নাই যাহাতে ঙ স্বতন্ত্র রূপে অবস্থান করে। কেবল ঙ্ক, ঙ্খ, ঙ্গ, ঙ্ক্ষ, ঙ্ঘ, এই ছয়টি অক্ষব 'ঙ' যুক্ত ব্যবহৃত হয়। এক্ষণে যদি এই ছুইটি অক্ষরেব উচ্চারণ ঠিক্ রেখে আমবা অন্যরূপে লিখিতে পাবি তবে পঞ্চমবর্ষীয় বঙ্গবালকের বিষম ভীতিব স্থান, বর্গীদিগের মত বৃহৎ উষ্ণীষধাবী এই অক্ষবটীকে হাস্যমুখে বর্ণমালা হইতে বিদায দিতে পারি।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বাঙ্গালা ভাষা প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন। প্রাকৃত ভাষায় উপরে বর্গেব পঞ্চমবর্ণ সংযুক্ত কোন বিজাতীয় বর্ণ নাই। ইহাতে গ্ন এবং স্ন ভিন্ন উপবে বর্গের পঞ্চমবর্ণ সংযুক্ত অক্ষর স্থলে পূর্ব্বে অনুস্বার দিয়া সেই বর্ণ অসংযুক্ত রূপে লেখা হয়। যেমন 'পর্য্যঙ্ক' স্থলে পর্য্যংক, 'পঞ্চ' পংচ 'কণ্ঠ' স্থলে কংঠ। প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন হিন্দী প্রভৃতি অপব ভাষাযও ঐ নিয়ম অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। কারণ ওরূপ লিখিলে ভাষাব কোন ক্ষতি নাই, অথচ উচ্চাবণানুরূপ লেখা হয়। হাঁ ওরূপ লিখিলে সংস্কৃত শিক্ষার্থীদিগের কিছু উপকাব হয় বটে, কিন্তু সংস্কৃত শিক্ষার্থীব সংখ্যা অতি অল্প এবং তাঁহাদেব জন্য মহর্ষি পাণিনী "অনুস্বারস্য যাষপব সবর্ণঃ" এই সূত্র কবিয়াছেন। আব আমরা পূর্ব্বেই বলিযাছি সংস্কৃত বর্ণমালা স্বতন্ত্র হওয়া উচিত। বাঙ্গালাকে সংস্কৃতানুরূপ কবিলে অধিক লোকেব বৃথা ক্ষতি সহ্য কবিতে হয় মাত্র।

আমাদেব সিদ্ধান্তানুসাবে যদি 'ঙ' প্রভৃতি বর্গেব পঞ্চমবর্ণ দ্বারা উপরে সংযুক্তবর্ণ গুলিকে পূর্ব্ববর্ণে অনুস্বার যোগ করিয়া লেখা হয়, তবে ঙ্ক, ঙ্খ, ঙ্গ, ঙ্ঘ, ঙ্ক্ষ, ঞ্চ, ঞ্ছ, ঞ্জ, ঞ্ঝ, ণ্ট, ণ্ঠ, ণ্ড, ণ্ঢ, ন্ত, ন্থ, ন্দ, ন্ধ,। ম্প, ম্ফ, ম্ব, ম্ভ, এই দ্বাবিংশতি বর্ণ এবং তাহাদেব স্বর এবং ফলাযুক্ত ভেদ সকলকে অনায়াসে বিদায় দেওয়া যায়।

কেহ আশঙ্কা কবিতে পাবেন 'দন্ত'কে 'দংত' 'লম্ফ' কে 'লংফ' ইত্যাদি রূপ লিখিলে উচ্চাবণভেদ হইতে পারে। এ কথা আমরাও স্বীকার করি, কিন্তু 'দংত' এইরূপ লিখিলে যেরূপ উচ্চারণ হয় মনুষ্যের প্রকৃত উচ্চারণ সেইরূপ, 'দন্ত' এরূপ সংস্কৃত উচ্চারণ মাত্র।

বৈদিকমন্ত্রে ঐরূপ স্থলে অনুস্বর দিয়া লেখা হয়। আর প্রাকৃত এবং হিন্দী প্রভৃতিতেও পূর্ব্ব বর্ণে অনুস্বর যোগ করিয়া লেখাতে উচ্চারণের কিছু বৈলক্ষণ্য প্রতীত হয় না। এবং অদ্যাপি অনেক বাঙ্গালা পুস্তকে'অসংখ্য''সংপ্রতি' 'সংবৎ' এইরূপ লেখা হয়, কিন্তু উচ্চারণের ত কোন বৈলক্ষণ্য শুনা যায় না। তবে এ বিষয় যাঁহারা নৈসর্গিক নিয়মের উপর দৃষ্টি না করিয়া সংস্কৃতের অনুসরণে দৃঢ় থাকিবেন, তাঁহারা আমাদিগের পরে অপর সংযুক্ত বর্ণস্থলে যে নিয়ম করিয়াছি এখানে তাহার অনুসরণ করিবেন। অর্থাৎ ন, ম, প্রভৃতির নীচে (্) হসন্ত যুক্ত করিয়া দিবেন। যথা 'দন্ত' ইহাকে 'দন্‌ত' এইরূপে লিখিবেন।

* * *

ঞ—উপরি লিখিত নিয়ম অবলম্বন করিয়া আমরা 'ঞ' কেও একবারে পরিত্যাগ করিতে পারিতাম। বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ একটি কথা নাই যাহাতে 'ঞ' পৃথক্‌রূপে ব্যবহৃত হয়। উপরে ঞ সংযুক্ত ঞ্চ প্রভৃতি স্থলে পূর্ব্বোক্ত প্রাকৃতের নিয়ম অবলম্বনে ইহা দূরীকৃত হইল বটে, কিন্তু বাঙ্গালাভাষায় একটী কথা আছে যাহা নীচে 'ঞ' দ্বারা সংযুক্ত। সে কথাটী 'যাজ্ঞা' বাঙ্গালীদিগের একমাত্র ভরসাস্থান। অম্লানমুখে দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করিতে এমন আর কোন জাতিই নাই। সুতরাং 'ঞ' টীকে রাখিতে হইতেছে। 'যাজ্ঞা' উঠান অপেক্ষা বাঙ্গালাভাষার লোপ করাও সহজ।*

রঘুনাথ গুরুমহাশয়ের নিকট যে কটী প্রশ্ন করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে অপর গুলির উত্তর আমরা বুঝি না বুঝি, মৌখিক দিতে পারি; কিন্তু বাঙ্গালায় যে দুটা ব কেন ইহার উত্তর আমরা দিতে পারি না। ইহা দ্বারা আমরা এ কথা বলি না যে দুটা "ব" একই; সংস্কৃতে ইহাদের আকার এবং উচ্চারণ ভিন্ন আছে। যথা ন ন। কিন্তু বাঙ্গালায় এ দুইএর কিছুই নাই অধিকন্তু বাঙ্গালায ্ব ফলা একটি স্বতন্ত্র অক্ষর রহিয়াছে, যাহা উচ্চারিত হোক না হোক দ্বিতীয় 'ব' ব সংযোগ স্থলে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অতএব বর্ণমালার মধ্যে কেবল একটি 'ব' রাখিলে আমরা কিছুই হানি দেখিতে পাই না।

সংযুক্ত বর্ণ। বাঙ্গালা সংযুক্তবর্ণগুলি অতি ভয়ঙ্করাকৃতি। বর্ণপরিচয়ের সংযুক্ত বর্ণ বিষয়ক পত্রগুলি দেখিলে বোধ হয় যেন "কুস্তির আখড়া" একটার উপর আর একটা চড়াই করে বসেছে। এই রূপ বিলাতি কুলুপের মত নানা প্রকার পেঁচদার সংযুক্ত বর্ণ গুলির গুণেই বিদে-

* 'জ্ঞ' এই অক্ষরটি জ এর নীচে ঞর যোগে সম্পন্ন হইয়াছে বটে। কিন্তু এ তত্ত্ব আমরা সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়ে। বাঙ্গালায় ইহার আকার ও উচ্চারণে ইহাতে যে ঞর সম্পর্ক আছে তাহা ত বোধ হয় না।

শীয়েরা বঙ্গভাষা শিখিতে অগ্রসর হন না। বিদেশীয় কেন, এ গুলির ভয়ে দেশীয় কত ছেলে যে পীড়িত হইয়া পাঠশালা কামাই করে তাহা বলা যায় না। বাস্তবিক 'হ্ন' 'হ্ব' প্রভৃতি অক্ষরগুলিকে বাল্যকালে মহিষাসুরের ন্যায় ভয়ঙ্কর বোধ হইত। অতএব এ গুলির বিশেষ রূপ সংস্কার করা উচিত।

অচ সংযুক্ত। প্রেসওয়ালারা প্রায় অচ সংযুক্ত বর্ণ স্বতন্ত্ররূপে রক্ষা করেন না। ইহারা অক্ষর বিন্যাসের সময় অচের যোগ করিয়া দেন। তবে এক্ষণে দুই একটি অচযুক্ত বর্ণ প্রস্তুত হইতেছে বটে। যাহা হৌক অচসংযুক্ত বর্ণের মধ্যে এই কয়টি বর্ণ পৃথক্‌রূপে রক্ষিত হয় এবং ইহাদিগের আকারও কিছু অস্বাভাবিক। যথা গু, রু, শু, হৃ, স্তু, ন্তু, প্রু, স্থ, শ্রু, শ্রূ, স্রু, ত্রু। ইহাদের এই অস্বাভাবিক প্রকৃতির নিমিত্ত শিক্ষক বা শিক্ষার্থী কেহই সুখী নহেন। ইহাদিগকে স্বাভাবিক রূপে লিখিলে কোন হানি হয় না বরং শিক্ষার সৌলভ্য হয়। এবং এই আটটি স্বাভাবিক হইলে কম্পোজিটরদিগের উপদ্রব অনেক কমিয়া যায়; তাঁহারা এখন অনেক স্থলে 'শু' স্থলে 'গু' লিখিয়া বসেন কিন্তু ইহারা স্বাভাবিক আকার প্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ শ্‌ু, গ্‌ু, এইরূপ হইলে তাদৃশ ভ্রমের সম্ভাবনা নাই।

ব্যঞ্জনসংযুক্ত। ব্যঞ্জন সংযুক্ত বর্ণ স্থলে আমরা এইরূপ একটি সাধারণ নিয়ম করিতে চাই যে সংযুক্ত বর্ণদ্বয়কে একত্র না লিখিয়া তাহাদের মধ্যে অচহীন বর্ণের নীচে যদি হসন্ত দিয়া লেখা যায় তাহা হইলে কোন হানি হয় না বরং বর্ণপরিচয়ের অনেক সৌকর্য্য উৎপন্ন হয়। থ, হ্ম, ইত্যাদি বর্ণ যে কিসে কিসে সংযুক্ত তাহা সহজে বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু আমাদের মতে যদ্যপি স্থানব্যয় হইবে বটে কিন্তু কোন রূপ ভ্রমের সম্ভাবনা থাকিবে না। কারণ আমাদের মতে 'বুদ্ধি' 'বুদ্‌ধি' একই। আর সংযুক্তবর্ণ যে একত্র করিয়া লিখিতে হইবে তাহার কোন বিধি নাই। পাণিনী বলিয়াছেন অচ দ্বারা অব্যবহিত হল বর্ণকে সংযুক্ত বলা যায়। এক্ষণে দেখ পূর্ব্বোক্ত একশত প্রকার সংযুক্তাক্ষর স্থলে ২২ শটীকে ত ও র সহিত বিদায় দিয়াছি। অবশিষ্ট ৭৮ টীর মধ্যে 'ক্ষ' 'জ্ঞ' এই দুইটি রক্ষা করিয়া অপর গুলি স্থলে যদি একত্রিশটী অর্দ্ধবর্ণ এবং একটি '্' হসন্ত চিহ্ন এই বত্রিশটি রাখা যায় তাহা হইলে উদ্দেশ্য সাধনের কোন ব্যাঘাত হয় না।

অনুস্বার, বিসর্গ এবং চন্দ্রবিন্দুযুক্ত বর্ণের মধ্যে অনুস্বার এবং বিসর্গ ত স্বতন্ত্র রূপেই যুক্ত হয় তবে চন্দ্রবিন্দু যুক্তস্থলে পূর্ব্বোক্ত অর্দ্ধ অক্ষরে চন্দ্রবিন্দু যোগ করিলে সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে। ফলাযুক্ত বর্ণ স্থলে এই নিয়ম অবলম্বন করিলে কোন হানি হয় না তবে '্র' ফলাযুক্ত কতকগুলি যে অস্বা-

ভাবিক আকৃতিবিশিষ্ট বর্ণ আছে তাহাদিগকে স্বাভাবিক করিয়া লইতে হয়। ক্র, ত্র, স্ত্র, স্র, ইহাদিগকে ক্‌র ত্‌র, স্ত্‌র, স্‌র এইরূপে লিখিতে হব এবং ' ্ব 'ফলা যুক্ত 'হ্ব' এই অক্ষরটিকে 'হ্ব' এইরূপ লেখায় কোন হানিই নাই প্রত্যুত শিক্ষার্থীদিগের বোধসৌকর্য্য সাধিত হয়। এ স্থলে ইহাও বাক্তব্য যে রফলা যুক্তবর্ণ যে দ্বিত্ব করিয়া লেখা হয় সে কেবল সংস্কৃতের নিয়মানুসারে, সংস্কৃতেও তাদৃশ দ্বিবিধির নিত্যতা নাই। যাহা হৌক ভাষায় ওরূপ দ্বিত্ব না লিখিয়া যদি একটি বর্ণের উপর রেফ দিয়া লেখা হয় অর্থাৎ 'কর্ম্ম' যদি 'কর্ম' এইরূপে লেখা হয় তাহা হইলে কিছুই হানি নাই।

পরিশিষ্ট

আমাদের সংস্কার দ্বারা পরিমার্জ্জিত হইলে এখনকার বিস্তৃত বাঙ্গালা বর্ণমালায় যে কয়েকটি অক্ষর থাকিলে কার্য্য চলিবে তাহা নীচে লিখিত হইতেছে।

স্বরবর্ণ

অ, া, ি, ী, ু, ূ, ৃ, ে, ৈ, ৌ, = ১০

ব্যঞ্জনবর্ণ

ক, খ, গ, ঘ। চ, ছ, জ, ঝ, ঞ। ট, ঠ, ড, ঢ, ণ। ত, থ, দ, ধ, ন। প, ফ, ব, ভ, ম। য, র, ল, শ, ষ, স, হ। এই একত্রিশ এবং এই একত্রিশটির অঙ্গীকার = মিলিত হইয়া = ৬২

(্) হসন্ত, (ং) অনুস্বার (ঃ) বিসর্গ এবং (ঁ) চন্দ্রবিন্দু এই পাঁচটি = ৫

ক্ষ, জ্ঞ = এই দুইটি = ২

ফলা

্য, ্র, ্ল, ্ব, ´ এই পাঁচটী ফলা = ৫

সর্ব্বশুদ্ধ ৮২টী অক্ষর রাখিলেই হয়। এক্ষণে দেখ, এদেশী বর্ণমালা সমূহের স্থানে রোমান বর্ণের ব্যবহারের কথা হইতেছে তাহাতেও ৭৮টী অক্ষর রাখিতে হয় ২৬টি ক্যাপিটল, ২৬টী স্মল, ২৬টী ইটলিক, আমাদের উল্লিখিত বাঙ্গালা অক্ষরের অপেক্ষা চারটি অক্ষর কম মাত্র।

কেহ বলিয়াছিলেন সংযুক্তবর্ণ লিখিবার সময় পূর্ব্বস্থিত ব্যঞ্জনবর্ণের নীচে (্) হসন্ত না দিয়া যদি পূর্ব্ববর্ণের পর অর্থাৎ সংযুক্ত বর্ণদ্বয়ের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র হাইফেন (-) দেওয়া হয় এবং তাহাকে সংযোগের চিহ্ন বলিয়া মানা যায়, তাহা হইলে কম্পোজিটর দিগের আরও সুবিধা হয়। একথা সত্য কিন্তু আমরা বর্ত্তমান সময়ে তাঁহার বাক্যের অনুমোদন করিতে পারিলাম না কারণ তাদৃশ রূপে লিখিতবর্ণকে সংযুক্ত বলিয়া বোধ করিতে কিছু কালসাপেক্ষ করিবে। সংযুক্ত স্থলে অক্ষর না থাকিলে এখনও পূর্ব্ববর্ণে (্) হসন্ত যোগ করিয়া লেখা হয় সুতরাং ইহা এক প্রকার স্বীকৃত পদ্ধতি।

মনুষ্যজাতির উন্নতি।

পৃথিবীতে কতকগুলি লোক আছেন তাঁহারা ভাবেন পৃথিবী ডুব্‌লো ডুব্‌লো ডুব্‌লো। ক্রমে মনুষ্য অধঃপাতে যাইতেছে। যতই দিন যাইতেছে ততই মানুষ খারাপ হইতেছে। মানুষে এখন পাপ বেশী করে, মিথ্যা কথা বেশী কয়। দুষ্কর্ম্মান্বিত বেশী। পাপের প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ রোজ রোজ দুর্ভিক্ষ হইতেছে, রোজ রোজ অনাবৃষ্টি, রোজ রোজ ম্যালেরিয়া। মানুষ অসুখী হইতেছে, রোগা হইতেছে, অল্পায়ু হইতেছে। মানুষের বুদ্ধিশক্তি কমিতেছে। বাপ ছেলেকে ভালবাসে না, ছেলে বাপের উপর ভক্তি করে না, ভয়ানক অরাজক, ভয়ানক উল্টা পাল্টা। ঘোর কলি, প্রলয় সন্নিকট।

আর একদল আছেন তাঁহারা বলেন, পৃথিবীর ক্রমশই উন্নতি হইতেছে। ক্রমে মনুষ্যের আয়ু বৃদ্ধি হইতেছে, বল বৃদ্ধি হইতেছে, জ্ঞান বৃদ্ধি হইতেছে, ধন বৃদ্ধি হইতেছে। ক্রমে জড়জগতের উপর মনুষ্যের আধিপত্য বিস্তার হইতেছে। মনুষ্যের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি হইতেছে। মনুষ্য ভাল বুঝিতেছে, ভাল খাইতেছে, ভাল পরিতেছে, ভাল কার্য্য করিতেছে, মনুষ্যের সকলই ভাল। আর এই সবে পৃথিবীর বাল্যাবস্থা ইহা হইতে অনেক উন্নতি হইবে, অনেক শ্রীবৃদ্ধি হইবে। মনুষ্য ত সৃষ্টির অধীশ্বর আছেই ক্রমে সৃষ্টির হাফ কর্ত্তা হইয়া দাঁড়াইবে।

এই দুরকম কথা আমরা প্রত্যহই শুনিতে পাই। নিত্যই দেখিতে পাই, কতক লোকে পৃথিবী ডুবাইতেছে আবার আর কতক লোকে পৃথিবী উদ্ধার করিতেছে। কেহ বলিতেছে কলির সন্ধ্যা, কেহ বলিতেছে সত্যযুগের আরম্ভ। কেহ নিরাশ সাগরে ডুবিতেছে ও আর পাঁচজনকে ডুবাইতে চাহিতেছে, কেহ ভরসায় নৃত্য করিতেছে ও সকলকে ভরসায় নাচাইয়া দিবার উদ্যোগ করিতেছে। দুর্ভাবনায় কাহারও মুখ চিন্তা-রেখায় অতি অঙ্কিত হইতেছে কাহারও গণ্ডদেশ লালের আভাযুক্ত হৃদয়গ্রাহী বর্ণ ধারণ করিতেছে।

পরের কথায় কাজ কি? আমরা নিজেই দেখিতে পাই এই সকাল বেলায় বোধ হইল, সব ভাল চলিতেছে বড় আনন্দ, আবার বৈকালে বোধ হইল সব মন্দ। আজ ভাবিলাম পৃথিবীতে পাপ অপেক্ষা পুণ্য দুঃখ অপেক্ষা সুখ অধিক, আবার খানিক পরেই ঠিক উল্টা ভাবিলাম।

এরূপ নিত্য বিরোধের অর্থ কি? কেন এ রূপ ঠিক বিপরীত প্রতীতি মনোমধ্যে উদয় হয়? কেনই বা কতক লোক একেবারে ডুব্‌লো ডুব্‌লো, আবার আর কতক উঠ্‌লো উঠ্‌লো বলে। শুধু বলি-

যাই ত ক্ষান্ত নয় তাহাদের মনোমধ্যে দৃঢ়সংস্কারই এই।—অনেকে এইরূপ সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া নানারূপ কষ্ট পায়। তাহাদের জীবনের প্রত্যেক দিনেই পূর্ব্বোক্ত রূপ সংস্কারের কার্য্য-কলাপ প্রকাশ পায়। প্রথম মনে হইতে পারে বৃদ্ধলোক "ডুবলোর" পোষক আর যুবকেরা "উন্নতির" পোষক। কিন্তু তাহা নহে, দুদলেই যুবাও আছেন বৃদ্ধও আছেন। বরং অনেক যুবা "ডুবলোর" অধিক পক্ষ।

এই পরস্পর বিরোধী মতদ্বয় শুনিলে প্রথম জিজ্ঞাস্য এই যে,কেন এত মতভেদ হয়,দ্বিতীয় এই যে এ দুইয়ের মধ্যে কোন টার কতটুকু সত্য। দুইই সম্পূর্ণ সত্য হইতে পারে না তবে একটা সত্য হউক। অধোগতিই সত্য হউক, পৃথিবীশুদ্ধ লোক ক্রমশঃ অধিক মিথ্যাবাদী হই-তেছে, অধিক চোর হইতেছে, অধিক আহাম্মুক হইতেছে, দুঃখী হইতেছে, অধিক কষ্টভোগ করিতেছে এই সত্য হউক। কিন্তু ইহাতে প্রত্যক্ষপ্রমাণবিরুদ্ধ গত শতাব্দীর লেখাপড়া তুলনা করিলে কি দেখা যায়? মিথ্যা কথার অবশ্য হিসাব নাই কিন্তু চুরি কমিতেছে, লোক অধিক সেয়ানা হইতেছে, দুঃখ হ্রাস হইতেছে, ধন বৃদ্ধি হইতেছে, এ সকল ত প্রত্যক্ষ লেখা পড়ার কথা, statistics এই বলে। অতএব ডুব্‌লো মত ঠিক নহে।

তবে কি উন্নতি মত ঠিক? পৃথিবী-শুদ্ধ লোক ধার্ম্মিক হইতেছে, ধনী হই-তেছে, কলহ নাই, বিবাদ নাই, সকলই উন্নত হইতেছে। সভ্যতাস্রোতে জগৎ ভাসিয়া যাইতেছে। এই মত কি সত্য? তা যদি সত্য হইত ত পৃথিবীই ত স্বর্গ, আর স্বর্গকামনায় কাজ কি? তাও নয়। সর্ব্বাঙ্গীণ সর্ব্বজাতীয় উন্নতি ঠিক নহে। প্রত্যক্ষপ্রমাণ,মুসলমানেরা ক্রমশঃই অধঃ-পাতে যাইতেছে। হিন্দুস্থানের মুসল-মানেরা ত বাবুগিরি করিয়া ইন্দ্রিয়দোষে মনুষ্যনামের অযোগ্য হইয়া পড়িতেছে। তাহার পর এই একশত বৎসরের মধ্যে তুর্কি ধ্বংস হইল, পারসিয়া রুসিয়ার করায়ত্ত হইয়া আসিতেছে। ঈজিপ্ত যায় যায় হইয়াছে অথবা গিয়াছে, তাহারা পরের হাতে রাজকার্য্য দিয়া স্বয়ং ঘরে বসিয়া থাকে তাহাদের আর আছে কি? তুর্কিস্তান গিয়াছে আফগান গেল, আল-জিয়ার্স গত, বার্ব্বরি ষ্টেট হীনবীর্য্য। কাসগড় মাথা তুলিয়া উঠিয়াছিল তাহারও নাম লোপ হইয়াছে, মুসলমানের কাছে এখন জগৎ "গেল" "ডুবিলই ত" বোধ হইল। মুসলমান জগতের প্রায় ষষ্ঠাংশ। এই ষষ্ঠাংশের যখন অবনতি প্রত্যক্ষ, তখন জগতের উন্নতি হইতেছে কেমন করিয়া বলিব।

আর এক মত আছে। জগৎ যে ভাব সেই ভাবেই আছে ৪০০০ বৎসর আগেও যেমন, ১৮৭৯ বৎসর আগেও তেমনি ছিল, আবার আজও তেমনই। কেহ উঠিতেছে কেহ পড়িতেছে, চাকা ঘুরি-

তেছে। রাশিচক্র যেমন ভাবে চলিতেছিল তেমনি আছে কিছু ব্যত্যয় হয় নাই তবে গ্রহ কাহারও বিগুণ কাহারও অনুকূল। কাহারও বৃহস্পতির দশা কাহারও শনির, কিন্তু উভযেরই প্রভুত্ব আজিও বজায় আছে সমান আছে। এই মতের অনেকে আবার এতদূর গোঁড়া আছেন যে তাঁহারা বলেন যে পৃথিবীর লোকের অবস্থা ঠিক একই আছে।

ইহাদের কথায়ও বিশ্বাস করা যায় না। এক বৎসর দুই বৎসর করিয়া গণিলে সর্ব্বদা উন্নতি দেখা যাউক আর নাই যাউক কিন্তু অনেক দিনের পর জগতের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে অনেক পরিবর্ত্ত হইয়াছে আর সেই পরিবর্ত্তের মধ্যে অনেক গুলি মন্দ হইতে ভাল হইযাছে। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে যেখানে লোকে ভূতের ভয়ে যাইত না এক্ষণে তথা হইতে ভূত পলাইয়াছে। যে নদী পর্ব্বত নক্ষত্রকে আমরা দেবতা দেখিতাম সে সকল এখন কেবল নদী পর্ব্বত ও নক্ষত্র মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে দেবতারা অন্তরিত হইয়াছেন। যে মেঘ শালপাতা খাইয়া অভ্র বমন করিত সেই মেঘ এখন "ধূমজ্যোতিঃ সলিল মরুতাং সন্নিপাতঃ" হইয়াছে। দাসব্যবসায়ীদের যে সকল অত্যাচার আমরা বুঝিতেই পারিতাম না এখন সেই সকল অপনয়নে আবালবৃদ্ধবনিতা চেষ্টা করিতেছে। রেল গাড়ী ব্যোমযান প্রভৃতির দ্বারা যে সকল লাভ ও উপকার হইয়াছে তাহার ত আর কথাই নাই। অতএব যখন দেখা যাইতেছে জড়জগতে, অন্তর্জগতে, শরীরে, মনে, শিক্ষায, নীতিতে, কার্য্যে, কর্ম্মে, চাল চলনে, সর্ব্বত্র ক্রমে পরিবর্ত্ত হইতেছে এবং সেই পরিবর্ত্তের অধিকাংশ মনুষ্যের সুখবৃদ্ধি করিতেছে তখন জগৎ মান্ধাতার সময়ও যে ভাবে ছিল এখনও সেই ভাবে আছে বলি কি রূপে।

অতএব জগৎ সমভাবে নাই, পরিবর্ত্ত হইতেছে এ কথায় কাহারও অবিশ্বাস নাই। যে হিন্দুসমাজ সর্ব্বাপেক্ষা স্থির ও পরিবর্ত্তবিরোধী সেই হিন্দুসমাজেই কত পরিবর্ত্ত হইয়া গিয়াছে। মনুর শাস্ত্রের সঙ্গে তুলনা করিলে দেখা যায় যে কত পরিবর্ত্ত হইয়াছে। মনু বলেন ব্রাহ্মণে ৩৬ বৎসর, ২৭ বৎসর, ১৮ বৎসর নিতান্ত না হয় ৯ বৎসর ব্রাহ্মচর্য্য করিবে। আমরা এখন ৯ রাত্রি তেরাত্রি বা এক রাত্রি পৈতার ঘরে থাকিয়াই সেই ব্রাহ্মচর্য্য সমাপন করি। মনু বলিয়াছেন ৫০ বৎসরের পর বানপ্রস্থ হইবে অর্থাৎ বনগমন করিবে। এখন আমরা ৮০ বৎসরের সময় কাশীবাস করিয়া সেই নিয়ম রক্ষা করি। মনু বলেন ব্রাহ্মণ চাতুর্ব্বর্ণ্য বিবাহ করিতে পারিবে। এখন এক ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য বর্ণে বিবাহ করিলে তাহার জাতিপাত হয়। অতএব এ সকল বিষয়ে যে ঘোর পরিবর্ত্ত হইয়াছে তাহার আর সংশয় নাই। কিন্তু এই পরিবর্ত্ত হইয়া হরেদরে হাঁটু জল হইয়া দাঁড়াইয়াছে কি না দেখা চাই। আমাদের যেদিকে পরি-

বর্ত্ত হইয়াছে পৃথিবীর আর কোনদিকে ঠিক তাহার উল্টা পরিবর্ত্ত হইয়াছে কি না? ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে কোথাও সেরূপ হয় নাই বরং দেখা যায় সমস্ত জগতেরই পরিবর্ত্ত একমুখে ধাবিত। সর্ব্বত্রই দেখা যায় জাতিগত বৈষম্য যাহাতে না থাকে তাহারই চেষ্টা—যাহাতে দাসত্ব বন্ধ হয় তাহারই উদ্যোগ। ভারতের শূদ্র, আমেরিকার শ্বেত, গ্রীসের হিলট, ইউরোপের সর্ফ ক্রমে দাসত্ববন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীনবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। যেখানে যেখানে পুরোহিতের আধিপত্য ছিল সর্ব্বত্র তাহার আধিপত্য কমিয়াছে। যেখানে যেখানে জমীদার ও রাজার আধিপত্য প্রবল ছিল সেই সেইখানেই তাহাদের প্রতাপ হ্রাস হইয়াছে। কুসংস্কার সকল ক্রমেই অস্তমিত হইতেছে। এ সকল পরিবর্ত্ত পৃথিবীর সর্ব্বত্র একই দিকে হইয়াছে। আমরা এমন বলি না যে এক সময়ে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই একভাবে পরিবর্ত্ত হইয়াছে কিন্তু যখন যখনই পরিবর্ত্ত হইয়াছে এই একদিকেই হইয়াছে। রোম বল গ্রীস বল ইংলণ্ড বল ফ্রান্স বল প্রথম অবস্থায় পুরোহিতদিগের সকলেই পদানত ছিলেন ক্রমে যত সভ্যতা বাড়িতে লাগিল ততই পুরোহিতদিগের ক্ষমতা কমিতে লাগিল। এই সকল দেশেই প্রথম অবস্থায় জমীদার ও প্রজার গোল মাল ছিল যতই উন্নতি হইতে লাগিল জমীদারের ক্ষমতা হ্রাস হইয়া তত সর্ব্বত্রই প্রজার ক্ষমতা বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

এক্ষণে বলিতে হইবে যে, পরিবর্ত্ত হইতেছে এবং ইহাও বলিতে হইবে যে পরিবর্ত্তস্রোত ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে একই মুখে ধাবিত। এখনও এক কথা আছে এখনও "হরে-দরে-হাটু-জল"বাদী বলিতে পারেন যে কোন এক সময়ে পৃথিবী শুদ্ধ ধরিলে এ দেশে ভাল হইল, ও দেশে মন্দ হইল সুতরাং যা ছিল তাহাই দাঁড়াইল। এই তাঁহাদের প্রধান আপত্তি। এইটি খণ্ডন করিতে পারিলে তাহারা নিরস্ত হইবেন। কোন্ সময় ধরিয়া প্রমাণ করিব। রোমান সাম্রাজ্যের ধ্বংসের সময় ধরা যাউক। রোমান-সাম্রাজ্যের ধ্বংসের ন্যায় ইউরোপের দুর্দ্দিন বোধ হয় আর কখন হয় নাই হবেও না। এই সময়ে পাশ্চাত্য রোমান্ সাম্রাজ্য অসভ্য বর্ব্বরজাতির হস্তে পতিত হইল। গল, ব্রিটেন, স্পেন, ইতালি প্রভৃতি সভ্যদেশ হইতে সভ্যতা দূরীভূত হইল। প্রাচ্য রোমানদেশও পুরোহিতের আধিপত্যে মগ্ন হইয়া নিস্তেজ নির্ব্বীর্য্যপ্রায় রহিল। সুতরাং সমস্ত ইউরোপ যেন অন্ধতমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। কিন্তু ঠিক এই সময়েই ভারতবর্ষের গৌরবের দ্বিতীয় দিন উপস্থিতপ্রায়। এই সময়ে ভারতবর্ষীয়েরা পাশ্চাত্যআক্রমণকারীদিগকে দূরীভূত করিয়া, নানাবিধ কাব্য-কলাপ সৃষ্টি করিয়া, জ্যোতিষাদি শাস্ত্রের গুহ্য তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া, সভ্যতার চূড়ান্ত করিয়া তুলিলেন। ৪৭৬ খৃঃ অব্দে

রোমে বর্ব্বরাধিপত্য স্থাপিত হইল ৫১১ খৃঃ অব্দে বরাহমিহির অমূল্য জ্যোতিষ-তত্ত্ব রচনা করিলেন। সম্ভবতঃ কালি-দাসও এই সময়ের লোক। আবার ঠিক এই সময়েই চীনের এক নূতন উন্নতির সময়। এই সময়েই চীনবাসীরা প্রাচীন সংস্কৃত বৌদ্ধগ্রন্থ সকল অনুবাদ করিতেছে আর চিনের পরিব্রাজকেরা ভারতবর্ষে ভ্রমণ করতঃ স্বদেশের জ্ঞানোন্নতিসাধন করিতেছে,আবার আরবদেশ এই সময়েই এক ভীষণ সমাজবিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হইতেছে, প্রাচীন পারস্যেরও অবস্থা এ সময় খুব ভাল। রোমের ধ্বংস হেতু জগতের যে অনিষ্ট হইয়াছিল এতগুলি দেশের উন্নতিতে তাহার কি সামঞ্জস্য অপেক্ষা অধিক হইল না? যখন প্রায় সমস্ত পৃথিবীর লোকের উন্নতি হইতেছে তখন এক রোমানসাম্রাজ্যের ধ্বংসে কত ক্ষতি হইবে।

বাস্তবিক জগতের উন্নতি হইতেছে বা অবনতি হইতেছে নির্ণয় করিতে হইলে যে প্রণালীতে আমরা এতক্ষণ যাইতে-ছিলাম সে প্রণালীতে যাইতে সুবিধা হইবে না,উহার আর এক উপায় আছে। যেমন বাহ্যজগতে উৎপত্তি স্থিতি ও লয় দেখা যায়, যেমন মনুষ্যের জন্মমৃত্যু দেখা যায় এইরূপ মনুষ্যজাতির হউক আর নাই হউক ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যসমাজের উৎপত্তি স্থিতি ও লয় আছে। মনুষ্য যতক্ষণ নিজে আপনার জন্য সব করিয়া লয় ততক্ষণ সমাজ হয় না, যে মুহূর্ত্তে মনুষ্য পরস্পরের মুখাপেক্ষা করিতে আরম্ভ করে যে সময় হইতে রাম হরির বোনা কাপড় পরিতে ও হরি রামের চাষের চাল খাইতে থাকে সেই সময় হইতে সমাজ আরম্ভ। যতক্ষণ সকল লোকই আপন আপন উদরান্নের জন্য দিবারাত্রি পরিশ্রম করে ততক্ষণ সমাজের উন্নতির সম্ভাবনা নাই। উন্নতি হইতে গেলে সমাজমধ্যে এমন একদল লোক চাই যাহাদের সাক্ষাৎসম্বন্ধে কৃষিকার্য্যে বা শিল্পকার্য্যে লিপ্ত থাকিতে হয় না। যাহারা সমাজের লোককে শিক্ষা দেয়,শাসন করে, সৎপথে প্রবর্ত্তিত করে। ইহারা শিক্ষিত লোক এই দলের উন্নতিতেই সমাজের উন্নতি। সুতরাং এই দলের সংখ্যা যত বৃদ্ধি হয় ততই মঙ্গল কিন্তু সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের মানসিক উন্নতিও হওয়া চাই। নচেৎ বড়ই সর্ব্বনাশ। যদি ইহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হয় কিন্তু মান-সিক উন্নতি না থাকে তাহা হইলে ইহারা জনসমাজের ভয়ানক শত্রু হয়; কেবল নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির জন্য দিবারাত্র ব্যস্ত থাকিয়া প্রজাবৃন্দের ভীষণ কষ্টের কারণ হয়। নিজের অলীক আমোদের জন্য সহস্র লোকের প্রাণবধ করিতেও কাতর হয় না। নিজের সামান্য উপ-কারের জন্য পরের ভয়ানক অপকার করিতে কষ্ট বোধ করে না। এইরূপ অত্যাচারী লোক অর্দ্ধ সভ্য অবস্থায় সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ইউরোপের ব্যারণ ও বিশপ, ভারতের ব্রাহ্মণ, এবং

প্রায় সর্ব্বত্রই রাজকর্ম্মচারিগণ এই তন্ত্রের লোক। যদি শিক্ষিত দলের সংখ্যাবৃদ্ধি হয় এবং তাঁহাদের মানসিক উন্নতিও ক্রমে বৃদ্ধি হইতে থাকে তাহা হইলে তাঁহারা অশিক্ষিতদিগের মঙ্গল কামনা করেন। তাহাদের সত্য বজায় করিবার ও তাহাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিবার পরামর্শ দেন, তাহাদের যাহাতে নিজ-কর্ম্ম করিয়া সময় থাকে ও যাহাতে তাহারাও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে গণ্য হইতে পারে তাহার চেষ্টা করেন। এইটি করিলেই সমাজের প্রকৃত উন্নতি হইল। কিছু দিন এইরূপ উন্নতি হই-বার পর সমাজের ধ্বংস হয়। সমাজ ধ্বংসের কারণ শিক্ষিত লোকদিগের তেজোহ্রাস। অনেক দিন পরিশ্রম ও ক্রমাগত চিন্তা করিলে যেমন মনুষ্যের চিন্তাশক্তি ক্রমে অবশ হইয়া আইসে, সমাজস্থ শিক্ষিত লোকদিগেরও তেমনি হয়, দশ পনর পুরুষ ক্রমাগত উন্নতি হই বার পর সমাজের মৌলিকতা হ্রাস হইতে থাকে, নূতন আর কিছু আবিষ্কার হয় না, দিন কত কেবল রুটিন বাঁধা সভ্যতা থাকে, এই রুটিন কাজের নাম সমাজ-ধ্বংস, যেমন সমাজের মৌলিকতা হ্রাস হইল উন্নতির স্রোতঃ রুদ্ধ হইল অমনি যদি সমাজ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে অথবা আর এক দল লোক উঠিয়া নিস্তেজঃ শিক্ষিতদিগের স্থান দখল করে তবেই মঙ্গল তবেই আরও দিনকত উন্নতির সম্ভাবনা নচেৎ সমাজের ক্রমেই অবনতি হয়। রুটিন ক্রমে খারাপ হইতে থাকে। সমাজস্থ লোকদিগের শিক্ষা ভাল হয় না। কুসংস্কার, ভীরুতা, সমাজ আক্রমণ ক রিয়া থাকে। সমাজের নাম থাকে, তেজ থাকে না। যেমন মৃতদেহ রক্ষা করায় কোন ফল নাই সেইরূপ পূর্ব্বোক্ত প্রকার মৃত বা ধ্বংসাবশিষ্ট রুটিন সমাজও কোন কার্য্যের হয় না বরং বহুসংখ্যক লোককে কুসংস্কারে মগ্ন করিয়া জগতের অনিষ্ট করে। যদি কুসংস্কারেরও বৃদ্ধি না হয় তথাপিও তাহারা জগতের অপকার করে। তাহারা আপনাদের গৌরবের স্মৃতিতে অহঙ্কৃত হইয়া পুরাণ সেকেলে সকল মতের পোষকতা করে। নূতন মত প্রচার হইতে দেয় না। প্রচার হইলে প্রাণপণে তাহার লোপ যাহাতে হয় তাহার চেষ্টা করে। নূতন মত প্রচার হইতে না দেওয়ার মত জগতের অ-নিষ্ট আর নাই। অতএব যখন যে সমা-জের শিক্ষিতগণের মৌলিকতা হ্রাস হইতে থাকে সে সমাজে হয় আমূলক পরিবর্ত্তন বা বিনাশ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক, নতুবা পৃথিবীর যে অংশে সে সমাজ থাকিবে সে অংশ পক্ষপাতগ্রস্ত অঙ্গের ন্যায় নিস্তেজ ও চলৎশক্তিবিহীন হইয়া পড়িবে।

এইরূপ দেখান গেল যে সকল সমা-জের উৎপত্তি স্থিতি ও লয় আছে। প্রায়ই দেখা যায় যে, যে সমাজের ধ্বংস হইতেছে তথাকার শিক্ষিত লোকেরাই ভুবুলো মন্ত্রের উপাসক, আর যেখানে সমাজের উন্নতি

হইতেছে সেইখানকার লোকই উন্নতি মতের প্রতিপোষক। যেমন জগতে মৃত্যু অপেক্ষা জন্ম অধিক সেইরূপ পৃথিবীর সর্ব্বত্র সমাজধ্বংস অপেক্ষা সমাজস্থিতি ও উৎপত্তি অধিক, সুতরাং অধিক লোক উন্নতিবাদী। ইহাতে একমাত্র বাদ আছে—পুরোহিত জাতি সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে "ডুব্‌লো" বাদী। সুতরাং যে দেশে পুরোহিতের ক্ষমতা নাই সেখানে "ডুব্‌লোর" বড় আদর নাই।

যেমন সমাজের উন্নতি অবনতি আছে তেমনি সমাজের বিশেষ বিশেষ অংশেরও উন্নতি অবনতি আছে। সর্ব্বত্রই উন্নতি অপেক্ষা অবনতি কম। সকল সমাজেই সমাজের সাধারণ উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই ধর্ম্মযাজক সম্প্রদায়ের অবনতি দেখা যায়। সুতরাং যত সমাজের উন্নতি হয় ততই ধর্ম্মযাজকগণ ডুব্‌লো ডুব্‌লো বলিয়া গোল বাধান, কিন্তু কে তাঁহাদের কথা শুনে। যে সম্প্রদায়েরই যখন অবনতি তাহারাই তখন ডুব্‌লো বলিয়া উঠে। অতএব বড় বড় সমাজেও যেমন, সমাজের মধ্যবর্ত্তী সম্প্রদায় সমূহে তেমনি, একই নিয়ম।

আমাদের প্রথম প্রশ্ন ছিল যে, কেন উন্নতি ও অবনতি দুই মতাবলম্বীর লোক হয়? তাহার উত্তর একপ্রকার দেওয়া হইল। এখন দেখিতে হইবে যে, এই দুই মতের কোনটীতে কত সত্য আছে।

প্রমাণ করা হইয়াছে, যে, সকল সমাজেরই উন্নতি ও অবনতি আছে। আজি মুসলমান অস্ত যাইতেছে কাল খ্রীষ্টিয়ান অস্ত যাইবে, হিন্দু বহুকাল অস্ত গিয়াছে। আজই দেখিতেছি খ্রীষ্টিয়ান উন্নত, মুসলমান অস্তমিত, হিন্দু ধ্বংসাবশেষ মাত্র। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন সমাজের উন্নতি অবনতি হইলেও সাধারণতঃ মানবজাতির ক্রমেই উন্নতি হইতেছে। তাহার ধ্বংস নাই, সে উন্নতি অবিশ্রান্ত। সমাজবিশেষের অবনতি হইলেও সে সমাজ জগতের কোন না কোন উন্নতি করে, উন্নতি করা যেন সমাজ মাত্রেরই মিশন। নিজের উৎপত্তি হয় স্থিতি হয় ধ্বংস হয় কিন্তু উন্নতি-সময়ে সে সমাজ যদি একটী নূতন কথা কহিয়া যায়, একটি নূতন আবিষ্ক্রিয়া করিয়া যায়, একটি বিষয়ে জড়জগতের উপর মনুষ্যের আধিপত্য বিস্তার করিয়া যায়, তবে সে তাহার মিশন পূর্ণ করিয়া গেল। সেই নূতন আবিষ্ক্রিয়া, ক্রমে সমস্ত মানবজাতির উপকারসাধন করে। এই সকল আবিষ্ক্রিয়া দেখিয়াই ঠিক করিতে হইবে জগতের উন্নতি হইতেছে কি অবনতি হইতেছে। শুদ্ধ যে প্রাকৃতিক আবিষ্ক্রিয়া লইয়াই উন্নতি তাহা নহে, যাহা কিছু নূতন কেহ করিতে পারে তাহাই উন্নতি। উন্নতির এইরূপ অর্থ করিলে দেখা যাইবে মান্ধাতার সময় হইতে ক্রমেই জগতের উন্নতি হইতেছে এবং এই উন্নতি যে কোথায় গিয়া শেষ হইবে তাহার ঠিকানা নাই। প্রথম অবস্থায় অবশ্য উন্নতি (নূতন আবিষ্ক্রিয়া) এত শীঘ্র

হইত না। কারণ তখন নূতন আবিষ্ক্রিয়ার এত সুবিধা হয় নাই, মনুষ্যের বুদ্ধিশুদ্ধি এত পরিপক্ব হয় নাই, এমন কি তখন পাঁচটা দেখিয়া শুনিয়া একটা নূতন করার প্রণালী (Inductive method) পর্য্যন্ত লোকে জানিত না। যতই মনুষ্যের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি হইতেছে ততই উন্নতি শীঘ্র হইতেছে। একটি নূতন idea যখন প্রচার হইয়া গেল তখন তাহার আর ধ্বংস নাই, সে মত অন্য উৎকৃষ্টতর idea দ্বারা তিরোহিত হইতে পারে, কিন্তু তাহার ধ্বংস নাই, ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন আকারে আবির্ভূত হইয়া জগতের ক্রমেই সে উপকারে আসিবে। সুতরাং যখন idea ধ্বংস নাই তখন তজ্জনিত উন্নতিরও ধ্বংস নাই।

সমস্ত মনুষ্যজাতির যে ক্রমে উন্নতি হইতেছে তাহার আর এক প্রমাণ, যে ভিন্ন ভিন্ন সমাজের আকার ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইতেছে। অতি প্রাচীন কালে পারিবারিক রাজত্ব প্রবল ছিল। একজন কর্ত্তা ছিলেন তাঁহার পরিবার তাঁহার তুল্য লোক,অবশিষ্ট সকলে তাঁহার দাস। ক্রমে এই পরিবারস্বামিগণ একত্র হইয়া tribal বা সম্প্রদায়প্রধান শাসন হইল। ক্রমে নানা সম্প্রদায় এক হইয়া নাগরিক শাসন হইল। ক্রমে নগরসমবায়, তাহার পর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশ। যথা ডিউকডম, আরলডম, ছোট ছোট রিপবলিক, ক্রমে এক্ষণে নেশন্যাল বা জাতীয় শাসন উপস্থিত হইয়াছে। ক্রমেই দেখা যাইতেছে সমাজের কলেবর বৃদ্ধি হইতেছে। প্রাচীনকালে প্রবল পরাক্রান্ত আথেন্সে পাঁচ হাজারের উপর নাগরিক লোক ছিল। অবশিষ্ট লোকেরা রাজ্যশাসন সম্বন্ধে কোন কথাই কহিতে পারিতনা। এখন ফ্রান্স ও আমেরিকার সমস্ত লোকই নাগরিক, সকলেরই রাজ্যশাসন সম্বন্ধে কথা কহিবার ক্ষমতা আছে। পূর্ব্বকালেও বড় বড় রাজ্য ও সাম্রাজ্য ছিল কিন্তু বৃহৎ জাতি বা নেশন ছিল না। সর্ব্বত্রই একজন লোক বা এক সম্প্রদায় বা এক নগর অবশিষ্টের উপর আধিপত্য করিত, কাহারও নিকট তাহাদের জবাবদিহি ছিল না। যখন দেখিতেছি সভ্যতা বৃদ্ধিসহকারে ক্রমেই মনুষ্যসমাজের কলেবর বৃদ্ধি হইতেছে তখন নিঃসন্দেহই ভরসা করিতে পারি যে যত কেন দেরিতে হউক না এমন দিন অবশ্য উপস্থিত হইবে যখন সমস্ত পৃথিবী একশাসনাধীন হইবে,সমস্ত মানবগণ এক পরিবারের ন্যায় পরস্পরের সহায়তায় পরমসুখে দিনাতিপাত করিবে। এখন যেমন একটী idea ইংলণ্ডে আবিষ্কৃত হইল ত ফ্রান্সে সেটি প্রচার হইতে দুই শত বৎসর, ভারতবর্ষে পাঁচশত বৎসর লাগে, তখন শীঘ্র শীঘ্র সমস্ত মানবমণ্ডলীতে সেটী প্রচার হইয়া পড়িবে। আমরা যতই বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করি তত আমাদের দৃঢ় সংস্কার হয় যে এমন দিন অবশ্যই উপস্থিত হইবে। কিন্তু এখনও দেরী আছে,

এখনও একজাতি অপর জাতির মুদ্রা ব্যবহার করে না, ভাষা ব্যবহার করে না, তুলাদণ্ড ব্যবহার করে না। সকলেরই স্বতন্ত্র মুদ্রা, ভাষা, তুলা-পরিমাণ। কিন্তু অনেক বিষয়ে ক্রমে এক হইতেছে। যদিও অল্পে অল্পে একাকার হইতেছে কিন্তু একাকার যে হইতেছে সেবিষয়ে সন্দেহ নাই। এখনও সকলজাতি আপন আপন স্বাধীনতা বা স্বার্থপরতা রক্ষা করিতেছে। না করিয়াই বা কি করে? এখনও কোন জাতি এমন সভ্য হয় নাই যে অধীন জাতিকে সমান স্বত্ব প্রদান করে। এখনও স্বার্থপরতার প্রয়োজন আছে, ক্রমে ইহার লোপ হইবে এবং সমস্ত জগৎ ভাই ভাই হইয়া উঠিবে।

মাধবী লতা।

৬

আরতি শেষ হইলে সকলেই প্রণাম করিয়াছিল, কেবল ব্রহ্মচারী বক্ষে বাহু-বিন্যাস করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন প্রণাম করেন নাই। তিনি দেবমূর্ত্তিকে কখন প্রণাম করেন না, এ কথা সকলে জানিত অথচ সে জন্য কেহ তাঁহাকে অভক্তি করিত না, বরং সকলেই বলিত ব্রহ্মচারী জ্ঞানী তাহাই তিনি রামসীতার মূর্ত্তিকে প্রণাম করেন না।

ব্রহ্মচারী মাসে মাসে একবার করিয়া সন্ধ্যার সময় রামসীতার আরতি দর্শন করিতে আসিতেন। যাঁহারা এই সময় সেখানে উপস্থিত থাকিতেন সকলের সহিত অতিসস্নেহে কথা বার্ত্তা কহিতেন। অনেকের নাম জানিতেন, তাহাদের সাংসারিক অবস্থাও জানিতেন; নাম ধরিয়া তাহাদের ডাকিতেন এবং সংসারের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতেন। কিন্তু কেহ সৎপরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে কোন উত্তর করিতেন না, কখন কখন বলিতেন, আমি সংসারী নহি, এসকল বিষয়ের মন্ত্রণা আমা অপেক্ষা অন্যে ভাল দিবে।

শান্তিশত গ্রামের প্রায় ক্রোশান্তর দূরে এক প্রান্তরমধ্যে একটি ভগ্ন মন্দিরে ব্রহ্মচারী একাকী বাস করিতেন। মন্দিরটি কোন দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে, কিন্তু যে সময়ের কথা বলা যাইতেছে সে সময়ে মন্দিরে কোন মূর্ত্তি ছিল না। প্রবাদ আছে যে, এক কালী প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিবার নিমিত্ত তথায় আনীত হইয়াছিল কিন্তু রাত্রিকালে বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের কতকগুলি নিরীহ শান্ত লোক আসিয়া প্রতিমাকে নিকটস্থ দীর্ঘিকায় নিক্ষেপ করে। এবং কালীমূর্ত্তি স্পর্শ করিয়াছে বলিয়া সেই রাত্রিকালে

তাহারা অবগাহন স্নান করে। প্রবাদ সত্য হউক বা মিথ্যা হউক দীর্ঘিকার নাম কালীদহ।

ব্রহ্মচারীর সহিত এই স্থানে সাক্ষাৎ করিতে গেলে সাক্ষাৎ হয় না। মন্দিরের দ্বার সর্ব্বদাই খোলা থাকে, অথচ প্রবেশ করিলে কখন ব্রহ্মচারীর দেখা পাওয়া যায় না। মন্দিরের তিন দিকে প্রান্তর এক দিকে কালীদহ। তথায় একটী বকুল দুইটী বেলবৃক্ষ ভিন্ন আর কোন বৃক্ষ কি লতা নাই। চারিদিকে বহুদূর পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইয়া থাকে কোথায়ও ব্রহ্মচারীকে দেখিতে পাওয়া যায় না। যখনই অনুসন্ধান করা যায় তখনই এইরূপ অথচ লোকে বলে ব্রহ্মচারী এই স্থানে বাস করেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনিও সেই কথা বলেন। মাসান্তরে কেবল রামসীতার মন্দিরে তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়। লোকের শ্রদ্ধা তাঁহার সম্বন্ধে অতি আশ্চর্য্য। দেবভক্তি তাঁহার একেবারে ছিল না, তিনি কখন দেবতাকে প্রণাম বা পূজা করেন নাই, কেহ কখন তাঁহাকে সন্ধ্যা পাঠ করিতে শুনে নাই অথচ সকলেই তাঁহাকে পরম ধার্ম্মিক বলিয়া জানিত। তিনি কখন কোন ভবিষ্যৎ কথা বলেন নাই, অথচ জ্যোতিষশাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ জ্ঞান আছে বলিয়া রাষ্ট ছিল। তিনি কখন কাহাকে ঔষধ দেন নাই কিন্তু লোকের বিশ্বাস ছিল যে, তিনি মনে করিলেই সকল রোগই আরাম করিতে পারেন। লোকের এরূপ বিশ্বাস, এরূপ শ্রদ্ধা কেন হইল তাহা অনুভব করা কঠিন কিন্তু চূড়াধন বাবু মনে মনে তাহা এক প্রকার অনুভব করিয়া রাখিয়াছিলেন। দেওয়ান পুত্র নবকুমারকে তিনি একদিন এই কথার প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, ব্রহ্মচারী হয় জুয়াচোর নতুবা অদৃষ্টবান্ পুরুষ। নবকুমার তাঁহাতেই মত দেন।

রামসীতার মন্দিরহইতে বহির্গত হইয়া ব্রহ্মচারী আপন আশ্রমাভিমুখে চলিলেন। কতক দূর যাইতে যাইতে কয়েক জন গ্রাম্য লোকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তাহারা কার্য্য উপলক্ষে প্রাতে শান্তিশত গ্রামে আসিয়াছিল, এক্ষণে কার্য্য সমাধান্তে স্ব স্ব গ্রামে প্রত্যাগমন করিতেছে। ব্রহ্মচারী তাহাদের সহিত কথোপকথন করিতে করিতে চলিলেন। তাহাদের মধ্যে একজন বৃদ্ধ নানা কথার পর বলিল "ঠাকুর, আজ এই মাত্র আমরা একটা বড় কুসম্বাদ শুনিয়াছি। রাজা আমাদের দেবতা স্বরূপ, রাজার ধর্ম্মে প্রজার ধর্ম্ম, রাজা যদি এরূপ হন ত আমাদের কি দশা হইবে। শুনিলাম, রাজা না কি এই মাত্র সন্ধ্যার সময় লোক জন লইয়া স্বয়ং একটী ব্রাহ্মণকন্যা অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছেন। যুবতী কত চীৎকার করিতে লাগিল কেহ তাহার রক্ষার্থে আসিল না, যে রক্ষক সেই যদি ভক্ষক হয় তবে আর কে কথা কহিবে! ভয়ে তাহার পিতা পলায়ন করিয়াছিল, স্বামী

বাটী নাই নতুবা সে রাজা বলিয়া বড় ভয় করিত না, তা সে যাহাই হউক পৃথিবীর দশা হল কি? এ যে ঘোর কলি উপস্থিত, রাজা হইয়া প্রজার কন্যাহরণ। তাহাতে আবার ব্রাহ্মণের কন্যা। কি সর্ব্বনাশ। আর বৃদ্ধ বয়সে রাজার এই দুর্ম্মতি, ইহা অপেক্ষা দেশের আর কি অমঙ্গল হইতে পারে।"

বৃদ্ধ চুপ করিল দেখিয়া একজন সঙ্গী বালক বলিল "পিতম পাগলার কথা বল। রাজা তাহাকে পিঁজরায় পুরিয়াছেন।"

বৃদ্ধ বলিল "ভাল কথা মনে। ঠাকুর, দুঃখের কথা কি বলিব। একটা পাগল পথে পথে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইত,কাহারও অনিষ্ট করিত না,তাহাকে ধরিয়া না কি বাঘের মুখে দিবার হুকুম হইয়াছিল। শেষ কে চূড়াধন বাবু আছেন তিনিই না কি তাহাকে রক্ষা করেন। তথাপি দেওয়ানজীর পরামর্শে রাজা তাহাকে পিঁজরায় বদ্ধ করিয়াছেন। বাঘের পার্শ্বে রাখিয়াছেন সে একপ্রকার বাঘের মুখেই দেওয়া। এতক্ষণ হয় ত বাঘ তাহাকে উদরে পুরিয়াছে। আমি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি বাঘ তাহাকে দেখিয়া লাপাইতেছে ঝাপাইতেছে এক একবার গরাদের উপর দুই পা দিয়া দাঁড়াইয়া পিতমকে দেখিতেছে আর হা করিতেছে।"

বালক বলিল "এক পাশে বাঘ এক পাশে ভালুক।"

বৃদ্ধ। কি আপশোষ কি আপশোষ! এত পাপ! পৃথিবী আর বহিতে পারিবেন কেন। রাজ্য আর থাকে না!

ব্রহ্মচারী কোন উত্তর দিলেন না। কতক দূর অন্যমনস্কে চলিলেন, পরে যখন উত্তর দিবার নিমিত্ত পশ্চাৎ ফিরিলেন তখন দেখিলেন, গ্রাম্য লোকেরা অন্য পথে চলিয়া গিয়াছে। ব্রহ্মচারী কতকক্ষণ তথায় দাঁড়াইয়া রহিলেন শেষ কি মনে করিয়া শান্তিশত গ্রামের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

রাত্রি প্রায় দেড় প্রহর অতীত হইলে পর ব্রহ্মচারী দেওয়ানজীর অতিথিশালায় প্রবেশ করিলেন। তৎসম্বাদ শুনিয়া দেওয়ানজী তথায় উপস্থিত হইলেন। প্রণাম করিয়া বসিলে, ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন "সমস্ত কুশল?"

দেওয়ান। মহাশয়ের শ্রীচরণ প্রসাদে সকলই কুশল বলিতে হইবে।

ব্রহ্মচারী। তাহা শুনিলেই আমাদের সুখ। অনেক দিন দেখি নাই,কোন সম্বাদও লইতে পারি নাই, তাহাই একবার আসিলাম।

দেওয়ান। অনুগ্রহ আপনার।

ব্রহ্মচারী। রাজার কুশল?

দেওয়ান। শারীরিক কুশল বটেই, মানসিক মন্দ বলিয়াও বোধ হয় না।

ব্রহ্মচারী। রাজকার্য্য সম্বন্ধে কিরূপ?

দেওয়ান। তাহাও মন্দ নহে। তবে বোধ হয় ইদানীং সকলেই তাঁহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী নহে।

ব্রহ্মচারী। আমি তাহা কতক বুঝি-

য়াছি। তবে সবিশেষ জানি না, এক্ষণে শুনিতেও বড় ইচ্ছা করি না, মনে জানি যে, যখন আপনার ন্যায় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি রাজার পরামর্শী তখন তাঁহার মঙ্গলই সম্ভব, সকল বিপদ হইতেই উদ্ধার হইবেন। তবে বোধ হয় বিপক্ষদল কিঞ্চিৎ প্রবল হইয়া থাকিবে অথবা তাহাদের কার্য্যকারিতা শক্তি কিছু বৃদ্ধি পাইয়া থাকিবে।

দেওয়ান। তাহা সত্য, এই মাত্র তাহার পরিচয় পাইয়াছি।

ব্রহ্মচারী। কিরূপ?

দেওয়ান। রাজার প্রতি যাহাতে প্রজার শ্রদ্ধা কমে এরূপ অপবাদ রটান হইতেছে। তাহা হউক, এরূপ হইয়াই থাকে, তাহার নিমিত্ত আমি বড় ব্যস্ত নহি, কিন্তু এক কথার নিমিত্ত আমার কিছু সন্দেহ হইয়াছে। সন্ধ্যার সময় রাজা ব্রাহ্মণকন্যাকে ক্রোড়ে করিয়াছেন কিন্তু রাত্রি এক প্রহর না হইতে হইতেই সে কথা বিকৃতিপ্রাপ্ত হইয়া দেশ রাষ্ট্র হইয়াছে।

ব্রহ্মচারী। যখন আপনি এ সকল বুঝিয়াছেন তখন আর ভাবনার বিষয় কিছুই নাই। এক্ষণে আমি আশ্রমে যাই।

দেওয়ানজী প্রণাম করিয়া ব্রহ্মচারীকে বিদায় দিলেন। অবস্থিতি করিতে অনুরোধ করিলেন না।

৭

পরদিবস প্রাতে একজন চোপদার রামসীতার পাড়ায় রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার হস্তে মুসলমানি গঠনের এক দীর্ঘ শূল ছিল, তাহা সজোরে মৃত্তিকায় প্রহার করায় শূল প্রোথিত হইয়া বিনাস্পর্শে দাঁড়াইয়া রহিল। তখন চোপদার অতি গম্ভীর ভাবে সেই স্থানে পাদচারণ করিতে আরম্ভ করিল। পল্লীস্থ অধিবাসীরা একে একে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। ক্রমে অনেক গুলি লোক আসিয়া জমিল। চোপদারের এ সময়ে এ স্থানে একা আসা অসম্ভব বলিয়া দুই একজন হেতু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিলে, চোপদার কেবল মাত্র প্রশ্নকারীর মুখপ্রতি একবার কটাক্ষ করিলেন, কোন উত্তর দিলেন না। চোপদার হিন্দুস্থানি, কাজেই দ্বিতীয়বার তাঁহাকে প্রশ্ন করিতে আর কেহ সাহস করিল না। কিছু বিলম্বে বৃত্তান্ত অবশ্য জানা যাইবে এই বিবেচনায় সকলে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। চোপদার পূর্ব্বমত পাদচারণ করিতে লাগিলেন।

বালকেরা রৌপ্য শূলের চাকচিক্য পরস্পর পরস্পরকে দেখাইতে লাগিল। যুবকেরা আপনাদের মধ্যে চুপি চুপি নানা তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিল। কেহ বলিল যে এখানে কোথাও একটী মন্দির নির্ম্মিত হইবে তাহাই চোপদার আসিয়াছে। কেহ বলিল যে তাহা নহে, এখানে অতিথিশালা হইবে। আবার কেহ বলিল,

ইট কাঠের ব্যাপার নহে কিছু গুরুতর ব্যাপার আছে ইহার পর জানিতে পারিবে। চতুর্থ আর এক ব্যক্তি বলিল ব্যাপার আর কিছুই নহে এখানে একটী কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মিত হইবে, যেস্থানে চোপ দার শূল গাড়িয়াছে ঠিক ঐস্থানে হইবে। এই কথা বলিয়া সে ব্যক্তি ঈষৎ মুখভঙ্গী করিয়া হাসিল। মুখভঙ্গী দেখিয়া হাসির অর্থ অনেকের মনে পড়িল, "ঠিক বলিয়াছ ঠিক বলিয়াছ" বলিয়া প্রকাশ্য হাসি পড়িয়া গেল। হাসি থামিলে একজন বলিল স্তম্ভ তবে আর একটু সরিয়া হইবে, এই বলিয়া নিকটস্থ একটী বাটীর প্রতি কটাক্ষ করিল, আবার হাসি উঠিল।

যে বাটীর উদ্দেশে এই হাসি হইল সে বাটীর দ্বার খোলা ছিল। এক বৃদ্ধা বিধবা, গলায় রুদ্রাক্ষ মালা, পরিধানে মলিন ছিন্ন বস্ত্র, দ্বারে আসিয়া অতি তীব্র দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল। বহুলোকের সমাগম স্পষ্ট দেখিতে পাইয়া সভয়ে দ্বার রুদ্ধ করিয়া বলিল "বিপদ দেখ, কার জঞ্জাল কোথায় আনিল।" পরে বৃদ্ধা পুত্রবধূর উদ্দেশে বলিল "আজ আর জল আনিতে কি অন্য কার্য্যে যাইবার প্রয়োজন নাই, জলের আবশ্যক হয় আমি আনিয়া দিব।" পুত্রবধূ গৃহমার্জ্জনা করিতেছিল কোন উত্তর করিল না, সস্নেহে কন্যার প্রতি চাহিয়া মাথা আন্দোলন করিতে করিতে বলিতে লাগিল, "জল আনিতে হয় পুটু আনিয়া দিবে, কেমন পুটু?" পুটু ধূলায় বসিয়া শুষ্ক খই খাইতেছিল, গর্ভধারিণীর স্বর শুনিয়া তাঁহার প্রতি চাহিল। মাতা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন পুটু?" পুটু খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, ক্ষুদ্র হস্তে একটি খই তুলিয়া মাকে দেখাইতে লাগিল "এ এ," মা বলিলেন "খাও, খাও, দেখ মা যেন কাকে লয় না।" কাকের নাম হইবামাত্রই ভীত ভাবে পুটু চারিদিক দেখিতে লাগিল। পুটু যদিও এক বৎসরের বালিকা, নিজে কথা কহিতে পারে না কিন্তু দুই একটি কথা বুঝিয়া থাকে। কাকের নামমাত্রেই হয় ত আপনার বিপদ বুঝিতে পারিল। প্রাতে উঠিয়া কেবল গুটিকতক খই পাইয়াছিল তাহা এখনি কাকে লইয়া যাইবে এই ভয়ে চারিদিক দেখিতে লাগিল।

বাস্তবিকই তৎকালে কাক আসিয়া চালে বসিয়া ছিল। পুটু তাহাকে দেখিয়া কাঁদিবার উদ্যোগ করিলে তাহার গর্ভধারিণী আসিয়া কাক তাড়াইয়া দিল। পুটু আহ্লাদে হাসিয়া উঠিল,যা যা বলিয়া দুই হাত নাড়িতে লাগিল। মাতা যত্নে পুটুর ক্ষুদ্র মুখখানি ধরিয়া চুম্বন করিলেন, আদর করিয়া বলিলেন "খাও মা এই খানে বসিয়া খাও। খই ধুলায় ফেল না, ধামিতে রেখে খাও, কাল তোমার সঙ্গে রাজপুত্রের বিবাহ হবে, তখন তুমি সোণার ধামিতে খই খাবে,কেমন পুটু?" পুটু আবার হাসিয়া দুই হাত বাড়াইল।

মা মুখচুম্বন করিয়া চলিয়া গেলেন। যাইবামাত্র আবার কাক আসিল। এবার চালে না বসিয়া পুটুর নিকট আসিয়া বসিল। পুটু ভয়ে চক্ষু বুজিল। কাক ক্রমে খইগুলি সংগ্রহ করিয়া উড়িয়া গেল। তখন পুটু চক্ষু চাহিয়া ধামি দেখিয়া কাঁদিতে লাগিল। ক্রন্দন শুনিয়া পুটুর মা দৌড়িয়া আসিলেন, ধামি শূন্য দেখিয়া প্রথমে কাককে পরে আপনার অদৃষ্টকে গালি দিতে লাগিলেন। শেষ পুটুকে ক্রোড়ে লইয়া চক্ষের জল মুছাইতে মুছাইতে বলিতে লাগিলেন "কেন মা এ অভাগিনীর গর্ভে জন্মিয়াছিলে ? আবার এখন খই আমি কোথা পাইব ?"

পুটু শীঘ্রই কান্না ভুলিয়া গেল, আপনিই চক্ষের জল মুছিল কিন্তু মুছিতে গালে নাকে হাতে চক্ষের অঞ্জন লাগিয়া গেল। "ঐ! কি করিলি" বলিয়া গর্ভধারিণী গাত্রমার্জ্জনী আনিয়া কালি মুছাইতে মুছাইতে বলিতে লাগিলেন "পুটু আমার কেমন সুন্দর মেয়ে, পুটু আমার আজ আবার রাজার কোলে উঠিবে—রাজা আবার আজ কোলে লইতে আসিবেন, না পুটু ?" মাধবীলতার আদরের নাম পুটু।

গৃহমধ্যে এইরূপে যখন গর্ভধারিণী মাধবীলতাকে লইয়া আদর করিতেছিলেন সেই সময়ে রাজপথে একজন কারকুন আসিয়া নিকটস্থ গৃহস্থদিগের নাম ইত্যাদি লিখিয়া লইতেছিল, কাহার কাহার বাটীর দৈর্ঘ্য প্রস্থ মানদণ্ডের দ্বারা পরিমাণ করিতেছিল। গৃহস্বামীদের আর ইহা দেখিয়া বুঝিতে বাকি রহিল না। এক্ষণে গৃহ ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে তাঁহাদের নিশ্চয় বোধ হইল। গৃহস্থের পক্ষে ইহা অপেক্ষা দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কি আছে! পূর্ব্বের হাস্য রহস্য কাজেই লোপ হইল, সকলেই গম্ভীর ভাবে দাঁড়াইয়া মনে মনে মাধবীলতার পিতা রামানুজকে তিরস্কার করিতে লাগিল। রামানুজ তৎকালে বাটী ছিলেন না, প্রাতেই আহার্য্য দ্রব্য সংগ্রহের নিমিত্ত বহির্গত হইয়াছিলেন।

কিয়ৎকাল পরে তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বস্ত্রাগ্রে কতকগুলি শাক, কদলি, বিল্বপত্র, হস্তে একটি বার্ত্তাকু। তাঁহাকে চিনিবা মাত্র চোপদার আসিয়া প্রণাম করিল এবং যোড়করে বলিল যে তাঁহার সেবায় যে সকল দাস দাসী নিযুক্ত হইয়াছে তাহারা আগতপ্রায়, বস্ত্র অলঙ্কার ও অন্যান্য দ্রব্যাদি লইয়া আসিতেছে। আপাততঃ চারিজন দ্বারবান্ উপস্থিত আছে, তাঁহার যেরূপ অনুমতি হয়। রামানুজ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, চোপদার আর কাহাকে নিবেদন করিতেছে মনে করিয়া পশ্চাতে দেখিলেন সে দিকে কেহই নাই। হতবুদ্ধি হইয়া শাক বার্ত্তাকু ফেলিয়া চোপদারের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। অগত্যা একজন প্রতিবেশী বলিয়া উঠিল, আমাদের দেশত্যাগী করিবার নিমিত্ত তোমার যদি মনে ছিল পূর্ব্বে বলিলেই আমরা আপনারাই চলিয়া যাইতাম এ সকল যোগা-

যোগ করিবার আর তোমার আবশ্যক হইত না। আর একজন বলিয়া উঠিল তুমি বড় লোক, আমাদের মত সামান্য লোকের উপর এ সকল অত্যাচার করা উচিত হয় নাই। রামানুজ কাতরনয়নে সকলের মুখপ্রতি চাহিতে লাগিলেন। এমন সময় রাজবাটী হইতে দ্রব্যাদি আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলের দৃষ্টি সেই দিকে পড়িল। সকলেই অগ্রসর হইয়া দাঁড়াইল। দেখিয়া কাহারও আহ্লাদ হইল না, প্রথমে সকলের মুখ ভার হইল। ক্রমে তাহাদের মধ্যে গোপনে উপহাস আরম্ভ হইল, কেহ কটাক্ষ দ্বারা, কেহ বা অঙ্গস্পর্শ দ্বারা উপহাস করিতে লাগিল। গৃহপ্রত্যাবর্ত্তন করিয়াও তাহাদের রহস্যপ্রবৃত্তি ক্ষান্ত হইল না। ধনাঢ্যের প্রতি উপহাস, দরিদ্রের প্রতি উপহাস, বৃদ্ধের প্রতি উপহাস, যুবতীর প্রতি উপহাস, সতীনের প্রতি উপহাস ঘরে ঘরে আরম্ভ হইল।

তাহাদের গৃহিণীরাও ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া নানা কথা আরম্ভ করিল। অনেকেই স্থির করিল যে "গহনা পরাব গলায় দড়ি।"

৮

অপরাহ্নে যখন রাজা ইন্দ্রভূপ আত্মীয় গণপরিবেষ্টিত হইয়া পুরাণ শ্রবণ করিতেছিলেন একখানি শিবিকা তাঁহার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। একজন পরিচারক আসিয়া যোড়হস্তে বলিল যে পাল্কী আসিয়া পৌঁছিল। রাজা ইঙ্গিত দ্বারা সম্বাদ গ্রহণ করিলেন, পুরাণপাঠ পূর্ব্বমত চলিল।

অন্তঃপুরে শিবিকা রক্ষিত হইলে, তিন চারি জন পরিচারিকা আসিয়া পাল্কীর দ্বার খুলিল। "মা মা" বলিয়া একটি ক্ষুদ্র বালিকা ক্ষুদ্র হস্তে করতালি দিয়া উঠিল, পরে পাল্কী হইতে অবতরণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। জনৈক পরিচারিকা তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া লইল। ক্রোড় হইতে বালিকা মাকে ডাকিতে লাগিল। পাল্কীতে একটী যুবতী ছিলেন, তিনিই বালিকার মা। পরিচারিকারা তাঁহাকে সসম্মানে আহ্বান করিলে, তিনি ধীরে ধীরে অবতরণ করিলেন। তাঁহার পরিধানে মুরসিদাবাদী পট্টবস্ত্র, আপাদমস্তক নানাবিধ অলঙ্কারে বিভূষিত। কিন্তু সকল গুলি অঙ্গোপযোগী নহে, অনেক গুলি অঙ্গ হইতে স্খলিতোন্মুখ। পাল্কীর নিকট দাঁড়াইয়া যুবতী সে গুলি অঙ্গে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু পারিতেছেন না দেখিয়া জনৈক পরিচারিকা সাহায্য করিল। অলঙ্কারের দৌরাত্ম্য শেষ হইলে যুবতী আবার দেখিল বস্ত্র আয়ত্তের মধ্যে রাখা ভার হইল। পরিচারিকারা তাহা বুঝিতে পারিয়া যত্ন জানাইবার উপলক্ষে সযত্নে তাঁহার অঙ্গ ধরিয়া রাণীর নিকট লইয়া চলিল।

রাণী তৎকালে কিঞ্চিৎ দূরে বারাণ্ডায় ব্যজন হস্তে দাঁড়াইয়া ঈষৎ বামে মস্তক

হেলাইয়া দেখিতেছিলেন। যুবতী অতি কুণ্ঠিতভাবে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। রাণী আশীর্ব্বাদ করিয়া হস্তধারণ পূর্ব্বক যুবতীকে তুলিলেন এবং নিকটে উপবেশন করিতে বলিয়া আপনি অগ্রসর হইয়া পরিচারিকার ক্রোড়হইতে বালিকাকে লইলেন। পরিচারিকার ক্রোড়ে বালিকা ম্লানভাবে থাকিয়া কাঁদিবার উদ্যোগ করিতেছিল, ক্রোড় পরিবর্ত্তন হওয়াতে সে ভাব কতক গেল। রাণীর ক্রোড়ে গিয়া বালিকা প্রথমে স্বর্ণখচিত বস্ত্রাগ্র দেখিতে লাগিল, তাহার পর একবার মুখ তুলিয়া রাণীর প্রতি চাহিল। কপালে হীরক জ্বলিতেছে তাহা স্পর্শ করিবে বলিয়া ক্ষুদ্র হস্ত প্রসারণ করিল, হস্ত সে পর্য্যন্ত গেল না। এই সময় কণ্ঠের হীরকের প্রতি দৃষ্টি পড়িল। বালিকা তৎক্ষণাৎ তাহা ধরিয়া বলিতে লাগিল "এ এ।" রাণী বালিকার মুখচুম্বন করিয়া শয্যায় বসিলেন, বালিকাকে আপন ক্রোড়ে বসাইলেন। তাহার গর্ভধারিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেয়েটির নাম কি?" গর্ভধারিণী বলিলেন "পুটু।" রাণী বলিলেন কল্য মহারাজ বলিয়াছিলেন নাম মাধবীলতা। তা হউক। মাধবীলতা অপেক্ষা পুটু নাম ভাল। পুরুষেরা মাধবীলতা বলুন আমরা পুটু বলিব।

এই সময় মাতার প্রতি দৃষ্টি পড়ায় পুটু রাণীর ক্রোড় হইতে মাতার ক্রোড়ে গেল, আবার মার ক্রোড় হইতে তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া রাণীর ক্রোড়ে বসিয়া মার প্রতি চাহিয়া হাসিতে লাগিল। "আয়" বলিয়া মা হাত বাড়াইলে পুটু হাসিয়া রাণীর বস্ত্রান্তরালে মুখ লুকাইল, আবার অল্পে অল্পে মুখ বাহির করিয়া মাকে দেখিতে লাগিল। তাহার প্রতি মার দৃষ্টি পড়িবা মাত্র আবার হাসিয়া মুখ লুকাইল।

রাণী একজন পরিচারিকার প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "রাজকুমার আমার এরূপ খেলা জানে না। রাজকুমার কোথায় একবার এইখানে আনিয়া পুটুর কাছে বসাইয়া দেও দুইজনে কি করে দেখি।" পরিচারিকা উঠিয়া গেল।

আর একজন পরিচারিকা আসিয়া পুটুর হাতে মিষ্টান্ন দিল। পুটু তাহা খাদ্য বলিয়া অনুভব করিতে পারিল না, খেলিবার দ্রব্য মনে করিয়া ভাঙ্গিল। স্তন্যদুগ্ধ, খই আর গুড় ভিন্ন পুটু অন্য দ্রব্য কখন খায় নাই, মোণ্ডা কখন দেখেও নাই কাজেই ফেলিয়া দিল।

এই সময় অন্তঃপুরের দ্বারে নাগরা বাজিয়া উঠিল। রাণী বলিলেন "রাজা আসিতেছেন।" একজন পরিচারিকা পুটুর মাকে কক্ষান্তরে লইয়া গেল। রাজা হাসিতে হাসিতে আসিলেন। রাজাকে দেখিবামাত্র পুটু হাত বাড়াইয়া দিল, রাজা পুটুকে ক্রোড়ে লইয়া রাণীর নিকট বসিলেন। রাণীকে বলিলেন, "আমি রাত্রে যে বলিয়াছিলাম মেয়েটি চমৎকার, বাস্তবিক তাহা নয়?"

রাণী। মেয়েটিকে কোলে করে যেন আমার কোল যুড়াল।

রাজা। শরীর চমৎকার নরম।

রাণী। আমি তা বলিতেছি না, ছেলেদের শরীর এইরূপ নরম হয়। রাজকুমারের শরীর বরং আরও নরম।

রাজা। তবে কি বলিতেছিলে?

রাণী কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন "অন্য ছেলে কোলে করে এত সুখ হয় না। এই খুদে মেয়ে যেন কি মন্ত্র জানে।"

রাজা হাসিয়া বলিলেন, "তাহা কিছুই নয়। আমি বড় ভাল বাসিয়াছি বলিয়া তোমারও ভাল লাগিয়াছে।"

রাণী। তাই হবে, মেয়েটির ত কোন খুঁত নাই সকলই গুণ, অন্য ছেলে হলে এতক্ষণ কত কাঁদিত, পুটু এসে অবধি কেবলই হাসিতেছে। আর দেখুন পুটুর হাসি যতবার দেখিলাম ততবারই আপনাকে মনে পড়িল, কেন বলুন দেখি।

রাজা। মাধবীর হাসি বুঝি কতক আমার মত।

রাণী। তা আমি ঠিক বুঝিতে পারি না, কিন্তু এর হাতের গড়ন দেখুন ঠিক আপনার মত।

রাজা। তাহা আমি ভাল বলিতে পারি না কিন্তু চোখ দুটি নিশ্চয় তোমার মত। প্রথমে দেখে আমি আশ্চর্য্য হয়ে ছিলাম।

রাণী। কি আশ্চর্য্য! মানুষের মত ত মানুষ হয়?

রাজা। এ জগতে কিছুই বিচিত্র নহে। রামসীতার মত যদি কোন ঘটনা আমাদের হইত তবে বলিতাম এ আমা বই লব। কিন্তু সেরূপ আমাদের কোন ঘটনাই ত নাই।

রাণী। বালাই! বালাই! তাঁরা দেবতা মাথার উপর থাকুন।

রাজা। প্রায় সন্ধ্যা হল। ব্রাহ্মণ কন্যাকে আর অধিকক্ষণ রাখা না হয়। আমি এখন যাই।

রাজা চলিয়া গেলেন, অন্তঃপুর অতিক্রম করিলে আবার পূর্ব্বমত বাদ্যোদ্যম হইয়া উঠিল। বাদ্যোদ্যম শুনিবা মাত্র রাজ অঙ্গনে স্বর্ণ মুষল হস্তে নকিব হিন্দি-ভাষায় উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া রাজার বহির্গমনবার্ত্তা প্রচার করিতে লাগিল। অমনি নহবৎ বাজিয়া উঠিল। দ্বারে সুসজ্জিত হস্তী উপস্থিত ছিল বৃংহিত নাদ করিয়া উঠিল। অমাত্যগণ অগ্রসর হইলেন, পরিচারকগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল। রাজা পুষ্প-উদ্যানে গেলেন।

৯

ইন্দ্রভূপ উঠিয়া গেলে পুটুর মা রাণীর নিকট আসিয়া বিদায় চাহিলেন। রাণী হাসিয়া বলিলেন, "পুটুকে রাজকুমারের সহিত আলাপ করিয়া দিই আর একটু থাক।" এই সময় পরিচারিকা রাজ-কুমারকে আনিয়া পুটুর সম্মুখে বসাইয়া দিল। উভয়ের একই বয়স, দেখিতে প্রায় একই রূপ। রাজকুমার কিঞ্চিৎ

দুর্ব্বল মাত্র। পুটু তখন মৃত্তিকায় বসিয়া অন্যমনস্কে স্বর্ণমুদ্রা লইয়া ক্রীড়া করিতে-ছিল। রাণী যখন প্রথমে পুটুকে ক্রোড়ে লইয়াছিলেন স্বর্ণমুদ্রা কয়েকটি তখন তাহার হস্তে দিয়াছিলেন। জনৈক দাসী তাহা পুটুর হস্ত হইতে লইয়া আপনার নিকটে রাখিয়াছিল এক্ষণে বিদায়ের সময় উপস্থিত দেখিয়া স্বর্ণমুদ্রা গুলি আবার পুটুর হস্তে দিয়াছিল, পুটু তাহা লইয়া আপন মনে খেলা করিতে-ছিল। রাজকুমারকে পুটুর সম্মুখে বসাইয়া দিলে পুটু ক্রীড়া ত্যাগ করিয়া রাজকুমারকে দেখিতে লাগিল। ক্ষণেক পরে ধীরে ধীরে ক্ষুদ্র হস্তটী রাজকুমারের অঙ্গে দিল সভয়ে হাত আবার সরাইয়া সকলের দিকে চাহিতে লাগিল। রাজ কুমার কাঁদিয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ পুটু একটী স্বর্ণমুদ্রা তুলিয়া "স্থা স্থা" বলিয়া রাজকুমারের সম্মুখে ধরিল। রাজকুমার প্রথমে শান্ত হইয়া পুটুর হস্তস্থিত স্বর্ণ-মুদ্রার প্রতি চাহিল পরে পুটুর হাত হইতে তাহা ফেলিয়া দিয়া আবার ক্রন্দন আরম্ভ করিল। রাণী বলিলেন, "ও পোড়া কপাল!" একজন সখী রাজকুমারকে ক্রোড়ে লইয়া মুখচুম্বন করিল।

পুটুর মা রাণীকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইল। বিদায় দিবার সময় রাণী আর কোন কথা কহিলেন না কেবল মাত্র একজনকে সঙ্গে যাইতে বলিলেন। সঙ্গিনী পুটুকে ক্রোড়ে লইয়া পাল্কীতে দিয়া আসিল। পাল্কীতে প্রবেশ করিবার সময় পুটুর মা সঙ্গিনীর দুটি হস্তধারণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "রাজ্যেশ্বরী কি আমার উপর রাগ করিলেন?" সঙ্গিনী হাসিয়া বলিল, "সে কি কথা?" বাহকগণ আসিয়া পাল্কী তুলিল।

রাণী শয়নঘরে প্রবেশ করিলেন, এক-বার দুই একখানি চিত্রপটের প্রতি দৃষ্টি পাত করিয়া আর এক কক্ষে যাইয়া রাজকুমারকে আনিতে বলিলেন। সখী রাজকুমারকে তথায় উপস্থিত করিলে রাণী ইঙ্গিত দ্বারা ক্রোড়ে দিতে বলিলেন। সখী রাজকুমারকে রাণীর ক্রোড়ে দিয়া আপনি পার্শ্বে বসিল। রাণী সন্তানকে বুকে করিলেন, মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন "আমার সোণার চাঁদ।" সখী তখন প্রফুল্লিত অন্তঃকরণে রাজকুমারের শত প্রশংসা করিতে লাগিলেন। রাণী অ-বাধে তাহা শুনিতে লাগিলেন।

যে সঙ্গিনী পুটুকে ক্রোড়ে লইয়া পাল্কীতে দিতে গিয়াছিল সে ধীরে ধীরে অন্য এক মহলে প্রবেশ করিল। রাজার কনিষ্ঠা ভগিনী, বিধবা, নিঃসন্তান, ত-থায় বাস করেন। মধ্যে মধ্যে প্রয়োজন-মত রাণীর অন্তঃপুরে আসিয়া থাকেন নতুবা রাজভগিনী নিয়ত পূজা অর্চ্চনায় সময় অতিবাহিত করেন। তাঁহার পরি-চারিকারা সকলেই বিধবা, বৃদ্ধা, অধিকাংশ ব্রাহ্মণকন্যা। একজন তাহার মধ্যে পঞ্জিকা দেখিতে এবং গ্রন্থপাঠ করিতে পারিত। সেই ব্রাহ্মণী প্রত্যহ অপরাহ্নে রাজভগিনীকে কালীকীর্ত্তন শুনাইত।

রাণীর সঙ্গিনী যখন প্রবেশ করিল তখন কীর্ত্তন পাঠ সমাধা হইয়াছে,সকলে তুলা চরকা তুলিতেছে। নিত্য ব্রাহ্মণ-পরিচারিকারা অপরাহ্নে সূতা কাটে বা পৈতা তোলে। রাজভগিনীর ব্রতে পৈতা সর্ব্বদাই প্রয়োজন হয়।

সঙ্গিনীকে দেখিয়া রাজভগিনী বলিলেন "আসিয়াছ ভাল হইয়াছে, আমি রাজার জন্য স্বহস্তে কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়াছি।" এই বলিয়া তাহাকে কক্ষান্তরে লইয়া গেলেন। রৌপ্যপাত্রে করিয়া দুই তিন প্রকার মিষ্টান্ন দিলেন। সঙ্গিনী তাহা হস্তে লইয়া বলিল, একটা কথা বলিতে আসিয়াছিলাম।

রাজ, ভ। কি ?

সঙ্গিনী। আজ সেই মেয়ে দেখিলাম।

রাজ, ভ। কোন্ মেয়ে ?

সঙ্গিনী। আপনি সকল ভুলে গেছেন ?

রাজ, ভ। আমার ত কই কিছুই মনে হয় না।

সঙ্গিনী। সেই হতভাগিনী।

রাজ, ভ। কোন্ হতভাগিনী ?

সঙ্গিনী। আপনি কি সেই বিপদের রাত্র ভুলিয়া গিয়াছেন ?

রাজ, ভ। এখন বুঝিলাম। কোথায় দেখিলে ?

সঙ্গিনী। এই রাজবাটীতে,এই মাত্র।

রাজ, ভ। সে কি ? কে আনিল ? চল আমি দেখি গে।

সঙ্গিনী। এক্ষণে আর দেখিতে পাইবেন না, তারে লয়ে গিয়াছে।

রাজ, ভ। আহা। আমি দেখিতে পেলেম না। কে আনিয়াছিল।

সঙ্গিনী। তার মা।

রাজ, ভ। রাণী কি বলিলেন ?

সঙ্গিনী। দরিদ্রের কন্যা বলিয়া কয়েকখান মোহর দিলেন। মেয়েটিকে রাজা বড় ভাল বেসেছেন। আপনি কোলে নিলেন মুখে চুমা খেলেন।

রাজভগিনী চক্ষের জল মুছিয়া অন্যমনস্কে বসিয়া রহিলেন। সঙ্গিনী চলিয়া গেল।

জেন্দ অবস্থা।

পার্সিদের মূল ধর্ম্মগ্রন্থের নাম 'জেন্দ অবস্থা।' এই প্রাচীন গ্রন্থের ভাষা অর্থ বিধি ব্যবস্থা লইয়া পাশ্চাত্য কতক গুলি পণ্ডিতদের মধ্যে বিস্তর বিচার চলিতেছে। কয়েক বৎসরমধ্যে ফরাসিস, জারমন, দিনামার ভাষায় এই গ্রন্থের অনুবাদ হইয়া গিয়াছে। এক সময় আমাদের সংস্কৃত ভাষায়ও ইহার অনুবাদ হইয়াছিল কিন্তু এক্ষণে আমাদের বাঙ্গালীর মধ্যে দুই চারি জন ভিন্ন বোধ হয় আর কেহই জেন্দ অবস্থার নামও শুনেন নাই।

গ্রন্থখানি জেন্দ ভাষায় লিখিত। বহুকাল পূর্ব্বে পারস্য রাজ্যে এই ভাষা

প্রচলিত ছিল। উইলিয়ম আর্স্কিন সাহেব বিবেচনা করেন যে জেন্দ ভাষা সংস্কৃতের অপভ্রংশ মাত্র। বিখ্যাত দিনা মার পণ্ডিত রাস্ক সাহেব সে মতের প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন যে,জেন্দ ভাষা কোন ভাষারই অবভ্রংশ নহে, স্বয়ং স্বতন্ত্র ভাষা। মক্ষমূলরেরও সেই মত; তবে তিনি এই বলেন যে অন্যান্য ভাষা অপেক্ষা সংস্কৃতের সহিত জেন্দ ভাষার কিঞ্চিৎ নিকট সম্বন্ধ আছে, এমন কি জেন্দভাষায় এরূপ অনেক কথা পাওয়া যায় যে, তাহার দুই একটি বর্ণ পরিবর্ত্তন করিয়া দিলে সংস্কৃত হয়, যথা— "অহুর" "হপ্তহিন্দু" ইহার হ স্থলে স করিলে অসুর ও সপ্তসিন্ধু হয়। এইরূপ অনেক কথা পাওয়া যায়।

জেন্দভাষা হইতে এখনকার পারস্য ভাষার উৎপত্তি। এই জন্য জেন্দভাষার কোন কোন শব্দ পারস্য ভাষায়ও পাওয়া যায়। কিন্তু সংস্কৃতের সহিত জেন্দ ভাষার সমসাদৃশ্য অধিক। মক্ষমূলর বলিয়াছেন যে যাঁহারা জেন্দভাষা ব্যবহার করিতেন তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ ভারতবর্ষে বাস করিতেন। তাহা হইলে সংস্কৃতভাষা হইতে জেন্দভাষার উৎপত্তি এরূপ অনুভব করা নিতান্ত অন্যায় নহে। কথিত আছে যে পূর্ব্বে যযাতি রাজার এক পুত্র পিতৃকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে তিনি বহু লোক সমভিব্যাহারে সপ্তসিন্ধু অতিক্রম করিয়া পশ্চিমাভিমুখে গমন করেন, তাঁহা হইতেই যবনের উৎপত্তি। এইটি স্মরণ রাখিলে কতক বুঝা যায় যে, বৃত্রাসুর বধ বা তদ্বৎ সংস্কৃত গ্রন্থমূলক কথা কেন জেন্দ অবস্থায় পাওয়া যায়।

জেন্দভাষা আর এক্ষণে প্রচলিত নাই। দুই সহস্র বৎসরের বরং অধিক হইবে এই ভাষা পৃথিবী হইতে একেবারে লোপ পাইয়াছে। এ ভাষার আর উপদেষ্টা নাই এক্ষণে শিখিতে হইলে কতক আপনা আপনি শিখিতে হয়। গ্রীক্ বলুন সংস্কৃত বলুন ইহার মধ্যে কোন ভাষাই আর প্রচলিত নাই কিন্তু তাহা বলিয়া এ সকল ভাষার লোপ হয় নাই, ইহাদের অধ্যয়ন অধ্যাপন চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু জেন্দভাষার অধ্যয়নও নাই অধ্যাপনাও নাই। কাজেই এ ভাষা এক্ষণে বুঝিবার উপায় গিয়াছে। বিলাতে যে কয়েকজন পণ্ডিত দৃঢ়সংকল্প হইয়া জেন্দ অবস্থার উদ্ধারসাধন করিতেছেন তাঁহারা যে কি প্রকারে এই ভাষা শিখিয়াছেন তাহার পরিচয় অতিবাহুল্য। এখানে এই পর্য্যন্ত বলা আবশ্যক যে তাঁহারা এ ভাষায় সম্পূর্ণ অধিকারী হয়েন নাই। তাঁহারা যে অনুবাদ করিয়াছেন তাহার অধিকাংশ স্থলে ভুল আছে। আপনারাও তাহা জানেন। ক্রমে সে ভুল সংশোধনের চেষ্টা করিতেছেন।

বিলাতীয় পণ্ডিতসম্বন্ধে এইরূপ। কিন্তু জেন্দ অবস্থা যাঁহাদের মূল ধর্ম্মগ্রন্থ তাঁহাদের সম্বন্ধে আর একরূপ। তাঁহারা কেহই ইহার ভাষা বুঝেন না, বুঝিতে বা শিখিতে চেষ্টাও করেন না। অথচ

ভক্তিভাবে গ্রন্থখানি পুরুষানুক্রমে রক্ষা করিতেছেন। ধর্ম্মযাজকেরা এই গ্রন্থের দোহাই দিয়া ধর্ম্মযাজন করেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা দিতে হইলে বা কোন তর্ক করিতে হইলে জেন্দ অবস্থার মুণ্ডপাত করেন, তাঁহাদের পরস্পর সকলের যুক্তি, সকলের ব্যবস্থা, সমুদয় জেন্দ অবস্থায় আছে বলেন অথচ কেহ জেন্দ অবস্থা পাঠ করেন নাই, তাহার ভাষাও কেহ জানেন না। আমাদের বাঙ্গালায় ধর্ম্মযাজকমধ্যেও এইরূপ। কেহই বেদ-পাঠ করেন নাই, বেদে কি আছে তাহা একেবারে জানেন না, অথচ তাঁহারা বেদের ব্যবস্থা দেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন দশমীর দিন তুলসী তলায় দশ বার গোময় লেপন করিতে হইবে। জিজ্ঞাসা করিলে বলিবেন বেদে ইহার স্পষ্ট বিধান আছে।

বম্বের পার্সিরা জেন্দ অবস্থায় লিখিত বিষয় কিছুই অবগত নহেন অথচ সেই গ্রন্থোক্ত ধর্ম্ম অনুসরণ করেন বলিয়া তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে। তিন চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রন্থোক্ত স্তব অভ্যাস করা রীতি ছিল। পিতা পুত্রকে শিখাইতেন, পুত্র আবার পৌত্রকে শিখাইতেন। এইরূপ পুরুষপরম্পরা স্তব গুলি মুখস্থ থাকিত, স্তব সম্বন্ধে আর গ্রন্থপাঠের প্রয়োজন হইত না। সেই প্রথা পার্সিদের মধ্যে অদ্যাপি চলিয়া আসিতেছে। ভাষা লোপ পাইয়াছে কিন্তু সে ভাষার স্তব গুলি আছে। কি বড় কি ছোট সকলেই দিনে রাত্রে ষোলবার জেন্দভাষার স্তব পাঠ করিয়া থাকেন। কিন্তু মাথা মুণ্ড কি পাঠ করেন তাহার অর্থ তাঁহারা আপনারাও বুঝেন না তাঁহাদের দেবতরাও বুঝেন না। এই রূপ না বুঝায় এক মহৎ লাভ আছে। ধর্ম্মগ্রন্থ না বুঝিলে ধর্ম্ম টেকসই হয়। পার্সিধর্ম্ম যে এতকাল চলিয়া আসিতেছে তাহার এই বিশেষ কারণ। যে অবধি বাইবেল চলিতভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে সেই অবধি খ্রীষ্টানধর্ম্ম দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। সাধারণের মূর্খতা পারত্রিক ধর্ম্মের জীবন স্বরূপ। ধর্ম্মগ্রন্থের দুর্জ্ঞেয়তা সেই ধর্ম্মের পরমায়ু স্বরূপ।

আমাদের হিন্দুধর্ম্ম যে এতকাল চলিয়া আসিতেছে তাহারও প্রতি সেই কারণ। ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতে অধিকাংশ লোকের প্রতি নিষেধ ছিল। কাজেই সাধারণও সকলেই অন্ধের ন্যায় ধর্ম্মপথে চলিত। অন্ধের আর যতই দোষ থাক পথদর্শকের বড় আজ্ঞাকারী। ধর্ম্মযাজক বলিলেন এই দিকে জল ছিটাও ধর্ম্মভীতেরা জল ছিটাইলেন। মনে করিলেন শাস্ত্রে ইহার বিশেষ তাৎপর্য্য লিখিত আছে। ধর্ম্মযাজক বলিলেন অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা কর্ণমূল ঘর্ষণ কর অন্ধাত্মারা তৎক্ষণাৎ তাহা করিল, কোন ওজর নাই। উত্তর কি পূর্ব্বদিকে জল ছিটাইলে পরকালের কি উপকার হইবে তাহা তাহাদের জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার নাই। জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজনও নাই, যখন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিধি দিতেছেন তখন অবশ্য তাহা শাস্ত্রে আছে। শাস্ত্র দেবপ্রণীত, সংস্কৃত দেববাক্য। মন্ত্রের মহাশক্তি; ভূত ছাড়ে, বিষ উড়ে, গাছ পড়ে। মারণ, বশীকরণ, উচাটন সকলই মন্ত্রবলে। মন্ত্রে দেবতা বশ হয়, পরকালও আয়ত্তর মধ্যে আসিবে ইহার আর আশ্চর্য্য কি?

কিন্তু আমাদের মধ্যে এক্ষণে যাঁহারা ভক্তিভাবে ত্রিসন্ধ্যা করেন তাঁহাদের যদি বাঙ্গালা ভাষায় সন্ধ্যা করিতে বলা যায় বোধ হয় অধিকাংশই একেবারে সন্ধ্যা ত্যাগ করিবেন। অনেকেই বলিবেন বাঙ্গালায় সন্ধ্যা করিলে কোন ফল হইবে

না। সংস্কৃত দেববাক্য, বাঙ্গালা নববাক্য। দেবতাদিগের নিকট নববাক্যে কোন ফল হয় না। বাস্তবিক তাহা না হইতে পারে, কেন না আমরা ভাল লোকের মুখে শুনিয়াছি অনেক দেবতা বাঙ্গালা ভাষা একেবারে বুঝিতে পারেন না। তাঁহাদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় নাই কাজেই মাতৃভাষা (সংস্কৃত) ভিন্ন আর কোন ভাষা তাঁহাদের শিক্ষা বা অধিকার হয় না।

মূল কথা বাঙ্গালা ভাষায় সন্ধ্যা অনুবাদিত হইলে সন্ধ্যার প্রতি লোকের আর শ্রদ্ধা থাকিবে না। অনুবাদ যতই মূলানুরূপ হউক যতই সুন্দর হউক তাহাতে শ্রদ্ধার হ্রাস হইবে। অর্থ না বুঝাই শ্রদ্ধার প্রতি কারণ, বাঙ্গালায় সন্ধ্যা সকলে বুঝিবে কাজেই গোদাবরী আমায় শুদ্ধ কর, নর্ম্মদা আমায় শুদ্ধ কর এ সকল উক্তি ফলদায়ক বলিয়া আর কাহার বোধ হইবে না। সন্ধ্যার অর্থ যত দিন সংস্কৃত ভাষায় গোপন আছে ততদিন তাহার মহিমা অপ্রতিহত চলিয়া আসিতেছে। পার্সিধর্ম্ম সম্বন্ধেও তাহাই হইয়াছে। জেন্দ অবস্থা পার্সিরা কেহ বুঝেন না তাহাই তাঁহাদের নিকট জেন্দ-অবস্থার এত গৌরব।

জেন্দ অবস্থার মূল প্রণেতার নাম জরতুষ্ট্র অথবা জরোস্তর। ইদানীং কেহ কেহ তাহাকে জরদোস্ত বলেন। তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহা প্রথমে সহস্রাধিক বৎসরের মধ্যে লিখিত হয় নাই। স্মৃতিরূপে শিষ্য প্রশিষ্য দ্বারা চলিয়া আসিয়াছিল পার্সিদের মধ্যে যে জেন্দ অবস্থা প্রচলিত আছে তাহা মক্ষমুলার বলেন প্রায় সতের শত বৎসর হইল লিখিত হইয়াছিল। জরতুষ্ট্র নিজে সমুদয় জেন্দ অবস্থা রচনা করেন নাই কতক তিনি করিয়াছিলেন বাকী তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যেরা করিয়াছিল। পুরাতন গ্রন্থ মাত্রেই এইরূপ হইয়া থাকে।

ধর্ম্মপ্রচারকগণ বলিয়া থাকেন যে ঈশ্বরের আদেশমত ধর্ম্মগ্রন্থ লিখিত হয় তিনি নিজে কোন কথার উপদেশ দেন না আর একজন তাহার মধ্যবর্ত্তী থাকে। ঈশ্বরের আদেশ মতে মহাম্মদ কোরান সরিফ প্রচার করেন সে স্থলে মধ্যবর্ত্তী গেব্রল ছিলেন। গেব্রল আসিয়া মহম্মদের কর্ণে ঈশ্বর আদেশ জানাইয়া যাইতেন মহাম্মদ তাহা চেলাদের নিকট প্রকাশ করিতেন। চেলারা তাহাই অভ্যাস করিত। জেন্দ অবস্থায় সেই প্রথা অবলম্বন করার কথা আছে। জরতুষ্ট্র ঈশ্বরবাক্য অর্ম্মজের নিকট শুনিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। অর্ম্মজ আমাদের ব্রহ্মার ন্যায় সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনই প্রথমে অবণ্যবীজ নামে দেশ সৃষ্টি করেন তথায় জরতুষ্ট্রের জন্ম হয়। অবণ্যবীজ কেহ বলেন আর্য্যবীজ। অবণ্যবীজ শব্দ ভারতবর্ষীয়দের মধ্যে নিতান্ত অপরিচিত নহে। অদ্যাপি বাঙ্গালার বৃদ্ধারা রাজা রাণীর গল্পে বনের বর্ণনা করিতে হইলে অবণ্যবীজের উল্লেখ করিয়া থাকে। 'অবণ্যবিজুবন' তাঁহারা বলিয়া থাকেন।

জেন্দ অবস্থার মতে পৃথিবী সৃষ্টি করিতে একবৎসর লাগিয়াছিল। পৃথিবীর পরমায়ু দ্বাদশ সহস্র বৎসর। এই বার হাজার বৎসর চার যুগে বিভক্ত। প্রত্যেক যুগ তিন হাজার বৎসর করিয়া স্থিতি। প্রথম তিন হাজার বৎসরে পৃথিবীর সৃষ্টি ও উন্নতি। দ্বিতীয় যুগে আদি মনুষ্যের নির্ব্বিঘ্নে জীবন যাপন, অপ্রতিহত সুখ। তৃতীয় যুগে দুঃখের আগমন সুখ দুঃখের যুদ্ধ। এক্ষণে সেই যুগ চলিতেছে। চতুর্থ যুগে দুঃখের পতন ও সুখের রাজ্য।

ক্রমশঃ।

বঙ্গদর্শন।

ষষ্ঠ বৎসর।

বঙ্গোন্নয়ন।

বাঙ্গালি মাত্রেই বাঙ্গালার শ্রীবৃদ্ধি-কামনা করেন। কতকগুলি নৈসর্গিক কারণ বঙ্গোন্নতির প্রতিকূল আছে। সেই সকল কারণের সমালোচনা প্রায় কেহই করেন না। ঈদৃশ সমালোচনা এই প্রস্তাবের মুখ্য উদ্দেশ্য।

একজন মুসলমান গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "বঙ্গভূমির উর্ব্বরতা দেখিলে বাঙ্গালাকে পার্থিব নন্দনকানন (বেহেস্তই আলম) বলা যাইতে পারে, কিন্তু তথাকার জল ও বায়ু এমন দূষ্য, যে সে দেশকে নরকের প্রান্তভূমি বলিলে অত্যুক্তি হয় না।"

প্রথম পরিচ্ছেদ।

উর্ব্বরতা ও পৌরুষ।

ভূমির উর্ব্বরতা যে মহামঙ্গলময়ী ইহা বলা বাহুল্য। বুভুক্ষার ন্যায় মনুষ্যের কোন প্রবৃত্তি বলবতী নহে। সংসারে প্রায় সকলেই আহারের সংস্থান জন্য প্রত্যহই ব্যস্ত, অতএব ভূমির যে গুণে আহার্য্যের উৎপত্তি হয়, সেই গুণের কীর্ত্তন জন্য মসিব্যয় করায় প্রয়োজন নাই। ভারতবর্ষের নানাপ্রদেশে অনাবৃষ্টিজাত দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ প্রাণীর মৃত্যু হইয়াছে। উর্ব্বরতা গুণে বহুকাল বাঙ্গালার সে দুর্দ্দশা ঘটে নাই।

উর্ব্বরতা মহোপকারসাধিনী হইয়াও নিরবচ্ছিন্ন মঙ্গলের কারণ নহে। যাহারা স্বল্পায়াসলব্ধ ভক্ষ্য পাইয়া সন্তুষ্ট হয়, তাহারা প্রায় শ্রমশীল হয় না। শ্রমাভাবে পৌরুষের হানি হয়। উর্ব্বরাদেশবাসীরা প্রায় কোথাও পৌরুষ জন্য বিখ্যাত নহে। বাঙ্গালিদের পৌরুষের পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই।

গত বারশত বৎসরের ইতিহাসের পর্য্যালোচনা করিলে আসিয়ার অধিবাসীদের মধ্যে আরবীয়েরা বলবিক্রমে সর্ব্ব-

প্রধান, এবং তাতারগণ প্রায় আরবীয়দের সদৃশ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। ইউরোপীয়েরা এক্ষণে আসিয়াবাসীদিগকে মনুষ্য বলিয়াই গাহ্য করেন না। তাঁহাদের একবার স্মরণ করা উচিত যে আরবীয়েরা ইউরোপে স্পেন, সিসিলি, ও ফ্রান্সের দক্ষিণভাগ জয় করিয়াছিল এবং কনস্তন্তনিয়ার ইউরোপীয় সম্রাট্‌কে করদ রাজার শ্রেণীতে অবনত করিয়াছিল।*

এই আরবীয়দের দেশ মরুভূমি। মাঞ্চু তাতারগণ চীন জয় করে; বর্ত্তমান চীনের সম্রাট তাতার বংশোদ্ভব। তুর্কোমান তাতারগণ ইউরোপে ইউনান সাম্রাজ্য অধিকার করিয়াছে। রুশ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছে বটে, কিন্তু প্লেব্‌নার সমরক্ষেত্রে পৌরুষের বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছে। রোম সাম্রাজ্যের যত বর্ব্বর অরি ছিল, হনতাতারদের অধিরাজ আতিলা তাহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান, ১৪০০ বৎসর হইল ইহার নামে পৃথিবী কাঁপিত।

মোগল তাতারগণ ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিল। এই সমস্ত তাতারদের আদিনিবাস মরুভূমি।

বস্তুতঃ এবিষয়ের প্রতিপাদন জন্য অধিক দূর দৃষ্টি করার প্রয়োজন নাই। ভারতবর্ষে বীরপ্রসূতি রাজস্থানকে প্রাচীনগণ ইরিনদেশ অর্থাৎ মরুভূমি বলিতেন।† শত শত সমরক্ষেত্রে রাজপুতগণ পরিচয় দিয়াছে, যে তাহারা প্রাণাপেক্ষা মানের অধিকতর গৌরব করে। চিতোর দুর্গের রক্ষকগণ যাদৃশ স্বাধীনতানুরাগ ও আত্মবিসর্জ্জনের আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন, এমন কোন পাষণ্ড নাই, যে সে কথা স্মরণ করিয়া চক্ষুর জল সম্বরণ করিতে পারে। এই ভারতবর্ষ যে অর্জ্জুনের জন্মভূমি ছিল, ইহার বর্ত্তমান অবস্থা দেখিলে সে কথায় শীঘ্র বিশ্বাস হয় না। তবে রাজপুত ও শিখদের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে মনোমধ্যে এবিষয়ে কতকটা প্রতীতি জন্মে। রাজপুতগণের যেরূপ পৌরুষ যদি সেরূপ রণকৌশল ও একতা থাকিত—জয়পুর, যোধপুর, ও উদয়পুরের প্রতি তাহাদের যাদৃশ অনুরাগ, ভারতের প্রতি যদি তাদৃশ অনুরাগ থাকিত, তাহা হইলে ভারতে যবনাধিকার হইত কি না সন্দেহ। এই রাজপুতদের দেশের ভূমি বালুকাপ্রধান।

---

* সম্রাট্ নিকেফরুস করদান বন্ধ করিবেন বলিয়া খলিফা হারুণরসিদকে পত্র লেখায়, খলিফা এই উত্তর পাঠাইয়াছিলেন, 'কুক্কুরীপুত্র কাফের, তোমার পত্রের উত্তর পড়িতে হইবে না, দেখিতে পাইবে।' সম্রাট্ যখন দেখিলেন আরবসেনা অগ্নি ও তরবার দ্বারায় ইউনান সাম্রাজ্য নষ্ট করিতেছে, তখন কৃতাঞ্জলি হইয়া খলিফাকে পুনর্ব্বার কর দিলেন।

† মারবার শব্দ মরু হইতে উৎপন্ন। মরু মারবার প্রদেশের পূর্ব্ব নাম।

তাহাতে বার্ব্বরবৃক্ষ যত জন্মে, শস্য তত জন্মে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অধিত্যকাবাস ও পৌরুষ।

মহাকবি মিল্টন গাইয়াছেন—

'মহীধর-অধিষ্ঠাত্রী, স্বাধীনতা দেবী।'*

বাঙ্গালা যদি পার্ব্বতদেশ হইত, তাহা হইলে বাঙ্গালিদের পৌরুষ, নেপালের গোরক্ষদের ন্যায় না হউক, অন্ততঃ কাশ্মীরীদের ন্যায় হইতে পারিত।

যদি আফ্গানস্থান পার্ব্বত দেশ না হইত, তাহা হইলে পঞ্জাব জয় পরেই ঐ দেশ ইংরেজাধিকৃত হইত সন্দেহ নাই।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের নভেম্বরে যে যুদ্ধারম্ভ হয়, সে যুদ্ধে আফ্গানস্থানের উপত্যকা প্রদেশ ব্রিটিস সেনা অনায়াসে জয় করিয়াছিল; অধিত্যকা জয় অতি দুরূহ ব্যাপার। যদি আমাদের রাজপুরুষগণ ভারতের ন্যায় আফ্গানস্থান অধিকৃত করিবার চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে কৃতকার্য্য হইতেন না এমন কথা বলা যাইতে পারে না; কিন্তু আফ্গানদের এরূপ পৌরুষ ও স্বাধীনতাপ্রিয়তা যে অর্থব্যয়ে আমাদের রাজকোষ শূন্যপ্রায় হইত এবং ভারতসৈনিকদের রক্তে অধিকৃত দেশ প্লাবিত হইত। নেপাল পার্ব্বতদেশ বলিয়াই নেপালরাজের পদ মহারাজা সিন্ধিয়া ও মহারাজা হোল্কারের পদাপেক্ষা উন্নত।

নেপালে ইংরেজ রেসিডেণ্ট আছেন। ভোটে তাহাও নাই। ভোটরাজ সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন। ভোট পার্ব্বতদেশ না হইলে এই স্বাধীনতা কোন্ কালে অন্তর্হিত হইত। কেহ কেহ এই আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন, 'পার্ব্বতদেশে বাসের সহিত পৌরুষের কি সম্বন্ধ? পার্ব্বতদেশ একটী বৃহৎ দুর্গস্বরূপ; সেই দুর্গই স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছে; পৌরুষের কি কার্য্য?'

ইহার উত্তর এই যে অধিত্যকাবাস পৌরুষবর্দ্ধন ও পৌরুষসহায়। পৌরুষ ব্যতীত কেবল দুর্গবলে স্বাধীনতার রক্ষা হয় না। বস্তুতঃ পৌরুষ হইতে যেমন বুদ্ধিবল ও অস্ত্রবল বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না, তেমন দুর্গবলেরও বিচ্ছেদ হইতে পারে না। মনুষ্যের যদি কেবল প্রকৃতিদত্ত নখ ও দন্তের উপর নির্ভর করিতে হইত, তাহা হইলে মনুষ্যের ন্যায় দুর্ব্বল জীব অতি বিরল; এতদিন সিংহ ও ব্যাঘ্রে মানবকুল ধ্বংস করিয়া ফেলিত। বীরেন্দ্র অর্জ্জুনের যদি গাণ্ডীব না থাকিত, যদি তিনি নিরস্ত্র হইতেন, তাহা হইলে একজন সাধারণ অস্ত্রধারী কৌরবসৈনিক তাঁহাকে নষ্ট করিতে পারিত। তাহা হইলে ব্যাসদেবকর্ত্তৃক অর্জ্জুনের পৌরুষগুণকীর্ত্তন হইত না। জর্ম্মণ ও ইংরেজ

---

* "The mountain-nymph, sweet Liberty."

জাতির যদি উৎকৃষ্ট আগ্নেয় অস্ত্র—ক্রুপ্‌গণ, আরমষ্ট্রংগণ, নীডলগণ, হেনরিমাটিনী রাইফল—না থাকিত, যদি তাঁহাদের উত্তমরূপে রণকৌশল শিক্ষা না হইত, তাহা হইলে তাঁহাদের পৌরুষের খ্যাতি কে শুনিত? যদি অস্ত্রের সাহায্য লইলে পৌরুষের হানি না হয়, পর্ব্বত রূপ দুর্গ সাহায্য লইলে, পৌরুষহানি কেন স্বীকার করিব?

পার্ব্বতদেশে অধিক পরিশ্রম না করিলে জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে না। শারীরিক পরিশ্রম যে পৌরুষবর্দ্ধক তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অতএব কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, বাঙ্গালা পার্ব্বতদেশ হইলে, বাঙ্গালিদের কাপুরুষ বলিয়া কলঙ্ক হইত না।

ক্রমশঃ।

তা, প্র, চ।

গঙ্গাধর শর্ম্মা

ওরফে

জটাধারীর রোজনামচা।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

ডাকাতি।

কেহ জাগ্রত হইতে না হইতেই অমরেন্দ্রনাথ অদৃশ্য হইলেন। এখন চারিদিকে ডাকাতির গোল উঠিয়াছে, এই মাত্র জ্যোৎস্না অস্তমিত হইয়াছে, জগৎ শুদ্ধ তমোময়, সেই তমোরাশি ভেদ করিয়া এক একটী বিজাতীয় শব্দ শুনা যাইতেছে "নিলে রে" "গেল রে" "মেলে রে" প্রভৃতি বাক্যগুলির মধ্যে মধ্যে হুঙ্কারমিশ্রিত ঘন ঘন শব্দ শুনা যাইতেছে। শ্রীনগর গ্রামবাসীরা সকলেই উঠিয়াছে, দরিদ্রজন আসিয়া পথে দাঁড়াইয়াছে, ধনিগণ আপন আপন কপাটে দৃঢ় অর্গল বন্ধ করিয়া ছাদে উঠিয়া এক একটি বন্দুক ছাড়িতেছেন। কেহ কহিতেছেন, "এই পথ দিয়া দুই জন লাঠিয়াল সড়্‌কি হস্তে দৌড়িয়া গেল," কেহ কহিতেছেন, "আজ সন্ধ্যাবেলা ভয়ানক দেখিয়াছিলাম।" দাসীরা বলাবলি করিতেছে, "আজ ঘাটের নিকট তেঁতুল তলায় দুই জন পাগড়ীওয়ালা দেখিয়াছিলাম, তারাই হবে।" আর একটি বৃদ্ধা কহিতেছে, "চুপ কর তাদের নামে আর কাজ নাই।" আমাদের ভোলা সিং দ্বারবানের এমন সময় দেখা নাই; সেই কহিত, "যব শুশুরা আওয়ে ত ভোলা ভাগে।" সেই কথা

প্রসমাণ জন্য সে কোন নিবিড় বৃক্ষশাখায় গা আড়াল দিয়াছে। ফলতঃ ডাকাতি যে কোন্ গ্রামে কোথায় হইতেছে, এ পর্য্যন্ত তাহার নিশ্চয় সংবাদ আইসে নাই। গঙ্গাধব জাগ্রত হইবামাত্র শুনিলেন যে গ্রামের বাবইয়াবি তলায় তামুলিদের ঘবে ডাকাত পড়িযাছে,বাবইয়ারি তলা আমাদের বাটীর নিকট, ডাকাতি দেখিতে হইবে বলিয়া মল্লবেশে বাহিব হইবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময়ে বুড়ি দাই মা কান্দিয়া জড়াইয়া ধরিল, ফলতঃ তাহাতে বিশেষ ক্ষতি নাই। অমবেন্দ্রনাথ ঐ বিষয়ের গল্পচ্ছলে বারম্বার যাহা কহিয়াছেন, তাহা আমি শুনিয়াছি।

যে সময় গ্রামে গোলযোগ হইতেছে, বাবুদের ফটকে ঢং ঢং করিয়া বাবটা বাজিল ও তার পর পাহাবাদার ঘন ঘন ঘড়িতে মুদ্গব প্রহারে যেন নিষ্ঠুব নিশারবক্ষে কতকগুলি আঘাত করিল, তাহার গোলে গোল মিশাইল। বোধ হইল যেন ডাকাতগণ আবো নিকটে আসিতেছে। সেই ঘড়ি বাজাইবার সময় অমরেন্দ্রনাথ শ্রীনগর ও শান্তিপুর-মধ্যমর্ত্তী নদীকূলে অশ্বপৃষ্ঠে উপনীত হইয়াছেন। নদীর জল অনেক মরিয়া গিয়াছে, তথাপি গভীর,পারাপার এখনও নৌকাতেই হইয়া থাকে। কিন্তু নৌকা, নাবিক সংগ্রহ করিবার সময় নাই, তিনি অপর কূলে দূরে দেখিতেছেন মসালশ্রেণী দৌড়াদৌড়ি করিতেছে "মার" "কাট" "ধর ধর" শব্দ সঙ্গে কোমলকণ্ঠনিঃসৃত শব্দ ও ক্রন্দনরোল উঠিয়াছে, অবলাগণ ঘন ঘন আশ্রয় চাহিতেছে কিন্তু কোথায় আশ্রয় পাইবে? দুই পদ অগ্রসর হয় এমন সাধ্য, এমন সাহস কার আছে? অমরেন্দ্রনাথ আরও ব্যগ্র হইলেন। তাঁহার পর মনে হইল, যেন তাঁহার কাদম্বিনী কোন নৃশংস দুর্বৃত্তের হস্তে পতিত হইয়াছেন, যেন তাহারই কাতরোক্তি শুনিতেছেন, বিলম্ব করিবার সময় নাই, অশ্বের রজ্জু ছাড়িয়া দিলেন, অশ্ব জলতরঙ্গে ঝাঁপ দিল। তীববেগে নদী পার হইয়া ঘোটকটী প্রথমে হ্রেষারব করিল, পরে ঘন ঘন গাত্র কাঁপাইয়া জলকণা সমূহ ঝাড়িয়া ফেলিল; আবার কর্ণদ্বয় পতঙ্গাকৃত করিয়া বেগে দৌড়িল। শান্তিপুব গ্রামে প্রবেশ করিবার সময় গোপাল চৌকিদার আপনাপনি বলিতেছে,"হায়! কি হইল, আমি থাকিতে এই গ্রামে এই ঘরে এমন অত্যাচার! লোকে চিরকাল নিমকহারাম বল্‌বে? কি বলিব ঘুমাইয়া ছিলাম,হস্ত পদ বান্ধিয়া খাটিয়া চাকা দিয়া দস্যুরা চলিয়া গিয়াছে,দেখি একবার দড়ি ছিঁড়িতে পারি কি না। পারি না। অতিদৃঢ় বন্ধন জোর দিতে বাগ পাইতেছি না, কেহ কি এসময় এ বন্ধন মুক্ত করে না?" অমরেন্দ্র নাথ কাতরোক্তি শুনিবামাত্র গোপালের নিকট উপস্থিত হইয়া একটী ছুরিকাতে তাহার বন্ধনগুলি কাটিয়া দিলেন, ঘোড়াটি সেই খানেই

রাখিতে কহিলেন,ও স্বয়ং পদব্রজে সিংহ বাবুদের গৃহাভিমুখে গেলেন। প্রথমতঃ বাটীর পশ্চিম পার্শ্বে উপনীত হইলেন; এখানে ডাকাতের ঘাটি বসিযাছে, এক একটি মশাল উত্তোলন করিয়া তাহার চারি পার্শ্বে চারটি করিয়া চোয়াড় চতুর্ম্মুখ একস্থানে সংলগ্ন করিয়া পা ছড়াইয়া বসিয়া রহিয়াছে,চতুষ্পার্শ্বে সমভাবে নিরীক্ষণ করিতেছে। কয়েক জন ভোতা তরোয়াল বা তরবালাকৃতি তালশাখা হস্তে লম্ফ দিয়া ডাকাত খেল খেলিতেছে, হুঙ্কার ছাড়িতেছে। কিন্তু ছাদে চিলা গৃহের পার্শ্বে কারনিসে অমরেন্দ্র নাথ কি দেখিলেন? নীচে মশালের আলো প্রায় সে উচ্চ স্থান স্পর্শ করে নাই, কেবল আভাস মাত্র লাগিয়াছে, তাহাতে দেখিতেছেন,যেন মেঘমালার ছায়াবাজির পুতুল শূন্যে আকাশপথে হেলিতেছে। কারনিসে পদ স্থাপিত একটি মূর্ত্তির আভাসমাত্র দেখিলেন, কর্ণে যেন তার কি উজ্জ্বল অলঙ্কার দোদুল্যমান রহিয়াছে। সে উচ্চ প্রাসাদ হইতে ছবিটি যেন পড়ি পড়ি করিতেছে। অমরেন্দ্র ব্যগ্রচিত্তে ভাবিলেন "কি হবে? এ কে? আমারই কাদম্বিনী না?" অমরেন্দ্রনাথ মাথার উপর দিয়া দুই হস্ত হইতে দুইটি বন্দুক ছুড়িলেন, শব্দের পর চক্ষু চাহিতে কাহার অবসর না হইতেই ঘাটি পার হইয়া দেউড়ি প্রবেশ করিলেন। বাটীর মধ্যে গিয়া দেখেন সকল দ্বারই মুক্ত, কিন্তু প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে দুই চারি জন অস্ত্রধারী পুরুষ রহিয়াছে। পশ্চাতে দেখেন গোপাল চৌকিদার আসিতেছে,সেই পথ দেখাইয়া চলিল,ডাকাইতেরা নির্ভয়। বাহির হইতে কোন আক্রমণের আশঙ্কা নাই। তাঁহাকে দেখিয়া মনে করিল ইনি গৃহবাসী কোন লোক প্রস্থান করিতেছেন। অমরেন্দ্র নাথ সত্বর প্রাসাদের উপর যেখানে আকাশে সেই ছবি দেখিয়াছিলেন,সেই-খানেই উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন একটি সাক্ষাৎ কালমূর্ত্তি গদা হস্তে ছাদের উপর দণ্ডায়মান, তাহার ভয়েই অবলা কাদম্বিনী কারনিসের উপর বসিয়া আছেন,ডাকাইত কহিতেছে,"এই দিকে আইস, না হলে তোমার নাকের ঐ বড় মুক্তাটি ছিঁড়িয়া লইব।" কুমারী কহিতেছেন, "তুই জানিস আমি তোর দেবী সাক্ষাৎ কালী, আমাকে ছুঁইবার জন্য হাত বাড়াইবি কি এই অবলম্বন ত্যাগ করিয়া ঐ নীচে পোস্তার উপরে ঝাঁপ দিব।" ভাগ্যক্রমে অমরেন্দ্রনাথ এই সময়েই তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। এক হস্তে পিস্তলের উল্টা দিক দিয়া কাল পুরুষের মস্তকে বজ্রপ্রহারে তাহাকে ধরাশায়ী করিয়া অপর হস্তে সুন্দরীর হস্তদ্বয় দৃঢ় রূপে ধারণ করিলেন। ডাকাতের হস্তদ্বয় হইতে গদকা ও মশাল স্খলিত হইয়া পড়িল। কাদম্বিনী তাঁহার উদ্ধারকর্ত্তাকে—অবলাবান্ধবকে—চিনিয়াছেন, আর ভয় নাই। কারনিস হইতে প্রাসাদে

নীত হইলেন—কিন্তু ক্ষণ মাত্র মধ্যেই অমরেন্দ্র নাথের কোলে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। নীচ লোকের নিকট আপন শস্ত্রনিপুণতা প্রদর্শন করা অমরেন্দ্র নাথের অভিপ্রায় ছিল না, তাঁহার কাদম্বিনীর উদ্ধার করাব একমাত্র উদ্দেশ্য, কাদম্বিনীকে ক্রোড়ে লইয়া গোপালের দর্শিতমত গুপ্ত পথে বাটীর বহির্দ্দেশে জলাশয়ের পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন। এখন ডাকাতেরা জানে না যে তাহাদের সর্দ্দার ছাদে মৃতপ্রায় শয্যাশায়ী হইয়াছে। তাহারা লুণ্ঠনকার্য্যে ব্যস্ত। এদিকে কাদম্বিনীর অধরে জলসেচন করায় তাহার সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইল। অমরেন্দ্র নাথ পুনরায় তাঁহাকে লইয়া গ্রামের বাহিরে আসিলেন। গোপাল চৌকিদারকে কটু দিব্বি দিয়া কহিলেন, "আমি ইহাকে তর্কালঙ্কারের আশ্রমে লইয়া যাই, তুমি কোন মতে অন্য কাহার নিকট এ ঘটনা ব্যক্ত করিও না।" অমরেন্দ্র নাথ কিঞ্চিৎ পরে আশ্রমের নিকটবর্ত্তী স্থানে উপনীত হইয়া কাদম্বিনীকে কহিলেন, "ঐ তর্কালঙ্কারগৃহে যাও, কহিও গুরুদেবই তোমাকে রক্ষা করিয়াছেন। গোপাল চৌকিদার অনেক সাহায্য করিয়াছে, দেখ যেন কোন মতে আমার নাম প্রসঙ্গে, প্রকাশ না পায়।" কাদম্বিনী আশ্রমকাননে প্রবেশ করিলেন। অন্ধকার গগন ভেদ করিয়া অমরেন্দ্রনাথ সন্তুষ্ট মনে আপনার প্রাসাদ লক্ষ্য করিয়া প্রিয় ঘোটককে চালিত করিলেন। তাহার অস্ত্র সকল শোণিত স্পর্শ করে নাই—তরবাল কোষমধ্যেই রহিয়াছে, মনে করিতেছেন, লোকের কি ভ্রম, ডাকাত মারিতে কি বীরত্ব দরকার করে? তাহারা নৃশংস বিশ্বাসঘাতকী লোক, প্রকৃত সাহসী জনকে তাহারা যম স্বরূপ দেখে।" এই প্রকার ভাবিতে ভাবিতে আসিতেছেন, এমত সময়ে দেখিলেন একটী শ্মশ্রুধারী অশ্বারোহী পুরুষ দল বলে শান্তিপুরাভিমুখে যাইতেছেন। অমরেন্দ্র নাথ একটি জঙ্গলবেষ্টিত বটবৃক্ষ পার্শ্বে স্থির ভাবে লুক্কায়িত রহিলেন। তাহাদের কথায় জানিলেন দারোগা সাহেব ডাকাত ধরিতে যাইতেছেন। কিয়ৎকাল পরেই পাটনির নাম ধরিয়া হাঁক পড়িল। কারণ পাটনি না আসিলে পুলিসের বীরগণের নদীপার হইবার উপায় কি? অমরেন্দ্র এই ভাবিয়া মনে মনে হাসিতে হাসিতে চলিতেছেন, এমন সময় আবার ঘড়ি বাজিয়া উঠিল, তিনি জানিতে পারিলেন যে, আবার ঘরে আসিলেন, আবার রোগীর বেশে শয্যাশায়ী হইতে হইবে।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

দারগার চালাকি।

বীরপুরুষ দারগার নদীপার হইতে একঘণ্টা মাত্র দেরি হইল। তিনি ওজোগুণশালী কর্ম্মণ্য কর্ম্মচারী, অপর

লোক হইলে হয় ত পার হইতে প্রভাতের তারা এখানেই উদয় হইত। পাঠক হাসিবেন না, এইরূপ চালাকিতে গোলাম রহমান "ভেরি গুড" অর্থাৎ প্রথম বর্গভুক্ত হইয়াছেন—চাল, ক্রিচ পুরস্কার পাইয়াছেন, কবে ফৌজদার হইয়া পড়িবেন। আবার লোকে বলাবলি করে আসচে দরবারে "খাঁ বাহাদুর" উপাধিও পাইবেন। যাহা হউক দারগা সাহেব অকু-স্থলে পৌছিবার পূর্ব্বেই "মাল গুড়াইয়া" ডাকাতগণ "চম্পট" দিয়াছে—গোপাল চৌকিদার আবার হাত পায়ে দড়ি বান্ধাইয়া কাঁদিতেছে, বান্ধা লোককে মারা বড় সহজ, দারগা সাহেব স্বয়ং গোপালকে দুই একটি প্রহার করিলেন—গোপাল কহিল"ক্ষমা করুন, মাল, চোর সব হস্তগত করিব। এই যে বান্ধা দেখিতেছেন এ কৌশলের কর্ম্ম, আমি খাটিয়াতে ঘুমাইতেছিলাম, প্রথমে দস্যুগণ বান্ধিয়া গিয়াছিল, পুনরায় এই পথে পলাইবার সময়ও আমাকে বান্ধা দেখিয়া গিয়াছে, মধ্যে যে আমি তাহাদের সর্দ্দারকে ছাদের উপর খুন করে রেখে এসেছি তা জানে না—এই 'বমাল' দেখুন"—এই কথা বলিয়াই গোপাল একটী বহুমূল্য অলঙ্কার দেখাইল—তার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধনমুক্ত হইল। এখনও নিশাকাশ ঘোর রহিয়াছে,অমনি দারগা দলবলসহ বাবু শিবসহায় সিংহের গৃহাভিমুখে চলিলেন, দুইজন বিশ্বস্ত পদাতিক্ সহিত দারগা সাহেব গৃহের সমস্ত স্থান পরিদর্শন করিলেন। গৃহের আকারটি ভয়ানক। সকল কপাটই খোলা, "খাই খাই" করিতেছে। গৃহবাসিগণ অপরগৃহে আশ্রয় লইয়াছে। দারগার আগমন সম্বাদে এক একজন হস্তপদভগ্ন বা অর্দ্ধদাহিত অঙ্গ ভৃত্য আসিয়া ক্রন্দন আরম্ভ করিল; কারও পৃষ্ঠে খোঁচের দাগ,কার মস্তক-ত্বক্ ভোতা তলবারে কর্ষিত—বাহিরের মালখানার ভাণ্ডারির সর্ব্বাপেক্ষা দুর্দ্দশা, তাহার নিকট হইতে কুঞ্জিকা লইবার জন্য স্থানে স্থানে মশালাগ্নিতে দগ্ধ করিযাছে, কারণ রাঙ্গা ঠাকুরাণীর প্রদত্ত দুই সহস্র টাকার থলিটি তাহারই জিম্মায় ছিল। গৃহের চতুষ্পার্শ্বে অর্দ্ধদগ্ধ মশাল, টাঁটি, তৈলভাণ্ড, তাল-শাখা-নির্ম্মিত চূণলেপিত তরবাল প্রভৃতি স্থানে স্থানে পতিত, বহির্দ্বারে কপাটে কয়েকটি টাঙ্গির প্রহার মাত্র দৃষ্ট হইল। বৃদ্ধ রামা ভৃত্য কহিল, "আমি সত্যনারায়ণের পূজান্তে শিরণি বণ্টন করিয়া তামাক খাইতেছি আর বেটারা হঠাৎ আসিয়া পড়িল। কপাট ভালরূপ বন্ধ করিতে পারি নাই, একটী মাত্র খিল দিয়াছিলাম,ভাঙ্গিয়া ফেলিবার উদ্যোগ দেখিয়া ঐ পূজার দালানের বড় সিঁড়ির নীচে ফুকরে হামা দিয়া লুকাইয়াছিলাম।" দারগা কহিলেন," তুমি অবশ্যই দুই চার জন ডাকাইতকে চিনেছ।" রাম কহিল, "তা বড় বলিতে পারি না।" দারগা মনে মনে ভাবিলেন, না বলিলে কেন হবে। দুই চার

জনকে না চিনিলে এমন বড় মোকর্দ্দমা প্রমাণ হয়? এই কথার পর দারগাসাহেব, দুইজন বিশ্বস্ত পদাতিক ও গোপাল চৌকিদার সঙ্গে প্রাসাদোপরি আরোহণ করিলেন, তথায় দেখিলেন, এক কাল-মূর্ত্তি ভীষণকায় দস্যু মৃতপ্রায় হইয়া প্রাসাদে পড়িয়া রহিয়াছে। সর্ব্বাঙ্গে তৈল মর্দ্দিত, রক্তপ্লাবনে কেশদল ভিজিয়া অঙ্গে কয়েকটি রেখা হইয়া ফোঁটা ফোঁটা করিয়া ছাদে পড়িয়াছে; এক ক্ষুদ্র বস্ত্র দস্যুর শ্মশ্রু কর্ণদ্বয় হইয়া মুণ্ডচূড়ে আবদ্ধ—কপাল, চক্ষু, নাসিকার যে ভাগ বস্ত্রের বাহিরে রহিয়াছে তাহা কালিতে লেপিত ও সেই প্রলেপের উপর বৃহৎ বৃহৎ চূণের ফোঁটা। ঊষা উপস্থিত, কিন্তু গগন এখনও ঘোর রহিয়াছে, দস্যু নয়ন বদ্ধ করিয়া রহিয়াছে অনেক চেষ্টাতেও কোন উত্তর দিল না। সে আর কথা কহিবে না, লজ্জায় মুখ দেখাইবে না, তাহার ধাতু ক্ষীণ হইয়াছে, ডাক্তার সাহেবের পরীক্ষা জন্য প্রেরণ করা আবশ্যক বোধ হইল। দারগা তাহারই উদ্যোগের জন্য একজন পদাতিককে সত্বর নিম্নে পাঠাইলেন, পরে গোপাল চৌকিদারকে লইয়া দস্যুর অঙ্গান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। লুণ্ঠিত দ্রব্য মধ্যে ডাকাতের কোমরে কুঞ্চিত বস্ত্রে মোহরের একটি থলি, কয়েকটি রত্নখচিত অঙ্গুরী একটিতে স্বয়ং শিবসহায় সিংহের নাম সন তারিখ মুদ্রিত, আর একটী থলিতে কতকগুলি জড়ওয়া অলঙ্কার বাহির হইল। দারগা কহিলেন "মর দিয়া—ডাকাইতও ধরিলাম, মালও বাহির হইল"—গোপাল কহিল "আমারও নেকনামি হইতে পারে—"

দারগা কহিলেন, আমার হলেই তোর; তোরও পুরস্কার না হবে কি?

রামা কহিল এত মালের চতুর্থাংশও নয়, এক বাহিরের সিন্ধুক হইতেই নগদ দুটি হাজার টাকা গেছে—কাল সন্ধ্যার পরেই তা আমদানি হয়েছিল। দারগা বিরক্ত হইয়া কহিলেন "তোদের ঐ সব বাহুল্য কথা—মোকদ্দমা মিছা সঙ্গিন করা কি ভাল, টাকা ছিল? টাকা ছিল? তুই দেখেছিলি? বল দেখি—"

দারগা সাহেবের ভঙ্গি দেখিয়াই রামা কহিল "দেখি নাই, শুনিয়াছিলাম—" তবে শুনা—সে কথায় কাজ নাই, এখন ত্বরায় লাশ চালান করা চাই—কয়েকটী চৌকিদার দ্বারা দস্যুকে প্রাসাদ হইতে বাহির বাটীতে আনয়ন করা হইল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার অঙ্গ মায়না হইয়া শুরথালের কাগজ প্রস্তুত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরেই একটি চালান দ্বারা বাঁশের খাটুলির উপর অচিহ্নিত পুরুষের লাস বাহিত হইল। গ্রাম হইতে কিয়দ্দূর যাইয়া প্রাতঃসমীরণে দস্যুর কিঞ্চিৎ সংজ্ঞা হইল—গোঙ্গা স্বরে কহিল "তোদের চিনি রে—জল দে।" একজন চৌকিদার কহিল "সমদ্ধিকে ভূতে পেয়েছে আমার কাছেও ঔষধ আছে, এই কুড়ালের এক প্রহারেই মাথাটি ভাঙ্গিয়া দিব।" রঘুবীর

এই ছদ্মবেশী দস্যু, আর কেহ নহে—ভয় পাইল। তৃষ্ণায় প্রাণাবশেষ, তবু পরশুর প্রহারভয়ে মুখ বন্ধ করিয়া শাস্তি ভোগ করিতে লাগিল।

এদিকে দারগা সাহেব অনেক জাঁক জমক করিয়া তদারকে প্রবৃত্ত। মালের অর্দ্ধেক মোহর ও অলঙ্কার আত্মসাৎ করিয়াছেন। তিনি বিলক্ষণ জানিতেন শতকরা ৫০ টাকার মূল্যের দ্রব্য উদ্ধার হইলেই পুলিষের কৃতকার্য্যতার উত্তম পরিচয় দেওয়া হয়—ছোট সাহেব বড় সাহেব সকলেই সন্তুষ্ট থাকেন অতএব সেই পরিমাণেই দ্রব্য উদ্ধার করিয়া দিলেই যথেষ্ট হইবে। অপহৃত ব্যক্তির কিছু ক্ষতি হইবে কিন্তু তাহাতে তাঁহার নিজ লাভের ও নিজ কার্য্যদক্ষতার কি ক্রটি হইবে? ফলতঃ আর চারি পাঁচজন আসামি ও সাক্ষী চাই—দুই একজন একরারী হইলে কেমন হয়? তাইদ আনন্দরাম বাঁড়ুয্যে হাসিয়া কহিয়া উঠিলেন "তবে ত সোনায় সোহাগা মহাশয়" কিন্তু এ সকল তদ্বির জন্য প্রতিপত্তিশালী দেওয়ানজী গজানন চৌধুরী মহাশয়ের সাহায্য আবশ্যক।

পাঠক একবার গজাননের গোশালার প্রাঙ্গণকোণে নয়ন নিক্ষেপ কর। তথায় গজানন রাত্রিশেষে যা কিছু মাল পাইয়াছেন উড়াইতে পুড়াইতে ফুঁকিতে ব্যস্ত। টাকার তোড়া দুইটী নিজ ধনাগারে বন্ধ করিয়াছেন, কেবল বাহককে দুই হাতে দুই ফাকা মুষ্টিতে কয়েকটি টাকা উড়াইয়া পুরস্কার দিয়া বিদায় করিয়াছেন, জানিতেছেন বন্ধুবীর এখন কিয়দ্দিবসের জন্য স্থানান্তরে "গাঢাকা" দিয়াছে—দারগা সাহেবের লোক আসিয়া তাঁহার ফটকে বসিয়াছে, খবর পাইলেন। গজানন কহিলেন, গরজ পড়িলে অনেক লোক তল্লাস করে—সংবাদ পাঠাইলেন যে তাঁহার হাতে অনেক কর্ম্ম, সব শেষ করে কল্য প্রাতে দারগা সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিব। দেওয়ানজি বুঝিয়াছেন যে "যেমন তিনি সর্প হইয়া কাটিয়াছেন, ওঝা হইয়া আবার বিষ ঝাড়িবেন।"

আবার দারগার নিকট গজাননের আসিবার বিলম্ব সম্বাদ পৌঁছিবামাত্র গোলাম রহমান ক্রুদ্ধ হইলেন, তাঁহার চক্ষু স্বভাবতঃ আরক্তবর্ণ আর দুই গোঁফ রাঙ্গা হইল। দাড়ি আঁচড়াইতে লাগিলেন। এবং কহিলেন এই পল্লী ত এখন শ্রীনগর জমিদারীর অন্তর্গত? দেওয়ানজী এ ঘটনার কোন সম্বাদ দেন নাই, কুস্কে বাঁক সারিব—বাঁড়ুয্যে অনন্তরামকে হুকুম নামা লিখিয়া গজাননের কৈফিয়ত তলব করিতে অনুমতি দিলেন। এই অক্রু গোপন করিবার চেষ্টার জন্য জমিদারের নামে কেন না পৃথক্ অভিযোগ করা যাইবে? সঙ্গে সঙ্গে একজন পদাতিক আবার গজাননের নিকট হুকুম নামা লইয়া দৌড়িল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বিদেশ যাত্রা।

এদিকে আমাদের নগরে যাত্রা করিবার দিন উপস্থিত। নীলমণি মায়াতে মুগ্ধ—"কানকাটা" "ফটকা" "ছব্‌লা" "বাঘা," "বেঁড়ে" "আহ্লাদে'—তাহার এক পাল প্রিয় কুক্কুর রহিয়াছে; আবার ছবলা, পরুপা, মুখি, গলাফুল ও গ্রহবাজ এক "খাপান" কবুতর ভিন্ন ভিন্ন কাবুতে পালিত হইত, যখন কপোতদল প্রাতে উড়িত ও তণ্ডুল বিতরণ হইত তখন নীলমণি বাবু দ্বিতীয় লক্ষ্ণৌয়ের নবাবের তুল্য হু হু আ—আহা শব্দে উন্মত্ত হইতেন, তাঁহার বড়ই আমোদ হইত। কেমন করিয়া এই সকল প্রিয় পালিত জীব ছাড়িয়া যাইবেন এই চিন্তায় চঞ্চল হইয়াছেন। এমন সময় গোলা বাটীর দ্বারে পুঁটে বাগ্‌দি আসিয়া উপস্থিত। নীলমণি বাবুর দিকে চাহিয়াই পুঁটে কহিল, ইহার চিন্তা কি, এই চার মাস বাদে বাবুজীর বিবাহ হইবে, বর সাজিয়া আসিবেন, এ দাস আপনার সকল সামগ্রী রক্ষা করিবে, এক মুঠ টাকা দিয়া যাবেন, খুব চাল ছোলা খাওয়াইয়া পায়রা কুক্কুর মোটা করে রাখিব।

নীলমণি কহিল তাকার অভাব কি? বাবার যে চোরা কুঠারিতে তাকা থাকে সব দেখিছি, তুই চাবি আন্‌তে পারিস? পুঁটে কহিল, আমার জ্যেঠা রঘুবীরের অনেক চাবি আছে। সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে পুঁটে এক গোছা চাবি আনিল। নীলমণি বস্ত্র মধ্যে ঢাকিলেন—অন্তরে মাতা ঠাকুরাণীর নিকট গিয়া কহিলেন "মা! আগামী কল্য প্রাতে আমরা যাইব!" গৃহিণী কহিলেন "ষাট যাই বলিতে নাই বাছা, কাল আস্‌বে।" নীলমণি এ আসা যাওয়ার প্রভেদ কিছু বুঝিতে পারিলেন না কিন্তু সেদিকে এখন সুবুদ্ধি চালনা করিবার অবসর নাই। কহিলেন "মা বাবা ডাবগার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছেন, আমরা ছাদে যাইয়া পায়রা গুলি গুণিয়া পুঁটের জিম্মা করিয়া আসি, কুঁজি দাও।" নীলমণি সোহাগের ধন, তাহার ইচ্ছা অন্যথা হইবার নহে, কুঁজি লইয়া পুঁটের সঙ্গে সঙ্গে গৃহের উপর দ্বিতীয় তলে যাইলেন। গজাননের ধনাগার একটি ক্ষুদ্র কুঠারী, তাঁহার শয়নঘরে প্রথমতঃ প্রবেশ করিতে হইবেক। সেই ঘরের মধ্যে ছাদের সোপানতলে আর একটি ক্ষুদ্র দৃঢ়দ্বার বিশিষ্ট ডবল তালা বন্ধ, লোহার পাত হুড়কা, অর্গল, লোহার গোল মেক সংলগ্ন ক্ষুদ্র গৃহ দ্বার, এটি ঘরের ভিতর ঘর। এখানে দস্যু চোরের প্রবেশ করিবার সাধ্য নাই কিন্তু ঘরের চোর হইলে কোন দ্বার ভেদ না হইতে পারে? যে রিং সহিত কুঁজি গুলি নীলমণি আপন মাতার নিকট হইতে আনিলেন, তাহার মধ্যে গজাননের শয়নগৃহদ্বার খুলিবার সুবিধা হইল। সেই দ্বার খুলিয়াই চাবির উপর চাবি প্রবেশ করাইয়া ধনাগারের তালা খুলিবার চেষ্টা হইল।

কিঞ্চিৎ কাল মধ্যেই নীলমণি ও পুঁটে উভয়ে ঘর্ম্মসিক্ত হইলেন। নীলমণি সকল দিকে সুবুদ্ধি, দক্ষিণে হেলাইতে বামে কুঞ্জিকা হেলাইয়া ক্লান্ত হইলেন; বসিয়া পড়িলেন ও কহিলেন "পুঁটে! টুই ডেখ।" যতই হউক পুঁটে চোরের গোষ্ঠী পেঁচ বুঝিত, তাহার কুঁজিতেই একটী চাবি খুলিল, আবার চেষ্টাতে কস্তা কস্তিতে কিঞ্চিৎকাল মধ্যে আর একটী তালাও খুলিল এখন নীলমণি পুঁটের প্রতি নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন "টুই খুব বাহাডুর।" এই সন্তুষ্টি ঈশ্বর দত্ত, অদ্য হউক কল্য হউক না হয় দুই দিন বাদেই হউক "চোরের ধন বাটপাড়ে" পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তেই যাইবে। তালা খুলিল, বাহির হইতে ভিতরের অর্গল এক পেঁচেই খুলিল। কুঠারীর মধ্যে—নরকাকাশ ঘোর অন্ধকার—অন্ধকারে পাপকার্য্যে অর্জ্জিত পাপের কোষের উপযুক্ত স্থানে গজাননের বহুধন স্থাপিত হইয়াছে। এই আলোকবর্জ্জিত স্থানে নীলমণি প্রবেশ মানসে দ্বারমধ্যে মস্তক সমর্পণ করিলেন। করিবামাত্র চিক্ চিক্ শব্দ শুনিলেন, অমনি ত্রাসে বাহিরে আসিলেন, "এর ভিটর কিরে?" পুঁটে কহিল "চামচিকা" নীলমণি কহিল "ওরে! চর্ম্ম চটি" পুঁটে আবার কহিল আমিই ভিতরে যাই। নীলমণি কহিলেন "হাট বাড়া, ডেক, কিসে হাত পড়ে।" কুঠারীর অন্তর স্থান তোড়ায় তোড়ায় আবদ্ধ, হস্ত প্রক্ষেপ করিবামাত্র একটীতে হাত লাগিল। পুঁটে বাহিরে আনিয়া মুখের বন্ধনরজ্জু কর্ত্তন করিল। এটি শিব সিংহের গৃহ হইতে অপহৃত দুই সহস্র মুদ্রার থলি। দুই জনে চারি মুঠা ভরিয়া যত পারিল টাকা বাহির করিয়া একটি বস্ত্রাংশে বান্ধিলে, পুটলিটি বড় হইল, কেমন করিয়া লইয়া যাইবেন ভাবিতে লাগিলেন। পুঁটে কহিল বেশ বুদ্ধি আছে। কুঠারীর কপাটটী শীঘ্র বন্ধ করিয়া কহিল আমি গৃহের পশ্চাতে ময়দানে যাইয়া দাঁড়াই, আপনি এই জানালার রেলমধ্য দিয়া তোড়াটি ফেলিয়া দিন। কহিয়াই পুঁটে প্রস্থান করিল। নীলমণি পুটলি নিম্নে নিক্ষেপ করিলেন, পুঁটেকে দৌড়িয়া যাইতে দেখিয়া নীলমণির মাতা ভীতা হইলেন। মনে করিলেন তাঁহার নীলমণি একা সন্ধ্যা বেলা ছাদে রহিয়াছে। "নীলমণি নীলমণি" জপোচ্চারণ করিতে করিতে উপরতলে উপস্থিত। নীলমণি চমকিত হইয়া বারান্দায় আসিলেন ও কহিলেন, পায়রা ধরিতে ঘামে ভাসিয়াছি এই বাতাসে বারান্দায় এখন বসি।

পরদিন প্রাতে আমাদের যাত্রিক লগ্ন উপস্থিত। তর্কালঙ্কার মহাশয় আশীর্ব্বাদী পুষ্প লইয়া উপস্থিত; মাথায় ফুল দিয়া তিনি অপরস্থানে চলিয়া গেলেন। মাতা সস্নেহবদনে আমার মস্তকোপরি আপন সুকোমল হস্তে ধরিয়া আপনার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম মনে মনে উচ্চারণ করিয়া সেই দেবীর হস্তেই আমার শুভাশুভ চিরদিনের জন্য অর্পণ করিলেন।

মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহার নয়ন অশ্রুতে বিসিক্ত হইল। গঙ্গাধর বড় নিষ্ঠুর, নগরে যাইবে, জ্ঞানলাভ করিবে, নূতন নূতন দেশ ও কত প্রকার মনোহারী দ্রব্য দেখিবার আশয়ে আহ্লাদিত। এখনও নির্ব্বোধ—এখনও অজ্ঞান অন্ধ জানে না যে, যে ধন আজ ত্যজিয়া যাইতেছে তাহার স্বরূপ গুরুতর নিস্বার্থ স্বর্গীয় পদার্থ জগতে আর কোথাও পাইবার নাই। সেই ধন সুপবিত্র চিরানন্দদায়ী মাতৃস্নেহ। সেই ধন হারাইলে তত্তুল্য বস্তু এই পৃথিবীতে আর পাইবার সম্ভাবনা নাই। সেই ধন না হারাইলেও তাহার প্রকৃত মর্ম্ম কেহ জানে না, যাহারা হারাইয়াছে তাহারাই জানিয়াছে। মাতার কাতরতা দেখিয়াই আমার সব উৎসাহ শেষ হইল। মন কান্দিল, আঁখিতে কেহ জল দেখিয়া ছিল কি না সন্দেহ কিন্তু অন্তঃকরণ একান্ত অস্থির হইল। সেই অস্থিরমনে গৃহ ত্যজিয়া গ্রামের বহির্দ্দেশে আসিলাম। দেখিলাম একটী পুষ্করিণীর তটে প্রিয়অনুচরগণ নগেন্দ্র, গোপাল, প্রিয়তম ভগিনী প্রফুল্লআহীন বদনে আমার দিকে চাহিতেছেন, কাঁদিতেছেন প্রফুল্ল আমার প্রিয় হরিণ শাবকটীকে ধরিয়া কহিতেছে "দাদা এটী থাকে না, তোমার সঙ্গে যাইতে চায়।" আমার সব উৎসাহ নিঃশেষ হইল। এই দুইটি নির্ম্মলা প্রীতির পদার্থ দেখিয়া অশ্রুধারা বহিল। দায় মা একবার চীৎকার করিয়া কান্দিয়া উঠিল, উভয়ে উভয়ের দিকে দেখিতে দেখিতে চলিলাম। অনেক দূর আসিয়া দূরাকাশ উভয়কে উভয় হইতে প্রভেদ করিল।

গ্রামান্তরে আসিয়া দেখিলাম, নীলমণির পালকী নদীতটে উপস্থিত। একটি বেঁড়ে কুকুর সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছে ও পাল্কির ছাদে একটি পিঞ্জরে কতকগুলি গোলা পায়রা আনিয়াছেন। মনে করিলাম বিদ্যাভ্যাসের বিলক্ষণ সরঞ্জাম হইয়াছে।

বাঙ্গালা বর্ণমালা সংস্কার।

আমরা এই প্রস্তাবের অবতারণায় যে মত গুলি উদ্ধৃত করিয়াছি তাহার সকল গুলিই প্রায় বিদেশীয় পণ্ডিতের। এদেশীয় পণ্ডিতের মধ্যে অতি অল্প লোকেই এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। যাহা হউক আমাদের দেশের প্রধান স্কলার (scholar) ডাক্তর রাজেন্দ্রলাল মিত্রের এতদ্বিষয়ক মতটী প্রকাশ না করায় প্রস্তাবটী এ পর্য্যন্ত অপূর্ণ রহিয়াছে বলিতে হইবে। সুতরাং এস্থলে তাঁহার মতটি প্রকাশ করিয়া আমরা প্রস্তাব সম্পূর্ণ করিবার ইচ্ছা করি।

হিন্দীভাষার মূল নিরূপণ নামক প্রস্তাবে* রাজেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন—

"The question is one of great importance. It has already engaged the attention of some of the most distinguished scholars of Europe and it would be presumptuous on my part to dispose it off at the fag-end of an article in a different subject. But as a native, who feels deeply interested in the prospect of the vernacular of his country, I can not allow this opportunity to pass without observing that the question has been hitherto discussed mainly, if not entirely, from an European stand point. The benefits which European scholars, officials and missionaries are to derive by substituting the Roman characters in their writing and printing the Indian dialects, are what have been most elaborately discussed, but little consideration has been shown as to the advantage which the natives are to derive by accepting the Roman as a substitute for their national alphabet. It is that point therefore that I wish to discuss the question here."

"অর্থাৎ বিষয়টী অতি গুরুতর, ইহার প্রতি অনেক অনেক প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ মনোনিবেশ করিয়াছেন। অপর প্রস্তাবের প্রসঙ্গে এইরূপ একটী গুরুতর বিষয়ের সমালোচনা করা আমার পক্ষে অবিমৃষ্যকারিতা হইলেও আমি যখন এদেশীয় এবং এতদ্দেশীয় ভাষার উন্নতিতে লাভ বিবেচনা করি তখন আমি এখানে ইহা না বলিয়া থাকিতে পারি না যে, আজ পর্য্যন্ত এ বিষয়ে যে সকল মত প্রকাশিত হইয়াছে ইউরোপীয়দিগের সুবিধাই তাহাদিগের সম্পূর্ণরূপে না হউক প্রধান লক্ষ্য করা হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় ভাষা সকল রোমান বর্ণমালায় লিখিত বা মুদ্রিত হইলে ইউরোপীয় বিদ্যোৎসাহী, মিসনরী বা কর্ম্মচারীদিগের যে সকল উপকার হইতে পারে তাহাই পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বিচার করা হইয়াছে কিন্তু দেশীয় বর্ণমালার পরিবর্ত্তে রোমান বর্ণমালা ব্যবহার করিলে দেশীয়দিগের কি লাভ হইবে তদ্বিষয় বিবেচনা করা হয় নাই। অতএব সেই উদ্দেশ্যেই আমি এস্থলে এতাদৃশ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলাম।"

"ভাষাতত্ত্বের নিয়মানুসারে বিবেচনা করিয়া দেখিলে নাদ সমুদয়কেই প্রচলিত ভাষাদিগের সার বলিয়া বোধ হয় এবং ইহাও জানা যায় যে ঐসকল নাদ

* See Journal of the Asiatic Society No. v 1864.

প্রকাশকারী বর্ণ বা চিহ্নের আকারের সহিত ভাষার কিছুই সম্পর্ক নাই। অর্থাৎ 'কমল' এই শব্দকে 'Kamala' এই রূপে লিখিলে ভাষার কিছুমাত্র হানি হয় না। এক্ষণে দেখ যদি ঐ সকল বর্ণের আকারবিশেষ গ্রহণ করিলে লিপি ও মুদ্রাঙ্কির সৌকর্য্য হয় এবং উচ্চারণও যথাবৎ প্রকাশিত হয় তাহা হইলে জাতীয় গর্ব্বকে জলাঞ্জলি দিয়া সেইরূপ বিশেষ আকারের ব্যবহার অবশ্যই উচিত। কিন্তু অস্মদ্দেশীয় বর্ণমালা স্থলে রোমান বর্ণমালা ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার হইবে কি না তাহা সম্পূর্ণ সন্দেহস্থল। পৃথিবীর পণ্ডিত মাত্রেই রোমান বর্ণমালার অপূর্ণতার বিষয় স্বীকার করিয়া থাকেন। বড় বড় পণ্ডিতদিগের মতে সংস্কৃত বর্ণমালার মত সম্পূর্ণ বর্ণমালা আর দৃষ্টিগোচর হয় না অতএব তাদৃশ সম্পূর্ণ বর্ণমালা স্থলে একটী অপূর্ণ বর্ণমালা ব্যবহার কখনই যুক্তিসঙ্গত নহে এবং তাহা দ্বারা অভিপ্রায় সিদ্ধিরও সম্ভাবনা নাই।"

"সত্যবটে দেশীয় হিন্দী প্রভৃতি ভাষায় নানাবিধ কোণশালী অক্ষর থাকায় তাহা লিখিতে অনেক সময় লাগে। এপক্ষে তৎতৎ বর্ণমালা অপেক্ষা রোমান বর্ণমালার শ্রেষ্ঠতা অবশ্যই স্বীকার্য্য কিন্তু একমাত্র লিপিসৌকর্য্যই বর্ণমালার উত্তমতার সাধক নহে। আরও দেখ যদি রোমান বর্ণমালায় সম্যক্ প্রকার লিপি সৌকর্য্য গুণ থাকিত তাহা হইলে বক্তৃতাদি লিখিবার নিমিত্ত নানাবিধ লঘু হস্ত লিপির short (hand wirting) কেন আবিষ্কার হইত। ইহাও সচরাচর দেখা গিয়া থাকে যে আদালতে ইংরেজি ভাষায় সাক্ষী জবানবন্দী প্রভৃতি রোমান বর্ণমালায় লিখিতে যে সময় লাগে, বাঙ্গালা উর্দ্দু সাক্ষী জবানবন্দী নিজ নিজ বর্ণমালায় লিখিতে তাহা অপেক্ষা অধিক সময় লাগে না। বিশেষ যখন ইহা বিবেচনা করা যায় যে, রোমান বর্ণমালায় দেশী ভাষা সকল লিপিবদ্ধ করিবার সময় দেশীয় বাক্যের ঠিক ঠিক উচ্চারণ প্রকাশ করিবার নিমিত্ত অনেক অক্ষরে বিন্দু ভাস, কথা প্রভৃতির যোগ না করিলে চলিবে না, তখন যে লিপিসৌকর্য্যের নিমিত্ত ইহার ব্যবহার অভীপ্সিত হইয়াছিল তাহা সুদূরপরাহত হইল। লেপসিয়স সাহেব দেশী অক্ষর লিখিবার জন্য যে রোমান বর্ণমালা প্রস্তুত করিয়াছেন তাহাতে ১৮৯ প্রকার বিভিন্ন বর্ণ প্রস্তুত হইয়াছে। তাহাতে এরূপ নূতন নূতন আকারের অক্ষর সন্নিবেশিত হইয়াছে যে তাহা লেখা দূরে থাকুক পরিচয় করাই কঠিন। রোমান অক্ষরে দেশীয় ভাষা সকল লিখিবার জন্য যতগুলি পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়াছে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে এরূপ একতা নাই যে, তাহাদের মধ্যে যে কোন একটি সমুদয় ইউরোপে বোধগম্য হইতে পারে।"

"কেহ বলিয়াছেন যে হাঁ আপাতত

দেশী ভাষা লিখিবার জন্য রোমান বর্ণমালায় কতকগুলি চিহ্নের যোগ করিতে হইবে বটে কিন্তু পরে ভারতবর্ষীয়েরা যখন ইহাতে সম্যক্ পরিচয় লাভ করিবে তখন তাদৃশ চিহ্ন ব্যবহারের কোনরূপ আবশ্যকতা হইবে না এবং ঐ সকল চিহ্ন ত্যাগ করিলে যে লেখনাদির সমধিক সৌকর্য্য সাধিত হইবে তাহা বলা বাহুল্য। এ যুক্তি যে সম্পূর্ণ ভ্রমাচ্ছন্ন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইহার অকিঞ্চিৎকারিতা দেখাইবার জন্য নীচে একটি উদাহরণ দেখান যাইতেছে। হিন্দুস্থানে কুটিয়াল হিন্দী নামক এক প্রকার দেবনাগর অক্ষর ব্যবহার হয় ইহাতে মাত্রা বা স্বর চিহ্ন কিছুই থাকে না কেবল ব্যঞ্জনবর্ণের বিন্যাস করা হয় মাত্র। কোন সময় একজন গমস্তা আগরা হইতে তাহার মনিবের বাড়ী ঐ রূপ অক্ষরে এই অভিপ্রায়ে এক চিঠী লেখে যে—

"বাবু আজমীর গয়ে বড়ীবহী ভেজ দিজীয়ে" বাবু আজমীরে গিয়েছেন বড় খাতা খানি পাঠাইয়া দিবেন। বাবুর বাড়ীর লোকেরা পাঠ করিল "বাবু আজ মর গয়ে বড় বহু ভেজ দিজীয়ে" বাবু আজ মরে গেছেন বড় বহুকে পাঠাইয়া দিবেন, সতী হইবার অভিপ্রায়ে অথবা মুখাগ্নি প্রভৃতি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার নিমিত্ত!!! গল্পটী সত্য হোক বা না হোক উপযুক্ত চিহ্নাদির যোগ না করিয়া ভারতবর্ষীয় ভাষায় রোমান বর্ণমালা ব্যবহার করিলে ইহা অপেক্ষা যে অধিক গোলযোগ হইবে সে বিষয় কোন সন্দেহ নাই।"

"এইরূপ চিহ্ন যোগ করিয়া রোমান অক্ষর ব্যবহার করা নেটিবদিগের পক্ষে ত সুকর নহেই; ইউরোপীয়দিগের পক্ষেও বিলক্ষণ কঠিন, কারণ প্রথমে তাঁহাদের বর্ণপরিচয় গ্রন্থ হইতে সচরাচর যে রোমান বর্ণগুলি লিখিত, তাহাদিগকে দূরীভূত করিয়া তাহাদের স্থানে লেপসিয়স বা মোক্ষমূলর প্রদর্শিত পদ্ধতি অনুসারে বর্ণ স্থাপন করিতে হইবে। তাহার পর ভারতবর্ষীয় ভাষা সকল লিখিবার জন্য ঐ সকল বর্ণ প্রয়োগ শিক্ষা করিতে হইবে। কেবল যথেচ্ছরূপে বর্ণ প্রয়োগ করিলে হইবে না যাহাতে সমুদয় দেশে সকল লোকে অক্লেশে পাঠ করিতে পারে সেইরূপ নিয়মাদির আবিষ্কার করিতে হইবে। এক্ষণে দেখ ২৬টী অক্ষর স্থলে ১৮৯ এতগুলি অক্ষর শিক্ষা করিতে কোন ইউরোপীয় সহজে সম্মত হইবেন না, তাহার পরে ত অন্য নিয়ম। ফল বিদেশীয় ভাষা শিক্ষা করিবার নিমিত্ত যাহাদের সময় আছে এবং আগ্রহ আছে তাহাদের পক্ষে সেই সেই ভাষার বর্ণমালা শিক্ষা কিছু কঠিন নয় বর্ণমালা শিক্ষা করিতে অতি অল্পমাত্র সময়ই ব্যয়িত হয়। আর যিনি অল্প সময় ব্যয় করিয়া বর্ণমালা শিক্ষা করিতে অক্ষম তিনি যে ভাষা শিক্ষা করিবেন তাহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না।"

পরিশেষে রাজেন্দ্র বাবু সিদ্ধান্ত করি-

য়াছেন যে "বাবেলস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিবার সময় মানবজাতির উপর যে শাপ নিপতিত হয়, তাহা অদ্যাপি আমাদের উপর প্রভুতা করিতেছে অতএব এক্ষণে এক রূপ ভাষা বা একরূপ বর্ণমালা প্রচার করিবার প্রয়াস বিফল মাত্র!।"

অশোক।*

প্রাচীন ভারতবর্ষে যত রাজা রাজত্ব করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অশোক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অশোকের প্রতাপ ও অশোকের শাসন এক সময়ে পাটলীপুত্র হইতে হিন্দুকুশ পর্য্যন্ত, ধাযুলী হইতে কটক পর্য্যন্ত, এবং ত্রিহুতের উত্তরাংশ হইতে গুজরাট পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিল। হোমার অবিসম্বাদিতরূপে বীররসের শ্রেষ্ঠ কবি নহেন, দিমস্থিনিস অবিসম্বাদিতরূপে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাগ্মী নহেন, নেপোলিয়ন অবিসম্বাদিতরূপে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীরপুরুষ নহেন, কিন্তু অশোক সমুদয় প্রাচীন নরপতিগণের শ্রেষ্ঠ। তাঁহার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। তিনি অন্যান্য নৃপতিদিগকে এতদূর পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়াছেন যে, তাঁহাদিগকে কখনই তাঁহার পার্শ্বে উপস্থাপিত করা যায় না।

মহারাজ অশোক সুপ্রসিদ্ধ পাটলীপুত্ররাজ বিন্দুসারের পুত্র। যে চন্দ্রগুপ্তের শাসনমহিমা এক সময়ে যুনানী সম্রাট্গণের গৌরবস্পর্দ্ধী হইয়াছিল, যাঁহার সময় হইতে প্রাচীন ভারতের অন্ধকারাচ্ছন্ন ইতিহাস অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট ও আলোকিত হইয়াছিল; অশোক সেই মৌর্য্যকুলগৌরব মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র।

বিন্দুসার যখন পাটলীপুত্রে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন চম্পাপুরীবাসী একজন ব্রাহ্মণের নিকট একটী কন্যারত্ন লাভ করেন। কন্যার নাম সুভদ্রাঙ্গী। সুভদ্রাঙ্গীর সম্বন্ধে একদা গণকেরা কহিয়াছিলেন, ইনি একজন প্রসিদ্ধ রাজার মহিষী ও একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নরপতির মাতা হইবেন। ব্রাহ্মণ এই ভবিষ্যদ্বাণী ফলবতী করিবার আশায় তনয়াকে বিন্দুসারের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করেন।

বিন্দুসার কন্যাটিকে পাইয়া অন্তঃপুরে রাখিলেন। কিন্তু সুভদ্রাঙ্গীকে দেখিয়া অন্তঃপুরবাসিনী মহিষীদিগের নিদারুণ ঈর্ষার সঞ্চার হইল। তাঁহারা সুভদ্রাঙ্গীকে সর্ব্বদা নিকৃষ্ট কার্য্যসাধনে নিয়োজিত রাখিতেন। ক্রমে তাঁহার প্রতি ক্ষৌর-

* Proceedings of the A. Soc. Beng. No. 1, 1879. Wheeler's India, III. &c. &c.

কার্য্যের ভার সমর্পিত হইল। সুভদ্রাঙ্গী তাহাতে অপমানিতা বোধ না করিয়া এই কার্য্যে সাতিশয় মনোযোগী হইলেন। একদা রাণীগণের আদেশে তিনি মহারাজ বিন্দুসারের সেই কার্য্য সম্পাদন করেন। মহারাজ বিন্দুসার সুভদ্রাঙ্গীর কার্য্যপটুতা দর্শনে সাতিশয় প্রীত হইয়া তাঁহার যে কোন প্রার্থনা পূরণে প্রতিশ্রুতা হইলেন। সুভদ্রাঙ্গী ইহাতে বিন্দুসারের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইবার প্রস্তাব করিলেন। বিন্দুসার তাঁহাকে কোন নীচবংশোদ্ভবা মনে করিয়া এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। তাহাতে সুভদ্রাঙ্গী উত্তর করিলেন, "আমি ব্রাহ্মণতনয়া। পিতা আপনার সহিত বিবাহ দিবার ইচ্ছা করিয়াই আমাকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন।" সুভদ্রাঙ্গীর এই উত্তরে ভূতপূর্ব্ব সমস্ত বিবরণ বিন্দুসারের স্মৃতিপথবর্ত্তী হইল। বিন্দুসার তাঁহাকে যথাবিধানে বিবাহ করিলেন। সুভদ্রাঙ্গী ক্রমে নিজগুণে অন্তঃপুরের প্রধানা মহিষী হইলেন।

এই দম্পতী হইতে অশোকের উদ্ভব হয়। কথিত আছে পুত্রমুখ নিরীক্ষণে মাতার শোক দূরীভূত হওয়াতে ভূমিষ্ঠ সন্তান অশোক নামে অভিহিত হয়। কিন্তু সুভদ্রাঙ্গীর কি শোক ছিল তাহা প্রকাশ নাই। অশোক অতি কদাকার ছিলেন; আকৃতির সঙ্গে অশোকের প্রকৃতিও সাতিশয় অপ্রীতিকর হইয়াছিল। এজন্য তিনি "চণ্ড" নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। বিন্দুসার পুত্রকে বিদ্যাশিক্ষার্থ পিঙ্গলবৎস নামে একজন জ্যোতির্ব্বিদের হস্তে সমর্পণ করেন। এই জ্যোতির্ব্বিৎ একদা গণনা করিয়া কহেন, অশোক পিতৃরাজ্যের অধিকারী হইয়া পাটলীপুত্রের সিংহাসনে আরোহণ করিবেন। অশোক ব্যতীত সুভদ্রাঙ্গীর আরও একটি পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তাঁহার নাম বীতাশোক বা বিগতাশোক।

মহারাজ বিন্দুসারের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ তনয়ের নাম সুসীম। ইহার সহিত অশোকের সম্প্রীতি ছিল না। বিন্দুসার তাঁহাকে স্থানান্তরে রাখিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এই সময়ে তক্ষশিলায় বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল। বিন্দুসার অশোককে ঐ বিদ্রোহদমনার্থ পাঠাইয়া দিলেন।

অশোক তক্ষশিলায় উপস্থিত হইলে তত্রত্য অধিবাসিগণ তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিল। অশোক বিদ্রোহ দমনে কৃতকার্য্য হইলেন। ইতিমধ্যে সুসীম পাটলীপুত্রে উৎপাত আরম্ভ করাতে মন্ত্রিগণের পরামর্শে বিন্দুসার সুসীমকে তক্ষশিলায় পাঠাইয়া অশোককে পাটলীপুত্রে আহ্বান করিলেন।

ক্রমে বিন্দুসারের আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইল; তিনি জীবনের শেষ সীমায় পদার্পণ করিলেন। বিন্দুসার এই আসন্নকালে অমাত্যের পরামর্শে কিন্তু নিজের সম্পূর্ণ অমতে জ্যেষ্ঠপুত্রের অনুপস্থিতি পর্য্যন্ত অশোককে রাজকার্য্য নির্ব্বাহার্থ আদেশ দিয়া পরলোক গমন করিলেন। এদিকে সুসীম তক্ষশীলা হইতে প্রত্যাগত হইয়া

পাটলীপুত্র আক্রমণ করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অশোক তাঁহার কার্য্যকুশল অমাত্য রাধাগুপ্তের সাহায্যে সুসীমকে পরাভূত ও নিহত করিলেন।

ইহার পর ভাবী অনিষ্ট ও উপদ্রবের আশঙ্কায় অশোক স্বহস্তে রাজবংশীয় অনেক ব্যক্তির শিরশ্ছেদ করেন। এই রূপ আরও অনেক কার্য্যে তাঁহার প্রচণ্ড স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। একদা তিনি শুনিতে পাইলেন, কয়েকটা কামিনী পুষ্পচয়ন উপলক্ষে একটি অশোকবৃক্ষের শাখা ভগ্ন করিয়াছে। এই অপরাধ বড় গুরুতর মনে করিয়া সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি সেই অপরাধিনী কামিনীদিগকে প্রজ্বলিত অনলে দগ্ধ করিবার জন্য চণ্ডগিরিক নামে একজন নরহন্তাকে আদেশ করিলেন। নিষ্ঠুর চণ্ডগিরিক অবিলম্বে কঠোরপ্রকৃতি প্রভুর এই কঠোর আজ্ঞা সম্পাদন করিল।

একদা সার্থবাহ নামে একজন ধনাঢ্য বণিক্ সপরিবারে একশত বণিকের সহিত বাণিজ্যার্থ সমুদ্রপথে যাত্রা করেন। এই সমুদ্রবাস সময়েই তাঁহার একটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, সার্থবাহ তাঁহার নাম সমুদ্র রাখেন। সার্থবাহ বাণিজ্যের নিমিত্ত দ্বাদশবর্ষকাল নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া যখন গৃহে প্রত্যাগত হইতেছিলেন, তখন একদল দস্যু আসিয়া তাঁহাকে সপরিবারে নিহত করে, কেবল সমুদ্র নামে তাঁহার পুত্র ঘটনাক্রমে পলায়ন করেন। সমুদ্র এইরূপে পিতৃমাতৃহীন হইয়া বৌদ্ধ যতিবেশে নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করেন। একদা ভিক্ষাপ্রার্থী হইয়া তিনি চণ্ডগিরিকের গৃহে সমুপস্থিত হন। চণ্ডগিরিক এই বৌদ্ধ যতিকে হত্যা করিতে যথাশক্তি চেষ্টা পায়, কিন্তু কোন ক্রমেই কৃতকার্য্য হইতে পারে না। ইহাতে অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া চণ্ডগিরিক এই বিবরণ অশোককে বিজ্ঞাপিত করে। মহারাজ অশোক এই সংবাদে ভ্রমণকারী ভিক্ষুকে দেখিতে আসিলেন এবং তাঁহার কথা বার্ত্তা শুনিয়া এবং চরিত্র দেখিয়া অশোকের জ্ঞানলাভ হইল। নিজ চরিত্র সংশোধনের ইচ্ছা জন্মিল। কিন্তু প্রথমে দুরাচার চণ্ডগিরিকের শিরশ্ছেদ না করিয়া নিরস্ত হইতে পারিলেন না।

এই অবধি বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি অশোকের আস্থা ও শ্রদ্ধার সঞ্চার হয়। অশোক ক্রমে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। মহারাজ অশোকের ধর্ম্মগুরুর নাম উপগুপ্ত। উপগুপ্ত মথুরার একজন ধনাঢ্য ব্যক্তির তনয়। শোনবাসী নামে একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু ইঁহাকে স্বীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। উপগুপ্ত বৌদ্ধধর্ম্ম তত্ত্বে সাতিশয় প্রবীণ ছিলেন। তিনি অশোককে নানা প্রকার ধর্ম্মোপদেশ দিয়া তাঁহার হৃদয় প্রশস্ত, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা বলবতী ও সাধনা মহীয়সী করিয়া তুলেন। অশোক এইরূপে গুরুসহবাসে ও গুরূপদেশে ধর্ম্মনিরত ও ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ হইয়া উঠেন।৮

ক্রমে ধর্ম্মাচরণে ও ধর্ম্মনিষ্ঠায় অশোকের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি চারিদিকে বিস্তৃত হইল। নানা স্থানে স্তূপ ও মঠ প্রভৃতির নির্ম্মাণে তিনি অনেক অর্থ ব্যয় করিতে লাগিলেন। তক্ষশিলাবাসিগণের প্রার্থনায় তথায় ৩,৫১০,০০০,০০০ স্তূপ নির্ম্মিত হয়; সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থানেও দশলক্ষ স্তূপ প্রতিষ্ঠাপিত হইয়া উঠে। ঈদৃশ ধর্ম্মাচরণে ও ধর্ম্মসম্মত কার্য্যানুষ্ঠানে অশোকের পূর্ব্বতন "চণ্ড" নাম তিরোহিত হয়; তিনি ধর্ম্মাশোক নামে সাধারণের নিকট প্রসিদ্ধ হইয়া উঠেন।

যখন উপগুপ্ত আপনার আশ্রমে প্রত্যাগমন করেন, তখন অশোক বৌদ্ধধর্ম্ম তাঁহার সাম্রাজ্যের ধর্ম্ম বলিয়া সাধারণ্যে ঘোষণাপত্র প্রচার করেন, এবং এই ধর্ম্মের মহিমা ও এই ধর্ম্মের উন্নতিবিধানে সমুদয় সম্পত্তি ব্যয়িত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া উঠেন। বুদ্ধগয়ার যে তরুমূলে বসিয়া মহামতি বুদ্ধ ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছিলেন, সেই বোধী বৃক্ষের রক্ষাবিধানে তাঁহার একাগ্রতা ও চেষ্টা সাতিশয় বলবতী হইয়া উঠে। মহারাজ অশোকের প্রধানা মহিষী পরিষ্যরক্ষিতা ভর্ত্তাকে এইরূপ পুরুষানুগত চিরন্তন ধর্ম্মের প্রতি বীতরাগ ও নূতন ধর্ম্মের প্রতি আস্থাবান্ দেখিয়া সাতিশয় বিরক্ত হন। কথিত আছে, একদা পরিষ্যরক্ষিতা মাতঙ্গী নামে এক চণ্ডালীকে গুপ্তভাবে উক্ত বোধীবৃক্ষ বিনষ্ট করিতে আদেশ করেন। চণ্ডালী যাদুবিদ্যাপ্রভাবে ও ঔষধ-প্রয়োগে বৃক্ষটীকে ক্রমে বিশুষ্ক করিয়া তুলে। অশোক এই সংবাদ শ্রবণে সাতিশয় ক্ষুব্ধ হন। রাণী তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে যথাশক্তি চেষ্টা করেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হয় না। পরিশেষে পরিষ্যরক্ষিতার আদেশে মাতঙ্গী বৃক্ষটীকে পুনর্ব্বার সজীব করে; বৃক্ষের সজীবতার সঙ্গে সঙ্গে অশোকও সজীব ও সুপ্রসন্ন হইয়া উঠেন।

এই সময়ে তক্ষশিলা শান্তিপ্রবণ ছিল না। অন্তর্ব্বিদ্রোহে উহা সাতিশয় অব্যবস্থিত হইয়া উঠিয়াছিল। মহারাজ অশোক স্বীয় পুত্র কুনালকে এই বিদ্রোহ দমন জন্য তক্ষশিলায় প্রেরণ করেন। কুনাল অশোকের সাতিশয় প্রিয় ছিলেন। অশোক মহা আড়ম্বরে কাঞ্চনমালা নামে একটি রূপবতী কামিনীর সহিত কুনালের বিবাহ দেন। কাঞ্চনমালার চরিত্র অতি পবিত্র ছিল। কুনাল সৈন্যদল সমভিব্যাহারে তক্ষশিলায় উপনীত হইলে বিদ্রোহীদিগের দলপতি কুঞ্জরকর্ণ বশ্যতা স্বীকার করে। এরূপ প্রবাদ আছে, কুনাল বিদ্রোহদমনার্থ তক্ষশিলায় প্রেরিত হইলে অশোক একদা স্বপ্নে দেখিলেন প্রাণপ্রিয় পুত্র কুনালের মুখ বিবর্ণ, বিশীর্ণ ও বিশুষ্ক হইয়া গিয়াছে। অশোক এই স্বপ্নের বিবরণ গণকদিগকে জানাইলে তাঁহারা গণনা করিয়া কহিলেন, প্রস্তাবিত স্বপ্নে তিনটি অনিষ্ট সূচিত হইতেছে, প্রথম প্রাণহানি, দ্বিতীয়

পার্থিব বন্ধন পরিত্যাগ পূর্ব্বক যতিবেশ ধারণ, তৃতীয় দর্শনশক্তির বিনাশ। মহারাজ অশোক প্রিয়তম পুত্রের সম্বন্ধে এইরূপ অনিষ্টের সূচনায় সাতিশয় খিন্ন হইয়া সর্ব্বপ্রকার রাজকার্য্য হইতে বিরত হইলেন। ইহাতে অশোকের অন্যতমা মহিষী ও কুনালের বিমাতা তিশ্যরক্ষিতা কুনালের অনিষ্ট সাধনের উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া স্বয়ং রাজকার্য্যের ভার গ্রহণ করেন। তাঁহার মতানুসারে আদেশলিপি প্রচারিত হইতে লাগিল, এবং তাঁহার মতানুসারে সমুদয় কর্ম্মচারিগণ যথা নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। তিনি গোপনে একখানি পত্র লিখাইয়া কুঞ্জর কর্ণকে আদেশ করিলেন যে, অবিলম্বে কুনালের দর্শনশক্তি বিনষ্ট করিতে হইবে। পত্র রাজনামাঙ্কিত মোহরে শোভিত হইয়া যথাস্থানে প্রেরিত হইল। কুঞ্জরকর্ণ এই পত্র পাইয়া, কি প্রকারে আদেশ প্রতিপালন করিতে হইবে ভাবিতেছেন, ইত্যবসরে কুনাল রাজাজ্ঞা জানিতে পারিয়া আপনি কুঞ্জরকর্ণের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়া রাজাজ্ঞা দেখিতে চাহিলেন। কুঞ্জরকর্ণ বড় কুণ্ঠিত হইলেন কিন্তু কি করেন মহা পরাক্রান্ত কুনালের নিকট বাক্‌চাতুরী করিবার তাঁহার সাধ্য হইল না। রাজলিপি কুনালের হস্তে সমর্পণ করিলেন। কুনাল ধীরে ধীরে পড়িলেন। পত্রে রাজার নাম রাজার মোহর রহিয়াছে সন্দেহ আর কিছুই রহিল না। তখন কুনাল বলিলেন কুঞ্জরকর্ণ, রাজাজ্ঞা প্রতিপালন কর। কুঞ্জরকর্ণকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া কুনাল বলিলেন, আপনি ইতস্ততঃ করিবেন না, রাজাজ্ঞা অবহেলা করিলে তাহার প্রতিফল এখনই আমি দিব, বলিয়া কুনাল কটীহইতে অসি নিস্কোষিত করিলেন। কাজেই রাজাজ্ঞা রক্ষা হইল। কিন্তু এ বিষয়ে মতান্তর আছে। পরে অন্ধ কুনাল পরিব্রাজক বেশে তক্ষশিলা হইতে বহির্গত হইয়া বহু কষ্টে পাটলীপুত্রে উপনীত হইলেন। তিনি গোপনে রাজকীয় হস্তিশালায় আসিয়া নিশীথ সময়ে বংশীধ্বনি করিয়া আমোদ করিতে লাগিলেন। ধ্বনি রাজবিলাসভবনের গবাক্ষদেশ দিয়া অশোকের শ্রুতিপ্রবিষ্ট হইল। ইহা অশোকের হৃদয়ের প্রতিস্তর অমৃতরসে অভিষিক্ত করিয়া তুলিল। মহারাজ অশোক নিশীথকালে দূরাগত বংশীধ্বনিতে সাতিশয় প্রীত হইলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে তিনি বংশীবাদককে নিকটে আনয়ন করিতে লোক পাঠাইলেন। রাজ আজ্ঞায় যতিবেশধারী বংশীবাদক যথাস্থলে উপনীত হইলেন। তখন মহারাজ অশোক বিস্ময়সহকারে দেখিলেন, বংশীবাদক তাঁহার প্রিয়তম তনয় কুনাল অন্ধ। অশোক কুনালের এতদবস্থা দেখিয়া অধৈর্য্য হইলেন। কুনালকে ঈদৃশ অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কুনাল কিছুই বলিলেন না। পরে অশোক অন্যত্র সমুদয় বিবরণ শুনিয়া

যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া নীচাশয় ও নিষ্ঠুরপ্রকৃতি মহিষীর শিরশ্ছেদের জন্য তরবারি গ্রহণ করিলেন। কুনাল পিতাকে ঈদৃশ ভয়ঙ্কর কার্য্যসাধনে সমুদ্যত দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি বুদ্ধের নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে শান্ত করিলেন।

অশোক বিন্দুসারের জীবদ্দশায় কিয়ৎ কাল উজ্জয়িনী রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তিনি অনেকস্থলে পরিভ্রমণ করেন। ভ্রমণ সময়ে একদা দেবী নামে একটি পরমসুন্দরী রাজবালার প্রণয়পাশে বদ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ করেন। এই দেবীর গর্ভে একটী পুত্র ও একটি কন্যার জন্ম হয়। পুত্রের নাম মহেন্দ্র এবং কন্যার নাম সঙ্ঘমিত্রা। ইঁহারা উভয়েই তরুণ বয়সে সিংহল দ্বীপে যাইয়া তত্রত্য রাজাকে বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন।

অশোক পাটলীপুত্রের সিংহাসন গ্রহণ করিবার সময় যেরূপ নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়াছিলেন, বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বনের পর অশোকের তাদৃশ নির্দ্দয়তার নিদর্শন লক্ষিত হয় না। অশোক যখন সুসীম প্রভৃতিকে হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন সেই সময়ে সুসীমের পত্নী গর্ভবতী ছিলেন। তিনি আকস্মিক বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবার আশায় চণ্ডালপল্লীতে যাইয়া একজন চণ্ডালের আলয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই স্থানে তাঁহার একটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। অশোক এই সন্তানের জীবনের সম্বন্ধে কোনরূপ অনিষ্ট করেন নাই। কথিত আছে, সুসীম-তনয় বৌদ্ধধর্ম্ম পরিগ্রহ পূর্ব্বক যতিবেশে নানাস্থান পর্য্যটনে প্রবৃত্ত হন।

কথিত আছে নূতন ধর্ম্মের প্রতি অশোকের আন্তরিক যত্ন ও প্রগাঢ় আস্থা দর্শনে কতিপয় তীর্থক অশোকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বীতশোককে বৌদ্ধধর্ম্ম পরিগ্রহ করিতে নিষেধ করেন। অশোক ভ্রাতাকে আপনার ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে যথাশক্তি চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। পরিশেষে তাঁহার অমাত্য এই কার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং রাজ্য দিবার লোভ দেখাইয়া বীতশোককে বৌদ্ধধর্ম্মে আনয়ন করিলেন। অমাত্য বীতশোককে যথাবিধানে রাজা বলিয়া স্বীকার করিতে কাতর হইলেন না। কিন্তু এই কার্য্যে অশোকের হৃদয়ে আঘাত লাগিল। তিনি তৎক্ষণাৎ বীতশোকের শিরশ্ছেদ করিতে আদেশ প্রচার করিলেন। এই সময়ে তাঁহার অমাত্য বহু চেষ্টা করিয়া বীতশোককে একসপ্তাহের জন্য আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিলেন। এই এক সপ্তাহ পরে বীতশোক উপগুপ্তের আশ্রয়প্রার্থী হন, এবং তদীয় শিষ্য গুণাকরের নিকট মন্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহশূন্য পরিব্রাজকত্ব অবলম্বন করেন।

বীতশোক এইরূপ পরিব্রাজক হইয়াও মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইলেন না।

এই সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মদ্বেষী এক সন্ন্যাসী আপনার প্রতিকৃতির পাদমূলে বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া সেই আলেখ্য সমুদয় স্থানে প্রচার করেন। অশোক এই বিষয় শুনিয়া সেই ধর্ম্মদ্বেষ্টা চিত্রকরের মস্তকের জন্য একটী বিশেষ পারিতোষিক দিতে প্রতিশ্রুত হন। অচিরাৎ এই প্রতিশ্রুতির বিষয় চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হয়। একজন গোরক্ষক এইসংবাদ শুনিয়াছিল, সে একদা জটাচিরধারী, দীর্ঘশ্মশ্রু, অখণ্ডিতনখ, বীতশোককে দেখিয়া বৌদ্ধধর্ম্মদ্বেষ্টা সেই সন্ন্যাসী জ্ঞানে রাত্রিকালে তাঁহার শিরশ্ছেদ করে, এবং নির্দ্দিষ্ট পারিতোষিক লাভের আশায় সেই ছিন্ন মস্তক অশোকের নিকট লইয়া যায়। অশোক স্নেহাস্পদ ভ্রাতার মস্তক দেখিয়া, সাতিশয় শোকাতুর হইয়া বহুক্ষণ বিলাপ করেন, এবং এই নির্দ্দয়তা ও পাপের প্রায়শ্চিত্ত জন্য তাঁহার ধর্ম্মোপদেষ্টা উপগুপ্তের পাদমূলে পতিত হন। এই কাহিনী কতদূর সত্য, নির্দ্দেশ করা যায় না। বোধ হয় বীতশোক বৌদ্ধধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন বলিয়া অশোকের সহিত তাঁহার অপ্রণয় সংঘটিত হইয়াছিল। তাহা হইতেই এই কিম্বদন্তী বদ্ধমূল হইয়াছে।

অশোক ৩৭ বৎসর কাল রাজ্য ভোগ করিয়া পরলোকগত হন। প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষে তাঁহার আধিপত্য প্রসারিত হইয়াছিল। নর্ম্মদা হইতে কাশ্মীর পর্য্যন্ত সুবিস্তৃত ভূখণ্ডে, বিহার ও বঙ্গের শ্যামলক্ষেত্রে, পঞ্জাব ও আফগাণস্থানের পার্ব্বত্য প্রদেশে তাঁহার বিজয় পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল। অশোকের নামান্তর প্রিয়দর্শী। ইনি বিক্রমাদিত্য সংবতের ২০৫ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের অধীশ্বর হন, এবং বুদ্ধের মৃত্যুর ২০২ বৎসর পরে বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করেন।

অশোকের মৃত্যুর পর তদীয় তনয়গণ তাঁহার সুবিস্তৃত সাম্রাজ্য আপনাদের মধ্যে বিভাগ করিয়া লন। কুনাল পঞ্জাবের আধিপত্য গ্রহণ করেন। এই কুনালই ধর্ম্মবর্দ্ধন নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় রাজকুমার জলোক কাশ্মীরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন, এবং তৃতীয় পুত্র পাটলীপুত্রের শাসনদণ্ড গ্রহণ করেন।

এই গুলি মহারাজ অশোকের জীবনীর কঙ্কাল মাত্র। প্রাচীন ভারতবর্ষের অন্ধকারাচ্ছন্ন ইতিহাস হইতে ইহা অপেক্ষা আর কিছু অধিক বিবরণ এপর্য্যন্ত সংগৃহীত হয় নাই। আমরা এই জীবনীকে আর নানাপ্রকার অপ্রাসঙ্গিক কিম্বদন্তীতে পল্লবিত করিলাম না। অতঃপর মহারাজ অশোকের ধর্ম্মানুশাসন সম্বন্ধে কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল।

প্রত্যাখ্যান।

১

"এই নেও"—শিশিরের চন্দ্রের কিরণে,
বসি বাঁধা ঘাটে, ক্ষুদ্র তটিনীরতটে,
যুবক যুবতী দুই, যেন চিত্র পটে।
শিশিরের চন্দ্রালোক, বিষাদের হাসি,
হাসিছে বিষাদ হাসি, তটিনীর নীরে।
দুই পার্শ্বে ঝাউ শ্রেণী দাঁড়াইয়া তীরে,
গাইছে বিষাদ গীত, অতি ধীরে ধীরে।
একটী কুসুম দাম বিহ্বল যুবায়
দুই করে চাপি বক্ষে, রহেছে চাহিয়া
নৈশ নীলাম্বর পানে। বামে সিমন্তিনী
প্রসারি দক্ষিণ কর, রহেছে বসিয়া,—
প্রত্যাখ্যান-মুখী বামা। বহুক্ষণ পরে
যুবক ফুলের মালা করিয়া মোচন,
অর্পিয়া একটী ফুল প্রসারিত করে
কহিল কাতর কণ্ঠে,—"এই নেও তবে,
নিশ্চয় যদ্যপি মালা ফিরাইয়া লবে।
না জানি হায় রে! ওই জ্যোৎস্নার সনে
কি সম্বন্ধ জীবনের! কত সুখ, কত
আশা, কত ভাল বাসা, শোক দুঃখ কত,
রয়েছে মিশিয়া চন্দ্র কৌমুদীর মত!
কত দিন কত বর্ষ!—এমন নিশীথে;
এমন চাঁদের আলো; এমন দেখিতে
মনোহর; কিন্তু নহে এমন মলিন;
এমন বিষণ্ণ;—মনে আছে ত সে দিন?
কুটিল সংসার ছায়া হৃদয়ে আমার
পড়ে নাই, ছিল চিত্ত দর্পণ আকার—
স্বচ্ছ, নিরমল শোভা! যে দিন প্রথম,
দর্পণে একটী ছায়া হইল পতন।

২

সেই ছায়া,—
বসন্ত চন্দ্রমা মাখা সুনীল সুন্দর
পাথার সলিলে নব নীরদের ছায়া!
সেই ছায়া—
বিষবৃক্ষ ছায়া কুন্দ কুসুম কাননে!
ভরিল হৃদয়, মেঘে ঢাকিল অম্বর!
কত চাহিলাম ছায়া ফেলিতে মুছিয়া
অশ্রুজলে। জ্বালি কত পরিতাপানল
চাহিলাম সেই ছায়া করিতে অন্তর।
সকলি বিফল, ছায়া বাড়িতে লাগিল।
বলিয়াছি,—ক্রমে ছায়া হৃদয় দহিল।
চাহি মুছিবারে ছায়া, হৃদয় দর্পণ
চাহে ভাঙ্গিবারে, ছায়া হয় না মোচন।
ছায়া যার,সে কাহার? সে কি গো আমার?
উঠিত এ প্রশ্ন মনে দিনে শত বার।
কে দিবে উত্তর? আর কেবা দিতে পারে?
যে পারে কেমনে হায় জিজ্ঞাসিব তারে?
যদি সে উত্তর নাহি হয় অনুকূল!
চিন্তায় উঠিত বুকে তুফাণ তুমুল।
না, না,—
সেই ছায়া, এ হৃদয় করি নিষ্পেষণ
রাখিতাম লুকাইয়া যেন চোরা ধন।
প্রাণাধিকে!—ক্ষমা কর, ক্ষম সম্বোধন;
দুরন্ত হৃদয়বেগ মানে না বারণ।—
প্রথম যৌবনে এই আত্মনির্যাতন,
পদ্মা গর্ভে বরিষার প্রথম প্রবাহ,—
তীব্র যন্ত্রণার স্মৃতি করিল তখন
যুবকের কণ্ঠরোধ। যুবা রহিল চাহিয়া

স্থির নেত্রে উর্দ্ধমুখে আকাশের পানে,
বিষাদের মূর্ত্তি যেন গঠিত পাষাণে।

৩

পুষ্পহারে রমণীর মৃদু আকর্ষণে
ভাঙ্গিল যুবার ধ্যান,—"এই নেও প্রাণ!"
আবার একটী ফুল করিল প্রদান।
সেই ছায়া বক্ষে করে, আশু দেশান্তরে
বলিলাম, সে কথা কি মনে আজ পড়ে?
আঁধারে আনন্দে তুমি ছিলে দাড়াইয়া
মাতৃপাশে, নত শিরে নমিনু তোমারে।
সকলে ভাবিল ভ্রম. হাসিলাম আমি
মনে মনে। ধরে প্রেম কি দিব্য নয়ন,
অন্ধকারে দেখে, থাকে যথা প্রিয়জন।
কি যে বিজুলির খেলা মানবহৃদয়ে
খেলে নাহি জানি, তব নিকটে আসিলে,
খেলিত যে উর্ম্মি মম শোণিত সলিলে,
আঁধারে, অদৃশ্যে তুমি থাক লুকাইয়া,
যাইত শোনিতে মম বিজুলি খেলিয়া।
নহে ভ্রম, কহিলাম নমিয়া চরণে
বিদায়ের কালে—থাকি যথায় যখন,
রহিলাম উপাসক জন্মের মতন।
অন্ধকারে সঙ্কোচিতে দিলে আলিঙ্গন,
দেখিলে না তরলাগ্নি বর্ষিল নয়ন।
হৃদয়, প্রণাম সহ চরণে রাখিয়া,
চলিলাম দেশান্তরে, হায় ভাসাইয়া
সংসারের সুখসাধ প্রথম যৌবনে,
বিনিময়ে,
লইয়া একটী ছায়া হৃদয় দর্পণে।"

৪

বহুক্ষণ স্থির নেত্রে নিস্পন্দ যুবার,
যুবতীর মুখ পানে চাহিছে কেবল।
যুবতী আনত মুখে, চিন্তা স্বরূপিণী—
ছিঁড়িছে কুসুমকরে কুসুমের দল।
ঝুলিছে অসাবধানে মুক্তকেশরাশি,
আবরিয়া বদনার্দ্ধ—অতুল সে শোভা!
লতাকুঞ্জ অন্তরালে বাসন্তি নিশায়,
এই রূপে মরি পূর্ণচন্দ্র শোভা পায়।
"এই মুখ খানি,—
দেশে দেশে বহুবর্ষ ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া
তীব্র বাসনার স্রোত গিয়াছে নিবিয়া
নিরাশয়ে অন্ধকারে। হৃদয় তখন
চন্দ্রাস্তে অবাত স্তব্ধ জলধি যেমন।
কদাচিত তব স্মৃতি হৃদয়ে উঠিয়া
যাইত ঝটিকা রহি সিন্ধু উচ্ছ্বসিয়া।
কভু সান্ধ্য সমীরণ কি যেন কহিয়া
কানে কানে মৃদুস্বরে, যাইত বহিয়া
সন্ধ্যালোকে দেহ প্রাণ যাইত মিশিয়া।
নিরমল চন্দ্রালোক করি দরশন,
কখন কি যেন মনে হইত স্মরণ।
অস্ত সরোবরে, কিম্বা অনন্ত সাগরে,
কদাচিত দেখিতাম বিস্মিত অন্তরে
কি যেন ভাসিছে। গোলাপ দেখিয়া
সিহরিত অঙ্গ কভু কি যেন ভাবিয়া।

৫

'চন্দ্রশেখরের" চন্দ্র—পরশি শেখরে
বসিয়াছি, দিবাকর সমুদ্র শয্যায়।
মুগ্ধ চিত্ত বনদেবী সঙ্গীত শোভায়!
অচল শেখরে বসি অচঞ্চল নয়নে
দেখিতে ছিলাম দূরে পর্ব্বত গহ্বরে,
বেষ্টিত লতিকা জালে একটী কুসুম।
দেখিতে, দেখিতে, পুষ্প হলো রূপান্তর,
সেই মুখ, চোক, বর্ণ চন্দ্রকলা খানি,

সর্ব্ব শেষ দেখিলাম এই মুখ খানি।
কি তীব্র মদিরা স্মৃতি দিল যে ঢালিয়া,
উন্মত্তের মত বেগে গেলাম ছুটিয়া।
কুসুমের দলে দলে কত যে চুম্বন,
কত যে আদরে, সুখে, করিনু বর্ষণ।
কত হাসিলাম সুখে কাঁদিলাম দুখে,
কতবার, শতবার, লইলাম বুকে
কত বার সেই মুখ রাখিনু তুলিয়া,
বাঁচাইয়া প্রেমভরে চুম্বিয়া চুম্বিয়া।
ক্রমে শুষ্ক বাসনার প্রবাহ ছুটিয়া
ক্ষুদ্র তৃণ মত বেগে গেলাম ভাসিয়া,—
কোথায়?" বসিল যুবা বামার চরণে
জানুপাতি, শিলাসনে নীচের সোপানে।
পরশি চরণ দ্বয়, বলিল—"এখানে!
সেই আমি, সে চরণ, সেই নির্শিখিনী,
তুমি এ আমার সেই প্রেম প্রবাহিণী।
সেই নিশি, মহানিশি জীবনে আমার।
সেই নিশি,—অহে! প্রিয়ে ক্ষম একবার।"

৬

যুবক অবশ শির অঙ্কে যুবতীর
রাখিয়া আবেশে, গদ গদ কণ্ঠে ধীরে
কহিতে লাগিল,—"সেই নিশি প্রিয়তমে!
রাখিয়াছি এ হৃদয়ে লিখিয়া যতনে
প্রেমের অমর বর্ণে। দ্বাদশ বৎসর
করিয়াছি অনিবার তপস্যা যাহার,
সেও হায়! তপস্বিনী শুনিনু আমার।
যে কথা শুনিতে হায়! দ্বাদশ বৎসর
ছিলাম প্রস্তুত প্রাণ করিতে অর্পণ,
শুনিলাম সেই কথা—বেসেছি যেমন,
দ্বাদশ বৎসর ভাল বেসেছে তেমন।"
দেখিলাম কত ক্ষুদ্র তুচ্ছ নিদর্শন
রাখিয়াছে প্রাণাধিক করিয়া যতন।
দেখিলাম—
প্রথম মিলনে দুই ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী
অজানিত পরস্পর হইয়া নির্গত,
ভ্রমি দেশ দেশান্তরে দ্বাদশ বৎসর,
হইয়াছে প্রবাহিণী ভীমা বিপ্লবিনী।
উত্তাপ তরঙ্গে আলিঙ্গিয়া পরস্পরে,
সে নিশীথে পরিণত হইল সাগরে।

৭

দেখিলাম এক স্রোত পুণ্য প্রবাহিণী—
মহাতীর্থ সুরধুনী, স্বরগ সম্ভূতা!
চলেছে অনন্ত মুখে স্থির অবিচল।
অন্য স্রোত তরঙ্গিণী পদ্মা বিপ্লবিনী।
স্বভাবতঃ নিরমল সুধা পয়স্বিনী,—
প্রশস্ত আকাশ খণ্ড প্রসারিত যেন!
অচঞ্চল! কিন্তু যদি হইল পতিত
করাল কমলা রূপী কাল মেঘ ছায়া,
উন্মত্ত তরঙ্গে বক্ষ হলো বিঘূর্ণিত।
জগত গ্রাসিতে যেন ভীমা ভয়ঙ্করী
ছুটিল ভীষণ বেগে, মত্ত উন্মাদিনী—
সম্বরিল কলেবর। প্রণয় কাহিনী।
বুঝিলাম—
হেন দুই মহাস্রোত প্রেম সম্মিলনে
বহিবে না বহুদূর। হৃদয় খুলিয়া—
রাখিনু চরণতলে; কহিনু কাঁদিয়া—
বিগত জীবন মম উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসে।
কহিলাম—'দয়াময়ি! দারুণ নিরাশা
দ্বাদশ বৎসর বক্ষে করিয়া বহন,
কত পাপে ডুবাইতে করেছি যতন।
হেন পাপারণ্যে কেন করিবে অর্পণ,
পবিত্র প্রণয় তব—ত্রিদিব রতন?

প্রাণ সমর্পিতে পারি সেই রত্ন তরে
শুষ্ক তৃণ মত, কিন্তু না পারি তাহারে
লইতে, জীবনাধিকে। বঞ্চিয়া তোমারে।
ঘৃণা কর, ঘৃণা তুমি করিবে নিশ্চয়,
সহিবে তা অকাতরে এ ভগ্ন হৃদয়।
বল প্রিয়ে, ঘৃণা কর, এখনি হাসিব।
বলিও না ভাল বাস—দ্বিগুণ কাঁদিব।
সময়েতে এ দু কথা করিলে শ্রবণ,
এই পাপারণ্য হতো নন্দন কানন,
পবিত্র কুসুমাসন। আরাধ্যা তোমারে
বসাতেম—আহা! বুক চাহে ফাটিবারে।—

৮

"উন্মত্তের মত প্রিয়ে লইয়া হৃদয়ে
মুছিয়া নয়ন মম,—অনন্ত নির্ঝর।
কহিলে উচ্ছ্বাস কণ্ঠে—'জীবন আমার!
এ দুর্লভ সরলতা কোথা আর পাবে?
নহ দোষী, দোষী আমি, দোষী অভিমান,
দ্বাদশ বৎসর আমি ছিলাম পাষাণ।
ক্ষমিবে কি? না না, তুমি পার না ক্ষমিতে,
নাহি মম ক্ষমা, প্রিয়! এই অবনীতে।
জানিতাম নহি আমি অপ্রিয় তোমার।
কিন্তু ভাবিতাম, আমি যেই পরিমাণ
বাসি ভাল, নাহি পাব তার প্রতিদান।
এই অভিমানে এই উন্মত্ত হৃদয়
রাখিয়া দলিয়া বলে চাপিয়া পাষাণ।
হায়! এ সংসারস্রোতে ভাসিয়া ভাসিয়া
কত কীর্ত্তি—শৈলস্তম্ভ করিনু দর্শন,
যে বালক মূর্ত্তি মম আছিল হৃদয়ে
দেখিলাম এ জগতে সেই অতুলন!
অনন্ত সমুদ্রগর্ভে মহার্ণব-যান
পাব স্থান শত শত, কিন্তু প্রিয়তম!
বালিকা হৃদয় চারু ক্ষুদ্র সরোবরে,
একটী তরণী মাত্র পারে ভাসিবারে।
আমার কৈশোর স্বপ্ন। নাহি জান তুমি,
সেই বালকের রূপ কত ভাল বাসি।
বালকের সরলতা পূরিত প্রণয়,
আইস ঢালিয়া দেও হৃদয়ে আমার,
যুড়াও পিপাসা মম, কহ একবার
উন্মত্ত বালক মত—তুমি কি আমার?
সহস্র গোলাপ বৃষ্টি করিলে আমার
অধরে, ললাটে, সিক্ত যুগল নয়নে।
সহস্র কুসুম—দীর্ঘ সহস্র চুম্বনে।
জীবন্ত মদিরা সিক্ত অবশ মস্তক
রাখি অংশে অংশে ক্লান্ত চারিটী নয়ন,
নীরবে কাঁদিল কত, অশ্রু সুখকর।
সে রোদন, এ রোদন কতই অন্তর!"

৯

উঠিল যুবক। যুবা উঠিতে খসিয়া
পড়িল কতটী ফুল ছিন্ন মালা হতে।
রমণী অমনি তাহা লইল তুলিয়া।
অধোমুখে, ধীরে যুবা ভ্রমিতে লাগিল।
গম্ভীর মুখশ্রী, মেঘে আচ্ছন্ন বদন;
কেশের কিরিটি সহ মিশেছে বরণ।
কখন বা ছিন্ন হার গলায় পরিয়া;
কখন বা হৃদয়েতে রাখিছে চাপিয়া।
"যেই দিন এই মালা করিলে অর্পণ,
সেই দিন—সে রহস্য—আছে কি স্মরণ?
অপরাহ্ণ বেলা। দৃশ্য সমুদ্রের তীর।
দুজনে বিজনে বসি। জলধির নীর
তরঙ্গে তরঙ্গে আসি গর্জ্জিয়া, ঢালিয়া
তরল রজত রাশি, যাইছে সরিয়া।
ফেণ শীর্ষ ঊর্ম্মিমালা মধ্য পারাবারে,

কি রঙ্গ কবিছে বক্ষে লয়ে সবিতাবে!
সিন্দূরমণ্ডিত যেন সুবর্ণ কলসী,
শোভিছে ভাস্কর সিন্ধু নীলিমা ঝলসি।
কথায় কথায় তুমি কবি অভিমান
বলিলে প্রণয় তব সমুদ্র সমান।
তেমতি অনন্ত, প্রেম তেমতি গম্ভীব,
তেমতি অমব। বুঝি তেমতি অস্থিব--
বলিলাম আমি—'পূর্ণ জোয়াবে এখন,
কে জানে ভাটায় কোথা হইবে পতন।'
রমণীব অভিমানে ভরিল বদন
দলিত ফণিনী মত বলিলে তখন—
'অবিশ্বাস ভালবাসা পদ্মপত্র জল।
এই আছে, এই নাই, নিবাশা কেবল।'
কর হতে করপদ্ম করিয়া মোচন,
অভিমানে প্রবেশিলে কুসুম কানন।
অভিমানে বেলাভূমে বহিনু শুইয়া,
সিন্দুর কলসী গেল সমুদ্রে ডবিয়া।
পশিয়া কুসুম বনে দেখি একাকিনী
গাঁথিতেছ এই মালা বসি বিষাদিনী।
নীলোৎপল ভ্রষ্ট মুক্তা চুম্বি বক্তোৎপল
শিক্ত করিতেছে চাক কুসুমেব দল।
অলক্ষিতে থাকি চিত্র দেখিতে দেখিতে,
মোহিত হইল প্রাণ। এ সংসাব ভুলি
লইনু প্রতিমা খানি নিজ অঙ্কে তুলি।
বলিলে—'প্রান না, প্রাণ। কত কষ্টকব
তব অবিশ্বাস। বুকে লইযা আমাবে
এ প্রতিজ্ঞা কর আজি, প্রণয়ে আমাব
হেন অবিশ্বাস নাহি কবিবে আবাব।'
'তথাস্তু' বলিয়া বুকে লইনু যেমন
সচুম্বন কণ্ঠে মালা করিলে অর্পণ।
নৈশ চন্দ্রাতপ দেখা দিলা শশধর,
উভয়ে বহিনু চাহি মোহিত অন্তব।
জিজ্ঞাসিলে—'কোথা আমি বল প্রাণেশ্বর?'
'এ হৃদয়ে'—'স্বর্গে আমি' কবিলে উত্তব।
আজিও গগনে ভাসে সেই শশধব।
সেই নিশি, এই নিশি—কতই অন্তব!"

১০

যুবতী বলিল—"নিশি হলো কি প্রহব,
দেও অবশিষ্ট মালা যাই ফিবে ঘব।"
পশিল ভুজঙ্গ বিষ যুবাব অন্তবে।
সমর্পিল শুষ্ক মালা যুবতীব কবে।
"চলিলাম"—স্থিবকণ্ঠে কহিল কামিনী—
"ফুবাইল, এই শেষ প্রণয় কাহিনী।
সব তীব্র অনুতাপ; কিন্তু যেন আব
ঘৃণিত বদন পুনঃ না দেখি তোমাব।"
চলিল বিদ্যুৎবেগে বিদ্যুৎ ববণী।
বিদ্যুতে আহত যেন দাঁড়ায়ে অমনি
চাহিয়া বহিল যুবা। মুহূর্ত্ত দেখিল।
নৈশ সৃষ্টি নেত্র হতে সরিতে লাগিল।
বলিল চীৎকাব ছাড়ি—"প্রাণেশ্বরি প্রাণ।
কোন অপরাধে বল এই প্রত্যাখ্যান?
সে সমুদ্র ভালবাসা শুকাল কেমনে?
কেমনে এ 'ঘৃণা' কথা আনিলে আননে?
চিব উপাসকে তব একবাব চাও।
একবার মুখখানি দেখাইয়া যাও।
আমাব সর্ব্বস্ব।"—যুবা ছিন্ন তরু মত,
পড়িল ভূতলে দীর্ঘ, জীবন বিগত।
এখন সে বাঁধা ঘাটে, সেই ঝাউমূলে,
একটি সমাধি শোভে সেই নদীকূলে।
মুদ্রিত বয়েছে বক্ষে কঠিন প্রস্তরে—
"রমণী প্রণয় লেখে জলের উপরে।"

মাধবীলতা।

১০

পর দিবস প্রাতে পুঁটুর মা গৃহকার্য্য করিতে গেলেন। প্রথমে মার্জ্জনী লইয়া গৃহমার্জ্জনা আরম্ভ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন এমত সময় একজন পরিচারিকা তাঁহার হস্ত হইতে ঝাঁটা লইল। পুঁটুর মা পাকশালায় চুল্লি সংস্কার করিবার নিমিত্ত গেলেন, আর একজন পরিচারিকা আসিয়া বলিল "ঠাকুরাণি এ সকল আমাদের কার্য্য।" পুঁটুর মার উত্তর অপেক্ষা না করিয়া ঐ চারিকা চুল্লি সংস্করণ করিতে বসিল। পুঁটুর মা উঠিয়া অঞ্চলে হস্ত মুছিতে লাগিলেন। এমন সময় একটি মৃৎকলসের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। পুঁটুর মা অমনি কলসটি কক্ষে লইয়া জল আনিতে চলিলেন। এই সময় তৃতীয় আর একজন পরিচারিকা আসিয়া কক্ষ হইতে কলস লইয়া জল আনিতে ছুটিল। পুঁটুরমা কোন কার্য্য করিতে পাইলেন না। তাঁহার মনে অভিমান জন্মিল। খড়কি দ্বারে দাঁড়াইয়া নখদ্বারা কপাটের এক স্থান খুটিতে খুটিতে অস্ফুট স্বরে আপনাপনি বলিতে লাগিলেন "আমি কি তবে সংসারের কোন কার্য্য করিতে পাব না? আমি কি আর সংসারে কেহই নই, আমায় তবে আর কাজ কি?"

বহির্ব্বাটীতে তাঁহার স্বামীও এই দশাপন্ন। তথায় চারিজন দ্বারবান্ বসিয়াছিল। রামসেবককে দেখিবামাত্র তাহারা উঠিয়া যোড়হস্তে দাঁড়াইয়া রহিল। রামসেবক অপ্রতিভ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। শয়নঘর হইতে তামাক সযত্নে সাজিয়া তাহাদের নিমিত্ত লইয়া গেলেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাহারা বসিয়াছিল, তাঁহাকে দেখিবা-মাত্র আবার ব্যস্ত হইয়া দাঁড়াইল। রামসেবক তাহাদের নিকট কলিকা রাখিয়া "আপনারা তামাক খান" বলিয়া চলিয়া আসিলেন। রামসেবক যখনই বহির্ব্বাটীতে যান তখনই তাহারা ব্যস্ত হইয়া উঠে দাঁড়ায়, কাজেই রামসেবক তাহাদের সম্মুখে যাইতে কুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। অন্তঃপুরে স্থান নাই, বিশেষতঃ তথায় তিন চারি জন দাসী রহিয়াছে, সদরে দারবানেরা। রামসেবক বড়ই কষ্টে পড়িলেন। কোথায় যান? পূর্ব্বে তাঁহার যতই কষ্ট থাকুক তিনি আপনার গৃহে নির্ভয়ে থাকিতে পারিতেন, এক্ষণে সে সুখ গেল। তখনকার প্রচলিত কথা ছিল যে "পরভাতি ভাল, ত পর ঘরি কিছুঁ নয়।" রামসেবক এক্ষণে প্রকারান্তরে "পরঘরি" হইলেন। আপনার ঘরে পরের নিমিত্ত তাঁহাকে কুণ্ঠিত থাকিতে হইল। কেন হইল তাহা বুঝিতে না পারিয়া রামসেবক সিদ্ধান্ত করিলেন

যে যাহাদের দাসদাসী আছে তাহারা সকলেই এইরূপ "পরঘরি।"

অনেকে নিজের ঘরে পরঘরি। বিশেষতঃ হিন্দুসংসারে। ইংরেজদের মধ্যে পরঘরি হইতে বড় ভয়। এই জন্য পিতাপুত্রে স্বতন্ত্র।

রামসেবক খড়কিদ্বার দিয়া বহির্গত হইলেন, পথে একজন প্রতিবাসীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। প্রতিবাসী একটু ঈষৎ হাসিলেন; রামসেবক বলিলেন চল ভাই তোমার বাটীতে যাই। প্রতিবাসী বলিল আমার কাজ আছে। পরে অন্য পথে চলিয়া গেল। রামসেবক ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া মধ্যাহ্নকালে খড়কির দ্বার দিয়া গৃহপ্রবেশ করিলেন। আহারান্তে আবার খড়কি দ্বার দিয়া চলিয়া গেলেন।

অপরাহ্নে পুঁটুর মাতা একাকী শয়ন ঘরে বসিয়া ভাবিতেছেন। ইতিপূর্ব্বে আর কখনই তাঁহাকে এরূপ বিমর্ষ হইয়া দীর্ঘকাল একাকী থাকিতে হইত না; অপরাহ্নে সমবয়স্কারা আসিয়া জুটিত। অল্পবয়স্কারা একত্র হইয়া যদি কেবল বসিয়া থাকে,—কথা কব না, কবই না, বলিয়া যদি প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়া থাকে, তথাপি তাহাদের মধ্যে আহ্লাদের তরঙ্গ উছলিয়া উঠে। যে পর্য্যন্ত দাস দাসী তাঁহার বাটীতে আসিয়াছে সেই পর্য্যন্ত প্রতিবাসীদের গতিবিধি কমিয়াছে। পূর্ব্বে মধ্যাহ্নে সকল সময়েই কেহ না কেহ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিত "আজ এখন রাঁধচ? আজ কি রান্না হয়েছিল? বেগুন কে দিলে? তেল আর কেনা যায় না, ছয় পয়সা করে পোয়া, পরে কি যে হবে তাহা বলা যায় না।" এক্ষণে এসকল আলাপ করিতে কেহ আর আইসে না। কিন্তু সকলেই আপন আপন বাটীতে বসিয়া সর্ব্বদাই পুঁটুরমার কথা আন্দোলন করিতেছে। কেহ বলিতেছে পুঁটুর মার কি অদৃষ্ট, কেহ উত্তর করিতেছে পোড়া কপাল অমন অদৃষ্টের। কেহ বলিতেছে বাছা না কি পুঁটুর মাকে সোণায় মুড়েছে; কেহ বলিতেছে তাহার কাপড়ে নাকি মুখ দেখা যায়; কেহ বলিতেছে এই দুই দিনে পুঁটুরমার শ্রী ফিরেছে বর্ণ ফেটে পড়িতেছে। কেহ বলিতেছে "পুটুর মার গলায় দড়ি আবার লোকের নিকট মুখ দেখাবে কেমন করে।"

যিনিই মুখে যাহা বলুন পুঁটুরমাকে দেখিতে সাধ সকলের অতি প্রবল হইয়াছিল, কিন্তু যাবার উপায় নাই, পুঁটুর মার কলঙ্ক রটিয়াছে, এক্ষণে তাহার বাটী যাইতে গৃহস্থেরা আপন আপন কন্যাদের নিষেধ করিয়াছেন। পুঁটুর মা এসকল কথা কিছুই জানেন না, একাকী বসিয়া আছেন এমত সময় এক জন পরিচারিকা আসিয়া কেশবিন্যাস করিতে আহ্বান করিল। পুঁটুর মা সকল বিষয়েই পরিচারিকাদের আজ্ঞাবাহক হইয়া পড়িয়াছেন, কাজেই কোন উত্তর না করিয়া তাহার সঙ্গে স্বতন্ত্র স্থানে গিয়া

বসিলেন। তথায় নানা প্রকার পাত্রে নানা প্রকার উপকরণ প্রস্তুত ছিল, পুঁটুর মা মনে করিলেন তাহার একটী একটী করিয়া নাম জিজ্ঞাসা করি কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না।

তখনকার বঙ্গযুবতীরা এক্ষণকার ন্যায় খর্ব্বকেশা হন নাই, তখন সিন্দুরে বিষ মিশে নাই, চুল টানিয়া বাধা ফ্যেসন হয় নাই, কাজেই এক্ষণকার মত কেবল টাক ঢাকিতে ঘোমটার প্রয়োজন হইত না। পরিচারিকা পুঁটুর মার পশ্চাতে বসিল, মেঘের ন্যায় পুঁটুর মার কেশরাশি এলাইয়া পড়িল। পরিচারিকা তাহার মধ্যে অঙ্গুলিসঞ্চালন করিতে করিতে বলিল "ঠাকুরাণীর কি চুল, আমাদের মহারাণীরও এরূপ নয়।" পুঁটুর মা দর্পণ তুলিয়া প্রসন্ন বদনে আপনার চুল দেখিতে লাগিলেন। কেশরাশি অঙ্গুলি-আন্দোলিত হইয়া আসনে খেলিতেছে। পুঁটুরমা ঈষৎ হাসিমুখে আপনার কেশের প্রতি কটাক্ষ করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন "রাণীর কেশ কি আরও ছোট?" পরিচারিকা বলিল "আহা! সে দুঃখের কথা আর কি বলিব? এবার প্রসব হওয়ার পর তাঁহার অর্দ্ধেক চুল গিয়াছে, যাহা কিছু আছে তাহা কেবল আমাদের গুণে। কেবল চুল কেন? দেখেছেন ত রাণীর বর্ণ, যেন কাঁচা সোণা, তাহাও আমাদের কল্যান। রাজা যে এতটা রাণীকে ভাল বাসিতেন তাহাও আমাদের চেষ্টায়—"

পুঁটুর মা। রাজা কি এখন আর রাণীকে তত ভাল বাসেন না।

পরি। "কই আর" এই বলিয়া পরিচারিকা চক্ষুভঙ্গি করিয়া হাসিল। পুঁটুর মা তাহা দেখিতে পাইলে আর একথার প্রসঙ্গ করিতেন না।

পুঁটুর মা। রাজার ভাল বাসা গেল কেন?

পরি। তা কি জানি মা? আমি বলে আর সোহাগ তৈল রাণী মাখেন না বলিয়া ভাল বাসা গেল।

পুঁটুরমা। সোহাগ তৈল কি?

পরি। সে একটা তেল।

পুঁটুর মা। তা আর মাখেন না কেন?

পরি। কোথায় পাবেন? আমি ছাড়িয়া গেলেম আর তেল তাঁরে কে করে দিবে। সোহাগ তেল সকলের হাতে হয় না, আমার স্বামী আমাকে এত ভাল বাসিত যে আমার জন্য প্রাণ বার করে ছিল। তাই আমি সোহাগ তেল করে থাকি, অন্যে করিলে ফলে না; আর কাহারও স্বামী ত স্ত্রীর জন্য মরে নি।

পুঁটুরমা। তোমার স্বামী কি তোমার জন্য মরেছিলেন?

পরিচারিকা। সে আমায় একদণ্ড চক্ষুর আড করিত না, সর্ব্বদাই আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। আমি স্নান করিতে জেতেম অমনি সে গামছা কাঁদে ছুটিত, জল আনিতে গেলে পথে দাঁড়াইয়া থাকিত। যেখানে যাব সেখানে

যাবে। এক দিন রাত্রে আমি না বলে যাত্রা শুনিতে গিয়াছিলাম, ঘুম ভাঙ্গিলে আমাকে না দেখিতে পাইয়া গলায় দড়ি দেয়। সকলে বলিতে লাগিল "কি ভালবাসা।" ব্রহ্মচারী একথা শুনিয়া একদিন আমায় বলিলেন তোমার হাতে সোহাগ তৈল ফলিবে। তাই আমায় তিনি সোহাগ তৈল শিখাইয়া দিলেন, লোকে আমায় সেই অবধি সোহাগী বলে ডাকে। স্বামীর সোহাগী ছিলাম বলে সোহাগী। সোহাগ তেল করে সোহাগী নই।

পুঁটুর মা। তুমি যাত্রা শুনে এসে কি করিলে?

সোহাগী। কি আর করিব? একটু কাঁদলাম, বলি তুমি কোথা গেলে, ফিরে এস, আর আমি কখন যাত্রা শুনিতে যাব না। তা মা আমরা দুঃখিলোক আমাদের কাঁদা কাটার সময় কই? পাঁচ জন বারণ করিলে, আর কি করি, সকলেই বলিল যে আর কেঁদে কি হবে।

পুঁটুর মা আর মাথা বাঁধিলেন না, হয়েছে বলিয়া উঠিলেন। সোহাগী বলিল আর একটু বসুন, গা মুছাইয়া দিই, সিন্দুর পরাইয়া দিই। সিন্দুরের নাম শুনিবামাত্র পুঁটুর মা আবার বসিলেন। বেশবিন্যাস সমাপ্ত হইলে পুঁটুর মা উঠিয়া আপনার আপাদ মস্তক দর্পণে দেখিলেন। রক্তবর্ণই তখনকার ফ্যাসন ছিল, পায়ে আলতা, পরিধানে রাঙ্গাশাটী, ওষ্ঠ তাম্বুলরাগে রাঙ্গা, কপালে সিন্দুর। অলঙ্কার রাঙ্গা সূতায় গাঁথা। তখন সকলেই রাঙ্গা ভাল বাসিত। শাক্তেরা রক্ত মাখিত, পুষ্পের মধ্যে কেবল জবা তাঁহাদের নিকট আদর পাইত। পরে শক্তি উপাসনার সঙ্গে সঙ্গে রক্তবর্ণেরও কিছু মান কমিয়াছিল। কৃষ্ণ উপাসনা প্রবল হইলে রক্তবর্ণের পরিবর্ত্তে কৃষ্ণবর্ণের আদর বৃদ্ধি হইল, সেই সময় অবধি কালাপেড়ে ধুতী পরিচ্ছদ, দাঁতে মিসি, পিঞ্জরে কোকিল। কৃষ্ণভক্তি কমিতেছে এখন বঙ্গবাসীদের কি বর্ণ প্রিয় তাহার নিশ্চয় হয় নাই। অনেক দিন পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় উপাস্য দেবতানুসারে বর্ণ গৃহীত হইত। এক্ষণে তাহা আর হইবার বড় সম্ভাবনা নাই। কেহ কেহ বলেন এক্ষণে বাঙ্গালিরা "আসমানি" ভালবাসেন। আসমানি আকাশের বর্ণ। এক দিন পিতম পাগল ব্রহ্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল ব্রহ্মের কি বর্ণ? ব্রহ্মচারী দীপশিখা দেখাইয়া বলিয়াছিলেন ইহার মধ্যস্থিত যে অস্পষ্ট বর্ণ দেখিতেছ তাহাই। পিতম বলিল বুঝেছি পুড়িলে যে বর্ণ হয়।

১১

বেশবিন্যাস সমাধান্তে পুঁটুর মা পুঁটুকে ক্রোড়ে করিয়া খড়কি দ্বারে আসিলেন। ইচ্ছা যে কোন প্রতিবাসীর গৃহে গিয়া দুই দণ্ড বসেন অথচ যাইতে কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। কেন মনে

এরূপ সঙ্কোচ জন্মিতেছে তাহা ঠিক বুঝিতে পারিতেছেন না। বোধ হয় অলঙ্কারাদি পরিয়াছেন বলিয়া লজ্জা হইতেছে, অথচ অলঙ্কার দেখাইতেও সাধ জন্মিয়াছে। যাওয়া উচিত কি না এই ভাবিতেছেন এমত সময় তাঁহার স্বামী খড়কি দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রামসেবক স্ত্রীকে দেখিয়া হঠাৎ বিমুগ্ধের ন্যায় চাহিয়া রহিলেন। পুঁটুর মার বর্ণ পরিষ্কার হইয়াছে, অল্প বয়সের চাকচিক্য পুনঃ প্রকাশ হইয়াছে, সুন্দরী বলিয়া যেন তাঁহার নিজেরও প্রতীতি জন্মিয়াছে, আর পূর্ব্বের ন্যায় শরীরের সঙ্কোচ নাই। পুঁটুর মা অঞ্চলাগ্র ধরিয়া বামকক্ষে পুঁটুকে লইয়া ঈষৎ হেলিয়া দাড়াইয়া আছেন, পুঁটু সর্ব্বভয়নিবারক মাতৃক্রোড়ে অঙ্গুলি চুষিতেছে। রামসেবক যেন একখানি প্রতিমা দেখিলেন। গৃহিণীকে সুন্দরী দেখা সকলের অদৃষ্টে ঘটে না, ধনবান্‌দের ত কথাই নাই, স্ত্রী অপেক্ষা চতুষ্পাদের প্রতি দৃষ্টি তাঁহাদের অধিক। দরিদ্রের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু স্ত্রী সুন্দরী কি কুৎসিতা তাহা রামসেবক এপর্য্যন্ত একবারও অনুভব করেন নাই।

রামসেবক পুঁটুর মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথা যাইতেছ?

পুঁটুর মা। পদ্মদের বাড়ি বেড়াইতে।

রাম। গিয়া কাজ নাই।

পুঁ, মা। কেন? আমি যাই না বলিয়া তারা আর কেহ আসে না। পদ্ম আমায় ভাল বাসে, আমার ছেঁড়া কাপড় দেখে কত দুঃখ করিত, এখন আমায় গহনা দেখে কত সুখী হবে।

পুঁটুর মা অল্পবয়স্কা, অদ্যাপি জানেন নাই যে, যাহারা ছিন্নবস্ত্র দেখিয়া আহা বলে, পরে তাহারা অলঙ্কার দেখিলে মুখ ভার করে; যতদিন আমার অপেক্ষা তুমি দীনদশাপন্ন থাক ততদিন আমি তোমায় ভাল বাসি। তাহার পর স্বতন্ত্র ব্যবহার।

রামসেবক পুঁটুর মাকে ঘরে লইয়া গেলেন। পুঁটুর মা আপনার ইচ্ছামত কার্য্য করিতে পাইলে বেড়াইতে যাইতেন কি না সন্দেহ, কিন্তু রামসেবক তাহাতে প্রতিবন্ধক হওয়ায় যাওয়া হইল না মনে করিয়া অভিমান করিলেন, মুখ ভার করিয়া রহিলেন। রামসেবক তাহা কিছুই দেখিতে পাইলেন না, তিনি পুঁটুকে আদর করিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া পুঁটু "বাবা" শব্দ পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল, কিন্তু কোন স্থানটি বাবা তাহা ঠিক সিদ্ধান্ত করিতে না পারিয়া কখন চক্ষুতে অঙ্গুলি দিয়া বলিতে লাগিল "এই বাবা" কখন ওষ্ঠে অঙ্গুলি দিয়া বলিতে লাগিল, "এই বাবা।" পুঁটুর এই ভ্রম দেখিয়া পুঁটুর মা হাসিয়া ফেলিলেন, তাঁহার আর অভিমান থাকিল না, তিনি পুঁটুকে তখন আপন ক্রোড়ে লইয়া পুনঃ পুনঃ মুখচুম্বন করিয়া বলিতে লাগিলেন "ঠিক কথা, পুঁটু! ওরে চেনা যায় না।" পুঁটু হাসিয়া

উঠিল। পুঁটুকে তখন বুকে তুলিয়া গালের উপর গাল টিপিয়া নিশ্বাস টানিয়া পুঁটুর মা সুখে বলিতে লাগিলেন "পুঁটু, পুঁটু, আমার পুঁটু!"

রামসেবক। ও কি! তুমি যে করে পুঁটুকে টিপ, আমার ভয় করে।

পুঁটুর মা। আমার পুঁটুর গায় কেমন ক্ষীর ক্ষীর গন্ধ।

রামসেবক। আজ তোমার গায়েও সদ্গন্ধ বেরিয়েছে। পুঁটুর মা একটু লজ্জিতা হইলেন। লজ্জায় হাসিয়া বলিলেন, সহাগী কি কতকগুলা মাখাইয়া দিয়াছে। আমি কাল সোহাগ তেল মাখিব।

রামসেবক। সোহাগ তেল মাখিলে কি হবে?

পুঁটুর মা। তুমি আমায় ভালবাসিবে।

রামসেবক। আমি কি তোমায় ভাল বাসি না।

পুঁটুর মা। কই না।

রামসেবক। তবে ভালবাসা কারে বলে?

পুঁটুর মা। ভাল বাসা কারে বলে তুমি কি তা জান না। তুমি কি কাহারেও কখন ভাল বাস নাই।

রামসেবক। ভাল বেসেছি, এক সময় মাকে ভাল বেসেছি, এখন হয় ত সেইরূপ তোমায় ভাল বাসি।

পুঁটুর মা। হয় ত।

রামসেবক। তা বই কি, আমি কেমন করে বুঝিব?

পুঁটুর মা। ও পোড়া কপাল! ভাল বাসা কি বুঝে দেখিতে হয়? না, পাড়ার লোককে জিজ্ঞাসা করে জানিতে হয় যে ওগো তোমরা বলে দাও আমি কারে ভাল বাসি। তুমি ভাল বাস অথচ তুমি জান না যে কারে ভাল বাস।

রামসেবক। জানি বই কি? তবে দুজনের মধ্যে ঠিক করে বলিতে গেলে একটু সন্দেহ হয়, তাই বলিতেছিলাম তোমায় হয় ত মার মতই ভাল বাসি।

পুঁটুর মা। ও কি আবার কথার শ্রী?

রামসেবক। তা নয়, তা নয়, বলি তোমাদের দুজনাকেই সমান ভাল বাসি, হয় ত তোমায় কিছু বেসি ভাল বাসি।

পুঁটুর মা। আমায় যে তুমি ভাল বাস তা আমি কেমন করে বুঝিব? তুমি মনে করে দেখ দেখি কখন কি আমায় ভাল বাসার দুটা কথা বলেছ।

রামসেবক। সত্য কথা, বলিনে। ভালবাসার কথা কারে বলে আমি তা ঠিক জানি না, জানিলে অবশ্য বলিতাম। আমি ত কখন স্ত্রী পুরুষের একত্রে কথা বার্ত্তা শুনি নাই, শুনিলে শিখিতাম। তাহার পর ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন একবার গল্প শুনিয়া ছিলাম যে, একজন ভট্টাচার্য্য আপনার স্ত্রীর গাল ধরিয়া আদর করিয়াছিল "তুমি আমার নিমন্ত্রণ পত্র, তুমি আমার নস্যর শামুক, তুমি আমার ভুজ্জির চাল, তুমি আমার টাকার থলি, তুমি আমার বিদায়ের ঘড়া।" যদি এরূপ ভাল বাসার কথা চাও তা সময়ে সময়ে দুই একটা বলিতে পারি।

পুঁটুর মা হাসিয়া বলিলেন "না আমায় তোমায় ভাল বাসার কথা বলে কাজ নাই।"

রামসেবক। ভাল, বল দেখি, স্ত্রীকে ভাল বাসে না এমন লোক কি জগতে আছে?

পুঁটুর মা। আছে?

রামসেবক। কে?

পুঁটুর মা। রাজা।

রামসেবক। সে কি। রাজা কি রাণীকে ভাল বাসেন না, তবে তাঁহার সংসার চলে কেমন করে? না না, এ মিছে কথা।

পুঁটুর মা। আমি নিশ্চয় জানি, আমার অপেক্ষা রাজবাড়ির খবর কে জানে, আমি রাজার সকল কথা জানি। রাজা রাণীকে একেবারে ভাল বাসেন না।

রামসেবক। কেন ভাল বাসেন না?

পুঁটুর মা। কারণ আছে,

রামসেবক। কি, বল না।

পুঁটুর মা। তা আমি বলিব না। সে কথা যাক, এখন আমায় ভাল বাসিবে বল।

রামসেবক। কারে ভাল বাসা বলে আমায় শিখাইয়া দেও। কে স্ত্রীকে বিশেষ ভালবাসে বল আমি তার দেখে শিখি।

পুঁটুর মা। হাসিয়া বলিতে লাগিলেন বলিব! বলিব! এক জন স্ত্রীর জন্য আপনার প্রাণ—

পুঁটুর মা এই কথা বলিতে বলিতেই শিহরিয়া উঠিলেন "ওমা কেন অমন পোড়া কথা মুখ দিয়া বাহির হইল" এই বলিয়া কিঞ্চিৎ বিমর্শ হইলেন।

সে বৃত্তান্ত কি, রামসেবক তাহা জিজ্ঞাসা না করিয়া পুঁটুর মাকে অন্যমনস্ক করিবার নিমিত্ত বলিলেন "পুঁটুকে আজ রাজবাটীতে লয়ে যাবে না?"

পুঁটুর মা। কই, তার কোন কথা ত নাই।

রামসেবক। তুমি কাল যখন গিয়াছিলে তখন আমি দেখি নাই। তুমি কি এই বেশে গিয়াছিলে?

পুঁটুর মা। না।

রামসেবক। আজ তোমায় বড় সুন্দর দেখাচ্ছে।

পুঁটুর মা প্রথমে অলঙ্কারের প্রতি পরে বস্ত্রের প্রতি চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "আমি যদি সুন্দর, তবে তুমি এখন আমায় ভাল বাসিবে বল।"

রামসেবক। কই, পূর্ব্বে ত তুমি ভাল বাসিবার নিমিত্ত কখন অনুরোধ কর নাই, আজ কেন ভাল বাসাবার এত চেষ্টা হইয়াছে?

পুঁটুর মা। আগে আমার গহনাও ছিল না বস্ত্রও ছিল না। মনে করিতাম যে আমার কি আছে যে তুমি ভাল বাসিবে। এখন আমার সে সব হয়েছে, এখন বলিলে বলিতে পারি যে আমায় ভাল বাস।

রামসেবক। লোকে কি বস্ত্র অল-

ঙ্কারের নিমিত্ত স্ত্রীকে ভালবাসে? তাহা না থাকিলে কি ভাল বাসে না।

পুঁটুর মা। তা বই কি? বস্ত্র অলঙ্কার থাকিলে লোকে সুন্দর হয়। এত দিন আমার বস্ত্রালঙ্কার ছিল না, তুমি ত এক দিনও আমায় সুন্দর বল নাই। আজ আমায় সুন্দর দেখেছ, আমিও ভাল বাসার দাবি করেছি, অন্যায় হয়েছে? বল?

বামসেবক। তাই বলে কি পুটুকে তুমি সুন্দর দেখ নাই, না ভালবাস নাই। আসল কথা বস্ত্র অলঙ্কারে লোক সুন্দর হয় না।

পুটুর মা। তা যদি না হয় তবে লোকে বস্ত্র অলঙ্কারের জন্য এত করে মরে কেন? তোমার ও কথা শুনি না। অলঙ্কারে নাকি লোককে সুন্দর দেখায় না।

বামসেবক। অলঙ্কারে সুন্দরীর সৌন্দর্য্য বাড়ায় সত্য, কিন্তু আবার কুৎসিতার কুরূপ আরও বাড়ায়। তোমরা আপনারাই ত বলে থাক "নারীর ঐ ত রূপ তার উপর আবার গহনা পরেছে।"

পুঁটুর মা। মিথ্যা নয়। কুরূপীরা গহনা পরিলে বড় কুৎসিত দেখায় কিন্তু তবু লোকে গোদা পায়ে আল্তা পরে, খাঁদা নাকে উল্কী পরে। তারা কি জানে যে এতে তাদের আরও কুৎসিত দেখায়? আমায় ত কুৎসিত দেখাচ্ছে না, বল?

বামসেবক। তোমায় বড় সুন্দর দেখাচ্ছে।

পুঁটুর মা। তবে আমি একবার পদ্মর কাছে যাই।

বামসেবক হাসিয়া বলিলেন। যাও।

পুঁটুর মা পুঁটুকে কোলে করিয়া খড়কি দ্বারের দিকে গেলেন। গৃহে বামসেবক একা বসিয়া রহিলেন।

১২

যখন বামসেবক স্ত্রীপুরুষে একত্রে কথা বার্ত্তা কহিতেছিলেন তখন রাজা ইন্দ্রভূপ পারিষদ সমভিব্যাহারে বায়ুসেবনে যাইতেছিলেন। বামসেবকের বাটীর নিকট আসিয়া একবার দাড়াইলেন কিন্তু কিছুই না বলিয়া আবার পূর্ব্বমত মন্দ পাদবিক্ষেপে চলিতে লাগিলেন। ইচ্ছা একবার মাধবীলতাকে দেখেন, তাহাকে আনিতে বলিলেই তৎক্ষণাৎ দেখিতে পান কিন্তু কি ভাবিয়া আনিতে বলিলেন না, অথচ তাহাকে দেখিবার সাধও জন্মিয়াছে। পথে হয় 'ত মাধবীকে কাহার ক্রোড়ে দেখিতে পাইবেন এই মনে করিয়া ইপ্সিত লোচনে ইতস্ততঃ চাহিতে চাহিতে চলিলেন। কতক দূর যাইয়া দেখিলেন, আর একটী বালিকা এক বৃদ্ধের জানু ধরিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। পড়িয়া যাইতেছে আবার উঠিয়া জানু ধরিয়া উর্দ্ধমুখে দাঁড়াইতেছে ইচ্ছা যে ক্রোড়ে উঠে। বৃদ্ধ সে দিকে একে-

বাবে দৃষ্টি না কবিয়া অবাক্ হইয়া বাজদর্শন কবিতেছে। বাজা হাসিয়া বলিলেন "এদিকে কি দেখিতেছ? নাগরী যে তোমাব পাদমূলে।" বৃদ্ধ অপ্রতিভ হইযা বালিকাকে ক্রোডে লইল,মুখচুম্বন কবিল, বালিকাও হাসিয়া বৃদ্ধেব মুখ চুম্বন কবিল। বাজা হাসিমুখে দাঁডাইযা দেখিতেছিলেন। হাসিতে হাসিতে চলিযা গেলেন। কতক দূবে গিয়া ফিবিযা দাঁডাইলেন, হাসিতে হাসিতে একজন বৃদ্ধ পাবিষদকে বলিলেন, "বৃদ্ধবা প্রেম পীবিতে একেবাবে বঞ্চিত নহে।" পবে কতকদূব গিয়া আবাব ফিবিযা বলিলেন "এ প্রেমেব প্রতিবাদী নাই।"

এই সময় বৃদ্ধ পাবিষদ বলিলেন "যথার্থই আজ্ঞা কবেছেন এ প্রেমেব প্রতিবাদী নাই। আবাব দেখুন এ প্রেমে বৃদ্ধযুবা সকলেই অধিকাবী।"

"না, সকলে অধিকাবী নয, চূড়াধন বাবুকে তাহা জিজ্ঞাসা করুন,"এই কথা পশ্চাৎ হইতে একজন বলিযা উঠিল। সকলে ফিবিয়া দেখিলেন যে পিতম পাগলা এক বৃক্ষতলে বসিযা কি লিখিতেছিল, বাজাকে দেখিয়া কাগজ কলম হস্তে পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে। বাজা জিজ্ঞাসা কবিলেন "কি পিতম, এখানে যে? আমি তোমাকে দেখিবাব জন্য পশুশালায় যাইতেছিলাম।"

পিতম। মহারাজ আমি পশু নই যে পশুশালায় দেখিতে পাইবেন। যখন লোকে পশুর ন্যায় আমার সহিত ব্যবহাব কবিয়াছিল তখন তথায় গিয়াছিলাম কিন্তু থাকিতে পারিলাম না, সেখানে বাঘেব সঙ্গে আমাব বড বিরোধ হইল। তা ভাবিলাম, যে আমি যেখানেই যাব সেইখানেই বিরোধ, তবে আব কেন এখানে থাকি, তাই চলিয়া আসিলাম।

বাজা। বিবোধ হল কেন?

পিতম। বাঘ কাহাবেও ভালবাসে না, নিজেব ব্রাহ্মণীকেও ভালবাসে না, দাঁত খিচিযা যে প্রেমালাপ কবে তাব সঙ্গে কেমন কবে বাস কবি।

বাজা। বাঘ কি তোমায় ধবে ছিল?

পিতম। ধবে নাই ববং আমিই ধরে ছিলাম, তাব ন্যাজ ধবে টানিয়াছিলাম তাই তাব বাগ। তাব পূর্ব্বে আমাব সঙ্গে অনেক কথা হয়েছিল।

বাজা। কি কথা হয়েছিল।

পিতম। বাঘ বলে যে তোমবা বড় কাপুরুষ, তোমাদেব একেবারে সাহস নাই। তাহাতে আমি উত্তব কবি যে বটে, বটে, তোমাব এ নগরে আসাই তাহাব প্রমাণ। বাঘ বলিল আমায় পিঞ্জববদ্ধ কবে বাখা তোমাদের কৌশলের পবিচয মাত্র,তোমাদের বলবীর্য্যের পরিচয নহে। তোমবা দুর্ব্বল, একত্র থাকাই তাহার পবিচয়, যদি তোমরা আমাদেব মত বলিষ্ঠ হইতে তাহা হইলে তোমাদেব সমাজ কখন সৃজিত হইত না, তোমবা কখন একত্রে বাস কবিতে না, সে প্রবৃত্তিই হইত না, সকলে আ-

মাদের ন্যায় পরস্পর একা থাকিতে। আমরা পরস্পর সকলেই বীর, কেহ কাহার সাহায্য চাই না এই জন্য আমাদের সমাজ নাই। শুনেছ ত দুর্ব্বলের বল সমাজ।

রাজা। তোমার বাপ ত বড় জ্ঞানবান্।

পিতম। দণ্ডনীতি শুনে তার এই জ্ঞান জন্মিয়াছে। ইদানী কোথা হইতে একজন পণ্ডিত এসেছে সে নিত্য দণ্ডনীতি ব্যাখ্যা করিয়া বেড়ায়। কখন কখন পশুশালায় গিয়া দণ্ডনীতি পাঠ করে। যাহারা পশুশালায় আসে তাহারা তাই শুনে, সঙ্গে সঙ্গে পশুরাও কিছু কিছু শুনে। দণ্ডনীতি আপনাদের শিখিতে হয় না, আপনারা রাজা আপনাদের নিমিত্ত রাজনীতি, আমরা প্রজা আমাদের নিমিত্ত দণ্ডনীতি। বশিষ্ঠদেব যখন রামচন্দ্রের নিমিত্ত রাজনীতি লেখেন সেই সময় পরশুরাম দণ্ডনীতি লিখিয়াছিলেন। এত দিন তাহার বড় প্রচার ছিল না, এক্ষণে বাঙ্গালা ভাষায় তাহার ব্যাখ্যা আরম্ভ হইযাছে। শ্লোক গুলি এক একটি করিয়া সকলকে লিখিয়া দিয়াছে, আমিও দুই একটী পাইয়াছি।

রাজা। শ্লোকগুলি কি?

পিতম পাঠ করিল :—

"মনুষ্যের বল মনুষ্য, এইজন্য সমাজ।
প্রথমে সমাজ অন্ধ এই জন্য রাজা।
তার পর কালি পড়িয়াছে।"

রাজা। এ কই ত শ্লোক হইল না?

পিতম। না হউক, আর একটা বলিঃ—

"দেশের প্রকৃতিতে সমাজের প্রকৃতি,
তদনুসারে সমাজের উন্নতি বা অবনতি।"

রাজা। তোমার কাগজে অঙ্কপাত কিসের?

পিতম। ও আপনাদের ঠিকুজি গণনা করিতেছিলাম।

রাজা। জ্যোতিষ শাস্ত্র পড়া আছে তবে।

পিতম। বিলক্ষণ পড়া আছে।

রাজা। ভাল, কি গণনা করেছ?

পিতম। আপনার সময় বড় মন্দ। গ্রহ আপনার সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইতেছে। আপাতত আপনার জলভীতি। এই কথা বলিবামাত্র চূড়াধন বাবু চঞ্চল হইয়া প্রখর দৃষ্টিতে পিতমের প্রতি চাহিলেন কিন্তু তৎক্ষণাৎ শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়া হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর আমার? আমার কি ভীতি?"

পিতম। আপনার সময় বড় ভাল, ইচ্ছা হয় এই সময় আপনার পোষ্যপুত্র হই, আমায় পোষ্যপুত্র লইবেন? "পুত্র পিণ্ড প্রয়োজন" আমি আপনার শ্রাদ্ধ করিতে পারিব।

রাজা বিরক্ত হইলেন, পিতম তাহা বুঝিতে পারিয়া গীত গাইতে গাইতে চলিয়া গেল।

এই দিবস রাত্রি দুই প্রহরের সময় চূড়াধন বাবুর দ্বারে দুইজন খর্ব্বাকার পুরুষ দাঁড়াইয়া চুপি চুপি কি কথা কহিতেছিল। রাত্রি অন্ধকার, কেহ তাহাদের

দেখিতে পায় নাই, দেখিলে লোকে ভয় পাইত। উভয়েব হস্তে গুপ্তি, কটি দেশে ক্ষুদ্র ভোজালি, ওষ্ঠে লোম। শেষ পবিচয়টি সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক। তৎ কালে বাঙ্গালি গুম্ফ বা শ্মশ্রু রাখিত না। বাঙ্গালি তখন নম্র, শান্ত, ধর্ম্মভীত। তখন গোঁফ বাখিলে বিপবীত বুঝাইত। যে গোঁফ বাখিল সে 'প্রকাশ্যরূপে জানাইল যে আমি রাজা মানি ন',সমাজ মানি না, কিছুই মানি না। এই জন্য এক সময়ে বিষ্ণুপুরেব বাজাবা গোঁফ দেখিলেই শিবশ্ছেদ কবিতেন। ক্রমে বাজাদের শিবশ্ছেদ হইল কাজেই প্রজাব ওষ্ঠে গোঁফ গজাইল। কিন্তু অনেক দিন পর্য্যন্ত গোঁক সাহসেব পবিচায়ক ছিল এই জন্য প্রথমে লাঠিয়ালেবা গোঁফ রাখে। পবে গৃহরক্ষকেরা বাখে। তাহাব পব সাহসিক যুবাবা রাখে। এখন সকলেই বাখে। গোঁফ আব সাহসব্যঞ্জক নহে।

ক্ষণেক বিলম্বে চূড়াধন বাবু ধীবে ধীবে নিঃশব্দে দ্বার খুলিলেন। আগন্তুকেব মধ্যে একজন বলিল, "এতক্ষণ ধরে দাড়াইয়া থাকিতে গেলে ত চলে না, চারিদিকে লোক লাগিয়াছে।" চূড়াধন বাবু কোন উত্তর না করিয়া তাহাদের লইয়া বৈঠকখানায় গেলেন। তথায় প্রদীপ ছিল না, অন্ধকারে তিন জনে বসিলেন। যে ব্যক্তি প্রথমে কথা কহিয়াছিল সে জিজ্ঞাসা করিল "এখানে আর কেহ নাই ত ?" চূড়াধন বাবু বলিলেন নির্ভয়ে কথা কহ। কিন্তু প্রথমে জিজ্ঞাসা করি গত রাত্রে কেন আস নাই ?

প্রথম বক্তা। কাল চাবিদিকে বড পাহাবা ছিল। সন্দেহ কবে দুই চারি জনকে ধরে লইয়া কযেদ কবেছে।

চূড়াধন। তবে কি দেওয়ান সন্দেহ কবেছে ?

প্র, বক্তা। বিলক্ষণ সন্দেহ করেছে, কিন্তু সুবিধা এই যে আমাদের কেহ চেনে না। চেনে না বলিয়াই নূতন লোক দেখিলেই ধরিতেছে। কাজেই দশনীতি ব্যাখ্যা বন্ধ হয়েছে। তা হউক যে কয়টি নীতি বলা হয়েছে তাহাতেই কাজ হবে।

চূড়াধন। দেওযানেব সন্দেহ হল কেন ? অবশ্য তোমরা অসাবধান হয়েছিলে।

প্র, বক্তা। কিছু মাত্র নহে। তবে কি জান,আগুন লেগেছে এখন ঘুমন্তরও ঘুম ভাঙ্গিবে। নগরের সকল লোকই বাজার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে, সকলেই সর্ব্বদা রাজার অধর্ম্মাচরণের কথা কহিতেছে। জানিতে কি আর বাকি থাকে ?

চূড়াধন। তা নয়, বোধ হয় তোমাদেব কোন সঙ্গী দেওয়ানের হস্তগত হয়েছে, নতুবা অতি গোপন উদ্যোগ প্রকাশ পাইল কিরূপে ?

প্র, বক্তা। কোন উদ্যোগ ?

চূড়াধন। আজ একজন আসিয়া

রাজাকে বলিয়া গিয়াছে যে সম্প্রতি তাঁহার জলের ভয় আছে।

প্র, বক্তা। সে কি?

চূড়াধন। আমি স্বকর্ণে শুনিয়াছি।

ইহার পর তিনজনে বড় তর্কবিতর্ক হইল। অনেকক্ষণ পরে সকলেই উঠিলেন। বিদায় হইবার সময় চূড়াধন বাবু বিশেষ করিয়া সাবধান করিয়া দিলেন আর বলিলেন যে, সঙ্গিমধ্যে কে বিশ্বাসঘাতক তাহার অনুসন্ধান সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক।

প্র, বক্তা। আপনাকে কিছু বলিতে হইবে না, আমি তাকে সিদ্ধেশ্বরীর কাছে নরবলি দিয়ে আপনাকে সংবাদ দিব।

চূড়াধন। না, না, তা কদাচ কর না, সর্ব্বাগ্রে আমায় সম্বাদ দিবে আমি স্বহস্তে তাহার ঘাড় মুচড়াইব।

এই শেষ কথাগুলি চূড়াধন দন্তপিষিয়া বলিলেন। "আচ্ছা," বলিয়া আগন্তুকেরা চলিয়া গেল, চূড়াধন বাবু ক্ষণেক দ্বারে দাঁড়াইয়া শেষ অন্তঃপুরে গেলেন। এই সময় বৈঠকখানা হইতে চতুর্থ আর এক ব্যক্তি অতি সাবধানে বাহির হইল। দ্বারবান্ তাহারে অতি যত্নে দ্বার খুলিয়া দিয়া বলিল "দেখিবেন আমি যেন মারা না যাই।" "কুচপরয়া নাই" বলিয়া অপরিচিত ব্যক্তি চলিয়া গেল।

মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য।

মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য কি? একথা লইয়া অতি প্রাচীনকাল হইতে আজি পর্য্যন্ত যে কত আন্দোলন হইয়া গিয়াছে তাহার ঠিকানা নাই। কত লোক যে কত কথা বলিয়া গিয়াছেন তাহার নির্ণয় হয় না। যাঁহার যেরূপ প্রকৃতি, যাঁহার যেরূপ শিক্ষা, যাঁহার যেরূপ সহবাস, যাঁহার যেরূপ সমাজ তিনি সেই রূপ মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য স্থির করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মত লইয়া আবার অনেকে কত বিবাদ বিসম্বাদ করিয়াছে কত বাক্ বিতণ্ডা করিয়াছে কত রাশি রাশি ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচার করিয়াছে। যখন বৈদিক সময়ে মনুষ্যজীবনের প্রথম অবস্থা, যখন মনুষ্যপ্রকৃতির অসীম ক্ষমতা দৃষ্টে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সর্ব্বত্র দেবতা দেখিত ও সেই দেবতাদিগের আরাধনা করিত তখন যাগযজ্ঞ স্তবস্তুতিই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য ছিল, ক্রমে যখন চিন্তাশক্তি প্রবল হইতে লাগিল যখন পৃথিবীর সুখের সঙ্গে জন্মজরামরণকৃত দুঃখ অত্যন্ত ও একান্ত মিশ্রিত বোধ

হইতে লাগিল তখন ইহলোকের সুখে বিসর্জ্জন পরলোকের শুদ্ধ চৈতন্য ভাবে অবস্থান করাই (মুক্তিই) জীবনের উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইল। যখন অসংখ্য অনার্য্যগণের মধ্যে আর্য্যজাতির সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল তখন বংশবৃদ্ধি করিয়া পিতৃ পিতামহের নাম রক্ষা করা জীবনের উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইল। যখন দারুণ রৌদ্রতপ্ত আরবীয়গণ মহম্মদের মত অবলম্বন করতঃ প্রথম সভ্যতাসোপানে আরোহণ করিল—প্রথম চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইল তখন মৃত্যুর পর দিব্যাঙ্গনাসংসর্গে স্বর্গপুরে মদিরাপান করাই বিধেয় স্থির হইল। যখন পুরোহিতপদদলিত ইউরোপ অজ্ঞানতিমিরে আচ্ছন্ন তখন ধর্ম্মের জন্য পুরোহিতদিগকে অকাতরে ধনদান করাই জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া সংকল্পিত হইল। ইহা অপেক্ষাও আবার যখন ইউরোপের অবস্থা ক্রমশঃ অধিকতর শোচনীয় হইয়া উঠিল তখন পোপ মহাশয় ঈশ্বরের নায়েব দাওয়ান হইয়া স্বর্গের এক প্রকার নোট (indulgences) প্রচার করিলেন, সেই নোট ভাঙ্গাইয়া যে টাকা দিবে তাহারই জীবন ধন্য ও সেই "স্বর্গ লোকে মহীয়তে" স্থিরীকৃত হইল।

এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক অবস্থায় জীবনের উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন পরিগণিত হইয়াছে। সমাজ যখন প্রথম উন্নতির মুখে তখন এক রূপ উদ্দেশ্য, যখন উন্নতি হইতেছে তখন একরূপ, যখন অতি উন্নতি তখন আর একরূপ। আবার যখন সমাজ অধঃপাতে যাইতেছে তখন আর এক প্রকার।

ন্যায়সূত্রে প্রয়োজন নামে একটী পদার্থ আছে তাহার দুই অঙ্গ, মুখ্য ও গৌণ। সুখ লাভ মুখ্য উদ্দেশ্য, দুঃখনাশ গৌণ। বস্তুতঃ মনুষ্যজীবনে যা কিছু করা যায় তাহার উদ্দেশ্যই সুখ। কিন্তু দুঃখনাশ ব্যতীত সুখ হয় না। এজন্য দুঃখনাশও গৌণ প্রয়োজন অবধারিত হইয়াছে। দুঃখনাশ উপায়, সুখ উদ্দেশ্য। কিন্তু সুখ কি? আবার গোলযোগ! কেহ বলিবেন পরলোকের সুখই সুখ, কেহ বলিবেন ইহকালের সুখই সুখ কেহ বলিবেন দুঃখ ও সুখ দুই খারাপ, দুইএর নাশই ভাল। কৃপণ বলিবেন অর্থসংগ্রহই সুখ, কেরাণী বলিবেন গার্হস্থ্য সুখই সুখ, পণ্ডিত বলিবেন লেখাপড়ার সুখই সুখ, স্বদেশহিতৈষী বলিবেন দেশের মঙ্গলেই সুখ। আবার সেইরূপ লোকের শিক্ষা, প্রকৃতি, সংসর্গ, সহবাস, জাতি, গুণে সুখের আকার ভিন্ন ভিন্ন। আমি যাহাকে দুঃখ বলি রামা চাঁড়াল তাহাকে সুখ বলে, আমি যাহাকে সুখ বলি রামা চাঁড়াল তাহাকে আহাম্মকী বলে, নবীন কেরাণী তাহাকে দারুণ কষ্ট বলে। আমি কলম চালাইয়া জীবনের উদ্দেশ্য কি ভাবিয়া অস্থির হইতেছি আমার ইহাতে যদি আনন্দ না হইত কখন একর্ম্ম করিতাম না কিন্তু আমার পার্শ্বে বসিয়া একজন বলিতেছেন, আরে ভাই, বার

জীবনের যে উদ্দেশ্য সেই তাহা বুঝিবে তোর এত মাথা ব্যথা কেন?

জীবনের উদ্দেশ্য কি, বুঝিতে হইলে আগে জীবন কাহাকে বলিতেছি তাহা জানা চাই। আমরা ধর্ম্মজীবন নৈতিকজীবন আধ্যাত্মিক জীবন পারমার্থিক জীবনের কোন কথাই বলিতেছি না। আমরা মনুষ্যজীবন মাত্রের কথা কহিতেছি। মনুষ্যের জীবনটা কি? শুদ্ধ জন্ম হইলেই কি জীবন হইল। তাহা নহে। ✓জীবন বলিতে গেলে জন্ম হইতে মরণ পর্য্যন্ত মনুষ্য যে প্রকারে বাঁচিয়া থাকে তাহার নাম জীবন।✓ মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়াই বহুসংখ্যক কষ্টকর ও জীবনঅহিতকর প্রাকৃতিক নিয়ম ও পদার্থে পরিবেষ্টিত হইয়া পড়ে। জীবন আর কিছু নহে এই সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়মের সঙ্গে প্রতিনিয়ত নিমেষান্ত বা ব্যবহিত যুদ্ধের নাম জীবন। মনুষ্যকে কষ্ট দিবার ও মনুষ্যজীবন নাশ করিবার জন্য কত শত কারণ রহিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। যে বায়ু মনুষ্যের পরম বন্ধু যাহা ভিন্ন এক মুহূর্ত্ত চলে না সেই বায়ু কত রোগ পীড়ার কারণ, কত সময় ঝড়ে সহস্র সহস্র মনুষ্যবধের কারণ হয়। যে জল নহিলে এক দণ্ড চলে না সেই জল খারাপ হইয়া কত দেশ একেবারে জনশূন্য বিজন অরণ্যে পর্য্যবসিত হইয়াছে। কত দেশ বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে। এ সকল ত উপকারী জিনিসে অপকার করিতেছে, কত কত জন্তু আছে মনুষ্যের জীবন অপহরণই তাহাদের উদ্দেশ্য, কত কত বিষাক্ত দ্রব্য আছে তাহার স্পর্শে জীবন নষ্ট হয়, কত কত পদার্থ আছে যাহাতে জীবন একেবারে নষ্ট না হউক ক্রমে মনুষ্যের শরীর ও মন অবসন্ন ও অকর্ম্মণ্য হইয়া আসে। স্বভাবের নিয়মে এমন অনেক মনোবৃত্তি অপর ব্যবহার করাইয়া দেয় যাহাতে নিঃশব্দে অথচ নির্ব্বিরোধে মনুষ্যের সর্ব্বনাশ করিয়া ফেলে। এমন বিষ আছে যাহা একবার খাইলে যাবজ্জীবন কষ্ট পাইতে হয়। নির্ব্বোধ চিন্তাশক্তিশূন্য সদসৎবিবেকরহিত এমন অনেক পশুবৎ মনুষ্য আছে যাহাদের সহিত একবার সংসর্গ হইলে যখনই তাহাদের কথা মনে হয় তখনই মনে মনে কষ্ট হয় ঘৃণা হয়। ✓এই সকল অপকারী দুঃখদায়ক কারণ পরম্পরার সঙ্গে অনবরত রণ করিয়া জয়ী হইয়া স্বচ্ছন্দে অক্লেশে দীর্ঘকাল পৃথিবীতে থাকার নাম জীবন।✓ এরূপ যুদ্ধে যে সর্ব্বত্র মনুষ্য জয়ী হইতে পারিবে এমত নহে, অনেক সময় এমন করিয়া চলিতে হইবে যে পূর্ব্বোক্ত প্রকার দুঃখকর সামগ্রী কোন রূপ অপকার করিয়া উঠিতে না পারে, অনেক সময় উহাদের হস্ত হইতে পলাইয়া পরিত্রাণ পাইতে হয়। উদাহরণ প্রতিবৎসর ৫। ৬ বার করিয়া ঋতু পরিবর্ত্তন হয় প্রতি ঋতুতে বিভিন্ন প্রকার আহার, বিভিন্ন প্রকার পরিধেয়, বিভিন্ন প্রকার ব্যবহার প্রয়োজন। ঋতু তুমি পরিবর্ত্তন করিও না

বলিয়া রাখিবার ক্ষমতা মনুষ্যের আজিও হয় নাই, সুতরাং বিধিমতে চেষ্টা করা উচিত যে এই দুঃখদায়ক পরিবর্ত্তন কোন ক্ষতি করিতে না পারে। এই রূপ নানাপ্রকার দুঃখকর যন্ত্রণাময় কষ্ট সঙ্কুল অবস্থায় আপনাকে এমন করিয়া চালাইতে হইবে যে কোনরূপ কষ্ট না হয়। এই প্রকারে সুন্দর রূপে আপনাকে চালানর নাম জীবন। রোগ শোক প্রভৃতি যত কিছু মনুষ্যের কষ্ট আছে সে সকলই পূর্ব্বোক্ত প্রকারে চলিতে না পারার দোষ। এতক্ষণ যে আমরা কেবল বাহ্য জগতের অবস্থার সঙ্গেই মিলাইয়া চলিতে বলিতেছি এমত নহে। অন্তর্জগতের অবস্থার সঙ্গেও মিলাইয়া চলিতে হইবে। মনুষ্য স্বজাতিসংসর্গ ভিন্ন চলিতে পারে না। কিন্তু যেমন নিতান্ত প্রয়োজনীয় বায়ুও অনেকস্থলে জীবননাশক হয় সেই রূপ মনুষ্যের সংসর্গও সময়ে সময়ে সর্ব্বনাশের হেতু হয়। যে মানুষ আপনাকে পূর্ব্বোক্ত রূপে চালাইতে নাপারে সে মানুষ খারাপ হইয়া যায় তাহার সংসর্গে লোকের অনেক দোষ জন্মায়। সে যেমন বহিয়া গিয়াছে অন্য লোকও তাহার সঙ্গে থাকিলে তেমনি বহিয়া যায়। অতএব দূষিত বায়ু যেমন পরিহার্য্য দূষিত মনুষ্যও সর্ব্বতোভাবে পরিহরণীয়। এইরূপে শরীরস্থিত ও অন্তর্জগৎ এবং বহির্জ্জগৎস্থিত কার্য্য কারণ পরম্পরার যে সকল বিরোধ আছে সেই সকল বিরোধের কোথাও প্রতিবিধান করিয়া কোথাও হস্ত এড়াইয়া সকল অবস্থায় শারীরিক ও মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য ভোগের নাম জীবন। অনেকে বলিবেন তবে স্বার্থপরতাই জীবন? তাহার উত্তর এই যে জীবন টুকু পূর্ণ স্বার্থপরতা, ঐ স্বার্থপরতা টুকু নিতান্ত প্রয়োজনীয়। এই স্বার্থপরতা টুকু যে শুদ্ধ আমরাই আজি চাহির করিতেছি এমন নহে শত শত বৎসর পূর্ব্বে মহামহোপাধ্যায় মনুও বলিয়াছেন।

বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্ব্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্য
লক্ষণং।

তাঁহার মতে আপনার প্রিয়ও একটি প্রধান ধর্ম্ম কিন্তু কোনটি আপনার প্রিয় সেটি বাছিয়া লইতে অনেক কষ্ট হয় তাহার জন্য উত্তম শিক্ষা আবশ্যক, নহিলে একজন অশিক্ষিত লোক আজি আপনার প্রিয় বলিয়া এক কাজ করিয়া বসিল কালি তাহা তাহার ঘোরতর অপ্রিয় হইল সে হয় ত ইহজন্মের মত মাটী হইল। কিন্তু শিক্ষিত লোকের চক্ষে আপনার প্রিয় কি? পূর্ব্বোক্ত প্রকার বিরোধের হাত হইতে উদ্ধারের নামই সেই প্রিয় বস্তু।

অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন নিরন্তর বিরোধ যেখানে, সেখানে সকলেই যে সে সমস্ত বিরোধের হাত হইতে উদ্ধার হইবে তাহা কখনই সম্ভব নহে। অনেকে দুই এক জায়গায় প্রলোভন অতিক্রম করিতে পারিলেন না। অনেকে

বাহ্যজগতের প্রাতিকূল্যের সহিত বিরোধ করিয়া রোগগ্রস্ত হইলেন, অনেকে অন্যান্য সাংসারিক সামাজিক অনেক কারণে যে ভাবে আপনাকে চালান উচিত সেভাবে আপনাকে চালাইতে পারিলেন না। তবে তাহার জীবন কি জীবন বলিয়া পরিগণিত হইবে না? অবশ্য হইবে। তাঁহারা যদি সেই অবধি সামলাইয়া বরাবর ভাল করিয়া চলিতে পারেন তাঁহাদের জীবনও জীবন, আর না পারেন তাঁহাদের দুঃখে শৃগাল কুকুর রোদন করে, তিনি বাঁচিয়া থাকেন বটে কিন্তু সে জীবন্মৃত তাঁহার বাঁচিয়া সুখ নাই। তিনি নিজেও ভাবেন—

দুঃখসংবেদনায়ৈব ময়ি চৈতন্যমাহিতং।

আর তাঁহার নিকটস্থ লোকদিগকে শিক্ষা দেন যে জগৎ দুঃখময়, ইত্যাদি। তাদৃশ লোকের প্রতি শ্রদ্ধা বা অনুকম্পা প্রদর্শন উচিত কি না সে বিষয়ে খুব সন্দেহ। আবার যাহারা একবার দুষ্কর্ম্ম করিয়া পরে শোধরাইয়া গেলেন তাঁহারাই কি যাঁহারা কখন নিয়ম লঙ্ঘন করেন নাই তাঁহাদের মত হইতে পারেন? কখনই না। জীবনের ঐ এক দুর্ঘটনা স্মৃতি চিরদিন তাঁহাদের মনে মনে না হয় শরীরে গাঁথা থাকে তাহাতে তাঁহাদের শরীর ও মনের সর্ব্বতোমুখী উন্নতি হইতে দেয় না।

যাহারা পূর্ব্বোক্ত বিরোধের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া রীতিমত আপনাকে চালাইতে পারে তাহাদের শরীর সুস্থ থাকে, শরীর বলিষ্ঠ সুন্দর কর্ম্মক্ষম তেজস্বী হয়, তাহাদের মনোবৃত্তি সকলও পরিবর্দ্ধিত হয়। শুদ্ধ বুদ্ধিশক্তি, শুদ্ধ হৃদয়বৃত্তি, শুদ্ধ কর্ম্মক্ষমতার উন্নতি হইয়া নিবৃত্ত হয় না, সকল প্রকার মনোবৃত্তিই তাহাদের পরিপুষ্ট হয় তাহাদের দ্বারা জগতের অনেক কাজ হয় তাহারাই সমাজের শক্তি। সুস্থশরীরে সবল মন থাকাই অনেকে মনুষ্যজীবনের প্রধান সুখ মনে করেন। তাহা নহে। সেটী সম্যকপরিপুষ্ট ও উন্নত মনুষ্যজীবন মাত্র, মনুষ্যের জীবনের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র। সুস্থ শরীর ও সবল মন মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য সাধনের উপায় মাত্র, তাহা উদ্দেশ্য নহে। এক্ষণে মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য কি দেখা যাউক।

মনুষ্য যখন জন্মগ্রহণ করিল তখন তাহার মত নিঃসহায় অকর্ম্মণ্য জানোয়ার আর নাই, এক বৎসর যাবে কথা ফুটিতে, দুই বৎসরে হাটিতে শিখিবে, তাহার পর কত কি শিখিলে পরে তবে সে আপনার আহার সঞ্চয় করিবার মত শক্তি পাইয়া স্বাধীন হইবে। এইরূপে স্বাধীন হইতে মনুষ্যের ২৭ বৎসর লাগে। এই সাতাইশ বৎসর পর্য্যন্ত সমাজ তাহাকে খাওয়াইয়া পরাইয়া তাহার যত্ন করিয়া তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিল তবে ত সে স্বাধীন হইয়া নিজে খুঁটিয়া খাইতে শিখিল। যদি বল সমাজ খাইতে দিল কই, দিল তার বাপ মা। সত্য, কিন্তু বাপ মাই খাইতে দেয় কেন? সেও সমাজের নিয়ম বলিয়া ত।

প্রাচীন রোমে অনেক বাপ মা ছেলে হবামাত্র রাস্তায় ফেলিয়া দিয়া আসিত, আরো কত যাযণায় যে ছেলে ফেলিয়া দিবার প্রথা ছিল তাহার ঠিকানা নাই। ক্রমে সমাজবন্ধন যত দৃঢ় হইতে লাগিল ততই সন্তান প্রতিপালন পিতা মাতার অবশ্য কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত হইল। তাহার পর অনেক পিতামাতা সন্তান প্রতিপালন করিয়া উঠিতে পারেন না, অনেক জায়গায় পিতামাতা বালকের বাল্যকালেই কালগ্রাসে পতিত হইয়া থাকেন, এ সর্ব্বত্রইত সমাজ যে কোন রূপে ছেলেগুলিকে বাঁচাইয়া রাখে,কোন ছেলে পরের দয়ার উপর নির্ভর করে, কেহ দীর্ঘকাল শিক্ষানবিস থাকে। যে রূপেই হউক পিতামাতাই হউক, আত্মীয় বন্ধুই হউক, উদাসীনই হউক, সুনিয়ম বদ্ধ দানপ্রণালীই হউক সবই সমাজ বন্ধনের হেতুই হইয়া থাকে। সমাজবন্ধন না থাকিলে শতকরা নিরনব্বই ছেলে মারা যাইত।

অতএব যখন সাতাইশ বৎসর বয়সে মনুষ্য স্বাধীন হইয়া নিজের উপার্জ্জনে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে লাগিল তখন তাহার দেনা অগাধ। এখন হইতে সে যদি শুদ্ধ আপনার মত রোজগার করিয়াই ক্ষান্ত তবে সে মহাপাতকী জুয়াচোর, কারণ সে দেনা শোধ দিবার কোন উপায় করে না। আবার অনেকে আছেন তাঁহারা একেবারে স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জ্জনের কোন উপায়ই করেন না। তাঁহারা সমাজের পরম শত্রু, তাঁহাদিগকে ধরিয়া ফাঁসি দেওয়াই কর্ত্তব্য, যে হেতু তাঁহারা অন্য লোকের ন্যায্য উপার্জ্জনের কড়ি লইয়া অনর্থক নষ্ট করেন, কারণ যে নিজে রোজগার করিবে না তাহার জীবন ধারণই অনর্থক। ডাকাইত, জুয়ারি আর ভিক্ষুক এই তিন জন শেষোক্ত প্রকারের লোক। যাঁহারা আপন ক্ষমতাতীত দেনা করেন পরের টাকা লইয়া দাঁওমারা ব্যবসায় ও বাবুগিরি করেন তাঁহারাও এই শ্রেণীভুক্ত। অতএব যাঁহারা শুদ্ধ নিজের মত রোজগার করিয়া ক্ষান্ত হন ও যাঁহারা রোজগার না করেন তাঁহারা আপনাদেরও কর্ত্তব্যসাধনে বিমুখ, তাঁহাদিগকে সমাজ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দেওয়া উচিত। যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত দেনা শোধ দিতে প্রাণপণে চেষ্টা করেন ও দেন তাঁহারা আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্যক্ সাধন করেন। কিন্তু শুদ্ধ কর্ত্তব্যকর্ম্ম সাধনই ত জীবনের উদ্দেশ্য নহে। তাহার উপর আরও কিছু করিতে হইবে।

এখানে এক প্রশ্ন হইতে পারে সমাজের দেনা কিরূপে শোধ দেওয়া যাইতে পারে। তাহার উত্তর এই যে সমাজের উপকার কর। তোমার নিজের সন্তান সন্ততির সুন্দররূপে প্রতিপালন কর, তাহাদের উত্তম রূপে শিক্ষা দাও, সমাজের যখন প্রয়োজন হইবে তখন তাহার জন্য অর্থ সামর্থ ও প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হইও না, য হাতে সমাজের উপকার হয়

সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা কব, এইরূপেই সমাজের দেনা শোধ হইবে।✓

কিন্তু মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্যসাধন শুদ্ধ এই হইলেই হইবে না, বৃদ্ধ অবস্থায় খতাইয়া দেখ যদি তোমাব দেনা থাকে তবে তুমি মনুষ্যজীবনেব উদ্দেশ্য সাধন কবিতে পাব নাই, যদি ঠিক ঠিক হয তুমি আপনার কর্ত্তব্যকর্ম্ম কবিয়াছ মাত্র কিন্তু যদি তোমার হিসাবে বেশী থাকে তবে তোমার জীবন সার্থক। যত বেশী থাকিবে ততই তোমাব বাহবা। নিজ বুদ্ধিবৃত্তিব দ্বারা পার, পবিশ্রমেব দ্বাবা পার, ধন দ্বারা পাব কর্ত্তব্য যাহা আছে তাহাব অপেক্ষা সমাজেব অধিক উপকাব করিলেই তোমাব মনুষ্যজীবন সার্থক।✓

সেকালে এক গল্প শুনিযাছি, এক রাজাব এক মন্ত্রী ছিল। তাহাব বেতন লক্ষ টাকা। তাহাকে বাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, মন্ত্রিবব, তোমাব এত টাকাব কি দরকার? সে বলিল, মহাবাজ, ইহার চৌথ শোধ দিতে হয, চৌথ ধাব দিতে হয, চৌথ আহার করা যায়, আব চৌথ অসময়ের জন্য সংগ্রহ করি। মন্ত্রিবর ঠিক বলিযাছিলেন যে লোক ধার শোধ দিয়া ও ধাব দিয়া যাইতে পারে সেই ধন্য। মনুষ্যজীবনের দেনা যে যাহাব নিকট হইতে লইয়াছি তাহাকেই শোধ দিতে হইবে তাহা নহে। লইলাম সমজের নিকট, দিলাম সমাজকে; পিতামাতার খাইয়া মানুষ হইলাম, মানুষ কবিলাম সন্তানকে। দাতার খাইয়া মানুষ হইলাম, দিলাম অনাথকে। দরিদ্রালয় হইতে মানুষ হইলাম, স্থাপন কবিলাম বিদ্যালয। গুরুব নিকট উপদেশ পাইলাম, শিক্ষা দিলাম ছাত্রকে। গ্রন্থকারের নিকট উপদেশ পাইলাম, নিজে গ্রন্থ পাঠ কবিযা বচনা করিযা তাহাব ঋণ শোধ দিলাম। কিন্তু সর্ব্বত্র চেষ্টা কবা উচিত যাহা পাইযাছি তাহা অপেক্ষা অধিক দেওযা। পৈতৃক সম্পত্তি কাহাবও নয সমাজেব নিয়মে আমি তাহা পাইলাম। সমাজ আমায দেওযাইয়া দিল, আমি সমাজেব নিকট ঋণী, আমি যদি সেই টাকা তিন দিনে ফুঁকিয়া দিই তবে আমি পাপী, আমি সমাজেব সর্ব্ব প্রকাব দণ্ডেব যোগ্য, যদি তাহা কোনরূপে সঞ্চিয়া বঞ্চিযা রাখিযা যাই তবে আমার মনুষ্যজীবনেব উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না, আমি শুদ্ধ পাকা দ্বাববানেব কাজ কবিলাম বটে, কিন্তু যদি সেই টাকা লইযা খাটাই তাহাতে সহস্র লোকেব জীবন নির্ব্বাহ হইযা আবাব আমাব টাকা বাড়িযা যায় তবে আমি সার্থকজন্মা। আমি যখন পৈতৃক সম্পত্তি বিনাপবিশ্রমে পাইয়াছি তখন আমি যে না পাইয়াছে তাহা অপেক্ষা সমাজেব নিকট অধিক ঋণী, সেই ঋণ পরিশোধের জন্য আমার তাহাদের অপেক্ষা অনেক অধিক পরিশ্রম চেষ্টা ও যত্ন কবা একান্ত উচিত। যিনি স্বাভাবিক বুদ্ধিশক্তি অধিক পাইয়াছেন তাঁহাব একটা মস্ত সুবিধা বিনা পবিশ্রমে পাওয়া হইয়াছে, তাঁহার উচিত সেই

পরিমাণে সংসারের উন্নতির চেষ্টা করা। যে বালক অনেক সুবিধায় উত্তম রূপ শিক্ষা পাইয়াছেন তাঁহার নিকট সমাজ অনেক আশা করে। যেহেতু সমাজে তাঁহার চারিদিক হইতে সুবিধা করিয়া দিয়াছে।

এখন প্রশ্ন এই যে খতাইয়া যে অল্প বা অধিক স্থির করিতে হইবে তাহার উপায় কি? কোন রূপ তুলাদণ্ড ত নাই যাহাতে কার কাজ বেশী হইল কার কম হইল তা জানা যাবে, তাহার নিথতি নাই সের বাটখারা নাই ওজন নাই মাপ নাই, টাকায় তাহার মূল্য করা যায় না যে জানিলাম ৫০০ টাকা ধার আর এই ১০০০ টাকা জমা, ধার শোধ দিয়াও ৫০০ টাকা অধিক থাকিবে। কিন্তু মন তাহার সের বাটখারা লইয়া বসিয়া আছে, আপনার মনে যে আত্মপ্রসাদ জন্মে সেই তাহার মাপ। আর একমাপ যশঃ বাহিরের লোকে তোমায় ত তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতেছে, তাহারা তোমার কাছ থেকে যত টুকু আশা করে তাহা অপেক্ষা তুমি যদি অধিক করিতে পারিলে নিশ্চয়ই তাহারা তোমার সুখ্যাতি করিবে। অতএব যশ মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য নহে, মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে তাহার পরিমাপক মাত্র। যাহারা সমস্ত জীবন কেবল কিসে লোকে ভাল বলিবে কিসে লোকে ভাল বলিবে এই ভাবনায় অস্থির কেবল লোককে খুসী করিবার চেষ্টায় ফিরে তাহাদের যদি সার না থাকে তাহা হইলে তাহাদের সমস্ত উদ্যম বৃথা, তাহারা কেবল লোকের হাস্যাস্পদ হয় মাত্র। যাহাদের সার আছে তাহাদের যশঃ সুখ্যাতি বাঁধা। যাহারা যশকে জীবনের উদ্দেশ্য মনে করে তাহারা সের বাটখারাকে মাপ বলিয়া কিনিয়া লয়।

অনেকে মনে করেন বিদ্যা জীবনের উদ্দশ্য, আত্মোন্নতি জীবনের উদ্দেশ্য। আমাদের দেশে প্রথা ছিল যে বিদ্বান্ ব্যক্তিদিগকে দান করিবে তাহাদের সর্ব্বতোভাবে উৎসাহ দিবে। কিন্তু বিদ্যা যদি খরচ না হইয়া শুদ্ধ পেটে গজ গজ করে তবে বিদ্যায় কাজ কি? যদি সেই বিদ্যা দ্বারা তুমি আপন দেনা শোধ দিয়া সমাজকে কিছু ঋণ দিয়া যাইতে পার তবে ত জানি তোমার জীবন সার্থক নচেৎ তোমার পেটে বাঙ্ময় পোরা থাকিলেও তুমি যদি কেবল আপনার পেট চলিলেই খুসী থাক তবে তোমার বিদ্যার মুখে আগুন।

তাহাই বলিতেছি যে বিদ্যা যশঃ ধন মান পরোপকার এ সকল অতি উৎকৃষ্ট পদার্থ হইলেও ইহার কোনটিই জীবনের উদ্দেশ নহে। নিজের শরীর ও মনের উন্নতি হইয়া নিজের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সুচারু রূপে সম্পন্ন করিয়া তাহার পর বিদ্যা দ্বারা হউক, বুদ্ধি দ্বারা হউক, ধন দ্বারা হউক পরিশ্রম দ্বারা হউক সমাজকে কিঞ্চিৎ ঋণী করিয়া যাইতে পারিলে জীবনের উদ্দেশ্য সফল হইল। নচেৎ শুদ্ধ বিদ্যা লইয়া ধন লইয়া শক্তি লইয়া স্বাস্থ্য লইয়া ধুইয়া খাইলে কিছুই হইবে না।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

বাল্য উদরাময়। শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দত্ত প্রণীত। বহরমপুর। অরুণোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ।।০ আনা।

গোবিন্দ বাবু অবতরণিকায় লিখিয়াছেন যে "বালকের একমাত্র ভাষা রোদন। রোগে রোদন, বেদনায় রোদন, ক্ষুধায় রোদন, প্রার্থনায় (?) রোদন, ঘুমাইতে রোদন, জাগিতে রোদন, রোদন বই আর কথা নাই। প্রসূতিরও দৃঢ় বিশ্বাস শিশু রোদন করিলেই বুঝিতে হইবে, তাহার ক্ষুধা হইয়াছে। অমনি জোর করিয়া ক্রোড়ে ফেলিয়া স্তন্য পান করাইতে বসেন। ইহা একবারও তাঁহার মনে হয় না পুত্রের রোদনের ক্ষুধা ব্যতীত আরও সহস্র কারণ থাকিতে পারে। এই কারণে অনেক সময়েই ক্ষুধা না থাকিলেও আহার হয়—অজীর্ণ হয়—উদরাময় জন্মে।" এই রূপ আরম্ভ দেখিয়া আমরা মনে করিয়াছিলাম যে গ্রন্থখানি গৃহস্থদের নিমিত্ত লিখিত হইয়াছে। স্ত্রীলোকেরা পাঠ করিয়া সতর্ক হইতে পারিবে এবং নিতান্ত আবশ্যক হইলে আপনারাই ব্যবস্থা করিতে পারিবে। পরে দেখিলাম গ্রন্থখানি ক্ষুদ্র হউক, নেটিব ডাক্তারদিগের নিমিত্ত লিখিত হইয়াছে। প্রমাণ স্বরূপ নিম্নস্থ কয়েক পংক্তি ২৫ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত করা গেল। "স্নানের জলের উষ্ণতা ৯২ ডিগ্রি অথবা ৯৫ ডিগ্রি ফ্যারনহিট পর্য্যন্ত ব্যবস্থা করা যায়। এই ঈষৎ উষ্ণ জলে সন্তানকে ছয় অথবা আট মিনিট পর্য্যন্ত নিমগ্ন করিয়া রাখিবেক এবং শীতল জলে স্পঞ্জ অথবা ন্যাকড়া ভিজাইয়া তাহার মস্তক মুছাইয়া লইবে।" ঔষধের নাম গুলিও ল্যাটিন। বিলাতি ঔষধের বাঙ্গালা নাম কোথা পাওয়া যাইবে। নেটিব ডাক্তারগণ এই গ্রন্থ পড়িয়া বিশেষ উপকৃত হইবেন কি না জানি না কিন্তু যে প্রণালীতে লেখা হইয়াছে তাহাতে বোধ হয় উপকার হইবে।

মানব সংস্কারক। শ্রীসেখ আবদুল লতিফ কর্তৃক লিখিত। মেদিনীপুর। মূল্য ।।০ আনা।

গ্রন্থকারের নাম পড়িয়া ভাষা সম্বন্ধে আমাদের ভয় হইয়াছিল কিন্তু পরে দেখিলাম যে গ্রন্থখানি হিন্দুর বাঙ্গালায় লিখিত, কায়স্থের ভাষায় লিখিত, ব্রাহ্মণের ভাষা বলিলেও ক্ষতি নাই। তদ্ব্যতীত প্রশংসার আর কিছুই নাই।

বঙ্গদর্শন।

ষষ্ঠ বৎসর।

গঙ্গাধরশর্ম্মা

ওরফে

জটাধারীর রোজনামচা।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

পবিভ্রমণ।

নদী পাব হইয়া কিয়দ্দূব আসিতেই নভোমণ্ডল ঘন ঘোবে আবৃত দেখা গেল। তাহাব সঙ্গে ঝড উঠিল। সঙ্গিগণ কহিলেন দেবতা দুর্য্যোগ কবিবে, সন্ধ্যা উপস্থিত, সম্মুখে ঐ পল্লীতেই অদ্য বাত্রে অবস্থান উচিত। তথায় পঁহুছিবামাত্র দেখিলাম সে পল্লীটি অতি ক্ষুদ্র, বহু-জনের থাকিবার স্থানাভাব। আমি কহিলাম এখনো বেলা আছে, সম্মুখে ঐ বড় গ্রামে চল। সঙ্গীবা কহিল বেলা নাই, পথিমধ্যেই রাত্রি উপস্থিত হইবে, তাহাদের ভ্রম আমি সঙ্গে সঙ্গে দেখা-ইয়া দিলাম। কৃষিগণের ক্ষুদ্র মঞ্চে ঝিঙ্গা-কলিকা এ পর্য্যন্ত মুদ্রিত রহি-যাছে, সন্ধ্যাব প্রাক্কাল হইলে অবশ্যই কোমল অরদবক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুলগুলি এতক্ষণ প্রস্ফুটিত হইত, সকলে আমার কথা গ্রহণ করিলেন, বিস্তৃত ময়দান হইয়া আমবা শান্তিপুবগ্রামে পহুছিলাম। বাঙ্গাঠাকুবাণীব পিতৃগৃহে আজ থাকা উচিত বোধ হইল। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম সম্মুখের দ্বার দৃঢ অর্গল-বদ্ধ, গৃহ বাটী সব নিস্তব্ধ, "পালানে ঘব" যেন কেহ কোথাও নাই; বাটীর অলিগলি আমি সব জানিতাম, একটী গুপ্ত দ্বার হইয়া অন্তঃপুরে গেলাম, সকলে কহিয়া উঠিলেন "এ কি! বাছা, আজ এ গ্রামে আসিতে হয়? এখানে থানা-দার দেড়ে দারগা আসিয়াছে।" অন্দর হইতে বাহির বাটীতে আসিয়া দেখিলাম

সদর দ্বার বন্ধ—গ্রামের অধিকাংশ প্রজা স্থানে স্থানে নীরবে বসিয়া রহিয়াছে—আমাকে দেখিয়াই কেহ কেহ চমকিত হইয়া প্রস্থানের উদ্যোগ করিতেছিলেন। তাহা দেখিয়া কহিলাম আমি দারগা সাহেবের লোক, তোমাদিগকে ধরিতে আসিয়াছি, দুই চারিজন কুটীরে প্রবেশ করিলেন। একটী বৃদ্ধ আমাকে চিনিয়া কহিলেন "বটে ভাই, তুমিও কালে এই রূপ দোর্দ্দণ্ড হইবে।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমাদের কি বিপদ উপস্থিত—কি অপরাধে গ্রামস্থ এত লোক অবরোধে আবদ্ধ? বৃদ্ধ কাণে কাণে কহিলেন "শুন নাই? গ্রামে ডাকাতি হইয়াছে—দারগা আসিয়াছে, আজ তিন দিন আমরা প্রায় অনাহারে যাপন করিতেছি।" আমি কহিলাম দারগার সহিত সাক্ষাৎ করিব, তাহাকে এত ভয় কেন? বৃদ্ধ কহিলেন "এটি যাথার্থই ডাকাবুক ছেলে, দারগার কাছে যাইবার আবশ্যক? দাদা, রাত্রে গোপনে এখানে নিদ্রা যাও, প্রত্যূষে প্রস্থান করিবে, এমন অসময়েও এ গ্রামে প্রবেশ করিতে হয়?" এই সময় বাহিরের কপাটে একটি ধাক্কা পড়িল—ভীরু প্রজাকুল সঙ্কুচিত হইয়া কুটীরে লুকাইল—কাহার এতদূর সাহস হইল না—দাঁড়াইতে পলাইতেও সাহস চাই, কেহ কেহ পদ সঙ্কোচ করিয়া দুইটি জানুমধ্যে মস্তক রাখিয়া চক্ষু মুদিলেন। আর ভয় কি? এদিকে আঘাত আরো বাড়িল, কেহ উত্তর দেন না—আমি স্থির থাকিতে পারিলাম না, কহিলাম "কে রে?" একজন দাম্ভিক স্বরে কহিল "কে রে!" "আমি তোমার রে? এবার রে দেখিয়ে দিব। কেওয়াড়ি খোল তব দেখা জাগা।" আমি কহিলাম "উঃ আবার হিন্দি চালান"—পুরুষ তখন আরো ক্রোধে কপাটে পদাঘাত করিলেন ও কহিলেন "খুল্‌বে ত খুল না হয় ভাঙ্গিয়া ফেলি।" আমি কহিলাম, জোর ত ভারি এখন ত গর্জ্জনের শেষ রহিল না—এ দিকে বৃদ্ধ আমার হাতে ধরিয়া বিনয় করিতে লাগিলেন ও কহিলেন, আর বাড়াইও না—যে ব্যক্তি বাহিরে গর্জ্জন করিতেছিলেন আমি জানিতাম। আমি কহিয়া উঠিলাম "ও কমরুদ্দি চাচা, আমায় চিনিতে পার না—কি চাই বল সব হাজির।" কুমুরুদ্দি কহিলেন "চারি সের দুধ ও আট বোঝা কাঠ।" আমি কহিলাম "এই? আচ্ছা দেওয়া যাচ্চে" বৃদ্ধ প্রজাবর্গকে কহিলেন তাঁহারা খিড়কি দিয়া দৌড়িলেন, তাঁহারা গোপনেই বদান্যতার কার্য্য নিষ্পন্ন করিলেন। আমি এখন কপাট খুলিলাম। আমাকে দেখিয়াই কুমুরুদ্দি কহিলেন "বাবু আপনি এসেছেন তাই বলি বুড় চাচার সঙ্গে কে মস্করা করে।" কুমুরুদ্দিকে নিজকার্য্য সাধন জন্য রাখিয়া আমি দারগার এজলাস দেখিতে চলিলাম—এখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে আকাশ ঘোর—এই অন্ধকারেই দারগা সাহেবের এজলাস গরম হয়।

কিন্তু সে এজলাস কিরূপে বর্ণন করিব। হে বাগ্‌বাণি। তোমার কৃপায় মহৎ কবিগণ হোমর, ডেন্‌টি, মিল্টন, মধুসূদন প্রভৃতি নরক বর্ণন করিয়াছেন, পবিত্র আর্য্যকুলসম্ভূত জটাধারীর প্রতি কৃপা কেন না করিবে, আমি অনেক স্থান দেখিয়াছি, বর্ণনা করিবার চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু এখানে আসিয়া কেন মোহে অভিভূত হইতেছি, হতাশে চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছি। ইহার কারণ আছে—ইহা মিথ্যাচক্রের ও দারুণ নির্দ্দয় নিষ্ঠুরতার রঙ্গভূমি। দারগাসাহেবের আবাসগৃহপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করিবামাত্র চারিদিক হইতে আর্ত্তনাদ শ্রবণকুহর বিদীর্ণ করিতে লাগিল—দৃষ্টি আরো ভয়ানক—এককোণে চারিটি লোকের পদযুগল উল্টাইয়া তাহাদের মস্তকের পশ্চাৎভাগে সমর্পিত হইয়াছে, কাহার পৃষ্ঠে হাত মুড়িয়া কড়কড় করিয়া বান্ধা হইয়াছে ও সেই বন্ধনসন্ধিস্থানে সমসের খাঁ বরকন্দাজের বৃহৎ চর্ম্মপাদুকাদ্বয় চট্ চট্ শব্দে পড়িতেছে, কেহ একহস্তে ও এক পায়ে রজ্জু বন্ধনে উচ্চ ধরণায় আলম্বিত, কেহ চীৎকার করিয়া কহিতেছে আমার হাত ভাঙ্গিয়া গেল বাপরে। কাহারও নখ ও অঙ্গুলির মধ্যভাগ খর্জ্জূর পত্রের কণ্টকবিদ্ধ হইতেছে, তথা হইতে রক্ত টশ টশ করিয়া পড়িতেছে। কোথাও দুইজন দাড়িতে দাড়িতে বান্ধা হইয়া লঙ্কা মরিচের নস্যঘ্রাণে হাঁচিতেছে ও উভয়ের মস্তকে মস্তকে যেন কোন কলকৌশলে ঠক ঠক ঠেকাঠেকি হইতেছে।

লজ্জার বিষয় কি কহিব। স্ত্রীলোকদের কি লাঞ্ছনা। তাহারা নিরাশ্রয় দরিদ্র লোক। যাহারা অনেক গোলযোগ অনেক অর্থ ব্যয় করিতে পারে তাহাদেরই আপিল আছে। কিন্তু ইহাদের আপিল ঈশ্বরের নিকট ভিন্ন আর কোথায়! কিন্তু এই প্রাঙ্গণ ইন্দ্রিয়-কেলির ক্ষুদ্র অভিনয়স্থল। যেমন একদিকে নিষ্ঠুরতা অশ্লীলতা আবার আর একদিকে হঠাৎ দেখিলে দাতব্যের রঙ্গভূমি বলিয়া বোধ হয়। তিন চারিটি শীর্ণ জ্যোতিহীন দরিদ্র নীচজাতীয় লোক আজ নূতন বস্ত্র পরিয়া প্রচুর আহার সামগ্রী অন্ন মৎস্য দধি ও দুগ্ধ মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিতেছে। ইহারা কে? শুনিলাম একবারী আসামি, ইহাদের গৃহদ্বার, চালচুল ও জোৎজমি বাস্তুভূমি কিছুমাত্র নাই, বিবাহ হয় নাই কিন্তু এইবার ভাগ্যোদয় হইবে। ইহারা ডাকাইতের ঘুঁটি বা তল্লিদার হইয়া আসিয়াছিল কহিবে, দারগাকে ডাকাত ধরিয়া আহত করিতে দেখিয়াছে তাহাও উচ্চ বিচারস্থলে মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিবে, তাহা হইলেই সরকারের তরফ সাক্ষী হইবে, খালাস পাইবে, আর খালাস পাইলেই চৌকিদারী চাকরাণ পাইবে, চৌকিদারি কর্ম্ম পাইবে ও তাহা হইলে দেওয়ানজী সাধি বাগ্‌দিনীর মত কন্যার সহিত তাহাদের বিবাহ দিয়া দিবেন, তাহারা সন্তানসন্ততি লইয়া শ্রীমন্ত পুরুষ হইবে। দেওয়ানজী তাহা:

দিগকে এই সকল ভাবি সৌভাগ্যের প্রলোভ দিয়াছেন ; বুঝাইয়াছেন, তাহারাও ভাল বুঝিয়াছে, যে একটু মিথ্যা বলিয়া যদি কপালে এত সুখ হয় তবে আর কাঁথা বগলে কি আবশ্যক ?

এই এজলাস দর্শন করিয়া প্রভাতে পুনরায় যাত্রা করা গেল। কিয়দ্দূরে না যাইতেই ডাকবাবু চাটুয্যে মহাশয়ের দূত আসিয়া ঘেরিল। কোম্পানি বাহাদুরের হুকুম, তিনি আমাদের চারিজন বেহারা লইবেন, পশ্চিমাঞ্চলে যুদ্ধ হেতু বেহারা পাঠাইবার জন্য তাঁহার প্রতি হুকুম আসিয়াছে, কারণ এ চারি জন বেহারা না হইলে লড়াই ফতে হইবার নহে। অনেকক্ষণ উভয়দলে বিবাদ, প্রায় দাঙ্গা উপস্থিত। নীলমণির অনেক টাকা, তিনি মুদ্রাদ্বয় দিয়া রফা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আমি দূতের সর্দারের নাম জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলাম এই তোমার নাম লিখিলাম, মেজেষ্টর সাহেবের কাছে লিখি, বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে কাগজ কলম লইয়া খস্ খস করিয়া ইংরেজি টানিতে লাগিলাম, দূত ইংরেজি লেখা দেখিয়াই ভয় পাইয়াছে। কহিল বক্‌সিস চাই না, টাকা ফেলিয়াই ডাক ঘরে সম্বাদ দিতে দৌড়িল, আমরাও এ দিকে শিবিকা উঠাইয়া দিলাম।

আবার চলিতে আরম্ভ করা গেল। এতক্ষণ প্রান্তরে কোথাও শস্যক্ষেত্রের বাঁধ হইয়া কোথাও নদীর কূলে উচ্চ সেতু হইয়া আমাদের দলবল চলিতেছে। নদীর জল অনেক দূর—চরসমূহে কোথাও কেশে, কুশ, উলু, বেণার শুভ্রদল বাতাসে হেলিতেছে, ঘুরিতেছে তরঙ্গমালার স্বরূপ পুচ্ছবিস্তার উন্নত বিনত হইতেছে। দূরে জলের সহিত মিশিয়া প্রকৃত জলবিস্তার বলিয়াই এইরূপ ভ্রম জন্মাইতেছে যে বিখ্যাত কোন তন্তুবায় চূড়দাস ভায়া সঙ্গে থাকিলে সাঁতার কাটিতে অবশ্যই সে বনে লম্বমান হইতেন। যাহা হউক এ দেশে "রাস্তা রাস্তা" নাই, তথাপি আমাদের গমনের এখনও অসুবিধা নাই।

কয়েকটি প্রান্তর অতিক্রম করা গেল। আকাশে হিমাগমের শুভ্র রাশি রাশি কার্পাসপিঞ্জিত মেষাকৃতি মেঘমালা নিম্নে বিস্তৃত সমতলক্ষেত্রের মধ্যে মধ্যে এক একটি বৃহৎ অশ্বত্থ বা বটবৃক্ষ কিম্বা কোন স্থানে পদ্মকুসুমে শোভিত জলাশয় ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না।

এই বিস্তৃতক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া একটি ক্ষুদ্র খালের ঘাটে উপস্থিত হওয়া গেল, এইটী জেলার এক রাজমণ্ডলের (পরগণার) শেষ সীমা—এইটী পার হইলেই সদর রাজবিভাগ। খালটি অতিক্রম করিয়া একটী বৃহৎ মৃত্তিকা নির্ম্মিত সেতু দৃষ্টি হইল, কেহ কহিয়া উঠিল "ওরে এই নয়া সড়ক।" কিন্তু সড়কে কেহ উঠিল না, তাহার তলে তলেই সকলে চলিল। আমি ভাবিলাম পথ থাকিতে বিপথে কেন গমন ? কিন্তু বাহকেরা তাহা ভাবিল না, সেতুর পদতল

হইয়াই আঁকিয়া বাঁকিয়া কাদা, কাঁটা, জল ভাঙ্গিয়া হুচোট খাইয়া কথা কহিতে কহিতে কিয়দ্দূরে একটী জনপদে বিশ্রাম-স্থলে সকলে উপনীত হইলাম। এই চটিটি একটি বৃহৎ ক্রোশাধিক লম্বা দীর্ঘিকাতটে সংবেশিত হইয়াছে কিন্তু তাহার প্রবেশস্থলে দৃঢ় ফটকপার্শ্বে আদা হিন্দি বচনপ্রয়োগী পিয়াদাদ্বয় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। আমরা নিকটস্থ হইবা মাত্র কহিল "ওহ! সরকারি মাসুল দিয়া যাও।" একজন কহিল কিসের মাসুল? কিসের মাসুল মজাটা দেখাব "নূতন সড়ক দিয়া এলে না, টোল জারি আছে জান না।" টোল জারিকে ধন্যবাদ দিয়া তাহার কীর্ত্তিকে ধন্যবাদ দিয়া আমরা চটিতে প্রবেশ করিলাম। সকলে চলিল। আমি একটি সাথীকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি কহিলেন যে, এই নন্দন পুরের থানা—খালের এই পারে চাঁদা সংগ্রহ হইবা থাকে, সকলকে শুল্ক দিতে হয়, সেই টাকাতেই ঐ সেতু নির্ম্মাণ হইয়াছে। এই সেতুপথনির্ম্মাতা বিশ্বকর্ম্মার মহাকীর্ত্তি—শুষ্ক বা শীতকালে চলিলে পথিকের পদ পরিষ্কার থাকে। বর্ষাকালে গমন করিলে কর্দ্দমে নিমগ্ন হইয়া মরণের মাত্র আশঙ্কা থাকে। একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ঐরূপ কর্দ্দমে মরায় এই ময়দানের নাম বামনমারী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে।

এদিকে আর একটি কীর্ত্তি দেখা গেল। ঐ ক্রোশাধিক বিস্তৃত দীর্ঘিকা, সকলে উহাকে "অসুর খাদ" বলে—শত শত বৎসর উহার একই ভাব, একই আকার রহিয়াছে, জলের হ্রাস বৃদ্ধি বড় কেহ দেখে নাই, চতুঃসীমায় দশখানি গ্রামের সহস্র সহস্র খান ধান্য ভূমি এই জলে কর্ষণ হইয়া থাকে, প্রচুর মৎস্য জন্মে—ইহাও আশুতোষ বাবুর জমিদারীর অন্তর্গত, ইহা তাঁহার প্রজাদের বিশেষ সম্পত্তি—এই দীর্ঘিকা পল্লীস্থ, দেশস্থ, পথস্থ সহস্র সহস্র লোকের জীবনস্বরূপ। দীর্ঘিকার চতুঃপার্শ্বের মৃত্তিকারাশি পাহাড়ের স্বরূপ উচ্চ, তাহার উপর মধ্যে মধ্যে এক একটি পুরাতন শাল্মলী বা তেতুল বৃক্ষ দণ্ডায়মান, একটি তেতুল তলে পুরাতন ইষ্টকরাশি। সকলে কহে অসুর এই দীর্ঘিকা খনন করে, ঐ স্থানে তাহার গৃহ ছিল, এখন তিনি পীর হইয়াছেন, কারণ হস্তপদবিচ্ছিন্ন কতকগুলি মৃণ্ময় হস্তী হয় সেইস্থানে রাশীকৃত হইয়া রহিয়াছে। দেশে একরূপ অসুরের আর জন্ম নাই।

এই দীর্ঘিকাতটেই আমরা বিশ্রামি করিলাম। বিপণিশ্রেণীর সম্মুখে পঁহুছিবা মাত্র একটী বৃদ্ধা তাম্বুলিনী যেন কত কালের পরিচিতা জনের ন্যায় আমার পিতামহঠাকুরের নাতি বলিয়া নিকটে আসিয়া আমাকে ও কতকগুলি অন্য বালককে কত আদরসহ গৃহে লইয়া গেল। বুড়ি হাসে আর বলে "এই—গঙ্গাধর "মেজেষ্টর" এই নীলমণি দেওয়ানজীর আদরের পুত্র—না জানি বাবা-

জির মায়ের প্রাণটা আজ কত ধড়ফড় করিতেছে।" সেই গৃহ কিয়ৎক্ষণের জন্ম আমাদের গৃহ হইল। বৃদ্ধার নাতি নাতিনী সকল শিশুরা আমাদের সঙ্গী হইল। বৃদ্ধার একটি গৌরাঙ্গী বন্ধ্যা বধূ গাভীদোহন করিয়া সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দুগ্ধ আনিয়া দিল। এক সন্তান বড়সি লইয়া মৎস্য আহরণে দীঘির দিকে দৌড়িল। একটি ছেলে পিয়ারা বৃক্ষে আরোহণ করিল আর একটি শশাবনে আকশী হস্তে প্রবেশ করিল। আহারান্তে মহাদেবার মা আমাদের তিন পুরুষের গল্প আরম্ভ করিল—কখন পিতামহ মহাশয় তাহার ঘরের দুগ্ধ ভাল বলিয়াছিলেন, কখন জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় তার হাতের মুড়ি ভাজা বড় "লুণখর" বড় মিষ্ট কহিয়াছিলেন,কখন দেওয়ানজী তাহার গাছের আমড়া অতি মধুরাম্বল ব লিয়া সুখ্যাতি করিয়াছিলেন এই সব অভ্যস্ত ছড়ার ন্যায় কহিল। আবার কাহার কাছে কয় গণ্ডা কড়ি বা কাপড় পুরস্কার পাইয়াছিল তাহাতেও ক্রটি করিল না, তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমার নিকট ও আমার সঙ্গী বালক দের নিকট ও নিলমণি বাবুর নিকট কি কি সামগ্রী পাইবার হকদার তাহাও অগ্রে গাইয়া রাখিল।

কথা শেষ হইলে ভৈরব কহিয়া উঠিল "তাম্বুলী মাসির পনর আনা মিথ্যা।" তাম্বুলী মাসি তাহার পিতাকে অভিশম্পাত দিয়া উত্তর দিল দোকানে দ্রব্য লইয়া মূল্য না দিয়া প্রস্থান করা অপেক্ষা এ গল্প ভাল।

ভৈরব। যদি কর্ব্ব গল্প
তবে কেন হয় অল্প।

আমি ভাবিতেছি কতক্ষণ পথের শেষ হইবে। যাত্রা করিতে ব্যস্ত হইয়াছি, মহাদেবার মা কহিল এত ত্বরা করিবার আবশ্যক কি? এই ঘাট পার হইলেই পাদরি সাহেবের গির্জার চূড়া দেখা যাইবে। তাহার সুপরামর্শে আমরা কর্ণপাত করিলাম না, বিলম্ব করিলে রাত্রি হইবে বুঝিয়া তাহার প্রাপ্য বস্ত্র দিয়া যাত্রা করিলাম। এখন পথনির্ম্মাতার গৌরব ক্রমে প্রকাশ পাইতে লাগিল—নূতন মাটীতে এক হস্ত পরিমাণ গভীর কর্দ্দম। যেখানে মাটী নাই এক বুক জল, কোথাও জল এড়াইবার জন্য কণ্টকবনপরিপূর্ণ উচ্চ জাঙ্গাল দিয়া যাইতে হয়, কোথাও আবার শিবিকা-বাহকগণের মস্তকোপরি উত্থিত হইয়া জলা উত্তীর্ণ হইতে হয়—কোথাও ক্ষুদ্র খাল। যে খালের সেতুর উপর এখন পথিক প্রথম শ্রেণীর শকটে কোমল শয্যাশায়ী হইয়া নিদ্রাবস্থায় বাষ্পীয়যানে বাহিত হন সেকালে তাহার উপর কোন বদান্য জনের সাহায্যে একটি বুড় শুষ্ক অশ্বত্থ বৃক্ষশাখা প্রপাত হইয়া সাঁকোর কার্য্য করিত। এখানে শিবিকা হইতে অবতীর্ণ হইয়া বৃক্ষশাখায় ভদ্র পথিক-জনকে আরোহণ করিতে হইত, গুঁড়ি পার হইয়া ক্ষুদ্র শাখা অবলম্বন করিয়া

অপর পারে উত্তীর্ণ হইতে হইত। আবার কোথাও যেখানে বাদশাহী সড়কের পাকা পুলের দুই পার্শ্ব হইতে মৃত্তিকা-রাশি বন্যার স্রোতে বাহিত হইয়াছে সেস্থানে গ্রাম্য ডোঙ্গাতে চারি জন করিয়া পরপারে যাইতে হইত, ঐ নৌ-যানে চড়িয়া প্রাণ যথার্থই হাতে রাখিতে হইত। যান টলমল করিলেও আরোহি-গণকে স্থির হইয়া থাকিতে হইবেক এই পণে চড়িতে হইত। এইরূপ একটি খাল পার হইতে হইতেই আমাদের এক বিপদ উপস্থিত, নিলমণির প্রিয় কপোতপিঞ্জর খসিয়া জলে পড়িল আর ভাসিয়া গেল। নগরে উহা অপেক্ষা ভাল পায়রা পাওয়া যায় কহিয়া তাহাকে সকলে সান্ত্বনা করিলাম।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

রেইলওয়ে ষ্টেসন।

যে দুর্গম পথে আমরা এই মাত্র ভ্রমণ করিতেছিলাম তথায় এক্ষণে ক্ষেত্রমধ্যে একটী সুন্দর সেতু গ্রন্থিত অতি ঋজু পথ দেখিতে পাওয়া যায়,দূর হইতে সেতুটির বড় শোভা, শত শত উন্নত খিলানের সুগোল পরিধিসূত্র আকাশপটে অঙ্কিত বোধ হইতেছে, সেই খিলানের গর্ভ দিয়া অপর দিকে বহুদূরে শ্বেতাকাশ শস্যক্ষেত্রে সংমিলিত, আবার সেতুপার্শ্বে সুগঠিত স্তম্ভোপরি তাড়িতবার্ত্তাবাহী তার লম্বমান —যেন ভূমণ্ডলের যজ্ঞোপবীত সুশো-ভিত। বাস্তবিক পাশ্চাত্য পথের দুরবস্থার সহিত এই পথের সৌন্দর্য্য ও সুবিধা আলোচনা করিয়া দেখিলে অনুভব হয় যেন স্বর্গারোহণের পথ।

স্বর্গারোহণের পথ অতি দুর্গম। পথে বিপদ থাকুক বা না থাকুক দ্বারটি দুষ-মনের বাস। যমদূতের হাত অতিক্রম করিতে পারিলে সেই পথের পথিক হইতে পারা যায়, আবার শুনা যায় সেই দ্বারে সেই দূতগণের সাহায্যার্থ ভয়ানক কাল নেপালী কুকুর বিদ্যমান, যমা-লয়ের নিয়মানুসারে সকলকে দ্রংষ্টা বিস্তার পূর্ব্বক ভয়প্রদর্শন করানই তাহার প্রধান কার্য্য, উদর পূরণের প্রধান উপায়। এই যমদ্বারের প্রতিরূপ মর্ত্ত্যে রেইলওয়ে ষ্টেসন ঘর। ইতিপূর্ব্বে এই পথে একক চলিতে চলিতে যে সেতু দেখিতে পাই তাহার পার্শে সত্বর একটি শুভ্র প্রাসাদ নয়নপথে পড়ে। এটি একটী গাড়ি থামিবার স্থান "ষ্টেসন ঘর।" তথায় পঁহুছিয়া দেখিলাম সে স্থানটি অতি সুন্দর, স্বল্পকাল মধ্যে সুরম্য কানন শোভিত মানববাসোপযোগী অট্টালিকা পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু গৃহটি সুন্দর হইলেও যমালয়, যমদূতের অধি-কার, চারিদিকে কেবল কাল চাপকান কম্বুলের কোট সজ্জিত, প্রস্তর কয়লা চূর্ণ প্রলেপিত, মাদক তৈলসিক্ত দূত ভূতের দুষমন মুখশ্রী ইতস্ততঃ ভ্রমিতে দেখা যায়। যেখানে কেবল অসভ্য ক্ষেত্রজীবের বাক্য শুনা যাইত এখন সেইখানে সুসজ্জিত সুসভ্য নানা লোক

পাদচালনা করিতেছে। কণ্টকাকীর্ণ জঙ্গল বিনিময়ে বিপণিশ্রেণী নির্ম্মিত হইয়াছে। কাদা জল বিনিময়ে ডজন ডজন সোডাওয়াটরের অগ্নিঅস্ত্র রূপ কাক ছুটিতেছে। জঙ্গলজাত পরিকুল সেকুল পরিবর্ত্তে রম্ভা, আম্র, বেদানা ও আতার এলাইচদানার ছড়াছড়ি। যেখানে ভাণ্ড হস্তে করিয়া কাঙ্গালি শিশু, ছিন্ন বস্ত্র দরিদ্র দিগম্বরীগণ ক্ষেত্র হইতে শস্য খুঁটিত, সেখানে চটের থলিতে ধান্য সংগ্রহ হইত এখন সেখানে সুবঙ্গিণ রেশমি ছাতা, কারপেট ও চাকচিক্য বার্ণিস লেদার নির্ম্মিত ব্যাগ, প্রকৃতার্থে হাতে হাতে ঠেকিতেছে বিবাদ লাগাইতেছে। ক্রমে ভিড় বাড়িল, তিলকধারী উড়ের দল, শ্মশ্রুধারী নেড়ের পাল, বিদায়ের কলসী হস্তে ব্যতিব্যস্ত তর্কভূষণ, জাহাজের সারেঙ্গ মিয়া মাজন, পাত্রপূর্ণ সন্দেশ হস্ত কুঞ্জর মা চাকরাণী, তার পাশে স্থূলকায় অবগুণ্ঠনবতী রাম ঘোষের গৃহিণী; পাদরি ফিরিঙ্গি, মলঙ্গি, ব্যাপারি মহাজন সকলেই এক সংকীর্ণ রেল বেষ্টিত পান্থগামী। পাগড়ি পড়িতেছে, ছাতা হস্তান্তর হইতেছে, সন্দেশের হাঁড়ি ভাঙ্গিল, ক্রন্দনের রোল উঠিল "গেলাম" "গেলাম" "ধাঁ ধাঁ" চড় চাপড়ের শব্দ শুনা যাইতেছে: তার মধ্যে কর্কশ কণ্ঠোচ্চারিত চীৎকার বাক্য "বেটিকিট ওয়ালা বাহার যা" বলিবৃন্দ কর্ণভেদ করিতেছে। এই তৃতীয় শ্রেণীস্থ পথিক দলের টিকিট বিক্রয়স্থল।

অপর শ্রেণীর টিকিটক্রয়ের গবাক্ষের নিকট আর এক শোভা বিস্তার হইয়াছে। সেই কক্ষসংলগ্ন একটী সুচারু কামরা রসময় কোমল মুখশ্রীতে সুশোভিত। তন্মধ্যে একটি ধনাঢ্য যুবা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী একটী চঞ্চলনয়না স্বর্ণালঙ্কারাবৃত কৃশাঙ্গী কামিনী যাদৃশ সুন্দর ততোধিক সুন্দরী দেখাইবার কামনায় ওষ্ঠে,গণ্ডে গোলাপী আলতা রাগে রঞ্জিত করিয়া সদ্যস্নাত কেশগুলি মুক্তাভাবে দুই পার্শ্বে ফিনফিনে বস্ত্রমধ্যে আলম্বিত করিয়াছে। এদিকে গাড়ি আসিবার দেরি নাই, কারণ গাড়ি বারান্দায় ঘণ্টা বাজিয়াছে; সুদূরে শুভ্র মাস্তলের একটী হাত খট করিয়া নামিয়াছে, টিকিট বাবুও কট কট করিয়া টিকিট কাটিতেছেন, ব্যঙ্গ করিতেছেন, দন্ত দেখাইতেছেন, গালি পাড়িতেছেন মধ্যে মধ্যে বড় চাপড়ও তুলিতেছেন, আবার উচ্চ শ্রেণীস্থ জেন্টলম্যান অর্থাৎ বিলাতি সাহেব মানুষ দেখিলে বিনীতভাবে করযোড়ে "লিটল ওয়েট সার টিকিট গিব" কহিয়া নম্রতা রাশির পরিচয় দিতেছেন। তাঁহার চালাকি, ভঙ্গিবঙ্গি, প্রভুশালিত্ব দেখিয়া মনে করিলাম টিকিট ক্রয় করা বড় বিভ্রাট, এখানে মানী লোকের মান থাকা দুষ্কর। আবার যেমন দ্বারী তেমনি তাহার আজ্ঞাবাহী শান্তিরক্ষক। টিকিট বাবুর ইঙ্গিতমাত্র দরিদ্র পথিক জনের অংশ মর্দ্দন, কর্ণমলন প্রভৃতি কার্য্যে তৎপর, আবার কাহার প্রতি বি-

শেষ সামুকূল দেখিলাম, প্রায় শত পদের বাহিরে একটা স্তম্ভপার্শ্বে দাঁড়াইয়া দেখিতে আরম্ভ করিলাম। টিকিট বাবুর মুখশ্রী এখন বিলক্ষণ করিয়া দেখিলাম। ঘোর শ্যামবর্ণ মুখে আঁখির কোণ হইতে স্বক্কণী পর্য্যন্ত নিবিড় শ্মশ্রুকেশ-ভূষিত মুখশ্রী, কেশ পেটে প্রচুর তৈল-সিক্ত, মস্তকে ফেসও নামের টুপি, সামনে তিনটী জাবর অক্ষর বিন্যস্ত, টেবিলের উপরিভাগে মাষ্টার বাবুর বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে, কাল আলপাকার চাপকানে, নীলসূতের সেলাই দেদীপ্যমান, সর্ব্বোপরি সাদা বোতামটি ঘর হইতে খসিয়া উলটাইয়া পড়িয়াছে ও গলার নীচে সুপক্ক জামের আভা বাহির করিয়াছে। তাঁহাকে আমি দেখিবামাত্র চিনিলাম জুমনের চেহারা—আমার সঙ্গী ভৈরব কহিয়া উঠিল এই ত নকলের ভীম মাষ্টার।

টিকিট বাবু এক একটি লোকের প্রতি আবার দয়াবান, কাহাকে খুড়া বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন ও "কম কম কেন সিং গলে কম" "বেলডম্পে বম" বলিয়া ইংরাজিতে আহ্বান করিতেছেন, একটি ভদ্র পথিক আমার নিকট দাঁড়াইয়া কহিলেন "দেখ্‌ছেন কি? জাতে কর্ম্মকার, যেমন লোহার মত চেহারা তেমন লৌহনির্ম্মিত অন্তঃকরণ, এদেশে উহার নাম লোহার কার্ত্তিক, আইবর্ণ অক্‌-টোবর বাষ্ট হইয়াছে। কোথায় স্কুল মাষ্টার ছিলেন কিন্তু মাষ্টার বাবু বলিলে ক্ষিপ্ত প্রায় রাগান্ধ হন, প্রহার করিতে দৌড়িয়া যান।"

আমি কহিলাম বিলক্ষণ চিনি, আমাদের শিক্ষক ছিলেন। এদিকে পুলিস ম্যান কক্কর ভৈযারি দন্ত কিড়িমিড়ি করিয়া পাটি যুগলে দশ সালের খদির তাম্বূলের পাটকেল রঙ্গের গাঢ় প্রলেপ প্রদর্শন করিতেছেন, সেই দন্তের অনতি উপরে গোঁফের দল, ওষ্ঠশিরে ধনাকেশ মধ্যে দণ্ডায়মান, মস্তকে পীতাম্বরজড়িত উষ্ণীষ, অঙ্গে কাল কম্বলের কোট হাতে দণ্ড, ঠিক দণ্ডধর। তাহাকে সান্ত্বনা করিবার এই উপায় দেখিলাম। পান খাইবার জন্য দুটী পয়সা তাহার হস্তে অর্পণ করিলে টিকিট পাওয়া যায়। ভৈরব সত্বর অগ্রসর হইয়া তাহাই দিল ও আমাদের প্রত্যেক জনের কত ভাড়া লাগিবে কথায় ১০ আনা করিয়া কহিল। ভৈরব কহিল এক আনা কমিবে না? পাহারাদার কহিল, বড় বাবুকে জিজ্ঞাসা কর। বড় বাবু কহিলেন "বারেন্দায় টেবল রহিয়াছে পড়িতে চক্ষু নাই।" ভৈরব অগ্রসর হইয়া বাবুকে চিনিল ও স্বস্বরে গাহিয়া উঠিল "চূড়া ছেড়ে এবার পাগড়ি বেঁধেছে, এত সেই আমাদের মাষ্টার মশায়। টিকিট দেন ত।" একে "মাষ্টার তাতে মশায়" "বাবু" পর্য্যন্ত বলিল না, সম্বোধন শুনিয়া টিকিট বাবু মনে করিলেন যেন তাঁহার অঙ্গে অগ্নিরাশি বিকীর্ণ হইল, যে লৌহ যন্ত্রে টিকিটে কট কট করিয়া চিহ্ন দিতে ছিলেন দুই

হস্তে উঠাইয়া ভৈরবের মস্তকে নিক্ষিপ্ত করিতে চেষ্টা করিলেন, ভাগ্যক্রমে তাহা কাষ্ঠাসনে দৃঢ় আবদ্ধ ছিল। আমি ত্বরায় বিবাদস্থলে গমন করিলাম ও কহিলাম "বড় বাবুজী, ভৈরব চাষা, আপনার মর্ম্ম কি জানে, টিকিট দেন।" যেন খঞ্জ ভীমকে আমরা কেহই চিনিতে পারি নাই এই রূপ ব্যবহার করা গেল। টিকিট লওয়া সাঙ্গ হইলে "ঘোঁড়া ভাল আছ।" বলিয়াই আবার ভৈরব প্রস্থান করিল। টিকিট বাবু জানিতেন যে স্কুল মাষ্টার অপেক্ষা সহকারী এস্‌টেশন মাষ্টারের পদ অনেক মানশালী। হুকুমে "ট্রেণ টচ" করে ট্রেণ ষ্টার্ট করে গাড়ি থামে গাড়ি ফিরে গাড়ি চলে। হুকুমে রাজা মহারাজেরও গতিবদ্ধ হইয়া যায়। এখনো জানেন না যে আবার ঘন ঘন ফৌজদারি সুপর্দ্দ হইতে হয়।

যাহা হউক আমরা এখন সকলে টিকিট ক্রয় করিলাম। ভৈরব ইত্যবসরে হারাইয়াছে শুনা গেল, দূরে যাইয়া তা মাক টানিতেছে, গাড়ি আগতপ্রায়, ত্বরায় আসিতে আদেশ করায় ক্রুদ্ধস্বরে কহিল "পয়সা দিয়াছি ডাকিবে না?" যাহা হউক সকলে একত্র হইয়া গাড়ি বারেন্দায় দণ্ডায়মান হইতেই শকটশ্রেণী দূরে দেখা গেল। ভৈরব তর্জ্জন গর্জ্জন শুনিয়া, অগ্নিরাশি ধূমপুঞ্জ দেখিয়াই পলাইল ও কহিল এ বড় আপদ আমি ৪ ক্রোশ পথ পায়ে শেষ করিব।

সম্প্রতির রেলগাড়ির কথা যাক, পূর্ব্বকালিক পথের কষ্ট বর্ণন করিতে করিতে এই কথা পড়িয়াছিল। আমরা কয়েক দিনের মধ্যে নগরের নিকটস্থ হইলাম। এক দিন প্রাতে নগরের শত শত অট্টালিকা শ্রেণী, কত শত ধ্বজা মন্দিরচূড়া শত শত অর্ণবপোতের পটদণ্ড যেন পত্রশাখা বিরহিত শাল জঙ্গল গোধূলির গগন ভেদ করিয়া নয়ন পথে আসিল। ক্রমে আমাদের ভ্রমণ শেষ হইল। আমরা নগরে উপনীত হইলাম।

একস্‌চেঞ্জ।

বিদেশ হইতে আমদানী জিনিস কিনিতে হইলেই এক্সচেঞ্জ দিতে হয়। এই এক্সচেঞ্জের দরুণ কখন কখন লাভও হয়। লাভই হউক, আর লোকসানই হউক, শতকরা ২।৩ টাকার উপর এক্সচেঞ্জ প্রায় কখনই দিতে হয় না। কিন্তু আজি কালি শতকরা প্রায় ২২ টাকা এক্সচেঞ্জ দিতে হইতেছে। যদি কোন রূপ এক্সচেঞ্জ না থাকে তবে এক পৌণ্ডের জিনিস এখানে ১০ টাকায় বিক্রয় হয়। এক পাউণ্ডের রীতিমত দাম ১০, টাকা। ১০ পাউণ্ডের জিনিস ১০০ টাকায় বিক্রয় হয়। কিন্ত

এখন ১০ পাউণ্ডের জিনিসের মূল্য ১২২ টাকা হইয়াছে। ইহার দরুণ যে শুদ্ধ যাহারা বিলাতী জিনিস কেনে তাহাদেরই অসুখ হইতেছে তাহা নহে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে প্রতিবৎসর বিলাতে প্রায় এক কোটী পঞ্চাশ লক্ষ পাউণ্ড অথবা পনর কোটী টাকা পাঠাইতে হয়। এখন এই এক্সচেঞ্জ গোলমালের দরুণ প্রায় ৪ কোটী টাকা অধিক পাঠাইতে হইতেছে। ইহার দরুণ সমস্ত ভারতবর্ষবাসী প্রজাদিগেরই কষ্ট হইতেছে। যেখানে ১৫।১৬ কোটী টাকায় হইত, সেখানে এখন ১৯।২০ কোটী লাগিতেছে। এরূপ এক্সচেঞ্জ গোলমাল হইবার কারণ কি? এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে প্রতিপাদ্য বিষয় দুইভাগে বিভক্ত করিতে হয়। ১ম বিদেশীয় বাণিজ্য হইলেই অল্পবিস্তর এক্সচেঞ্জ কেন দিতে হয়? ২য় আজি কালি সেই এক্সচেঞ্জ এত বেশী কেন হইল?

প্রথম নিয়মমত এক্সচেঞ্জ হইবার কারণ এই যে, যখন দুইটি দেশে বাণিজ্যকার্য্য আরম্ভ হয়, তখন কিছু ক্রয় বিক্রয় নগদ টাকায় হয় না। বাণিজ্য—বিশেষতঃ বিদেশীয় বাণিজ্য ধারেই নির্ব্বাহ হয়। ফ্রান্সের লুইস যখন ইংলণ্ডের হেনেরির নিকট ব্রাণ্ডি বিক্রয় করিল তখন হেনেরি তাহাকে এক খত লিখিয়া দিল যে উহার দাম ছয় মাস পরে দিব। আবার যখন ইংলণ্ডের জন ফ্রান্সের চার্লসের নিকট কাপড় বিক্রয় করিল তখন চার্লসও পূর্ব্বোক্ত রূপ খত লিখিয়া দিল। এইরূপ ইংলণ্ডের উপর ফ্রান্সের ও ফ্রান্সের উপর ইংলণ্ডের অনেক খত জমিল। ইংলণ্ডের লোক ফ্রান্সে টাকা পাঠাইতে হইলে নগদ টাকা না পাঠাইয়া ফ্রান্সের কোন সওদাগরের সই করা খত ফ্রান্সে পাঠাইবার চেষ্টা করে। ফ্রান্সের লোকও ইংলণ্ডে টাকা পাঠাইতে হইলে ইংলণ্ডের কোন সওদাগরের সহী করা খত পাঠাইবার চেষ্টা করে। সুতরাং ঐ খতের নিয়মিত ক্রয় বিক্রয় ব্যবসায় চলে। দালালেরা এই ব্যবসায় চালায়। যেমন অন্য ব্যবসায়ে জিনিস কম ও খরিদদার বেশী হইলে জিনিসের দাম অধিক হয় ও খরিদদার কম ও জিনিস বেশী হইলে জিনিসের দাম কম হয়, খতের ব্যবসায়েও ঠিক তাহাই হয়। কখনও খত অধিক মূল্যে কখন অল্প মূল্যে বিক্রয় হয়। কেবল অধিকের মধ্যে এই যে অন্যান্য জিনিসের মূল্য অনেক বাড়িতে ও অনেক কমিতে পারে, খতের ব্যবসায়ে তাহা হয় না, যদি নিতান্ত অধিক মূল্য হইয়া উঠে তবে লোকে খত না কিনিয়া টাকাই পাঠায় সুতরাং খতের মূল্য টাকা পাঠানর খরচ পর্য্যন্ত বাড়িতে কমিতে পারে ইহার অধিক বা অল্প হইতে পারে না। মনে কর ইংলণ্ড হইতে ফ্রান্সে এক শত পাউণ্ড পাঠাইতে ২ পাউণ্ড খরচ হয়। ১০০ পাউণ্ড খতের দাম যদ ১০৩ পাউণ্ড হইয়া উঠে লোকে সে খত কিনিবে কেন?

তাহাতে তাহাদের কি উপকার হইবে। তাহারা নিজের খরচে টাকা পাঠাইলে তাহাদের এক পাউণ্ড লাভ হইবে। অতএব নিয়মিত ব্যবসায়ের এক্সচেঞ্জ, টাকা পাঠানর খরচের অধিক বা অল্প হইতে পারে না। সচরাচর আমরা যে অল্প বিস্তর এক্সচেঞ্জ দিয়া থাকি তাহার কারণ এই, আর কিছুই নহে। মনে যেন থাকে যে টাকা পাঠানর খরচ অপেক্ষা এই এক্সচেঞ্জ অধিক হইতে পারে না। আর এই এক্সচেঞ্জ প্রত্যহ পরিবর্ত্তনশীল। আজ শতকরা ২ টাকা বেশী দিতে হইল, কালি আবার শতকরা ২ টাকা কম। কিন্তু দুই টাকার অধিক কখন উঠিবে না।*

এখন লোকে মনে করিতে পারেন যে যাহারা খত কিনিবে তাহারাই এক্সচেঞ্জ দিবে। অন্য লোকে দিতে যাবে কেন? তাহার উত্তর এই যে বিদেশে টাকা অধিকাংশই ব্যবসায়ীদিগের পাঠাইতে হয় সুতরাং তাহাদের নিকট হইতে জিনিস কিনিতে হইলে তাহারা সেই এক্সচেঞ্জ খরিদদারের নিকট হইতে আদায় করিয়া লইবে। সুতরাং যে কেহ বিদেশের আমদানী জিনিস কিনিবে তাহাকেই এক্সচেঞ্জ দিতে হইবে।

আমরা এতক্ষণ যাহা বলিলাম তাহা ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে সাজে। কারণ দুই জায়গায়ই সোণার টাকা চলন। রূপার টাকার চলন এই দুই দেশে প্রায় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু ভারতবর্ষের সঙ্গে একথা নহে, ভারতবর্ষে রূপার টাকা চলন ইংলণ্ডে সোণার টাকা চলন সুতরাং ভারতবর্ষের সঙ্গে ইংলণ্ডের ব্যবসায়ে এই দুই ধাতুর মূল্যের ন্যূনাধিক্য প্রযুক্ত আর এক প্রকারে এক্সচেঞ্জ হইবার সম্ভাবনা। কখন সোণার দর অধিক হয় কখন সোণার দর কম হয়, কখন রূপার দর অধিক হয় কখন উহার দর কম হয়, ভারতবর্ষে রূপার টাকা চলতি, ভারতবর্ষের লোক রূপার দাম কমবৃদ্ধি বুঝিতে পারে না। তাহারা মনে করে রূপার দাম যা ছিল তাই আছে। যখন রূপার দাম বাড়ে তখন তাহারা ভাবে সোণার দাম কমিয়াছে। যখন রূপার দাম কমে তখন ভাবে সোণা মহার্ঘ হইয়াছে এইরূপ ইংলণ্ডের লোকও ভাবে। কিন্তু চিন্তাশীল লোক মাত্রেই দেখিতে পান কাহার দাম বাড়িয়াছে ও কাহার কমিয়াছে। যাহারা দুই দেশে বাণিজ্য করে তাহারা টের পায় যে এক্সচেঞ্জ বাড়িতেছে ও কমিতেছে। যে দেশের এক্সচেঞ্জে লোকসান তাহাদের টাকার দাম কমিয়াছে যে দেশের লোকসান নাই বা লাভ আছে তাহাদেরই টাকার দাম বাড়িয়াছে। যখন রূপার দাম কম হয় বা সোণার দাম বেশী হয় তখন এক্সচেঞ্জে ভারতবর্ষের

* মিল বলেন টাকা পাঠানর উপর আরো কিছু দিতে হয়। যে দালাল হইবে তাহার লাভও দিতে হয়।

লোকসান ও যখন রূপার দাম বেশী হয় বা সোণার দাম কম হয় তখন ভারতবর্ষের লাভ। বর্ত্তমান সময়ে সোণার দাম বড়ই বাড়িয়া গিয়াছে। যে সোণা ১৬ টাকায় তোলা বিক্রয় হইত তাহারই মূল্য এখন ১৯॥০ সাড়ে উনিশ টাকা। যে পাউণ্ড ১০ টাকা ছিল তাহার দাম সুতরাং ১২ টাকার উপর উঠিয়াছে।

যখন একস্‌চেঞ্জে বড়ই লোকসান হইতে লাগিল, যখন একস্‌চেঞ্জে শত করা দুই টাকা লাভ থেকে একেবারে শতকরা ১০। ১১ টাকা লোকসান হইতে লাগিল, তখন সকলে ভাবিত যে একস্‌চেঞ্জের এ লোকসান প্রথম কারণ-বশতঃ হইয়াছে। অর্থাৎ ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের উপর বিল অধিক হইয়াছে ইংলণ্ডে ভারতবর্ষের উপর বিল কম হইয়াছে। ব্যবসায়ের রিপোর্টে দেখা যায় যে প্রতিবৎসর ভারতবর্ষ হইতে প্রায় ৬০ কোটী টাকার দ্রব্য বিলাতে যায় বিলাত হইতে ৪০। ৪১ কোটি টাকার জিনিস আসে; সুতরাং ভারত-বর্ষে বিলের দাম সস্তা হইয়া একস্‌চেঞ্জে ভারতবর্ষের লোকসান। কিন্তু পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে প্রথম প্রকারে একস্‌চেঞ্জে শতকরা ২। ৩ টাকা অপেক্ষা অধিক হইতে পারে না অর্থাৎ ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে টাকা পাঠাইবার খরচ যাহা তাহা অপেক্ষা অধিক হইতে পারে না। তাহার পর আরও প্রমাণ হইল, যে ভারতবর্ষ হইতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমে-ণ্টকে প্রতিবৎসর ১৫। ১৬ কোটি টাকা নানাবাবদে বিলাতে পাঠাইতে হয়। ঐ ১৫। ১৬ কোটি টাকা নগদ না গিয়া উহার পরিবর্ত্তে মাল যায়। সুতরাং ইংলণ্ড হইতে যে মাল আসে, তাহা অপেক্ষা ভারতবর্ষ হইতে বর্ষে বর্ষে ১৫। ১৬ কোটি অধিক টাকার মাল যাওয়া চাহি। তাহার উপর ইংলণ্ডের লোকের অনেক টাকা ভারতবর্ষে খাটি-তেছে, তাহার সুদ প্রতিবৎসর ইংলণ্ডে যাইতেছে। সেও নগদ যায় না জিনিসে যায়, সুতরাং ভারতবর্ষে যদি ৪০। ৪২ কোটী টাকার জিনিস আসে ত ভারত-বর্ষ হইতে ৬০ কোটি টাকার জিনিস যাইবে, যখন বিলাতে পৌঁছিবে তখন পথখরচসমেত এই জিনিসের দাম ৬৪ কোটী টাকা হইবে। এই ৬৪ কোটি ভারত দিল, ইহা হইতে ইংলণ্ড হইতে আমদানীর দাম, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের হোমচার্জ্জেস ও বিলাতীয় টাকার সুদ সব প্রদত্ত হইবে। একস্‌-চেঞ্জ কম বেশী হওয়ার দরুণ ব্যবসায়ে ভারতবর্ষীয়দিগের লোকসান হইতে পারে কিন্তু এরূপ ব্যবসায়ের দরুণ ভারত-বর্ষের একস্‌চেঞ্জে লোকসান হয় নাই। ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের উপর যত বিল রাখে ইংলণ্ডেরও বিল, সেক্রেটরী অব ষ্টেটের ড্রাফ্টে ও অন্যান্য রকমে প্রায় ততই হইয়া উঠে সুতরাং ভারতবর্ষে ইংল-ণ্ডের উপর অধিক বিল থাকিলে

যে একসচেঞ্জ গোলমাল ঘটিত তাহা আর ঘটে না,কারণ,বাস্তবিক বিল উভয় দেশে সমান সমান আছে।

অনেকে আবার বলিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষে রূপা সস্তা হওয়াব দরুণ একসচেঞ্জে লোকসান হইতেছে। ১৮৫১ সাল হইতে যখন সোণা বড়ই সস্তা হইতে আরম্ভ হইল, তখন ইউরোপীয় গবর্ণমেণ্ট সকল রূপার টাকা ভাঙ্গিয়া এসিয়ায় পাঠাইতে লাগিল। আবার ঠিক এই সময়েই ভারতবর্ষে বড় বড় রেলওয়ে স্থাপিত হইতে লাগিল। সমস্ত রেলওয়েই বিলাতের টাকায় তৈয়ারি, সুতরাং অনেক রূপা ঐ সময়ে ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে আসে। ভারতবর্ষে রূপার টাকা চলিত সুতরাং রূপা পাঠানতেই রেলওয়ে কোম্পানির সুবিধা হইতে লাগিল। রূপার দরকারও বিলাতে কম হইতে লাগিল। এইরূপে অধিক রূপা দেশে আসার দরুণ এদেশে রূপা সস্তা হইত, যদি যত রূপা আসিয়াছিল সমস্তই টাকা হইয়া চলিত। কিন্তু অনেক রূপা টাকা রূপে চলিতেছে না অনেক লোক টাকা পুতিয়া রাখিয়াছে। ব্যাঙ্কিং এখানে ভাল নাই সুতরাং এদেশের লোক যাহা কিছু সঞ্চয় করে তাহা হয় গহনা গড়াইয়া রাখে না হয় পুতিয়া রাখে সুতরাং রূপা যখন বাজারে অতিরিক্ত পরিমাণে না রহিল তখন রূপা সস্তা হইল কেমন করিয়া বলিব। আর এদেশে রূপা সস্তা হইলে জিনিস পত্রের দাম মহার্ঘ হইত তাঁহার সন্দেহ নাই,কিন্তু তাহা হয় নাই। অকাল দুর্ভিক্ষ পড়াব দরুণ যে সকল জিনিসের দাম মহার্ঘ হইয়াছে মাত্র, তাহা ছাড়া আর সকলের যে দাম ৫।৭ বৎসর ধরিয়া ছিল সেই দামই আছে সুতরাং রূপা সস্তা হয় নাই। অতএব দুই চারি জন প্রধান সংবাদপত্র ওয়ালা যে বলিয়াছিলেন যে জর্ম্মানির বাতিল রূপা কিনিয়া রাখিলে একসচেঞ্জে সুবিধা হইবে, তাহা ঠিক নহে। এরূপ কিনিলে একসচেঞ্জে একটু লাভ হইত সন্দেহ নাই কিন্তু যে টাকা দিয়া কিনিতে হইত তাহার সুদ দিত কে?

এখন অনেক অনুসন্ধানের পর জানা গিয়াছে যে সোণা মহার্ঘ হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যাহারা তলাইয়া না বুঝে তাহাদের কাছে রূপা সস্তা হওয়া ও সোণা মহার্ঘ হওয়া দুইয়েরই এক প্রকার ফল সুতরাং তাহারা ঠিক করিয়া উঠিতে পারে না সোণা মহার্ঘ হইল কি রূপা সস্তা হইল। বর্ত্তমান উদাহরণে তাঁহারা ঠিক উল্টাটি বুঝিয়াছেন।

যদি বল সোণা মহার্ঘ হইল কিরূপে জানা গেল। আজি কালি ইংলণ্ডে বাণিজ্যে বড় গোলযোগ, অনেক হাউস ফেল হইতেছে লাভ কম হইতেছে, ব্যবসায়ে মন্দা পড়িয়া গিয়াছে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করায় প্রকাশ পায় যে ইংলণ্ডে ৫ বৎসর আগে যখন ব্যবসায় বড়ই ভাল ছিল তখন যে জিনিস যত

আমদানী ও রপ্তানী হইত এখন তাহা অপেক্ষা জিনিস পত্র বেশী আমদানী রপ্তানী হইতেছে কিন্তু যখন দাম ধরিয়া দেখা যায় তখন প্রমাণ হয় যে পূর্ব্বাপেক্ষা অল্প দামের জিনিস আমদানী রপ্তানী হইতেছে। আর বাজার দৃষ্টান্ত দেখিলেও সকল জিনিসেরই দাম কমিয়াছে যেমন রূপার দাম শতকরা ২২ করিয়া কমিয়াছে তেমনি সকল জিনিসেরই দাম শতকরা ২২ করিয়া কমিয়াছে। সুতরাং সোনার দাম শতকরা ২২ করিয়া বাড়িয়াছে। অর্থাৎ পূর্ব্বে যদি ৩০ মণ জিনিস রপ্তানী হইত তাহার দাম হইত ১৫০ পৌণ্ড এখন হয়ত ৩৫ মণ রপ্তানী হইতেছে, কিন্তু দাম হয়ত ১৪৫ পৌণ্ড বই নয়। এরূপ যদি একটা আধটা জিনিসের দাম কম হয় তবে জানা যায় যে অধিক উৎপন্ন হওয়ার দরুণ না হয় সেই জিনিসটাই সস্তা হইয়াছে, কিন্তু যখন সকল জিনিসেই এই রকম তখন তাহাতে কি বুঝায়? যে, যে বস্তু দ্বারা দাম নির্ণয় হয় তাহার মূল্য অধিক হইয়াছে, এই না! ইংলণ্ডে সোণা দ্বারা দাম নির্ণয় হয় সুতরাং সোণার মূল্য অধিক হইয়াছে।

এখনকার চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন যে সোণা মহার্ঘ হওয়ার জন্য এক্সচেঞ্জ গোলমাল উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু কথা এই সোণা মহার্ঘ হয় কেন? অষ্ট্রেলিয়া ও কালিফর্ণিয়ায় এত সোণা আবিষ্কার হইল, সোণা কোথায় সস্তাই হইবার কথা তাহা না হইয়া উপরন্তু মহার্ঘ হইয়া গেল। এ কেমন করিয়া হইবে। উত্তর এই যে ১৮৫১ শালের পূর্ব্বে ইংলণ্ডে স্বাধীন বাণিজ্য প্রবর্ত্তিত হয় অর্থাৎ ইংলণ্ড স্থির করে যে, যে জিনিস যেখানে সস্তা পাইব সেই জিনিস সেইখানে কিনিব ও যেখানে যে জিনিস মহার্ঘ দেখিব সেইখানে সে জিনিস বেচিব। এই সিদ্ধান্তানুযায়ী কার্য্যকরার দরুণ ইংলণ্ডের শীঘ্র শীঘ্র ধনোন্নতি হইতে লাগিল। ১৮১৬ খৃঃ অব্দ হইতে ইংলণ্ডে কেবল সোণার টাকা চলিতেছে, তাহার দরুণ ইউরোপীয় রৌপ্যমুদ্রদেশ সকলকে মধ্যে মধ্যে এক্সচেঞ্জে লোকসান দিতে হইত। তাহারা মনে করিত যে ইংলণ্ডের উন্নতির মূল স্বর্ণমুদ্রা ব্যবহার, উহাতে অপরাপর জাতির হানি করিয়া ইংলণ্ড বড় মানুষ হইতেছে, তাহার উপর আবার যখন স্বাধীন বাণিজ্য অবলম্বনের জন্য ইংলণ্ডের অতি শীঘ্র ধনোন্নতি হইল তখন উহাদের পূর্ব্ব সংস্কার দৃঢ়ীভূত হইতে লাগিল। যেমন অষ্ট্রেলিয়া ও কালিফর্ণিয়ায় স্বর্ণ আবিষ্কার হইল, যেমন এসিয়ায় অনেক রৌপ্য চালান হইতে লাগিল ইয়ুরোপের জাতিরা অমনি স্বর্ণমুদ্রা আশ্রয় করিলেন। ১৮৫১ খ্রীঃ অব্দের পূর্ব্বে জর্ম্মনিতে শুদ্ধ রৌপ্য মুদ্রা ছিল। ফ্রান্সে স্বর্ণ রৌপ্য দুই প্রকারের মুদ্রাই ব্যবহার ছিল। একটা অনুপাত বাঁধা ছিল যেমন এক তোলা

সোণার দাম ১৬ তোলা রূপা। ২০০০০ হাজার ফ্রাঙ্ক তোমায় দিতে হইল, সে কালে তুমি ফ্রান্সে সোণা বা রূপার যে কোন মুদ্রা ইচ্ছা দিতে পারিতে। (ইংলণ্ডে এরূপ হইবার যো নাই ২ পৌণ্ড পর্য্যন্ত রূপায় দিতে পার তাহার উপর সোণা দিতেই হইবে) আমেরিকার মাঝে দিনকত কাগজের টাকা চলিতেছিল যুদ্ধের সময় আমেরিকায় অনেক টাকার দরকার হয় অত সোণা বা রূপা উপস্থিত না থাকায় কাগজের টাকা কিছু দিনের জন্য বাহির করিতে হয়। ১৮৭০।৭১ সালে দেখা গেল জর্ম্মনি রূপার টাকা তুলিয়া দিয়া সোণার টাকা ছাপাইতে আরম্ভ করিয়াছে। সুইজর্লণ্ড, বেলজিয়ম, ফ্রান্স, ইতালি একত্রে পরামর্শ করিয়া ইচ্ছামত রৌপ্যমুদ্রা মুদ্রাঙ্কন বন্ধ করিয়া দিয়াছে অর্থাৎ স্বর্ণমুদ্রা আশ্রয় করিয়াছে। আমেরিকাও কাগজের পরিবর্ত্তে স্বর্ণমুদ্রা ছাপাইতেছে। ইংলণ্ডেও বাণিজ্যবিস্তারের জন্য অনেক স্বর্ণমুদ্রা আবশ্যক হইয়াছে। সুতরাং অনেক সোণার দরকার হইয়াছে, সোণার বাজার গরম হইয়া উঠিয়াছে, সোণার দাম ক্রমে উঠিতেছে। ওদিকে আবার ১৮৫১ খ্রীঃ অব্দে অর্থাৎ প্রথম প্রথম অষ্ট্রেলিয়া ও কালিফর্ণিয়ায় যে স্বর্ণ উৎপন্ন হইত এখন আর তত হয় না। সোণার দাম কাজেই আরও বাড়িয়া গেল শেষ এখন শতকরা ২২ টাকা অধিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ষোড়শ শতাব্দীতে যখন আমেরিকায় অনেক রূপার খনি আবিষ্কৃত হয় তখন একবার সোণা রূপার দামে এইরূপ তফাৎ হইয়া উঠে। তখন রূপা প্রায় শতকরা ৩৩ টাকা সস্তা হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু তখন শুদ্ধ স্বর্ণমুদ্র দেশ ছিল না সকল দেশেই দুই প্রকারের মুদ্রা ছাপা হইত। স্বর্ণমুদ্রা অধিক পরিমাণে না ছাপিয়া রৌপ্যমুদ্রা অধিক পরিমাণে ছাপাইলে সে গোলযোগ অনেক পরিমাণে কমিয়া আসিত। কিন্তু তখনও এত গোলমাল হয় নাই। রূপা সস্তার দরুণ যে ক্ষতি তাহাই মাত্র হইয়াছিল; এবার যদি স্বর্ণ সস্তা হইয়াই ক্ষান্ত হইত তাহা হইলে সেবারের মত ঠিক হইয়া দাঁড়াইত কিন্তু এবার ইউরোপীয় গবর্ণমেণ্ট সকলের আহাম্মুকিতে সোণার দাম সস্তা না হইয়া আরও মহার্ঘ হইয়া উঠিল। যদি মহার্ঘ হইয়াই ক্ষান্ত হইত তবেও ভাল ছিল। জানিলাম, বর্ত্তমান শতাব্দীতে আর ১৬ টাকায় সোণার ভরি মিলিবে না ১৯ টাকাই ভরি হইবে। সেই পরিমাণে এক্সচেঞ্জ বন্দোবস্ত করিয়া লওয়া যাইত। কিন্তু তাহা ত নহে। কেহই এখন পর্য্যন্ত অবগত নহে যে কত পরিমাণে সোণার দাম বেশী হইবে। জর্ম্মণি হইতে সব রূপার টাকা এখনও বাহির হয় নাই, এখনও জর্ম্মনিকে অনেক পরিমাণে সোণা কিনিতে হইবে, সোণার দাম তাহা হইলে আরও মহার্ঘ হইবে। এক্সচেঞ্জও কয়েক বৎসর ধরিয়া ক্রমে বাড়িয়া যাইতেছে। জিনিষ বিলাত হইতে

পাঠাইবার সময় এক রেট, সেই জিনিস ভারতবর্ষে পঁহুছিবার সময় রেট তাহা অপেক্ষা বেশী। এইরূপ একসচেঞ্জ রেট অনির্ণয়ে ব্যবসাদারদিগের সমূহ ক্ষতি হইতেছে, খরিদদারদিগেরও অনেক অসুবিধা হইতেছে।

অনেকে আছেন তাঁহারা বলেন এই সময় ভারতবর্ষও স্বর্ণমুদ্রা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করুক, তাহা হইলে তাহাকে আর দ্বিতীয় প্রকারের একসচেঞ্জ দিতে হইবে না, প্রথম প্রকারের এটা ওটা দিলেই হইবে। এখন যদি ভারতবর্ষও আবার সোণার খরিদদার হইয়া দাঁড়ান তাহা হইলে সোণার দাম অগ্নিমূল্য হইয়া উঠিবে, কারণ ভারতবর্ষে স্বর্ণমুদ্রা চালাইতে হইলে অল্প স্বর্ণে হইবে না। তত স্বর্ণ বাজারে নাই সুতরাং সোণার দর এখন যদি শতকরা ২২ বেশী থাকে তখন শতকরা ৫০ বেশী হইয়া দাঁড়াইবে।

১৮৫১ খৃঃ অব্দ হইতে এপর্য্যন্ত যত সোণা রূপা পাওয়া গিয়াছে তাহার এক তালিকা প্রদত্ত হইতেছে ইহা দেখিলেই জানা যাইবে এত সোণা আবিষ্কার হইয়াও কেন সোণা মহার্ঘ রহিয়াছে। পাঁচ ছয় বৎসর আগে কেয়ারণ সাহেব ও লেডি ফসেট বলিয়াছিলেন সোণা সস্তা হইয়াছে, লেডি ফসেট বলেন যে, তখন শতকরা ১৫ টাকা সোণার দাম কমিয়াছিল, কিন্তু এখন ইংলণ্ডের এক প্রসিদ্ধ মাগাজিনে প্রতিপন্ন করিয়াছে যে সোণার মূল্য শতকরা ২২ টাকা বাড়িয়াছে। ১৮৫১ সালের পূর্ব্বে পৃথিবীর সমস্ত খনি হইতে ৮ কোটী টাকার স্বর্ণ পাওয়া যাইত এই ছয় কোটীর ৪ কোটী ইংলণ্ডে আসিত। তাহার পর লেডি ফসেট যখন তাঁহার পুস্তক লিখেন তখন গড়ে ১০ কোটী টাকার সোণা প্রতিবৎসর উত্তোলিত হয় ও তাহা হইতে ১৪ কোটী টাকার সোণা ইংলণ্ডে আসিত। ইংলণ্ড ব্যবসায়ের দেশ, অন্যান্য দেশের লোক স্বর্ণ সমস্তই ইংলণ্ড হইতে পায়। অতএব ইংলণ্ডে যে স্বর্ণ আসে তাহাই ছড়াইয়া পড়ে। অবশিষ্ট স্বর্ণ যে দেশের খনি সেই দেশেই থাকে। সেও অল্প নয়। স্বর্ণ আবিষ্কারের পূর্ব্বে আষ্ট্রেলিয়ায় টাঁকশাল ছিল না। ২১৫ হাজার টাকা দরকার হইলেই ইংলণ্ড হইতে ছাপা হইয়া আসিত। এখন অষ্ট্রেলিয়ায় মস্ত টাঁকশাল হইয়াছে, কালিফর্ণিয়া অথবা ইয়ুনাইটেড ষ্টেট যদিও টাঁকশাল ছিল মধ্যে দিন কতক সেখানে টাকা ছাপাই হইত না। এখন আবার সোণা রূপার প্রচুর পরিমাণে ছাপা হইতেছে। নিম্নলিখিত হিসাব দৃষ্টি করিলে সোণা কি রূপা মহার্ঘ হইল কতক উপলব্ধি হইবে।

প্রথম রূপা।

১৮৭১ সাল হইতে ১৮৭৮ পর্য্যন্ত ৪৫ কোটী নাবারা রৌপ্য খনিতে পাওয়া যায়।

১৮৭৬ পর্য্যন্ত ৩২ কোটী জর্ম্মানি বিক্রয় করে।

১৮৭৬ হইতে ১৮৭৯ পর্য্যন্ত ২৬কোটী।

ইহার মধ্যে শেষোক্ত ২৬ কোটীর মধ্যে ২৫ কোটী টাকার রৌপ্য শুদ্ধ ভারতবর্ষে আসিয়াছে। এই পরিমাণে বরাবর ১৮৭১ সাল হইতে ভারতবর্ষে টাকা আসিতেছে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট অনেক দিন অবধি ইংলণ্ডে টাকা ধার করিয়া এ দেশে পবলিকওয়ার্কস চালাইতেছেন সে টাকার ইংলণ্ড হইতে রূপার চাই আসে। এই রূপে ১৮৭১ হইতে এ পর্য্যন্ত যত নূতন রূপা বাহির হইয়াছে তাহার অনেক ভারতবর্ষে আসিয়াছে। ৪।৫ বৎসর হইল একবার ফ্রান্স ও ইতালিতে রেসম হয় না। সে বৎসর চীন হইতে সমস্ত রেসম যায় চীনেরা বিলাতী জিনিস বড় লয় না। তাহারা রূপা লয়। তাহাতেও এই বাড়তি রূপার কিয়দংশ গিয়াছে। ১৮৭১ সালের পূর্ব্বে যে রূপা প্রতিবৎসর বাহির হইত এখনও তাহা হয় তাহার পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অল্প। চীনের সঙ্গে বাণিজ্যে ৮।১০ বৎসর ধরিয়া ইংলণ্ডকে প্রায় ৭ কোটী টাকার রৌপ্য দিতে হয়। চীনের চা নহিলে বিলাত চলে না। বিলাতী জিনিস চীনেরা লইতে চায় না। সুতরাং অনেক টাকার রৌপ্য প্রতিবৎসর দিতে হয়। চীনের সঙ্গে এরূপ বিস্তৃত বাণিজ্য হইবার পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৮৭১ সালের পূর্ব্বে এক ভারতবর্ষে রেলওয়ে কোম্পানি সমূহের ৬০ কোটী টাকা খরচ হয়, ইহার কিয়দংশ সোণায় আসে, কিয়দংশ ভারতবর্ষেও পাওয়া যায়। কিন্তু অধিকাংশ ইংলণ্ড হইতে রূপার চাই খরিদ হইয়া আসে। সুতরাং বিলাতে রূপা (কি পুরান কি নূতন) অধিক নাই প্রতিপন্ন হইল। প্রায় সমস্ত রূপাই ভারতবর্ষ ও চীনে পঁহুছিয়াছে। সমস্ত রূপা টাকাভাবে নাই। অনেকই কুলিগৃহিনীদিগের পঁইচারূপে পরিণত হইয়াছে।

এক্ষণে সোণার হিসাব। ১৮৫১ সালের পূর্ব্বে পৃথিবীতে ছয় কোটী টাকার সোণা উৎপন্ন হইত। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে

১৮৫২ হইতে ৫ বৎসর গড়ে			২৯ কোটী করিয়া হইয়াছে।
১৮৫৭	,,	,,	২৪
১৮৬২	,,	,,	২২
১৮৬৭	,,	,,	২১
১৮৭২ হইতে ৪ বৎসর			১৯

গড়ে সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ৬০০ কোটী টাকার স্বর্ণ খনি হইতে উত্তোলিত হইয়াছে। ইহার এক চতুর্থাংশ গড়ে অষ্ট্রেলিয়া ও কালিফর্ণিয়ায় রহিয়া গিয়াছে। আগে যে রূপেই হউক, এক্ষণে বাহিরে যত সোণা যায় সমুদয়ই ইংলণ্ড হইতে। যাহারই সোণা কেনার দরকার হয় সেই ইংলণ্ড হইতে কিনিয়া লয় সুতরাং অষ্ট্রেলিয়া ও কালিফর্ণিয়ায় এই ৬০০ কোটীর মধ্যে ১৫০ কোটি রহিয়া গিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। লেভিফসেটও বলিয়াছেন যে যখন ১৯ কোটি উৎপন্ন তখন ইংলণ্ডে

১৪ কোটি আসে। সেই অনুপাত ধরিলেও ১৫০ কোটিই দাঁড়ায়। ইহার উপর এক জর্ম্মনি ১৮৭৬ পর্য্যন্ত ৮৪ কোটী টাকার স্বর্ণ খরিদ করিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছে। ইংলণ্ডের করেন্‌সি টাকা তিন গুণ বাড়িয়াছে। ১৮৬৫ সাল হইতে ইটালি ফ্রান্স সুইজর্লণ্ড বেলজিয়ম লাটিন কনফ্রাবেন্স নামক সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়া রৌপ্য মুদ্রাঙ্কন বন্ধ করিয়া দিয়াছে। এখানকার পুরান রূপাও কতক ইংলণ্ড হইতে ও কতক নিজ ফ্রান্স হইতে ভারতবর্ষ চীন প্রভৃতি দেশে আসিয়া পড়িয়াছে। ১৮৭৬ সালে আমেরিকায় ৩০ কোটী টাকার সোণার Reserve ছিল। এখন ফ্রান্স ইংলণ্ড ও বর্লিন ব্যাঙ্কে ৩৭ কোটি টাকার রূপা ও ৯৮ কোটি টাকার সোণা Reserve আছে। সে টাকা না থাকিলে ব্যাঙ্ক চলে না। হিসাব করিয়া বেশ দেখান যায় যে ৬০০ কোটি টাকার সোনা পূর্ব্বোক্ত সমস্ত কারণে বাজার হইতে অন্তর্হিতপ্রায় হইয়াছে। দেখিবে? আচ্ছা ৬০০ কোটি হইতে অষ্ট্রেলিয়া ও কালিফর্ণিয়ায় ১৫০ ও জর্ম্মনির ৮৪ বাদ দাও বাকী ৩৬৬। ইহা হইতে আমেরিকায় ৩০, = ৩৩৬। ব্যাঙ্ক Reserve সব বাদ দিতে পার না কারণ ১৮৫১ সালের পূর্ব্বেও ব্যাঙ্কে রিসার্ভ ছিল। ১৮৪৬ সালে ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডে সোণায় রূপায় ১৪ কোটি ছিল ইহার মধ্যে যদি ১০ কোটি সোণা হয় আর ব্যাঙ্ক অবফ্রান্সেও যদি সেই পরিমাণে সোণা থাকে তাহা হইলে ২০ কোটি হইল। জর্ম্মনির রিসার্ভ রূপায় ছিল। তবে এখন যে এই তিন ব্যাঙ্কে ৯৮ কোটি সোণা আছে তাহার অন্ততঃ ৭৬ কোটিও ১৮৫১ সালের পর আসিয়াছে। আচ্ছা ৩৩৬ হইতে ৭৬ বাদ দাও বাকী রহিল ২৬০ কোটি।

১৮৫১ সালের পূর্ব্বে ইংলণ্ডে ৪ কোটী টাকার স্বর্ণ আসিত ইহার মধ্যে ২০ লক্ষ আন্দাজ গহনা আদি তৈয়ার হইত। মিঃ বিশ্বস্ত সূত্রে শুনিয়াছিলেন যে, গহনাদিতে (art and manufactures) উহা অপেক্ষা বৎসরে অধিক স্বর্ণ লাগে না। তখনও ইংলণ্ডের অনেক স্বর্ণ বাহিরে যাইত অতএব আমরা যদি আন্দাজ করিয়া ধরি যে ২॥ কোটী টাকার সোণা প্রতিবৎসর ইংলণ্ডে ছাপা হইত বোধ হয় আমাদের অধিক ভুল হইবে না। এখনকার অনেকে স্বীকার করেন যে ইংলণ্ডের করেন্‌সি তিন গুণ হইয়াছে তবে ৭॥ কোটী প্রতি বৎসর ইংলণ্ডে ছাপা হয়। প্রায় ২৮ বৎসর এই রূপ হইতেছে সেও প্রায় ২০০ কোটী। বাকী রহিল ৬৬ কোটী, এখনও ফ্রান্স আছেন ও আরও কত দেশে কত রকম সোণার খরচ আছে তাহার ঠিকানা নাই। এ পর্য্যন্ত হিসাবে দেখাইয়া দিল যে, অদ্যাবধি যত সোণা আসিয়াছিল সব চুকিয়া গিয়াছে।

এখন আর একটী জিনিস চাই। উপস্থিত যে সোণা বাজারে আসিয়া

পড়ে তাহাতে পৃথিবীর সংকুলান হয় কি না? যদি হইয়া উঠে ভারতবর্ষে স্বর্ণমুদ্রা চালানয় ভালই হইবে। যদি না থাকে চালাইলে সর্ব্বনাশ হইবে। বাজার শব্দের অর্থ ইংলণ্ড। কারণ ইংলণ্ডেই স্বর্ণ ও রৌপ্য জমিয়া থাকে ও তথা হইতেই লোক উহা খরিদ বিক্রয় করে। ইংলণ্ডে ৫ বৎসর আগে ২৪ কোটী স্বর্ণ আসিত; এখন স্বর্ণ উঠা কমিয়াছে ইংলণ্ডে আসাও কমিয়াছে। যে পরিমাণে কমিয়া আসিতেছে তাহাতে এখন কমিয়া ১২ কোটি হইয়াছে। এক ইংলণ্ডেই তাহার ৭৷৷ কোটী ছাপা হয়। বাকী ৪৷৷ কোটী। জর্ম্মণি প্রায় তিন কোটী ছাপিতেছেন, [illegible] বছর। সাড়ে তের কোটী প্রায় দরকার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু জন্মে ১২ কোটী বই ধরে নাই, এমনি টানাটানি দাঁড়াইয়াছে যে জর্ম্মনিও আবার রূপা ছাপাইতে হুকুম দিয়াছেন। এখন আবার যদি ভারতবর্ষে স্বর্ণ ধরেন তবে আর রক্ষা নাই।

পাঠকবর্গ দেখিবেন যে ব্যবসায়ে শতকরা ২।৩ টাকা এক্সচেঞ্জ প্রায়ই দিতে হয়। তাহার উপর সোনা ও রূপার টাকা চলন লইয়া আর এক রকমের এক্সচেঞ্জ হয় এবং বর্ত্তমান সময়ে স্বর্ণের মূল্য অধিক হওয়ার দরুণ এই এক্সচেঞ্জে ভারতবর্ষের ভয়ানক লোকসান হইতেছে। কেন স্বর্ণ মহার্ঘ হইল তাহাও একপ্রকার প্রতিপাদিত হইয়াছে। এসকল ভিন্ন ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডে আর এক রকমের এক্সচেঞ্জ হইয়া থাকে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে ভারতবর্ষ হইতে প্রায় ৬০ কোটী টাকার জিনিস ইংলণ্ডে যায়, আর ইংলণ্ডের, ভারতবর্ষে রপ্তানী সেক্রেটরী ষ্টেটের ড্রাফ্‌ট ও টাকার সুদ সেটা ভুক্তন হইয়া যায়। দেনাটা এক রকম গায়ে গায়ে শোধ যায়। কিন্তু ইহার মধ্যে যদি কোন বার ইংলণ্ড হইতে কোন রেলওয়ের জন্য ১০ কোটি টাকা পাঠাইতে হয় সেবার এক্সচেঞ্জ ভারতবর্ষে একটু না একটু সুবিধা নিশ্চয়ই হয়। আর মধ্যে মধ্যে এরূপ টাকা ধার হইয়া ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে আসেই। এই ধারী টাকার অনেক রূপার আসে যে অল্প দিন আসে তাহাতেই আমাদের কিছু সুবিধা হয়।

এখন এই এক্সচেঞ্জ গোলযোগের ঔষধ কি? উত্তর এই যে, কোন ঔষধই আমাদের হাতে নাই। আমরা কোনরূপেই ইহার প্রতিবিধান করিতে পারি না। তবে সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে যে অতি অল্প দিনের মধ্যে রূপার দাম মহার্ঘ হইয়া আসিবে। রূপার বড় বড় খনিতে মাল তলায় পড়িয়াছে ২০০০।৩০০০ ফুটের নীচে বসিয়া রূপা তুলিতে হইলেই রূপার দাম একটু একটু করিয়া মহার্ঘ হইবে। আর সোনার দাম বেশী হওয়ার দরুণ, ইউরোপীয় অনেক গবর্ণমেণ্টের চক্ষু খুলিয়া যাই-

তেছে। জর্ম্মানি ত রূপা ছাপিবার হুকুম দিয়াছেন। ইংলণ্ডেও রূপার টাকা অল্প বিস্তর ছাপা হয় এবিষয়ে আন্দোলন হইতেছে। আমাদের গবর্ণমেণ্টের এখন উচিত চুপ করিয়া থাকা, অথবা ইউরোপীয় গবর্ণমেণ্ট সকল যাহাতে রূপার টাকা ছাপেন তাহার চেষ্টা করা।

উপসংহার কালে আমাদের একজন প্রধান সংবাদপত্র যে বলেন পৃথিবী শুদ্ধ রূপার টাকা হইলে এক্সচেঞ্জ গোল হইবে না তাহার বিষয় কিছু বলা আবশ্যক। জর্ম্মানি ফ্রান্স কেবল সোণার টাকা করিতে গিয়া এখন যেমন গোল বাঁধাইয়াছেন, যদি তাঁহারা ঐরূপ কেবল রূপার ধরিতেন তাহা হইলেও ঠিক এইরূপ গোল হইত। এখন সোণা মহার্ঘ হইয়াছে তখন রূপা মহার্ঘ হইত এই মাত্র বিশেষ।

তৈল।

তৈল যে কি পদার্থ তাহা সংস্কৃত কবিরা কতক বুঝিয়াছিলেন, তাঁহাদের মতে তৈলের অপর নাম স্নেহ—বাস্তবিকও স্নেহ ও তৈল একই পদার্থ, আমি তোমায় স্নেহ করি, তুমি আমায় স্নেহ কর অর্থাৎ আমরা পরস্পরকে তৈল দিয়া থাকি। স্নেহ কি ? যাহা স্নিগ্ধ বা ঠাণ্ডা করে তাহার নাম স্নেহ। তৈলের ন্যায় ঠাণ্ডা করিতে আর কিসে পারে !

সংস্কৃত কবিরা ঠিক বুঝিয়াছিলেন। যে হেতু তাঁহারা সকল মনুষ্যকেই সমান রূপ স্নেহ করিতে বা তৈল প্রদান করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

বাস্তবিকই তৈল সর্ব্বশক্তিমান্, যাহা বলের অসাধ্য, যাহা বিদ্যার অসাধ্য, যাহা ধনের অসাধ্য, যাহা কৌশলের অসাধ্য, তাহা কেবল একমাত্র তৈল দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে।

যে সর্ব্বশক্তিময় তৈল ব্যবহার করিতে জানে সে সর্ব্বশক্তিমান্। তাহার কাছে জগতের সকল কাজই সোজা, তাহার চাকরির জন্য ভাবিতে হয় না—উকিলিতে পসার করিবার জন্য সময় নষ্ট করিতে হয় না—বিনা কাজে বসিয়া থাকিতে হয় না, কোন কাজেই শিক্ষানবিশ থাকিতে হয় না।

যে তৈল দিতে পারিবে তাহার বিদ্যা না থাকিলেও সে প্রফেসার হইতে পারে, আহাম্মুক হইলেও ম্যাজিষ্ট্রেট হইতে পারে, সাহস না থাকিলেও সেনাপতি হইতে পারে এবং দুর্ল্লভ রাম হইয়াও উড়িষ্যার গবর্ণর হইতে পারে।

তৈলের মহিমা অতি অপরূপ, তৈল নহিলে জগতের কোন কার্য্য সিদ্ধ হয় না। তৈল নহিলে কল চলে না, প্রদীপ জ্বলে না, ব্যঞ্জন সুস্বাদু হয় না, চেহারা

খোলে না, হাজার গুণ থাকুক তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না। তৈল থাকিলে তাহার কিছুরই অভাব থাকে না।

সর্ব্বশক্তিময় তৈল নানা রূপে সমস্ত পৃথিবী ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। তৈলের যে মূর্ত্তিতে আমরা গুরুজনকে স্নিগ্ধ করি তাহার নাম ভক্তি, যাহাতে প্রণয়ীকে স্নিগ্ধ করি তাহার নাম প্রণয় যাহাতে প্রতিবেশীকে স্নিগ্ধ করি তাহার নাম মৈত্রী, যাহা দ্বারা সমস্ত জগৎকে স্নিগ্ধ করি তাহার নাম শিষ্টাচার ও সৌজন্য "ফিলনথুপি।" যাহা দ্বারা সাহেবকে স্নিগ্ধ করি তাহার নাম লয়েলটি, যাহা দ্বারা বড়লোককে স্নিগ্ধ করি তাহার নাম নম্রতা বা মডেষ্টি, চাকর বাকর প্রভৃতিকেও আমরা তৈল দিয়া থাকি, তাহার পরিবর্ত্তে ভক্তি বা যত্ন পাই। অনেকের নিকট তৈল দিয়া তৈল বাহির করি।

পরস্পর ঘর্ষিত হইলে সকল বস্তুতেই অগ্ন্যুদ্গম হয় সেই অগ্ন্যুদ্গম নিবারণের এক মাত্র উপায় তৈল। এই জন্যই রেলের চাকায় তৈলের অনুকল্প চর্ব্বি দিয়া থাকে। এই জন্যই যখন দুইজনে ঘোরতর বিবাদে লঙ্কাকাণ্ড উপস্থিত হয়, তখন রফা নামক তৈল আসিয়া উভয়কে ঠাণ্ডা করিয়া দেয়। তৈলের যদি অগ্নিনিবারণী শক্তি না থাকিত তবে গৃহে গৃহে গ্রামে গ্রামে পিতা পুত্রে স্বামী স্ত্রীতে রাজায় প্রজায় বিবাদ বিষম্বাদে নিরন্তর অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইত।

পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে যে তৈল দিতে পারে সে সর্ব্বশক্তিমান্ কিন্তু তৈল দিলেই হয় না। দিবার পাত্র আছে সময় আছে কৌশল আছে।

তৈল দ্বারা অগ্নি পর্য্যন্ত বশতাপন্ন হয়। অগ্নিতে অল্প তৈল দিয়া সমস্ত রাত্রি ঘরে আবদ্ধ রাখা যায়। কিন্তু সে তৈল মূর্ত্তিমান্।

কে যে তৈল দিবার পাত্র নয় তাহা বলা যায় না। পুঁটে তেলি হইতে লাট সাহেব পর্য্যন্ত সকলেই তৈল দিবার পাত্র। তৈল এমন জিনিস নয় যে নষ্ট হয়। একবার দিয়া রাখিলে নিশ্চয়ই কোন না কোন ফল ফলিবে। কিন্তু তথাপি যাহার নিকট উপস্থিত কাজ আদায় করিতে হইবে সেই তৈলনিষেকের প্রধান পাত্র।

সময়—যে সময়েই হউক তৈল দিয়া রাখিলেই কাজ হইবে। কিন্তু উপযুক্ত সময়ে অল্প তৈলে অধিক কাজ হয়।

কৌশল—পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে যে রূপেই হউক তৈল দিলে কিছু না কিছু উপকার হইবে। যে হেতু তৈল নষ্ট হয় না তথাপি দিবার কৌশল আছে। তাহার প্রমাণ ভট্টাচার্য্যেরা সমস্ত দিন বকিয়াও যাহার নিকট ১।০ পাঁচ সিকা বই আদায় করিতে পারিল না—একজন ইংরেজীওয়ালা তাহার নিকট অনায়াসে ৫০ টাকা বাহির করিয়া লইয়া গেল। কৌশল করিয়া একবিন্দু দিলে যত কার্য্য হয় বিনা কৌশলে কলস কলস ঢালিলেও তত হয় না।

ব্যক্তিবিশেষে তৈলের গুণতারতম্য

অনেক আছে। নিষ্কৃত্রিম তৈল পাওয়া অতি দুর্লভ। কিন্তু তৈলের এমনি একটী আশ্চর্য্য সম্মিলনী শক্তি আছে যে তাহাতে যে উহা অন্য সকল পদার্থের গুণই আত্মসাৎ করিতে পারে। যাহার বিদ্যা আছে তাহার তৈল আমার তৈল অপেক্ষা মূল্যবান্। বিদ্যার উপর যাহার বুদ্ধি আছে তাহার আরও মূল্যবান্। তাহার উপর যদি ধন থাকে তবে তাহার প্রতি বিন্দুর মূল্য লক্ষ টাকা। কিন্তু তৈল না থাকিলে তাহার বুদ্ধি থাকুক, হাজার বিদ্যা থাকুক, হাজার ধন থাকুক কেহই টের পায় না।

তৈল দিবার প্রবৃত্তি স্বাভাবিক। এ প্রবৃত্তি সকলেরই আছে এবং সুবিধামতে আপনগৃহে ও আপন দলে সকলেই ইহা প্রয়োগ করিয়া থাকে কিন্তু অনেকে এত অধিক স্বার্থপর যে বাহিরের লোককে তৈল দিতে পারে না। তৈল দান প্রবৃত্তি স্বাভাবিক হইলেও উহাতে কৃতকার্য্য হওয়া অদৃষ্টসাপেক্ষ।

আজ কাল বিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতি শিখাইবার জন্য নানাবিধ চেষ্টা হইতেছে। যাহাতে বঙ্গের লোক প্রাক্টিকল অর্থাৎ কাজের লোক হইতে পারে তজ্জন্য সকলেই সচেষ্ট কিন্তু কাজের লোক হইতে হইলে তৈলদান সকলের আগে দরকার—অতএব তৈলদানের একটি স্কুলের নিতান্ত প্রয়োজন। অতএব আমরা প্রস্তাব করি বাছিয়া বাছিয়া কোন রায়বাহাদুর অথবা খাঁ বাহাদুরকে প্রিন্সিপাল করিয়া শীঘ্র একটী স্নেহনিষেকের কালেজ খোলা হয়। অন্ততঃ উকিলি শিক্ষার নিমিত্ত লা কালেজে একজন তৈল অধ্যাপক নিযুক্ত করা আবশ্যক। কালেজ খুলিতে পারিলে ভালই হয়।

কিন্তু এরূপ কালেজ খুলিতে হইলে প্রথমেই গোলযোগ উপস্থিত হয়। তৈল সকলেই দিয়া থাকেন—কিন্তু কেহই স্বীকার করেন না যে আমি দিই। সুতরাং এ বিদ্যার অধ্যাপক জোটা ভার, এ বিদ্যা শিখিতে হইলে [illegible] শুনিয়া শিখিতে [illegible] পা-ওয়া [illegible] কালেজ [illegible] যাঁহারা [illegible] বিব বা প্রোফেসারের অভাব মিলে তাদৃশ লোকের বাড়ী সদাসর্ব্বদা গেলে উত্তমরূপ শিক্ষালাভ করা যাইতে পারে। বাঙ্গালির বল নাই, বিক্রম নাই, বিদ্যাও নাই বুদ্ধিও নাই। সুতরাং বাঙ্গালির একমাত্র ভরসা তৈল—বাঙ্গালায় যে কেহ কিছু করিয়াছেন সকলই তৈলের জোরে। বাঙ্গালিদিগের তৈলের মূল্য অধিক নয়। এবং কি কৌশলে সেই তৈল বিধাতৃপুরুষদিগের সুখসেব্য হয়, তাহাও অতি অল্প লোক জানে। যাঁহারা জানেন তাঁহাদিগকে আমরা ধন্যবাদ দিই। তাঁহারাই আমাদের দেশের বড় লোক তাঁহারাই আমাদের দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়া আছেন।

তৈল বিধাতৃ পুরুষদিগের সুখসেব্য

হইবে ইচ্ছা করিলে সে শিক্ষা এ দেশে হওয়া কঠিন। তজ্জন্য বিলাত যাওয়া আবশ্যক। তত্রত্য রমণীরা এ বিষয়ের প্রধান অধ্যাপক, তাহাদের থু হইলে তৈল শীঘ্র কাজে আইসে।

শেষ মনে রাখা উচিত এক তৈলে চাকা ঘোরে আর তৈলে মন ফেরে।

চন্দ্রের বৃত্তান্ত।

যখন ভগবান্ মরীচিমালী দৈবসিক ব্যাপার সমাধা করিয়া পৃথিবীর স্থূল কলেবরের অন্তরালে বিশ্রামগৃহে প্রবেশ করেন ও যখন আমরা রজনীর নিবিড় তিমিরসংহতির মধ্যে নিমজ্জিত হই তখন কে ঐ গগন প্রদেশে নিজ পরিচিত মুখখানি সময়ে সময়ে দেখাইয়া আমাদের আলোকবিরহসঞ্জাত ভীতিকে চিত্ত হইতে দূর করে ও স্বচ্ছ সুনির্ম্মল কিরণরাশি বর্ষণ করিয়া প্রকৃতিকে রজতসন্নিভ করিয়া তুলে? আমরা সকৃতজ্ঞচিত্তে আজি উক্ত মহৎ পদার্থের নাম, ধাম ও গুণ কীর্ত্তন করিয়া পাঠকগণের সন্নিধানে পরিচয় দিব। ঐ প্রিয়দর্শনকে অবনীবাসিগণ চন্দ্র এই অভিধানে আখ্যাত করে। চন্দ্র পৃথিবীর চিরসহচর। যখন পৃথিবীতলে মনুষ্যজাতির পদচিহ্ন পড়ে নাই, যখন জীবনব্যাপার পৃথিবীতে অজ্ঞাত ছিল তখনও এই চন্দ্র তৃণহীন পর্ব্বতশীর্ষ সকলকে রজতকিরীট প্রদান করিত, তখনও বিশাল বিস্তীর্ণ মরুপ্রদেশ সকলকে নিজকরে উদ্ভাসিত করিত, তখনও নীরব ভূপৃষ্ঠকে নিভৃত ভাবে শীতল করিত। এমন চিরসহচর বন্ধুর বিষয় যতদূর জানা সম্ভব আমাদের জানা উচিত।

চন্দ্রের কলাবস্তা বহুদিবস হইতেই মানবজাতির বিচার্য্য বিষয়। চন্দ্রের ক্ষয় বৃদ্ধির নিয়মানুসারে প্রাচীন জাতিরা যে সময়পরিমাণ করিত তাহার সন্দেহ নাই। টিউটনিক ভাষায় চন্দ্রের নাম ও তাহাদের মাসার্থবোধক শব্দ একই ছিল। কালডীয় জাতীয়েরা চন্দ্রের গ্রহণ নির্ণয়েও কিয়ৎপরিমাণে ক্ষমবান্ হইয়াছিল। কালডীয়ের পরে মিসরীয়েরাও গ্রহণ নির্ণয় করিত। গ্রীক্ রোমানগণ কালডীয়ের ও মিসরের নিকট চন্দ্রসম্বন্ধীয় অনেক জ্ঞানলাভ করে। তাহাদেরই নিকট হইতে গ্রীকগণ চন্দ্রের উপাসনা শিখে। গ্রীকদিগের নিকট চন্দ্র সাধারণপ্রিয় একজন উপাস্য দেবতা ছিলেন। আমাদের হিন্দুগণ অতি পূর্ব্ব কালেই চন্দ্রসম্বন্ধীয় কয়েকটী প্রধান প্রধান বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন সকলের মীমাংসা করিয়াছিলেন। চন্দ্র যে পৃথিবীকর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া ঘুরে ও সূর্য্যকিরণপাতে

চন্দ্রের দীপ্তিমত্তা ইহা কালিদাসাদি জ্যোতির্ব্বিদ গণ জানিতেন।

বভৌ চ সম্পর্কমুপেত্য বালা
নবেন দীক্ষা বিধিশাবকেণ।
করেণ ভানোর্বহুলাবসানে
সন্ধুক্ষ্যমাণেব শশাঙ্করেখা।

কুমার-সম্ভব।

চন্দ্রের ক্ষয়বৃদ্ধি-সম্বন্ধে পৌরাণিকেরা আর এক গল্প বলেন।

দক্ষপ্রজাপতির আটাইশ কন্যা। প্রথম সাতাইশটির সহিত চন্দ্রের বিবাহ হয়। কনিষ্ঠা সতী শিবরমণী হন। উক্ত দক্ষতনুজা সাতাইশ নক্ষত্র নামে অভিহিতা। চন্দ্র সকল স্ত্রীর মধ্যে রোহিণীতে (Aldebaron) কিছু বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। বক্রী ছাব্বিশটী স্ত্রী মনের ক্লেশে পিতাকে চন্দ্রের কথা জানান। দক্ষ চন্দ্রকে বারণ করিয়া বলেন, সে কেবল রোহিণীকে অত ভালবাসিলে চলিবে কেন; চন্দ্র মুখে স্বীকার করিলেন যে সকলের প্রতি সমান ভালবাসা রাখিবেন কিন্তু কার্য্যতঃ যে রোহিণীগতপ্রাণ সে রোহিণীগতপ্রাণই রহিলেন। কন্যারা পুনরায় পিতাকে জানানতে দক্ষ রাগিয়া অভিসম্পাত করিলেন, চন্দ্র যক্ষ্মা হইয়া মরুক। চন্দ্র যখন মরেন মরেন তখন কন্যারা দেখিলেন বড়ই বিভ্রাট্, সকলেই ত বিধবা হয়! তখন আবার কাঁদিতে কাঁদিতে পিতার পায়ে হাতে ধরেন। পিতা তখন একটু নরম হইয়া আজ্ঞা দিলেন, "আমার বাক্য ত ব্যর্থ হইবে না। চন্দ্র ক্ষয় নিশ্চয়ই হইবেন, তবে তিনি ৫ দিন ক্ষয় হইবেন, পরদিন সেই ক্ষয় পূরণ করিবেন। সুতরাং চন্দ্রের নানা অবস্থা ভেদ।

পৌরাণিক মতে চন্দ্র অত্রিনেত্রসম্ভূত:—
"ব্রহ্মণো মানসঃপুত্র অত্রির্নাম মহাতপাঃ
সৃষ্টিকামঃ প্রজা বৎস তপস্তেপে সুদুস্তরং।
ত্রীণিবর্ষ সহস্রাণি দিব্যানীতীহ নঃ শ্রুতং
ঊর্দ্ধমাচক্রমে তস্য রেতঃ সোমত্বমীয়িবৎ।
নেত্রাভ্যাং বারিসুস্রাব দশধা দ্যোতয়দ্দিশঃ
তং গর্ভং ব্রহ্মণাদিষ্টা দশদেব্যো দধুর্দিশঃ।
সমেত্যোর মহারাজ নৈব তাঃ সমশক্নুবন্।
যদা ন ধারণে শক্তা গর্ভস্য তা দিশঃ
ততস্তাভিঃ সহৈবাসৌ নিপপাত বসুন্ধরাং
পতিতং তং সমালোক্য ব্রহ্মলোকপিতামহঃ
রথমারোপয়ামাস লোকানাং হিতকাম্যয়া
স তেন রথমুখ্যেন সাগরান্তাং বসুন্ধরাং
ত্রিসপ্তকৃত্বো দ্রুহিণো কারয়ত্তং প্রদক্ষিণং
তস্য তৎ স্রাবিতং তেজঃপৃথিবী মন্বপদ্যত
তেনৌষধ্যঃ সমুদ্ভূতা যাভিঃসন্ধার্য্যতে জগৎ
সলব্ধতেজা ভগবান্ ব্রহ্মণা বর্দ্ধিতঃ স্বয়ং।"

অর্থাৎ ব্রহ্মার মানসপুত্র ভগবান্ অত্রি প্রজাসৃষ্টি কামনা করিয়া দেবলোকীয় ৩০০০ বৎসর উগ্র তপস্যাচরণ করেন। তাঁহার তেজোরাশি তাঁহার চক্ষুপথ দিয়া লব্ধমার্গ হইয়া দশদিক উজ্জ্বল করিয়া দশভাগে বিভক্ত হয়। ব্রহ্মার আদেশে সেই চন্দ্রত্বপ্রাপ্ত তেজোরাশিকে দশদিক গর্ভে ধারণ করেন। কিন্তু ধারণে অশক্ত হইয়া চন্দ্রের সহিত তাহারা পৃথিবীতে পড়িয়া যায়। চন্দ্রকে পতিত দেখিয়া

লোকপিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাকে রথে তুলিয়া লন। এবং সেই দিব্য রথে উঠাইয়া তাঁহাকে একুশবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করান। তাহাতে চন্দ্রের তেজঃ পৃথিবীতে পড়ে; তাহাতে ওষধি সকল উৎপন্ন হইয়াছে, যদ্গুণে পৃথিবী রক্ষা পাইতেছে।

মহাভারতের মতে চন্দ্র সমুদ্রমন্থনকালে উৎপন্ন হইয়া পৃথিবী হইতে দুই লক্ষ যোজন দূরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। যখন নারায়ণ মোহিনীবেশে দেবগণকে সুধা পরিবেশন করেন, তখন দৈবাৎ রাহুদৈত্য দেবসমাজে লুকাইয়া সুধাপান করিতে থাকে।

"সবাকারে ক্রমে সুধা বাঁটিয়া মোহিনী
অবশেষে যত পান করেন আপনি
হেনকালে ডাকিয়া বলিল রবিশশী
হের দেখ রাহুদৈত্য সুধা খাইল আসি
শুনি সুদর্শনে আজ্ঞা দেন নারায়ণ
দুইখান করিয়া কাটিল ততক্ষণ
তথাপি না মরিলেক সুধাপান হেতু
মুখ হৈল রাহু কলেবর হৈল কেতু।"

কাশীদাস

নারায়ণের আজ্ঞায় খণ্ডদেহ হইলেও তাহারা আজিও চন্দ্র ও সূর্য্যের শত্রুতা সাধন করিতেছে।

চন্দ্রের কলঙ্কের কারণ চন্দ্র দেবগুরু বৃহস্পতির স্ত্রীকে হরণ করেন। চন্দ্র একবার অভিমন্যুরূপে পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন। চন্দ্র অত্যন্ত রোহিণীভক্ত ছিলেন। গর্গমুনি চন্দ্রের বাটীতে গিয়া আতিথ্য স্বীকার করেন; চন্দ্র অন্তঃপুর হইতে বাহির হইলেন না। গর্গমুনি শাপ দিলেন তুমি পৃথিবীতে যাও। চন্দ্র পায়ে পড়েন। তখন সদয় হইয়া মুনি বলিলেন যে তোমাকে অধিককাল পৃথিবীতে থাকিতে হইবে না। এই জন্যই অকালে অভিমন্যুবধ। চন্দ্র সৌম্যমূর্ত্তি রজোগুণবিশিষ্ট ছিলেন।

যাহা হউক আমরা এক্ষণে পুরাণ ত্যাগ করিয়া প্রকৃত বিজ্ঞানের কথা লইয়া আলোচনা করি। চন্দ্র পৃথিবীর একমাত্র পারিপার্শ্বিক; ইহা পৃথিবী অপেক্ষা বড় এরূপ গল্পকথা সকল অযৌক্তিক। চন্দ্র অবয়বে পৃথিবীর প্রায় সার্দ্ধ ঊনপঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ। পৃথিবীর ব্যাস ৭৯২৬ মাইল, চন্দ্রের ব্যাস ২১৫৩ মাইল। উভয়ের ঘনফলের যে অনুপাত উভয়ের অবয়বেরও সেই অনুপাত। চন্দ্র দেখিতে একটী ছোট রেকাবের মত কিন্তু চন্দ্রের পরিমাণফল ইউরোপ অপেক্ষা অধিক। ইহা বর্ত্তুলাকার ও পৃথিবী হইতে ২৪০০০০ মাইল দূরে অবস্থিত। চন্দ্র এক বৎসরে পৃথিবীকে প্রায় তের বার প্রদক্ষিণ করে। সুতরাং সম্বৎসরে চান্দ্র মাস সর্ব্বশুদ্ধ তেরটী। চন্দ্র যে সময়ে পৃথিবীকে একবার বেষ্টন করে, ইহার আপন মেরুদণ্ডে একবার ঘুরিতে ঠিক সেই সময় লাগে। যেমন একটা বর্ত্তুলকে সূত্রলগ্ন করিয়া অঙ্গুলির চতুপার্শ্বে ঘুরাইলে সেই বর্ত্তুলের একবারের পর পুনরায় পূর্ব্বস্থানে আসিতে যে

সময় লাগে, বর্ত্তুলের আপন মেরুসীমা ব্যতীত যে কোনদিক,পুনবায় সেইদিকে আসিতে ঠিক সেই সময়কে প্রযোজন করে। তৈলযন্ত্রের বলীবর্দ্দের পূর্ব্বদিকস্থ পার্শ্বের পুনরায় পূর্ব্বদিকস্থ হইতে যে সময় অতিবাহিতহইবে, ঠিক সেই সময়েই বলদ একবার ঘানিগাছকে প্রদক্ষিণ করে। চন্দ্রের একপার্শ্ব সতত আমাদের সম্মুখীন থাকে। চন্দ্রের অপর পৃষ্ঠ কোন কালে কখন আমাদের নেত্রগোচর হইবার নহে। ইহা বলা বাহুল্য যে চন্দ্র পৃথিবীর আকর্ষণ বশতই শূন্যমার্গে ঘুরিতেছে। যেমন অঙ্গুলি কর্ত্তৃক ঘূর্ণ্যমান বর্ত্তুলের এক পৃষ্ঠ নিরন্তর অঙ্গুলির পুরোবর্ত্তী থাকে,অপর পৃষ্ঠ চিরপরাঙ্মুখ থাকে,সেইরূপ চন্দ্রেরও একদিক সর্ব্বদা পৃথিবীর সম্মুখীন থাকে,অপর দিক চিরবিবর্ত্তিত।

আমরা চন্দ্রসম্বন্ধে এতদূর যাহা বলিলাম তাহাতে গণিতনির্ণীত যুক্তি কিছুই দিলাম না। বস্তুতঃ তাহা দিতে গেলে সাধারণের বোধগম্য হওয়া সুকঠিন হইবে। খগোলকের সমস্ত জ্যোতিষ্কের মধ্যে চন্দ্রের গতি যেমন জটিল এমন আর কাহারও নহে। চন্দ্র পৃথিবীর পারিপার্শ্বিক বটে কিন্তু চন্দ্রের কক্ষ পৃথিবীর কক্ষের সহিত সমধরাতলস্থ নহে, সুতরাং পৃথিবীর উষ্ণ কটিবন্ধের অপেক্ষাকৃত স্ফুরিত অংশের দ্বারা যখন চন্দ্র আকৃষ্ট হয় তখন ইহা কিয়ৎপরিমাণে পৃথিবীর নিকটস্থ হয়। চন্দ্রের কক্ষ এ জন্য ঠিক বৃত্তাকৃতি না হইয়া বৃত্তাভাসাকৃতি। তাহাতে আবার চন্দ্রও কিয়ৎপরিমাণে পৃথিবীকে আকর্ষণ করে; তদ্ব্যতীত চন্দ্র যখন যে গ্রহের সমীপস্থ, তখন তাহাকর্ত্তৃক সামান্য পরিমাণে আকর্ষিত হয়। সুতরাং চন্দ্রের বর্ত্ম আরও দুর্নির্ণেয় হইয়াছে। আমরা সূর্য্যগ্রহণের বিষয় বলিবার সময় এ বিষয় বুঝাইতে কিছু চেষ্টা করিব। একটি উদাহরণ দিলে বোধ হয় চন্দ্রের খগোলস্থ গতি কতকটা উপলব্ধ হইতে পারে। তুমি একটি সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যভাগে একটি স্তম্ভোপরি বইস। সেই স্তম্ভের চারিদিকে ৪০০ রসি করিয়া তফাতে ৩৬৫ টী বৃক্ষ বৃত্তাকারে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া ক্রমান্বয়ে সমদূরবর্ত্তীভাবে অবস্থিত আছে। একজন অশ্বারোহী পুরুষ প্রত্যেক বৃক্ষের প্রায় ১ রসি করিয়া তফাতে থাকিয়া ১৪ টী বৃক্ষের বামপার্শ্ব ও ১৪ টী বৃক্ষের দক্ষিণ পার্শ্ব অতিক্রম করিয়া যাইতেছে। এইরূপে সেই অশ্বারোহী পুরুষ ২৬ বার পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া পূর্ব্বস্থানে আসিল। ঐ অশ্বারোহী পুরুষ যে বর্ত্মে চলিল,সৌরজগতে চন্দ্রের বর্ত্মও ঠিক তাহাই। কিন্তু পৃথিবীর লোকেরা চন্দ্রকে ঠিক বৃত্তাকারে পৃথিবীকে বেষ্টন করিতে দেখিবে। মনে কর ঐ ৩৬৫ টী বৃক্ষ আর কিছুই নহে, একটি সচল বৃক্ষের ৩৬৫ দিনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান মাত্র ও একটি বৃক্ষই অশ্বারোহী পুরুষকে টানিয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে লইয়া যাইতেছে। তাহা হইলে বৃক্ষেরা

লোক অশ্বারোহীকে কিরূপ অবস্থায় দেখিবে? তাহারা দেখিবে যে অশ্বারোহী তাহাদিগকে বৎসরে ১৩ বার অর্থাৎ ২৮ দিনে একবার প্রদক্ষিণ করিতেছে। সেইরূপ পৃথিবীর লোকেরা চন্দ্রকে নিত্যই ১৫ অংশ করিয়া পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইতে দেখে। এই জন্য চন্দ্রকে শুক্ল প্রতিপদ হইতে তিথিবৃদ্ধি ক্রমে পনর অংশ করিয়া উপর উপর উদয় হইতে দেখি। এই জন্যই ৪৮ মিনিট করিয়া চন্দ্র দেরি করিয়া উঠেন।

চন্দ্রের নিজের কিরণ নাই। সূর্য্যকিরণেই ইহার দীপ্তি। পূর্ণিমার সময় পৃথিবী, সূর্য্য ও চন্দ্রের মধ্যভাগে পড়ে, এ জন্য চন্দ্রের পৃথিবীসম্মুখীন পৃষ্ঠটা সমস্তই আমরা উজ্জ্বল দেখিতে পাই। ক্রমে চন্দ্র যত আপন পথে অগ্রসর হইতে থাকে, ততই এ পৃষ্ঠের কিয়দংশ করিয়া রবিকরবিরহিত হইতে থাকে। আমরাও চন্দ্রকে ক্ষীণমান দেখি। অমাবস্যার সময় চন্দ্র, পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যভাগে পড়ে, এ জন্য চন্দ্রের অপর পৃষ্ঠে সূর্য্যের সমস্ত কিরণ প'ড আমাদের দিকে কিছুই পড়ে না। এ জন্য তখন আমরা চন্দ্রকে এককালীন দেখিতে পাই না। কোন কোন পূর্ণিমাতে চন্দ্র, পৃথিবী ও সূর্য্য সমসূত্রপাতে অবস্থিত হয় বলিয়া পৃথিবীর করাল ছায়ায় চন্দ্র আবৃত হয়। ইনিই আমাদের রাহু। এই রাহুর গ্রাসে চন্দ্রগ্রহণ হয়। দ্বিতীয়া ও তৃতীয়াতে চন্দ্রকে হাঁসুলির মত দেখায়। সূর্য্যকরদীপ্ত অংশ আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাই, অবশিষ্ট ভাগ আমরা অস্পষ্ট দেখিতে পাই। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, ঐ ঐ দিনে পৃথিবীর অধিকাংশ উদ্দীপ্ত অংশ চন্দ্রের দিকে ফিরান থাকে, পৃথিবী হইতে সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত হইয়া চন্দ্রকে আলোকিত করে। চন্দ্রের অপেক্ষা পৃথিবী দেখিতে ১৩½ গুণে বড়। সুতরাং ইহা বিচিত্র নহে চন্দ্রকিরণে আমরা যেমন আলোকিত হই, পৃথিবীকিরণে চন্দ্র তাহার তের গুণ উদ্ভাসিত হইবে। কোন কোন জ্যোতির্ব্বিদ বলেন, যে দক্ষিণ আমেরিকার নিবিড় অরণ্যানি সময়ে সময়ে চন্দ্রকে হরিদ্বর্ণ করিয়াছে। তথাপি সূর্য্যের নিকট হইতে চন্দ্রের কিরণগ্রহণ সম্বন্ধে এক আপত্তি এই হইতে পারে, যে চন্দ্রে সূর্য্যকিরণের উষ্ণতা কই? উলাষ্টন্ সাহেব পরীক্ষার দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে চন্দ্রকর সূর্য্যকর অপেক্ষা ৮০০০০০ ভাগে হীন। অর্থাৎ ৮০০০০০ পূর্ণচন্দ্র একত্র করিলে সূর্য্যকিরণের সমান উষ্ণতা ও আলোক উপলব্ধি হইতে পারে। সচরাচর মনুষ্যরক্তের যেরূপ উষ্ণতা চন্দ্রকরের উষ্ণতা তাহা অপেক্ষা বাস্তবিক কম। এ জন্য চন্দ্রকে শীতলই বোধ হয়। অনেকে অবগত আছেন, যে সচরাচর জলে কিয়ৎ পরিমাণে তাপাংশ থাকে কিন্তু আমরা তথাপি জলকে কত শীতল বিবেচনা করি!! যদি চন্দ্রকিরণে সূর্য্যকিরণের কিয়দংশ

আছে, তবে চন্দ্রহীন রজনীতে আমরা অধিক শৈত্য অনুভব না করিয়া বরং উষ্ণতা অনুভব করি কেন? তাহার উত্তর এই, যে প্রত্যহই ক্ষিতিতল হইতে বাষ্পরাশি সমুদ্গত হইয়া গগনের অত্যুচ্চ প্রদেশে তরল মেঘমালার সৃষ্টি করে। তাহা এত পাতলা, যে আমাদের নেত্র গোচর হয় না, কিন্তু সেই দিবাকালীন সঞ্চিত মেঘস্তরের অস্তিত্ব আমরা রাত্রে ফলদ্বারা জানিতে পারি। মেঘ কিয়ৎ পরিমাণে অপরিচালক। সূর্য্যাস্তের পর পৃথিবীর সঞ্চিত তাপরাশি অন্তরীক্ষে অপসৃত হইতে চেষ্টা পায়। কিন্তু উপরোক্ত মেঘ সকল প্রতিনিয়তই সেই উত্তাপাগমনের প্রতিবন্ধক হয়। সার জন হার্সেল বলেন, পূর্ণিমার রাত্রে চন্দ্রকিরণে সেই মেঘ সকলের অপনয়ন হয়, কিন্তু অমাবস্যার রাত্রে তাহা হইতে পায় না এ জন্য আমরা পূর্ণিমা অপেক্ষায় অমাবস্যাতে উষ্ণতা অনুভব করি। পূর্ণিমার রাত্রে পৃথিবীত্যক্ত উত্তাপ অবাধে অন্তরীক্ষে প্রসারিত হইয়া পড়ে, আমরা তজ্জন্য শৈত্য অনুভব করি। অমাবস্যার রাত্রে আমরা পৃথিবীর তাপেই তপ্ত থাকি। চন্দ্রের সংস্কৃত নাম শীতরশ্মি, বা হিমাংশু, কিন্তু তাহার কারণ যে চন্দ্রে বরফ মাখান আছে তাহা নহে।

এক্ষণে চন্দ্রকিরণ সম্বন্ধে আর এক আপত্তির নিরাস করিতে আমাদের বাকি আছে। কেহ কেহ বলিতে পারেন, যে চন্দ্রের সর্ব্বগ্রাসের সময় পৃথিবীর সূর্য্যবিরহিত অংশই চন্দ্রের দিকস্থ থাকে, কিন্তু তথাপি সে সময়েও চন্দ্রের স্থানে স্থানে অস্পষ্ট আলোক দৃষ্টি হয় কেন? তাহার কারণ নির্ণয় বিষয়ে জ্যোতির্ব্বিদ্দিগের আজিও মতভেদ আছে। যাঁহারা চন্দ্রে বায়ুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাঁহারা বলেন যে পৃথিবীর পশ্চাদ্দিকস্থ সূর্য্যকিরণ চন্দ্রের সীমাগত বায়ুরাশিতে তির্য্যগ্গতি (refraction) প্রাপ্ত হইয়া অল্পপরিমাণে চন্দ্রপৃষ্ঠকে আলোকিত করে। আবার কেহ কেহ বলেন যে চন্দ্রের ধাতুময় পাহাড় সকলের অনেকগুলি দীপক প্রকৃতিক (phosphorescent) তজ্জন্য সর্ব্বগ্রাস সময়ে পূর্ব্বসঞ্চিত কিরণরাশির এককালে অপনয়ন হয় না। আমরাও গ্রহণের কিছু পর পর্য্যন্তও চন্দ্রকে অপরিস্ফুট দেখি।

সূর্য্যকিরণে আলোক ও উত্তাপ ব্যতীত আরও অনেক গুণ আছে। সূর্য্যকিরণে এমন এক রাসায়নিক ক্ষমতা আছে, যাহা দ্বারা উদ্ভিদগণ তাহাদের পত্রের হরিদ্বর্ণ প্রাপ্ত হয়, ও যাহার সাহায্যে তাহারা আপন কাষ্ঠাংশ প্রস্তুত করে। সূর্য্যের এই ছবিজননী ক্ষমতা থাকাতেই বৈজ্ঞানিকেরা সৌরচিত্রের sun-painting উদ্ভাবন করিয়াছেন। এক্ষণে দেখা যাউক চন্দ্রস্থ ক্ষীণ সূর্য্যকিরণে সে গুণের কিয়দংশ আছে কি না? ইউনাইটেড ষ্টেটের আচার্য্য বস্থ সাহেব চন্দ্রকিরণ দ্বারাও সে কার্য্য সংসাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

চন্দ্র যে সূর্য্যেরই নিকট হইতে কিরণ-রাশি ঋণ করিয়া লইতেছে, তাহার আর এক প্রমাণ চন্দ্রের দ্বিতীয় কলার সূর্য্য-সন্নিহিত সীমাই আমারা সমুজ্জল দেখি। চন্দ্রকে তখন হাঁসুলির মত দেখি,ও সেই হাঁসুলির স্থূলতার অংশ চন্দ্রের পশ্চিমাংশ। যদ্যপি কয়েক ঘণ্টা আমরা দ্বিতীয়া ও তৃতীয়ায় চন্দ্রকে লক্ষ্য করি, তবে আমরা এক বিস্ময়াবহ ব্যাপার দেখিতে পাই। চন্দ্রের উজ্জ্বল অংশ জলস্রোতের ন্যায় সমভাবে না বাড়িয়া একটু অনিয়মে বাড়ে। প্রথমতঃ উজ্জ্বল অংশের পূর্ব্বসীমার দুই একটি অঙ্গুরীয়াকৃতি সমধিক প্রোজ্জ্বল দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়, সেই অঙ্গুরীয়ক গুলির পশ্চিমাংশ বিশিষ্টরূপ উজ্জ্বল হইতে থাকে, অল্প বিলম্বেই অঙ্গুরীয়কটী সম্পূর্ণ হইয়া গেল। মধ্যস্থান গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন রহিয়া গেল। এই গুলি দেখিয়া বোধ হয়, যে চন্দ্রস্থ অঙ্গুরীয়াকৃতি উত্তুঙ্গ গিরিকিরীটের পশ্চিমাংশে প্রথমতঃ সূর্য্যকিরণ পড়ে, তজ্জন্য তাহা প্রথমে নেত্রগোচর হয়। তৎপরে উপত্যকায় সূর্য্যকিরণ আর না পড়িয়া একেবারে পূর্ব্বদিকের শীর্ষকে সুবর্ণ-মণ্ডিত করেন। তজ্জন্যই মধ্যভাগ ধ্বান্তসমাচ্ছন্ন থাকে। কিন্তু যত পূর্ণিমা নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে, সূর্য্য ততই চন্দ্রের পুরোবর্ত্তী হইতে থাকে, সে সময় গিরিকন্দর সকল অপেক্ষাকৃত প্রসন্ন হইয়া উঠে আমরাও কন্দরসমূহকে তত মলিন দেখি না। পূর্ব্বোক্ত ব্যাপারটীর সহিত পৃথিবীর একটি ঘটনার সাদৃশ্য দেখাইলে, বোধ হয় অনেকের বিশেষ উপলব্ধি হইতে পারিবে। প্রাতঃকালে যখন সূর্য্য উঠে, তখন আমরা কোন একটি চকমিলান বাটীর পূর্ব্বদিকের ঘরগুলির ছাদ আলোকিত দেখি, পরে অনতিবিলম্বেই পশ্চিমদিকের ছাদ-গুলি আলোকিত দেখি। মধ্যের উঠান দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত ভালরূপ কৃষ্ণিমাবিহীন দেখিতে পাই না। ঠিক চন্দ্রের গিরিগুহা সকলেও এইরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে, আমরা এই পার্থিব কারাগারে থাকিয়াও পরীক্ষা দ্বারা তাহা বুঝিতে পারিতেছি।

এক্ষণে আমরা দেখিব চন্দ্রহইতে পৃথিবীর কি কি উপকার সাধিত হয়। প্রথমতঃ চন্দ্রের হিমশীতলতা গুণ থাকায় মানবগণ দৈবসিক পরিশ্রমের পর হিমাংশুনিঃসৃতকর সেবন করিয়া কতই বিশ্রামসুখ অনুভব করে। ওষধি সকল চন্দ্র হইতে তাহাদের রোগনাশক গুণ প্রচুর পরিমাণে সঞ্চয় করে। পৃথিবী সমুদ্র ও নদনদীতে যে জোয়ার ভাঁটা হয় তাহা চন্দ্রের আকর্ষণের উপরই অধিক নির্ভর করে। এই জোয়ার ভাটায় মানবজাতির যে কি পর্য্যন্ত উপকার সাধিত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। অর্ণবযান সকলের যাতায়াতের সুবিধা; কৃষক-গণের ক্ষেত্রে জলসেচনের সৌকর্য্য ও বণিকগণের দেশ হইতে দেশান্তর গমনের উপায় জোয়ার ভাঁটার উপর বিস্তর নির্ভর করিতেছে। জ্যোতির্ব্বিদগণ নির্দ্দিষ্ট

করিয়াছেন, যে চন্দ্র ১৭০০০ উজ্জ্বলতম নক্ষত্রের আলোক ধারণ করে। পবিব্রাট-গণ চন্দ্রের সাহায্যে পৃথিবীর দ্রাঘিমা ও অক্ষাংশ সকল নিরূপণ করিয়াছেন। শিশিরবর্ষণকার্য্যে চন্দ্রের বিলক্ষণ উপ-যোগিতা আছে, চন্দ্রের শিশিরপ্রভাবেই ওষধি সকল বলবান্ হয়। এ জন্য চন্দ্রের একটি সংস্কৃত নাম ওষধীশ। এরূপ প্রবাদ আছে যে সমকটিবন্ধের লোকেরা চন্দ্র হইতে আর এক উপ-কার সাধিত করিয়া লয়। কিন্তু এ কথা কতদূর সত্য, তাহা বলা যায় না। তাহাদের শস্য কাটিবার যে সময় সেই সময়ে চন্দ্র তিন চারিদিন প্রায় একই সময়ে উদিত হয়। সচরাচর এক তিথি হইতে পর তিথিতে চন্দ্র ৪৮ মিনিট পশ্চাতে উদিত হইয়া থাকে। কিন্তু সেই কয়দিন চন্দ্র ১৫ মিনিট করিয়া পরে উদিত হয়। চন্দ্রের বর্ত্ম পৃথিবীর বর্ত্মের সহিত এক ধরাতলস্থ নহে, উভয় ধরাতলের অবচ্ছেদক বিন্দুর নিকটে যখন চন্দ্র থাকে, তখন চন্দ্রকে কিছু শীঘ্র শীঘ্র উঠিতে দেখি। এই ঘটনাটীর সময় যে পূর্ণিমা হয়, তাহাতে চন্দ্রকে দুই তিন দিবস প্রায় ১৫ মিনিট অন্তর করিয়া উঠিতে দেখা যায়। প্রতি বৎসর ২২ এ সেপ্টেম্বরের কাছাকাছি এই ঘটনা ঘটে। ঐ সময় ঘনঘন পূর্ণিমার আলোক পাইয়া কৃষকেরা দিবারাত্রি পরিশ্রম ক-রিয়া শস্য কাটিয়া লয়। এই জন্য তথায় তৎসাময়িক চন্দ্রকে "হারভেষ্ট" মুন বা ফসলের চন্দ্র কহে। এই হারভেষ্ট মুনের পরেই ঐ সকল দেশে ঝড় বৃষ্টির আশঙ্কা থাকে।

এ সকল ব্যতীত চন্দ্র মনুষ্যের মনো-রাজ্যে কেমন আধিপত্য করিতেছে। কবিরা চন্দ্র হইতে কত কল্পনার সৃষ্টি করিতেছেন। প্রণয়িগণ চন্দ্রকিরণকে কিপর্য্যন্ত না প্রিয় সামগ্রী মনে করেন। ফলতঃ যদি প্রচণ্ড সূর্য্যসনাথ দিবামানের পর এককালে ঘোর তিমিরাবগুণ্ঠিতা যামিনীর তমোমধ্যে আমাদিগকে কাল যাপন করিতে হইত, যদি ক্লেশসমূহ-ক্লিষ্ট সংসারপীড়ায় পীড়িত হইয়া আমরা চান্দ্রমসী রজনীতে বন্ধুবান্ধবের সহিত প্রাঙ্গণে, উপবনে, বা প্রান্তরে বিশ্রম্ভা-লাপে কিয়ৎকাল অতিপাত করিতে না পারিতাম, তাহা হইলে এই রোগ শোক জরাসঙ্কুল পৃথিবী বাস আমাদের দ্বিগুণ-তর যন্ত্রণার নিদানীভূত হইত সন্দেহ নাই। চন্দ্র কবিদিগের নিকট নিশানাথ, কুমুদিনীবল্লভ, প্রভৃতি সমাদরসূচক নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এই অশেষগুণাকর নিশাকর নিজে কি বস্তু তাহা জানিতে কাহার কৌতূহল-শিখা উদ্দীপ্ত না হয়? কিন্তু জানিবার যো নাই। অনেক কাল হইতে অনেক পণ্ডিত বিবিধপ্রকার অনুমান করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু অদ্যাপি একটীর প্রমাণ হয় নাই; যাহা হউক চন্দ্র যে মৃত্তি-কাদি পার্থিব পদার্থঘটিত একটি প্রকাণ্ড জড়পিণ্ড তাহাতে সন্দেহের বিশেষ কারণ

বিদ্যমান নাই। চন্দ্রে জীবলোক আছে কি না, এই প্রশ্ন বহুকাল অবধি শুনিতেছি। কিন্তু জীবলোক থাকা আশ্চর্য্য নহে। যখন অগ্নিমধ্যে কীট বাস করে তখন বিশ্বনিয়ন্তা চন্দ্রে জীবস্থাপন করিবেন বিচিত্র কি? বরং এই প্রকার প্রশ্ন অনেকটা বিবেচনাসঙ্গত। পৃথিবীতে যে সকল প্রাকৃতিক অবস্থার অধীন হইয়া জীবগণ প্রাণধারণ করে চন্দ্রে সেই সকল প্রাকৃতিক ব্যাপার আছে কি না ও তদুপযোগী জীবসকল তথায় আছে কি না? ১৮৫৬ শালে লিখিত God's glory in heavens নামক পুস্তকে আমি যাহা পড়িয়াছিলাম তাহা অতি মনোহর; কিন্তু তাহা প্রকৃত উত্তর কি না সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ। যাহা হউক তাহার স্থূল মর্ম্ম ও সেই মর্ম্ম হইতে যেরূপ কল্পনা জন্মিতে পারে নিম্নে সন্নিবেশিত হইল। চন্দ্রের যে পৃষ্ঠ আমাদের দর্শনাধীন, তাহা উত্তুঙ্গ গিরিপ্রদেশ ও উপত্যকায় পরিপূর্ণ, তথায় বায়ুও নাই প্রাণীও নাই। যদি বায়ু থাকিত তাহা হইলে সবুজ দেখাইত, অথবা বায়ুর কোন কার্য্য লক্ষিত হইত। কিন্তু তাহা হয় না। কিন্তু চন্দ্রের অপর পৃষ্ঠে যে বিপুল বায়ুরাশি বহমান আছে, ও জীবগণ তাহাতে পরমসুখে কালাতিপাত করিতেছে, বিজ্ঞান তাহাতে কোন সন্দেহ করিতে পারে না। যদি একটা বর্ত্তুলের চতুর্দ্দিকে আলগা আলগা করিয়া তুলা জড়াইয়া বার্ত্তুলটাকে সূত্রলগ্ন করিয়া অঙ্গুলির চতুর্দ্দিকে ঘুরান যায়, তবে ঐ তুলাগুলি, অঙ্গুলির সম্মুখভাগ পরিত্যাগ করিয়া বর্ত্তুলের অপরপার্শ্ব আশ্রয় করিবে। ঠিক চন্দ্রে তাহাই ঘটিয়াছে। চন্দ্রের বিশ্লিষ্ট পারমাণব অংশ সকল অপর পৃষ্ঠে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। পৃথিবীর প্রত্যহই আবর্ত্তন ঘটে এ জন্য পৃথিবীর চতুষ্পার্শ্বই বায়ুরাশির দ্বারা পরিবেষ্টিত। কিন্তু চন্দ্রের একপার্শ্ব মাত্র বায়ুসমাচ্ছন্ন। চন্দ্রের অপর পৃষ্ঠে যখন বায়ু ও বৃহৎ বৃহৎ সমুদ্রাদি আছে, তখন তথায় যে আমাদের ন্যায় জীবগণ স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতেছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। চন্দ্রের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অবশ্য পৃথিবীর আপেক্ষিক গুরুত্বের বর্গমূলের সহিত সামানুপাতিক হইবে। অতএব তথায় মনুষ্য বপু এখানকার অপেক্ষা ৭ অংশে লঘু, সুতরাং তথাকার লোক অত্যন্ত দীর্ঘাকার না হইলে মনুষ্যের ন্যায় শক্তিতে ভূমিতে বিচরণ করিতে পারে না। এ জন্য বোধ হয়, সেখানকার লোক অত্যন্ত দীর্ঘাকারই বা।

চন্দ্রে চতুর্দ্দশ দিবসব্যাপী দিবামান এবং চতুর্দ্দশ দিবসব্যাপী রাত্রিমান। চন্দ্রে ঋতুবিপর্য্যয় নাই। প্রত্যেক দিনই গ্রীষ্মকাল। প্রত্যেক রাত্রিই শীতকাল। এমন হইতে পারে যে, চন্দ্রের অধিবাসীরা বিলক্ষণ কৃষক, জোয়ার ভাঁটা চন্দ্রের নদীতে নিত্য সমভাবে হইয়া থাকে। সরোবর হ্রদাদির সুগন্ধ জলকুসুম সকল প্রস্ফুটিত থাকে ও লোকেরা

নৌকাযানে সেই সকল পুষ্পের আঘ্রাণ লইতে লইতে বায়ুসেবন করে। পদ্ম প্রচুররূপে ফুটিয়া থাকে।

লাইব্রেশন বশতঃ চন্দ্রের অপর পৃষ্ঠের সীমাস্থ কিয়দংশ আমরা দেখিতে পাই, অবশ্য তথাকার অধিবাসীরা আমাদিগকেও দেখিতে পায়। যে স্থানে চান্দ্র বায়ু অত্যন্ত কম এজন্য তথায় লোক সমাগম নাই,তবে উৎসাহশীল পরিব্রাট্‌গণ কখন কখন আমাদের পৃথিবী দেখিতে আইসে। তাহারা পৃথিবীকে কি বিশালই দেখে!। আমরা চন্দ্রকে যেরূপ দেখি, চন্দ্রনিবাসী পৃথিবীকে তাহার ১৫ গুণ বৃহৎ দেখে। তাহারা পৃথিবীকে একটী সবুজ মণ্ডলাকার প্রায় দেখে। বার্ষিক বায়ুরাশির গতি তাহারা বোধ হয় কিছু কিছু দেখিতে পায় ও উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ সকলও কখন কখন দেখা যায়।

চন্দ্রের প্রকাণ্ড দবামান অতীত হইলে সুদীর্ঘ রজনী আইসে। সে সময়ে ঘোর অন্ধকার ও দারুণ শীত। চন্দ্রের চন্দ্র নাই যে জোৎস্না দেয়, কখন কখন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ও সূর্য্যাস্তের পর শুক্র তাঁহার ক্ষীণ আলোক বিতরণ করেন। অহো চন্দ্র! তুমি যখন নিজে নিশায় নিমগ্ন থাক, জানিতে পার না তোমার অপর পৃষ্ঠ ; আমাদিগকে স্বীয় করনিকর বিতরণ পূর্ব্বক উল্লাসিত করিতেছে ও শিশিরসিক্ত দৃশ্যাবলীতে কতই সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিতেছে ও কত কত চৌর অভিসারীগণের পথদর্শক হইতেছে!

চন্দ্রলোকের অধিবাসীরা যখন পৃথিবীবাসীদিগের ন্যায় জড়পদার্থের উপর আপন আপন জীবন নির্ভর করিয়া রহিয়াছে তখন তাহারা যে মরণ ধর্ম্মশীল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তথায়ও রোগ শোক জরা আছে, সুতরাং ধর্ম্ম আলোচনাও আছে, দ্বেষ আছে, প্রীতি আছে, সমাজ আছে, কুশল আছে, রণ আছে। হয় ত আমরা যেমন নানা প্রকার মত প্রচার করিয়া পুস্তকাদি লিখি চন্দ্রেও তদ্রূপ লেখক আছে, বিতণ্ডা আছে, হর্ষ আছে, আশা আছে, ভয় আছে। বিশ্বপতি, তোমার কাণ্ড অদ্ভুত।

কিন্তু চন্দ্রসম্বন্ধে আমাদের এ সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়; যখন আমরা মেন সাহেবের লিখিত গ্রন্থ পড়ি। তিনি বলেন চান্দ্র যদিও বায়ু থাকে তাহা এত তরল যে তাহা অপেক্ষা আমাদের বায়ু ২০০০ গুণে গাঢ়। যাহা হউক চন্দ্রে যে যৎকিঞ্চিৎ বায়ু আছে তাহার দুইটি প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে।

১ম। তারাগ্রহণ, যখন একটী তারা চন্দ্রের আড়ালে পড়ে; তখন তারার প্রথম প্রবেশ হইতে বহির্গমন পর্য্যন্ত যতটা সময় জ্যোতিষিক গণনাতে লাগিবার কথা, বস্তুতঃ তাহা লাগে না। তারাটি শীঘ্রই বাহির হইতে দেখা যায়। ইহার কারণ আর কিছুই হইতে পারে না; তারাটী চন্দ্রের অন্তরালে প্রবেশ করিলেও চন্দ্রের পার্শ্বস্থ কোন সূক্ষ্ম বায়বীয়

পদার্থসংঘটিত রশ্মির বক্রীভবন (refraction) বশতঃ কিয়ৎক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। এবং ঠিক ঐ কারণে বাহির হইবার কিয়ৎক্ষণ আগে আমরা দেখিতে পাই। উক্ত সূক্ষ্ম পদার্থ বায়ুরাশি ভিন্ন সম্ভবে না। বক্রীভবন কাহাকে বলে তাহা বিবেচনা করা উচিত, যদি একটি প্রদীপের কয়েক হাত অন্তরে একটী পুরু কাচ ধরা যায় ও সেই কাচ হইতে কয়েক হাত অন্তরে বসিয়া কাচের মধ্য দিয়া উক্ত প্রদীপকে দেখা যায় তবে দর্শকের চক্ষুঃপথে প্রদীপের যে অবস্থান হইবে, প্রদীপের প্রকৃত অবস্থান তাহা নহে তাহার কিছু নিম্নে। কাচের যে গুণ বশতঃ প্রদীপের রশ্মিকে কিছু উচ্চ করিল তাহাকে বক্রীভবনকারিত্ব বা refracting power কহিয়া থাকে। বায়ু জল প্রভৃতি স্বচ্ছ ও লঘু পদার্থে উক্ত ক্ষমতা আছে। বায়ুর এই গুণ থাকা প্রযুক্ত কোন এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে আমরা তৎসাময়িক সূর্য্যের প্রকৃত অবস্থান হইতে তাহাকে কিছু উচ্চে দেখি।

২য়। গোধূলি (Twilight) শুক্ল দ্বিতীয়া বা তৃতীয়ার চন্দ্রের অধিকাংশ ব্যাপার উজ্জ্বল হয়। সূর্য্যের কিরণ যত দূর পড়া সম্ভব তাহার অধিক দূর পর্য্যন্ত উক্ত তিথিতে চন্দ্রের পরিধিকে আলোকিত দেখায়। ইহার প্রকৃত কারণ কি? যেমন সূর্য্যাস্তের পরও অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত রশ্মির বক্রীভবন বশতঃ আমাদের বায়ুরাশি প্রভাবিশিষ্ট থাকে সেইরূপ বোধ হয় চন্দ্রেরও ঘটে। চন্দ্রের বায়ু সূর্য্যের খানিকটা রশ্মি হরণ করিয়া পার্শ্বে লইয়া যায়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে চন্দ্রে প্রত্যেক দিবাই এক একটি গ্রীষ্মকাল প্রত্যেক নিশাই শীতকাল, কিন্তু সময় বিশেষে চন্দ্রে দৈবসিক উত্তাপের তারতম্য হইয়া থাকে। চন্দ্র পৃথিবীর অনিয়মিক আকর্ষণ বশতঃ কখন কখন সূর্য্যের সমীপস্থ কখন কখন দূরস্থ হয়। ইহার প্রমাণ করিতে গেলে সূর্য্যগ্রহণ সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক হয়। যখন চন্দ্র, পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যস্থলে পড়ে তখন যদি পৃথিবীর কোন প্রদেশের সহিত চন্দ্র ও সূর্য্য ঠিক সমসূত্রপাতে অবস্থিত হয় তখন সেই প্রদেশে সূর্য্যগ্রহণ হয়, যদি চন্দ্র ঠিক সূর্য্যের মধ্যভাগে পড়ে তখন হয় সর্ব্বগ্রাস নয় মধ্যগ্রাস হয়। চন্দ্র সূর্য্যের সমীপস্থ ও পৃথিবী হইতে দূরস্থ হইলে চন্দ্রের অবয়ব অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র দেখাইবে সুতরাং সে সময় সূর্য্যের মধ্যগ্রাস হইবে ও চন্দ্র পৃথিবীর সমীপস্থ হইলে চন্দ্রকে বড় দেখাইবে সুতরাং সে সময় সূর্য্যের সর্ব্বগ্রাস হইবে। এইরূপ সূর্য্যের মধ্যগ্রাস ও সর্ব্বগ্রাস হওয়াতেই প্রমাণ হইতেছে যে চন্দ্র কখন কখন সূর্য্যের নিকটস্থ ও কখন সূর্য্যের দূরস্থ হয়। অতএব চন্দ্রের দিবামানের উত্তাপের তারতম্য হইয়া থাকে।

এক্ষণে চন্দ্রে উঠিতে গেলে কি উপায় করা আবশ্যক ভাবা যাউক। প্রত্যহ

৩০ মাইল করিয়া উঠিলে ২৪ বৎসরে চন্দ্রে পৌঁছান যায়। যদি কেহ ২৪ বৎসর বয়সে চন্দ্রে উঠিতে প্রস্তুত হয় তবে ৭২ বৎসর বয়সের সময় চন্দ্রের বৃত্তান্ত পৃথিবীতে জানাইতে পারিবে। ইথরের অপেক্ষা হালকা কোন পদার্থের ব্যোমযান করিয়া প্রতি সেকেণ্ডে দুই ফিট চলে এমন বেগ তাহাতে নিয়োজিত করিতে পারিলে কর্ম্মসমাধা হইতে পারিবে।

বিবেক ও নৈরাশ।

বিবেক।

যদিই বাসিল ভাল, যাতনা কি যাবে তায়
মিটিবে কি আশা?
শুনি জলধর ধ্বনি শৃঙ্খলিত চাতকের
মিটে কি পিপাসা?
কুল পিঞ্জরের পাখী পিঞ্জরে রহিবে সদা
তুমি রবে কোথা?
দীর্ঘশ্বাস হা হুতাশ পশিবে না কানে তার
তবে কেন বৃথা?
সুধু ভালবাসা নিয়ে কোন প্রেমিকের চিত
যুড়ায়েছে কবে?
আশার জলধি হৃদে বাসনায় আকুলিত
কিসে স্থির রবে!
আঁখির মিলনে যদি মিটিত মনের সাধ
তবে শৈবলিনী
কেন ত্যজি কুলমান অভাগা প্রতাপ তরে
হবে কলঙ্কিনী।
এ যে পাপের ধরণী পুরুষ কলঙ্কী হেথা
মত্ত বাসনায়।
হেথা—আঁখির মিলনে বাসনা জাগিয়া উঠে
তীব্র পিপাসায়
লুকায়ে বাসিলে ভাল প্রেমিক হৃদয় কাঁপে
কলঙ্কের ডরে!
আদরে চুমিলে মুখ কলঙ্ক লাগিয়া থাকে
নারীর অধরে।
গোপনে ছুঁইলে তনু রমণী শুকায়ে যায়
পাপের তরাশে,
প্রণয়ে গরল উঠে কণ্টকি লতায় হেথা
কমল বিকাশে।
অমূল্য মাণিক হেথা শোভে ভুজঙ্গের শিরে
রতন সাগরে
প্রণয়ি মনের মত দুর্লভ্য পিঞ্জরে বাঁধা
কে লভে তাহারে।
তবে—
ভাঙ্গা বুক যোড়া দিয়ে মুছি নয়নের জল
প্রবেশ সংসার
যাতনা পড়িবে ঢাকা সমর তরঙ্গে মাতি
ত্যজ আশা তার।

নৈরাশ।

হায় রে জীবনে তবে কি ফল লভিনু যদি
গেল এ প্রণয়

সংসারতরঙ্গে মাতি লভি ধন মান যশ
যুড়াবে হৃদয় ?
কি কায রোগীর তরে ঔষধ সেবন করি
যদি থাকে ধন
হীরক কাঞ্চন মতি সেবনে যদি রে ব্যাধি
হয় উপশম
পীড়িত মানীর কাণে কহিলে সম্মান তার
নিরোগী কি হয় ?
কহিলে যশের গান ব্যাথিত যশস্বিকাণে
ব্যাধি কভু ক্ষয় ?
যশের দুন্দুভি নাদে রত্নের উজ্জ্বল বর্ণে
হতাশের মন
শমিত হইত যদি যাতনা হইত দূর
তবে কি এমন।
তবে কি এণ্টনি কহে হোক্ রোম নিমগন
বারিধির তলে
কেনরে বিহঙ্গ তবে সোনার পিঞ্জরে বাঁধা
ভাসে আঁখি জলে!
অভাগি এলিজেবেথ কেন লিস্টার তরে
হইল পাগল!
আয়েষা নবাবপুত্রী জগৎ। বলিতে কেন
নেত্রে ঝরে জল!
যদিই বাসিল ভাল তবেই ঘুচিল দুঃখ
মিটিল পিপাসা।
ধন-মান-যশ-সুখ বিশ্ব ভূমণ্ডল খানি
তার ভালবাসা।
আঁখির মিলনে যদি না মিটে মনের সাধ
ছুটিব কাননে
হিমাদ্রি গহ্বরে পশি পাষাণ চাপিয়া বুকে
হেরিব স্বপনে।

দ্বীপ দ্বীপান্তরে রহি করিব তাহার ধ্যান
মুদ্রিত নয়নে
কালসিন্ধু নীরে প্রাণ সলিল বুদ্‌বুদ্ মত
মিশে যত দিনে।
সঁপিয়া পরাণ পরে কাঁদিতে প্রণয়ে তার
কত সুখোদয়
বণিকের পণ্যশালা এ ভব সংসারে বুঝে
কয়টি হৃদয়!
ক্ষতি লাভ গণনায় যথায় বিব্রত নর
স্বার্থে আপনার
প্রেমিকের মহাব্রতে সে নহে দীক্ষিত কভু
ক্ষুদ্র আশা তার
উৎসর্গ ইথে সুখ আত্মপ্রাণ বলিদান
অশ্রুর চন্দন
ভাবনা কুসুম ঢালি সন্ধি পূজা চিরকাল
অনিদ্র যাপন।

বিবেক ;

বুঝ না আপন মন হায় রে প্রেমিক জনা
প্রণয়ে পাগল
এ যে মাটির ধরণী সকলি কঠিন হেথা
যাতনা শৃঙ্খল!
সবারি চরণে বাঁধা কি বণিক কি প্রেমিক
কে সুখী সংসারে
এক আশা না ফুরাতে পুন আশা জাগে হৃদে
কে তারে নিবারে!
পাষাণ চাপিয়া বুকে দ্বীপ দ্বীপান্তরে রহি
লভিবে কি সুখ
নয়নের জল তব ফুরাবে না ইহকালে
স্মরিলে সে মুখ!
হৃদয় পুড়িয়া যাবে বুক চিরে রাখ যদি
তাহার বদন

নয়ন ঝলসি যাবে অতৃপ্ত নয়নে তায়
কর দরশন
হৃদয়ে রাখিলে তায় পাপের পরশে প্রাণ
হইবে চঞ্চল
অভাগা শিবের মত সমুদ্র মন্থন করি
পিবে হলাহল
তবু এ আশার নেশা কেন নাহি ত্যজে হায়
প্রেমিকের মন
না বুঝে আপন মন কাঁদে-পর পর-করি
যাবৎ জীবন
নয়নের জলে কভু নিবে কি প্রাণের জ্বালা
ওরে ভ্রান্ত মন
ও যে প্রেমিকের সাধ ও সাধ কি মিটে কভু
না হলে মিলন
ভাঙ্গিলে আশার বৃন্ত কাঁদিয়া আকুল হও
তুমি রে সংসারে
কত বৃন্ত ভেঙ্গে যাবে কত তরু উৎপাটিবে
নিরাশার ঝড়ে
মুখে বল কেঁদে সুখী পরাণে কি আছে তোর
দেখেছ কখন
কালের ভীষণ মূর্তি ব্যাদান করিয়া মুখ
আছে সর্ব্বক্ষণ
বেঁচে আছ-মনে বাঁধা এখনো সে আছে তোর
ফুরালে জীবন—
ছিঁড়িবে সাধের গ্রন্থি অতৃপ্ত জীবনে হায়
মুদিবে নয়ন।

নৈরাশ।

এস তবে এই বেলা রমণীরে দুজনায়
যাই সিন্ধুতীরে
হায় ধরাধরি করি হৃদয়ে হৃদয় চাপি
পশি তার নীরে
পুরুষ কঠিন প্রাণ সকলি সহিতে পারি
রমণি তোমার—
নবীন বল্লরী প্রাণ উত্তাপে শুকায়ে যাবে
পীযূষ তাহার
সংসারের কোলাহল বিষম বাজিবে কাণে
নারিবে সহিতে
নির্ম্মল সিন্ধুর জল ডাকিছে তরঙ্গ তুলি
আইস ত্বরিতে
মাটীর ধরণি যদি সকলি কঠিন হেথা
কি কায এখানে
জীবন যাইলে যদি ছিঁড়িবে সাধের গ্রন্থি
অতৃপ্ত নয়নে
এস তবে সিন্ধুনীরে আলিঙ্গিয়া পরস্পরে
হই নিমগন
ভবিষ্যৎ অন্ধকার কে জানে কি ক্রিয়া তার
পলাই এখন।

বঙ্গোন্নয়ন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দ্বীপবাসের ফলাফল।

বঙ্গদেশ দ্বীপ নহে। আমাদের প্রাচীন পণ্ডিতগণ দ্বীপের যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সে লক্ষণানুসারে, চব্বিশ পরগণা, নদিয়া, যশোহর, বাকরগঞ্জ, ফরিদপুর এবং মুর্সিদাবাদের পূর্ব্বাংশ এই সমস্ত লইয়া বঙ্গে একটী দ্বীপ আছে বলা যায়। ঐ দ্বীপ গাঙ্গেয় দ্বীপ বলিয়া বর্ণিত হইতে পারে। কিন্তু এ স্থলে যে দ্বীপের কথা হইতেছে, তাহা নদীজ দ্বীপ নহে সিন্ধুবেষ্টিত দ্বীপ। নদী একটি বৃহৎ পরিখার স্বরূপ, অনেক সময়ে শত্রুসৈন্যের গতির প্রতিরোধ করে। মহারাষ্ট্রীয়েরা রাঢ়দেশ ছারখার করিয়াছিলেন; কিন্তু গঙ্গার পূর্ব্বপারে তেমন অত্যাচার করিতে পারেন নাই। গঙ্গা পরিখাস্বরূপে পূর্ব্বাঞ্চল রক্ষা করিয়াছিলেন। এ জন্যই মহারাজা তিলকচাঁদ বর্দ্ধমান ত্যাগ করিয়া ভাগীরথীর পূর্ব্বপারে শ্যামনগরে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তথায় অবস্থিতি করিতেন।

নদীর যেমন প্রতিরোধিকা শক্তি আছে, সমুদ্রের সেরূপ শক্তি অনেক গুণে অধিক। পুরাণে কথিত আছে যে সেতু বন্ধ না করিয়া রামচন্দ্র লঙ্কাজয় করিতে পারেন নাই কিন্তু ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে যাহাদের রণতরি আছে তাহাদের পক্ষে সমুদ্রপথ অতি সুগম পথ।

আমাদের রাজপুরুষগণ দ্বীপবাসের অনেক শুভফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইতিহাসবেত্তা আলিসন বলেন যে ইংরেজ ও স্কচ জাতিদের উন্নতির প্রধান কারণ তাহাদের স্বভাবের তেজস্বিতা ও অধ্যবসায়, দ্বিতীয় কারণ দ্বীপে বাস। (১)

বাণিজ্যই ইংলণ্ডের লক্ষ্মী। ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ড সমুদ্রবেষ্টিত বলিয়াই ইংরেজ জাতির বাণিজ্যের এরূপ প্রাধান্য। জর্ম্মণ জাতি বিদ্যা ও শস্ত্রবলে ইংরেজদের অপেক্ষা বলীয়ান্, অধ্যবসায়ে ও বুদ্ধিবলে এবং বাণিজ্যস্পৃহায় তাহাদের সমান; অথচ বণিক্‌বৃত্তিতে তাহাদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট। ইহার প্রধান কারণ এই যে সমুদ্রতীরে জর্ম্মনির উপকূল অত্যল্প। ইংলণ্ডে মৃদঙ্গার ও লৌহ

---

(১) The second great circumstance which has contributed to the steady progress and present greatness of the British Empire is the insular situation of Great Britain and its position in the European seas.—Alison's Europe, Chap. IX. Para : 15.

প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়; ইহা ইংলণ্ডের শিল্পনৈপুণ্য ও বাণিজ্যবিস্তারের এক প্রধান কারণ বটে। কিন্তু বিস্তৃত উপকূল না থাকিলে বাণিজ্যে এতাধিক শ্রীবৃদ্ধি হইত না।

ইংরেজরা দ্বীপবাসী বলিয়াই রাজার স্বেচ্ছাচার দমন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বিজাতীয় শত্রুভয় না থাকায় নির্দ্দিষ্ট বেতনভোগী সেনা রাখিতে হয় নাই। ইউরোপের অন্যান্য দেশ রক্ষার জন্য নিয়ত বেতনভোগী সেনা রাখিতে হইত এবং তত্তদ্দেশের রাজগণ সেনার বলে স্বেচ্ছাচারী হইয়াছিলেন। ইংলণ্ডের সৌভাগ্যে তাহা ঘটে নাই। ২)

সমুদ্রে মৎস্য ধরা সহস্র সহস্র ইংরেজ ধীবরের উপজীবিকা। অভ্যাস বশতঃ ইহারা অতি নিপুণ নাবিক, এবং সামান্য শিক্ষা পাইলে রণতরির অত্যুৎকৃষ্ট সৈনিক হয়।(৩)

রাজ্ঞী এলিজাবেথের রাজ্যকালে যখন স্পেনরাজ ফিলিপ ইংলণ্ডের প্রতিকূলে যুদ্ধযাত্রা করেন, তখন সাগর ও পবন উভয়েই ইংলণ্ডের সহায় ছিলেন। তৃতীয় জর্জের রাজ্যকালে, সমুদ্রই ইংলণ্ডের প্রধান সহায় ছিলেন। যোধকেশরী নাপোলিয়ন প্রকাশ করিয়াছিলেন, "যদি দুই ঘণ্টা কাল চানেল্ [ইংলণ্ডের পরিখারূপ উপসাগর] অধিকার করিতে পারি, তাহা হইলে ইংলণ্ডের শেষ দশা উপস্থিত হইবে।" (৪)

যদি তিনি কোন প্রকারে সেনা পার করিয়া ইংলণ্ডের উপকূলে অবতীর্ণ হ-

(২) যাহারা ইংলণ্ডের ইতিহাস বিশেষ মনোযোগ করিয়া পড়েন নাই তাঁহাদিগকে এ বিষয় সংক্ষেপে বুঝাইয়া দেওয়া কঠিন। মেকলে লিখিয়াছেন "This singular felicity [exemption from despotism established by a standing army] she owed chiefly to her insular situation. Before the end of the fifteenth century, great military establishments were indispensablo to the dignity and even to the safety of the French and Castilian monarchies. If either of those powers had disarmed, it would have been compelled to submit to the dictation of the other. But England protected by the sea against invasion and rarely engaged in warlike operations on the Continent, was not, as yet, under the necessity of employing regular troops—Macaulay's England Chap. I.

(৩) Around the stormy and inhospitable Hebrides, and in the dark and dangerous seas that flow round the Orkeney Islands, thirty five thousand hardy seamen are engaged in fisheries which now cause to flow into the British empire that stream of wealth which the republic of Holland so long drew from the deep sea-fishery in the North seas. The tempestuous German ocean and the iron-bound east coast of England which render a voyage from London to Edinburgh more perilous to the inexperienced navigator than one to the East Indies have conspired to produce that incomparable race of seamen—in every age the nursury of the British navy—who carry on the vast coasting trade.—Alison's Europe Chap. IX, para 16.

(৪) Napoleon W. Decres, August. 9, 1805.

ইতে পারিতেন, তাহা হইলে ইংলণ্ড অপদস্থ হইতেন সন্দেহ নাই। যে শূর পুরুষের ভয়ে ইউরোপ কম্পিত হইত, যিনি জেতৃবেশে ভিএনা,বর্লীন ও মস্কোভায় প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহার পক্ষে যে লণ্ডন জয় বড় দুরূহ ব্যাপার এ কথা নিতান্ত স্বদেশপক্ষপাতী ইংরেজও বলিতে সক্ষম নহেন।

১২৮৩ সনের কার্ত্তিক মাসে দক্ষিণ সাহাবাজপুর দ্বীপে যে মহা প্রলয় হইয়াছে তাহার কথা স্মরণ করিয়া বাঙ্গালিরা দ্বীপবাসের যে কিছু শুভ ফল আছে, এ কথা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন. কিন্তু এই প্রস্তাবে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহার পর্য্যালোচনা করিলে তাঁহাদের দ্বিধা থাকিবে না। অন্ততঃ ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে ঐ অঞ্চলের নাবিকেরা বাঙ্গালার প্রধান নাবিক, এবং তথাকার প্রজারা যেমন তেজস্বী, তেমন তেজস্বী প্রজা বাঙ্গালার আর কোথাও নাই।

ক্রমশঃ।

তা, প্র, চ,।

পদোন্নতির পন্থা।

(অসন্তোষ, অতৃপ্তি উন্নতির মূলভিত্তি।)

পদোন্নতির পন্থা সম্বন্ধে নানা মতভেদ দেখা যায়। সরলচিত্ত ব্যক্তিরা বিবেচনা করেন যে, বিদ্যা থাকিলে পদোন্নতি হয়, তাঁহারা বিদ্যাহীনের যদি কখন পদোন্নতি দেখেন, অদৃষ্টের গুণানুবাদ করিয়া আপনাদের ভ্রান্তি পুষ্টি করেন। বালকের মধ্যে "কল" শব্দ যেমন সর্ব্বব্যাপক, প্রয়োগমাত্রেই হেতু বোধ হইয়া যায়, আমাদের বয়োধিকের মধ্যে অদৃষ্ট শব্দ সেইরূপ। ইহা কলে হইয়াছে, উহা কলে হয় বলিলে বালকেরা মনে করে বুঝিয়াছি, অদৃষ্টে হইয়াছে বা হইতেছে বলিলে বয়োধিকেরা মনে করেন বুঝিয়াছি। মাথামুণ্ড কি বুঝিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন।

বিদ্যাহীনের পদোন্নতি, কিম্বা অসার ব্যক্তির পদোন্নতি অথবা দুশ্চরিত্রের পদোন্নতি সর্ব্বদাই দেখা যায়। এ দেশের ত কথাই নাই, বিদেশী কর্ত্তৃক উপযুক্ত পাত্র নির্ব্বাচিত হইতে গেলে, ভুল সহজেই সম্ভব। কিন্তু স্বদেশে ইংরেজেরা এরূপ ভুল সর্ব্বদাই ভুলিয়া থাকেন। কেবল ইংলণ্ড বলিয়া নহে, সকল রাজ্যে সকল সময়েই এই ভুল হইয়া থাকে। হয় ত শতশত উপযুক্ত পাত্র উপস্থিত থাকিতে অতি অনুপযুক্ত ব্যক্তি কোন বিশেষ পদে মনোনীত হয়। তাহার অতি গূঢ় কারণ আছে। তাহা অনুসন্ধান করিবার পূর্ব্বে এইস্থলে একখানি পত্রের কতকাংশ উদ্ধৃত ক-

বিতে ইচ্ছা হইল। পত্রখানি বিদ্বেষ ভাবে পরিপূর্ণ, সেই জন্য কিঞ্চিৎ রহস্যের প্রাধান্য আছে, কিন্তু তাহা থাকিলেও প্রকৃত কথার বড় ক্ষতি হয় নাই ঃ—

"যাঁহাদের বিশেষ পদোন্নতি হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে দুই একটির পরিচয় দিলে বোধ হয় সুচতুর চাকরেরা বুঝিতে পারিবেন। বহুকাল পূর্ব্বে অঙ্গদেব নামে একজন রাজকর্ম্মচারী গঙ্গাপ্রহরী পদে নিযুক্ত ছিলেন। গঙ্গায় যে সকল নৌকা ডুবি হইত, তাহার দ্রব্যাদি উদ্ধার করা, তাহার অধিকারী থাকিলে সেই দ্রব্যাদি সমর্পণ করা ও অধিকারী না থাকিলে, তাহা রাজভাণ্ডারে প্রেরণ করা এই সকল গঙ্গাপ্রহরীর কার্য্য ছিল। অঙ্গদেব তাহা যথারীতি নির্ব্বাহ করিতেন। কিন্তু তাঁহার আর পদোন্নতি হয় না দেখিয়া, বিশেষ মনোযোগপূর্ব্বক কার্য্য করিবেন মনস্থ করিলেন। গঙ্গাপ্রহরীর যাহা প্রকৃতার্থে কর্ত্তব্য, তাহা ক্রমে করিতে লাগিলেন। গঙ্গার জল চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছে বলিয়া, জালের ভার ধরিতে লাগিলেন। গঙ্গাপ্রহরী হইয়া, গঙ্গার জল চুরি দেখা মহা পাপ। যে সকল গোরু গঙ্গার জল খাইত, তাহাদের নামে ফৌজদারি চার্জ্জ আনিতে লাগিলেন, যে সকল নৌকা অন্য নদী হইতে গঙ্গায় আসিয়াছিল, তাহাদের নামে অনধিকার প্রবেশ বলিয়া চার্জ্জ করিতে লাগিলেন। নৌকা আর ডুবিবার অপেক্ষা রহিল না, তাহার সমুদায় মালামাল বিক্রীত হইয়া, রাজভাণ্ডারে যাইতে লাগিল, রাজভাণ্ডার ক্রমে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কিছুদিন পরে রাজা জানিলেন যে, পূর্ব্বের গঙ্গাপ্রহরীদের সময় অল্প আয় হইত, তাহারা অবশ্য অনুপযুক্ত ছিল, এক্ষণকার গঙ্গাপ্রহরী বিশেষ দক্ষ ব্যক্তি, তাহাই এত আয়বৃদ্ধি হইয়াছে। অঙ্গদেবের পসার দাঁড়াইয়া গেল, সেই অবধি যখন কোন উচ্চপদ খালি হইত, অঙ্গদেব সর্ব্বাগ্রে পাইতেন।

"বর্ত্তমান সময়ের দুই একটি পরিচয় দিই। রামধন দাদা নামে একজন সদরআলা ছিলেন, তিনি কয়েক বৎসর হইল, রাজকার্য্য ত্যাগ করিয়াছেন; হয় ত পৃথিবীও ত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু সে সম্বন্ধে আমি কোন নিশ্চয় সংবাদ জানি না, রামধন দাদা যদি জীবিত থাকেন, কৃপাপূর্ব্বক আমার এ অপরাধ ক্ষমা করিবেন। তাঁহার প্রকৃত উপাধি কি ছিল, আমি জানি না, তাঁহাকে সকলেই রামধন—দাদা বলিত; তিনি সকলকেই দাদা বলিতেন, কাজেই সকলে তাঁহাকে দাদা না বলিয়া থাকিতে পারিত না; নিন্দকেরা বলিত, তিনি পঞ্চমপক্ষে বিবাহ করিয়াছিলেন সেই জন্য বয়ঃকনিষ্ঠদের দাদা বলিয়া আপনার বয়স কমাইতেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে, তিনি পঞ্চম পক্ষে বিবাহ করিয়াছিলেন সত্য, অথচ চুলে কলপ দিতেন না; কালাপেড়ে ধুতি

পরিতেন না, টপ্পা গাইতেন না, তবে ভদ্রলোকমাত্রকেই তিনি যে দাদা বলিতেন, তাহার প্রকৃত কারণ নিন্দকেরা জানিত না বলিয়া নানাপ্রকার উপহাস করিত। প্রথমতঃ তিনি একজন জজ সাহেবের সরকার ছিলেন, আবশ্যক মতে কুঠীর সমুদায় কার্য্য করিতেন, খানসামারা সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিত, তিনি তাহাদের ভালবাসুন বা নাই বাসুন, সকলকেই ভাই বলিয়া সম্বোধন করিতেন। সাহেবের সন্তানটীকে সর্ব্বদাই ক্রোড়ে করিয়া বেড়াইতেন, তাহার সামান্য অসুখ হইলে, চক্ষের জল মুছিতেন, কাজেই মেমসাহেবের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ বিজয়া দশমীর দিবস অতি ভক্তিভাবে দণ্ডবৎ হইয়া মেমসাহেবকে প্রণাম করিতেন, প্রথমবার মেমসাহেব কারণ জিজ্ঞাসা করায় রামধন দাদা আমাদের হিন্দুপ্রথা বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, মেমসাহেবের স্নেহ আরও বাড়িয়াছিল, একবার বিজয়ার দিবস প্রণামান্তে রামধন দাদা মেমসাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা আমায় কি বলে আশীর্ব্বাদ করিলেন?" মেমসাহেব আশীর্ব্বাদের প্রথা পূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন, হাসিয়া উত্তর করিলেন, "তুমি রাজা হও এ আশীর্ব্বাদ আমি করি নাই, কেন না ফলবান্ করা আমার ক্ষমতাতীত। সহস্র বৎসর পরমায়ু সম্বন্ধেও সেইরূপ। অতএব যাহা আমার আশীর্ব্বাদে ফলিলে ফলিতে পারে, আমি তাহাই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছি।" রামধন দাদা জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা সেটী কি?" মেমসাহেব আবার হাসিয়া বলিলেন, "তুমি শীঘ্র হাকিম হও।" রামধন দাদা বলিলেন, "যে আজ্ঞা মা আমি তবে অদ্যই বাটীতে পত্র লিখি আমি শীঘ্র মুন্সেফ হইব।" মেমসাহেব হাসিতে লাগিলেন। সেই দিবসেই আহারের সময় মেমসাহেব স্বজাতি কৌশল দ্বারা জজসাহেবকে আপনার আশীর্ব্বাদের পরিচয় জানাইলেন। আশীর্ব্বাদ যাহাতে সফল হয়, তাহার চেষ্টা করিবার নিমিত্ত জজসাহেব হাসিতে হাসিতে স্বীকার করিলেন। একবার মাত্র বলিলেন "বিচারের কার্য্য অতি কঠিন, রামধন মূর্খ তাহা পারিবে না।" মেমসাহেব বলিলেন, বিচারে যাহা ক্রটী হয়, আপীলে তাহা সংশোধন হইয়া যাইবে।

"কিছুদিন পরে রামধন দাদা মুন্সেফ হইলেন, ক্রমে সদর আমিন, সদর আলা হইয়া নানাবিধ বিবাদ ভঞ্জন করিলেন। বিচারে যত হউক বা না হউক, রফা দ্বারা অনেক মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতেন। রফায় কোন দোষ নাই, তবে যাহার দাবি মিথ্যা, তাহার কিছু লাভ হয়, অপর পক্ষের কিঞ্চিৎ ক্ষতি হয়। তাহা হউক, কিন্তু রামধন দাদা বিচারের দায় হইতে উদ্ধার হইতেন, বিশেষতঃ বিচারে একপক্ষের উকিল অস

ন্তোষ হইবার সম্ভব, রকায় সে সম্ভাবনা নাই।

"রামধন দাদা ইংরেজি কিঞ্চিৎ জানিতেন, সাহেবদের সঙ্গে ইংরেজিতে কথা কহিতেন; তাঁহার সকল কথা তাহারা বুঝিতে পারিতেন না। কিন্তু তিনি যে "ইয়ার আনার" (your honor) বলিয়া ছোট বড় সকল সাহেবকে সম্বোধন করিতেন তাহাতেই যথেষ্ট হইত। পুলিস দারগা জারিন সাহেবকে তিনি শতবার "ইয়ার আনার" বলিয়াছিলেন। যে অবধি তাঁহার মেম স্বকর্ণে তাহা শুনিয়াছিলেন, সেই পর্য্যন্ত স্বামীর পদগৌরব মেমের চক্ষে বিশেষ বাড়িয়াছিল, এবং সেই সঙ্গে দাম্পত্য কলহও কমিয়াছিল। কাজেই রামধন দাদার নিকট ফিরিঙ্গি দারগা বিশেষ বাধা ছিলেন।

"জজ, মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি সকল সাহেবের খানসামাদের রামধন দাদা আদরে ভাই বলিয়া সম্বোধন করিতেন; "ভাই রোমজান, তোমার সাহেব কি করিতেছেন, এখন কি সাক্ষাৎ হইতে পারে?" এইরূপ সম্বোধন একজন যুবা উকিল একদিন শুনিয়া বড় আক্ষেপ করাতে রামধন দাদা বলিলেন, দাস দাসীর মান সর্ব্বাগ্রে। ইহারা সদয় থাকিলে মুনিব সদয় হন। সময় পাইলে ইহারা উপকার করিতে পারে, অপকারও করিতে পারে। আমাদের আপনার মধ্যে কি হইয়া থাকে? জান না যে, আমাদের অধিকাংশ ভ্রাতৃবিরোধ দাস দাসীর দ্বারা উৎপত্তি হয়। আমার ভ্রাতৃবধূ অপেক্ষা তাঁহার দাসীকে আমি পূজা করি। বাটী গিয়া অগ্রে তাহাকে ডাকিয়া কাপড় দিই; সেই জন্য আমার গৃহে অদ্যাপি বিরোধ আরম্ভ হয় নাই। যেদিন দেখিব, তাহার মুখ ভার, সেই দিন জানিব, আমার কপাল ভাঙ্গিয়াছে।"

এই উদ্ধৃত অংশ যথেষ্ট। উপহাসের অনুরোধে লেখক কিঞ্চিৎ অত্যুক্তি করিয়াছেন; কিন্তু যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাতেই দেখা যাইতেছে যে, রামধন দাদা আপনার বিদ্যা বুদ্ধি নিজে জানিতেন কাজেই তদনুযায়ী ব্যবহার করিতেন; সকলকে আপ্যায়িত করিতে চেষ্টা পাইতেন। ছোট, বড়, কেহ তাঁহার শত্রু ছিল না; কেহ তাঁহার উন্নতির বিরোধী হইত না। সাহেবেরা অনুগত প্রতিপালক, কেই বা তাহা নহে। আমরা সকলেই অনুগত লোক ভাল বাসি। মনুষ্যমাত্রেই অনুগতের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। রামধন দাদা সকলের অনুগত ছিলেন, ক্ষমতাপন্নদের বিশেষতঃ; এ অবস্থায় তাঁহার উন্নতি নিশ্চয়ই সম্ভব। অনুগত হওয়া সকলের সাধ্য নহে; নম্রতা আবশ্যক, স্নেহ বা তৈল আবশ্যক, অভিমান জয় করা আবশ্যক। বিশেষতঃ অন্যের দোষ সম্বন্ধে অন্ধ হওয়া আবশ্যক। নম্রতা বা স্নেহ সহজ, অনেকেরই আছে। অন্যের দোষ

সম্বন্ধে অন্ধ হওয়াও নিতান্ত কঠিন নহে; বাক্যের সতর্কতা থাকিলে, সে গুণ উপলব্ধি হইতে পারে, কিন্তু নিরভিমানী হওয়া অতি কঠিন। রামধন দাদা নিরভিমানী ছিলেন তাহাই তাঁহার উন্নতি হইয়াছিল। উন্নতির অনেক হেতু আছে। নিরভিমানিতা তাহার মধ্যে একটি বিশেষ। যাহারা প্রতিভাশালী বা যাহাদের বিশেষ যোগ্যতা আছে তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। যাহাদের যোগ্যতা বিশেষ রূপে নাই তাহাদের পক্ষে রামধন দাদার পন্থা উন্নতিসাধক। বিশেষতঃ কি সাহেব কি বাঙ্গালি অনেকেই উপযুক্ত অনুপযুক্ত ব্যক্তিনির্ব্বাচন আপনি করিতে পারেন না, অন্যের কথায় নির্ভর করিয়া মীমাংসা করেন; এ অবস্থায় অন্যকে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী রাখা ভাল।

যাঁহাদের পদোন্নতি হয় না, অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, তাঁহারা বড় অভিমানী। অতি সামান্য বিষয়ে অপমানিত বোধ করেন। কাজেই কাহারও অনুগত হইতে পারেন না। হয় ত আবার কেহ কেহ আপনাদের যোগ্যতা বিষয়ে অতিরিক্ত অভিমানী। যাঁহার অধীনে কর্ম্ম করা যায়, যোগ্যতার অভিমান থাকিলে, কখন কখন তাঁহার প্রতি তাচ্ছিল্য জন্মে। অযোগ্য ব্যক্তিরা উচ্চপদ সর্ব্বদা পায়, অধীন ব্যক্তিরা যোগ্য হইলেও উভয়ের মধ্যে অসদ্ভাব ঘটে। এক পক্ষের তাচ্ছিল্য, অপর পক্ষের বিরুদ্ধতা, ফল অধীনের অনিষ্ট। এই জন্য কেহ কেহ বলেন:—

যার অধীনে কাজ করি।
কেন না তার পায়ে ধরি॥

যোগ্যতা থাকিলে, তাচ্ছিল্য নানা বিষয়ে নানা প্রকারে উপস্থিত হয়। বালকেরা নীতিকথায় পড়িয়া থাকে যে, এক খরগস ও এক কচ্ছপ উভয়ে কথা হইল যে, আইস আমাদের মধ্যে কে অগ্রে ঐ পর্ব্বতে পৌঁছিতে পারে। মন্দগতি কচ্ছপ তৎক্ষণাৎ ধীরে ধীরে চলিতে আরম্ভ করিল; খরগস ভাবিল, আমি যখন ইচ্ছা তখন গেলেও খরগসের পূর্ব্বে পৌঁছিব। অতএব তাচ্ছিল্য করিয়া নিদ্রা গেল, নিদ্রাভঙ্গে দেখে, কচ্ছপ বহুপূর্ব্বে পৌঁছিয়াছে। যোগ্য অযোগ্যের কার্য্যপ্রণালী প্রায় এইরূপই ঘটে। একপক্ষের যত্ন, অপর পক্ষের তাচ্ছিল্য। ফল ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির পরাজয়।

বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমানেরা অনেকে যে কৃতকার্য্য হইতে পারেন না, তাহার এক বিশেষ কারণ যে তাঁহারা উচিত বা উপযুক্ত বিষয়ে নিযুক্ত না হইয়া, হয় ত বিপরীত বিষয়ে লিপ্ত হন। যে ব্যক্তি বক্তৃতাশক্তিতে বঞ্চিত, তিনি হয় ত উকিল হইলেন; যিনি বক্তৃতাতে অদ্বিতীয় হইতেন, তিনি হয় ত যোদ্ধা হইলেন। যিনি মহাযোদ্ধা হইতেন, তিনি হয় ত কেরানি হইলেন। মধ্যে মধ্যে শুনা যায় যে, কেরানি কলম ফেলিয়া তরবার ধরিয়া মাত্র দেশ জয়

হইল; তাহার মূল কারণ এই। প্রকৃত যোদ্ধা কেরানির আসনে এতদিন বসিয়া মাটী হইতেছিলেন। সকল দেশেই এইরূপ সর্ব্বদা হইয়া থাকে, বিশেষতঃ হিন্দুসমাজে। তাহার বিশেষ কারণ, আমরা পৈতৃক ব্যবসা অবলম্বন করিয়া থাকি। স্বজাতিব্যবসায়ে আমাদের অধিকার বা ক্ষমতা থাকুক বা না থাকুক, তাহা অবলম্বন করিতে হয়, যে ব্যবসায়ে আমরা কৃতকার্য্য হইতে পারিতাম, তাহা গ্রহণ করা হয় না।

ইদানীন্তন পুরাতন প্রথা পরিবর্ত্তন হইতেছে। স্বজাতীয় ব্যবসা ত্যাগ করিয়া ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিতে পারা যাইতেছে; কিন্তু ইচ্ছার ভ্রান্তি হয়। যে বিষয়ে স্বাভাবিক শক্তি নাই, হয় ত কখন হইবেও না, সেই বিষয়ে সময় নষ্ট করিতে অনেকের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। কর্ণের দোষে যাহার কখন সুরবোধ হইবার সম্ভাবনা নাই, সে হয় ত গায়ক হইবে ইচ্ছায় বহুকাল পরিশ্রম করে। যে অদ্বিতীয় চিকিৎসক হইত, চিত্রকর হইবার সাধ তাহার হয় ত অতি প্রবল হইল। যদিও এরূপ প্রবৃত্তি সচরাচর দেখা যায়, কিন্তু তাহা স্বাভাবিক নহে। বিশেষ কারণে প্রবৃত্তির এরূপ ভ্রম ঘটিয়া থাকে; প্রশংসাপ্রিয়তা অনেক সময় এ ভ্রান্তির হেতু বলিয়া বোধ হয়। কোন সুকণ্ঠ গায়ক আবাল বৃদ্ধের বিশেষ প্রশংসাভাজন হইল দেখিয়া, কেহ গায়ক হইতে সাধ করিল। হয় ত সে ব্যক্তি অন্য ব্যবসায় অবলম্বন করিলে সেইরূপ প্রশংসার পাত্র হইতে পারিত; কিন্তু সে ব্যবসায়ে প্রশংসিত ব্যক্তি কেহ তাহার চক্ষে পড়িল না বলিয়াই ভ্রমবশতঃ গায়ক হইতে তাহার চেষ্টা হইল।

স্বজাতীয় ব্যবসা ত্যাগ করিয়া আপন আপন ক্ষমতা উপযোগী বৃত্তি অবলম্বন করিবার পক্ষে ইদানীং এক বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। [University] ইউনিভারসিটি তাহা ঘটাইয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয় নিজ বিধানদ্বারা জানাইয়াছেন যে, নানা শাস্ত্র তুল্যানুতুল্যরূপে শিখিতে হইবে, যে তাহা না পারিবে, তাহাকে একেবারে কিছুই শিখিতে দিব না। ইউনিভারসিটিতে প্রবেশ করিতেও দিব না; সে যদি তথাপি এদেশে থাকে, তাহাকে মূর্খ করিয়া রাখিব। সে ব্যক্তি প্রতিভাশালী হইলেও, তাহাকে কিছুই শিখিতে দিব না; রাজকার্য্যে বঞ্চিত করিব, তাহার উন্নতির ব্যাঘাত দিব। কাজেই অনেক বুদ্ধিমান্‌কে মূর্খ হইয়া থাকিতে হইতেছে। যাহার সকল বিষয়ে কিছু কিছু বুদ্ধি আছে, কোন বিষয়ে তাহার বিশেষ বুদ্ধি না থাকিলেও, সে ব্যক্তি বিদ্যোপার্জ্জনে অধিকারী বলিয়া গৃহীত হইতেছে; কিন্তু যাহার বিষয়বিশেষে অসাধারণ বুদ্ধি আছে, কিন্তু সকল বিষয়ে সমান প্রবৃত্তি নাই, তাহাকে অনধিকারী বলিয়া তাহার শিক্ষার দ্বার রুদ্ধ করা হইতেছে। যে ব্যক্ত রসায়ন শাস্ত্রে অসাধারণ হইয়া

দেশের হিতসাধন করিতেন, তিনি সাহিত্যের শ্লোক শিখিতে অমনোযোগী বলিয়া তাঁহাকে রসায়ন শাস্ত্র শিখিতে বঞ্চিত করা হইতেছে। যিনি সাহিত্যে চিরস্মরণীয় হইতেন, তিনি জমি জরীপ করিতে পারেন না বলিয়া, তাঁহার সাহিত্যশিক্ষার পথরোধ করা হইতেছে। শিক্ষাদানের এরূপ পক্ষপাতিত্ব পঁচিশ বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে; কিন্তু এ পক্ষপাতিত্ব দ্বারা দেশের কি বিশেষ ইষ্টসাধন হইয়াছে,তাহা অদ্যাপি স্পষ্ট জানা যায় নাই। যাহা হইয়াছে, অপক্ষপাতী শিক্ষাদানে তাহা যে কোন মতে হইত না এমতও লক্ষণ পাওয়া যায় না। এই পঁচিশ বৎসরের মধ্যে অনেকে বি, এ, অনেকে এম,,এ, উপাধিলাভ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা কোন বিষয়ে যে বিখ্যাতনামা হইয়াছেন,এমত আমরা শুনি নাই। সকলেই দশকর্ম্মা হইয়াছেন এইমাত্র শুনা যায়, বরং তাঁহাদের অধিকাংশই মধ্যবিধ ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। বোধ হয় নানা বিষয় তাঁহাদের শিখিতে হয় বলিয়া, কোন বিষয় বিশেষ করিয়া তাঁহারা শিখিতে পারেন নাই; কাজেই খ্যাতিমান্‌ও হন নাই। নানা শাস্ত্র অল্প অল্প শিক্ষা ভাল, কি এক শাস্ত্রে বিশেষ শিক্ষা ভাল; এ বিচার করিবার নিমিত্ত আমরা এ কথা তুলি নাই। আমরা এইমাত্র বলিতেছি যে, এক বিষয়ে কোন ব্যক্তির যদি বিশেষ বুদ্ধি বা প্রতিভা থাকে, তাহার সেই বিশেষ বুদ্ধির স্ফূর্ত্তি হইবার পক্ষে আমাদের ইউনিভারসিটি নিতান্ত বিরোধী, এতদূর পর্য্যন্ত বিরোধী যে,পাছে সে ব্যক্তি কোন রূপে আত্মশক্তি অনুযায়ী শিক্ষা পায়, এই আশঙ্কায় সকল কালেজের দ্বার রুদ্ধ করা হইতেছে। কেবল তাহাই নহে, যদি সে ব্যক্তি স্বচেষ্টায় আপনার উন্নতি সাধন করিতে যায়, ইউনিভারসিটি যেন বিমাতার ন্যায় তাহার উন্নতির পন্থা রোধ করেন। বিমাতা যদি শুনেন, ওকালতিতে তাঁহার বিশেষ অধিকার হইয়াছে, অমনি তৎক্ষণাৎ তাহার চুল ধরিয়া বলেন, "তুমি আমার নও, কাজেই তোমার উন্নতি নাই, তুমি আপনার চেষ্টা করিতে পাইবে না, আমার বাছাদের অন্নের ব্যাঘাত দিতে পাইবে না; তোমায় আমি উকিল হইতে দিব না।" হয় ত বিশ্ববিদ্যালয়ের এরূপ ব্যবহার সাধারণের পক্ষে মঙ্গলকর; কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের উন্নতিপক্ষে অনিষ্টকর। আমরা তাহাই বলিতেছিলাম যে, আপন ক্ষমতোপযোগী বৃত্তি অবলম্বন পক্ষে নূতন ব্যাঘাত উপস্থিত হইয়াছে।

যাঁহারা জানেন যে আমাদের কলিকাতা ইউনিভারসিটি বিলাতের লণ্ডন ইউনিভারসিটির অনুকরণ, তাঁহারা মনে করিতে পারেন আমরা যাহা বলিতেছি বাস্তবিক তাহা সত্য হইলে লণ্ডন ইউনিভারসিটির অন্য নিয়ম হইত। বিলাতে যে পদ্ধতি ভাল বলিয়া গৃহীত হইয়াছে বাঙ্গালায় তাহা মন্দ কেন

হইবে? কিন্তু তাঁহারা একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া যদি এ বিষয় বিশেষ আলোচনা করিয়া দেখেন তাহা হইলে বুঝিবেন ইংরেজদের বুদ্ধি বহুমুখী, নানা শাস্ত্র শিক্ষা করা তাঁহাদের পক্ষে অতি সহজ। কেবল সাহিত্য আর শুভঙ্করী অঙ্ক আমরা পুরুষানুক্রমে শিখিয়া আসিয়াছি কিন্তু ইংরেজেরা নানা শাস্ত্র অনেক পুরুষ অবধি আলোচনা করিতেছেন তাঁহাদের পক্ষে নানা শাস্ত্র শিক্ষা বৈজিক কারণে সহজ, আমাদের পক্ষে তাহা তত নহে, কিছু পুরুষ পরে সহজ হইতে পারে আপাততঃ নহে। লণ্ডন ইউনিভারসিটির শিক্ষিত সাহেবেরা সকল বিষয়ে মজবুদ, চৌকস, চালাক, আমাদের সেইরূপ কর্ম্মঠ করিবার নিমিত্ত লণ্ডন ইউনিভারসিটির অনুকরণ এখানে স্থাপন করা হইয়াছে। আমাদের পণ্ডিত করিবার নিমিত্ত কলিকাতা ইউনিভারসিটি হয় নাই। সেই জন্য যাঁহারা পণ্ডিত হইতে পারিতেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ শিক্ষায় বঞ্চিত হইতেছেন। বিলাতে এ ভুল সংশোধিত হইবার অন্য উপায় আছে। আমাদের মোটে একটী ইউনিভারসিটি তাহাতে প্রবেশ করিতে না পারিলে কোন কালেজে অধ্যয়নের উপায় নাই।

উন্নতির বিরোধী আর এক বিশেষ কারণ আছে—নিস্পৃহতা। আকাঙ্ক্ষাশূন্য হওয়া প্রশংসার বিষয় বটে; কিন্তু উন্নতি সম্বন্ধে নহে। আকাঙ্ক্ষা না থাকিলে, বিশেষ চেষ্টা হয় না। উন্নতির ইচ্ছা অনেকের আছে সত্য, কিন্তু সে ইচ্ছা বিশেষ প্রবল নহে। নিজ নিজ অবস্থায় নিতান্ত অসন্তুষ্ট অল্প লোকে; উন্নতি হইলে, ভাল হয়, তাহা না হইলেও ক্ষতি নাই ইহা অনেকের মনোগত ভাব। তাঁহাদের চেষ্টা বা উদ্যোগ কাজেই সামান্যরূপ হয়। তাহাই আমরা এ প্রবন্ধের শিরোভাগে বলিয়াছি "অসন্তোষ, অতৃপ্তি, উন্নতির মূলভিত্তি।" নীতিজ্ঞেরা আমাদের এ কথায় খড়্গাহস্ত হইবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা নীতিকথা বলি নাই, উন্নতির কথা বলিতেছি। তাঁহাদের আপত্তি থাকে, উন্নতির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরুন। ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে, যে নিয়ম, সমাজের পক্ষেও সেই নিয়ম; যেমন চলিয়া আসিতেছে, সেইরূপ চলিবে বলিয়া বসিয়া থাকিলে, একপক্ষে ব্যক্তিবিশেষের উন্নতি হয় না; অপর পক্ষে সমাজেরও উন্নতি হয় না। যে সকল সমাজ বিশেষ উন্নত, সে সকল সমাজের ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় অতৃপ্তই উন্নতির মূল।

আর একটি কথা আছে। বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা রাজপদে থাকিয়া উন্নতির প্রার্থী হন, তাঁহাদের ইংরেজিতে বাক্‌পটুতা আবশ্যক। ইংরেজেরা গুণগ্রাহী যতই হউন, তাঁহারা বিদেশী, আমাদের দোষ গুণ বুঝা তাঁহাদের পক্ষে সহজ নহে। তাঁহারা আপনা আপনি যতই

সে বিষয়ে আস্ফালন করুন, আমরা জানি তাঁহাদের ভ্রান্তি হইয়া থাকে। একশত বৎসর অবধি তাঁহারা এই আস্ফালন করিতেছেন; কিন্তু অদ্যাপি কিছু বুঝিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। সে যাহাই হউক, এক্ষণে দেখা যায় যে, তাঁহাদের নিজ ভাষায় আমরা বিশুদ্ধ ভাবে কথা কহিলে, দোষ গুণ বুঝিতে পারুন আর নাই পারুন, ভাষার গুণে বক্তার প্রতি তাঁহাদের কতক শ্রদ্ধা হয়, বিশেষতঃ বিশুদ্ধ ইংরেজি শিখিতে পারিলে, যে পরিমাণে অধ্যয়ন আবশ্যক, তাহাতে ইংরেজি ভাব অনেক শিক্ষা হয়। সহজেই তাহা কথায় বিন্যস্ত হইয়া বাঙ্গালি ভাব গোপন করে। সঙ্গে সঙ্গে বক্তার দোষও ঢাকা পড়ে। এই জন্য ইদানীন্তন অনেক নীচপ্রবৃত্তির লোক ইংরেজির গুণে উচ্চ পদাভিষিক্ত হইতেছে।

ইংরেজি আর এক কারণে বিশেষ করিয়া শিক্ষা করা আবশ্যক। যে সকল ব্যবহার আমাদের চক্ষে ভাল, ইংরেজের চক্ষে মন্দ, ইংরেজি জানিলে তাহা বর্জ্জন করা যায়। হেঁট মস্তক নিম্নদৃষ্টি আমাদের চক্ষে নম্রতার পরিচায়ক; ইংরেজি চক্ষে তাহা অপরাধের চিহ্ন। আমাদের ব্যবহারানুরূপ যে ব্যক্তি সাহেবদিগের নিকট নম্রতা দেখাইল, সে একেবারে মজিল। এই সকল ব্যবহারের ও প্রথার তারতম্য জানিবার নিমিত্তও ইংরেজি বিশেষ করিয়া জানা আবশ্যক।

এই স্থলে পরিচ্ছদ সম্বন্ধে দুই একটি কথা না বলিলে, ভাল হয় না। পরিচ্ছদ অনেক সময়ে উন্নতির সহায়তা করে; আবার অনেক সময় বৈরিতা সাধে, অতএব বুঝিয়া পরিচ্ছদ পরা আবশ্যক। আমরা সচরাচর বুঝি যে, পরিচ্ছদ ধন সম্পত্তির পরিচায়ক। ইংরেজেরা তাহার অতিরিক্ত আর একটু বুঝেন। পরিচ্ছদ মানসিক বৃত্তির পরিচায়ক; কে অসার ব্যক্তি, কে আড়ম্বরের লোক, কাহার নীচ প্রবৃত্তি, কে শাদাসিদে লোক, তাহা পরিচ্ছদ দেখিয়া তাঁহারা বিচার করেন, এ বিচার নিতান্ত অসঙ্গত নহে; অতএব পরিচ্ছদের প্রতি দৃষ্টি রাখা ভাল। বিশেষতঃ কতকগুলি ইদানীন্তন পরিচ্ছদ হইতে আমাদের কার্য্য পর্য্যন্ত অনুভব করিতে চাহেন। আমরা তাঁহাদের সম্মান করিতে গিয়াছি কি অপমান করিতে গিয়াছি, তাহা তাঁহারা দূর হইতে আমাদের পোষাক দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। যেখানে এতদূর অনুভব চলিতেছে, সেস্থলে অবশ্য বলিতে হইবে, পোষাক ভাল মন্দ ফল দিবার কতক মালিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এক সময়ে আমরা দেখিয়াছি, জুতার দোষে একজনের অবনতি হইয়াছিল; টুপিতে আর একজনের সর্ব্বনাশ করিয়াছিল, পয়সা দিয়া এ শত্রু কেন ঘরে আনিয়াছিলেন বলিয়া তিনি সর্ব্বদাই আক্ষেপ করিতেন। এ দেশের প্রচলিত কথা আছে যে "আবরুচি খানা, পররুচি পেহেন্না" এ পুরাতন কথা ভুলিবার প্রয়োজন কি? অন্যের যাহাতে বিরক্তি জন্মে এমত পরিচ্ছদ পরিয়া আপনার অনিষ্টসাধনের প্রয়োজন কি? সংসারে সকল ভার বহন করিয়া সামান্য এক পাগড়ির ভার যাহাদের অসহ্য বোধ হয় তাহারা কাপুরুষ। আমরা তাহাদের অশ্রদ্ধা করি।